যশোরেশ্বর

সম্রাট সেন

মণ্ডল বুক হাউস • ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড • কলিকাতা—৯

ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রদ্ধাভাজনেষু

লেখকের অন্যান্য বই

শিবাজীর স্বপ্ন

অধিবাস

মহানগর বাদশানগর।

অগ্নিতট সপ্তগ্রাম

দোলনচাঁপা

অঙ্গীকার

সায়াহ্নে সপ্তদুর্গা

যমুনাবতী সরস্বতী

তিমির-তোরণ (যন্ত্রস্থ)

দিঘির জলে ছায়া পড়েছে। মস্ত বড় দিঘি—প্রাসাদ নির্মাণকার্যের সুবিধার্থে প্রথমে ছোট পরে বৃহৎ ও সুরমা দিঘিতে পরিণত করা হয় ভ্রাতা বসন্তরায়ের উদ্যোগে। প্রতিটি কাজ নিখুঁত ভাবে সম্পাদন করা বসন্তরায়ের স্বভাব। ধৈর্য ও নিষ্ঠা প্রচুর। বুদ্ধিও তেমনি। সর্বোপরি রুচি ও সৌন্দর্যজ্ঞান থাকায় যে কাজে হাত দিয়েছে তাতেই ফুটে উঠেছে শ্রী। দিঘির পাড়ে পাড়ে শ্রেণীবদ্ধভাবে তাল-সুপারির শোভা, বহুকষ্টে কিভাবে যেন সংগ্রহ করেছে বিদেশী পামগাছ, প্রহরীর মতো সেগুলি মোতায়েন দিঘির উত্তর-দক্ষিণ দুই প্রান্তে। ঝিলের মতো টানা দীর্ঘ দিঘি, খুব সরু নয়, চওড়া বেশ। শিল্পীর মতো মাটি কেটে কেটে চারটি কোণের সৃষ্টি। ঘাট আছে দুটি—উত্তরে আর দক্ষিণে। টলটল করে স্বচ্ছ জল। ঠিক এ-রকম না-হোক, সারা যশোর জুড়ে অসংখ্য পুকুর ও দিঘি তৈরি করেছে ভ্রাতাটি। এখন তার মূল্য বোঝা যাচ্ছে, জনবসতি যত বাড়ছে, পুকুর ও দিঘি তত অপরিহার্য হয়ে উঠছে। বসন্তরায়ের দূরদর্শিতার প্রশংসা করতে হয়।

মেঘ,—আকাশে কোথাও সামান্য মেঘসঞ্চার হয়েছে নিশ্চয়, নইলে দিঘির জলে তার ছায়া পড়বে কেন? এখন ঝড়-বৃষ্টির সময় নয়, কোনো কারণে হাল্‌কা মেঘ উড়ে উড়ে এক খণ্ড দাঁড়িয়ে পড়েছে আকাশগাত্রে আর তারই ছায়া পড়ে দিঘির একাংশ জল হয়ে উঠেছে গভীর কালো। যেন কেউ কৌশলে কালি মিশিয়েছে ওইখানে। দু প্রান্তে রোদের ঝিলিক—মাঝখানে ওই কালো অংশটুকুর পানে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন রাজা বিক্রমাদিত্য। মনের মধ্যে কোথায় যেন নাড়া খেলেন সাংঘাতিক। এ লক্ষণ শুভ নয়। ঈশ্বর যেন বারে বারেই

প্রকৃতির খেয়ালের মাধ্যমে তাঁকে সচেতন করে দিতে চান। বিশ্রী চিন্তা ভর করে মনে। কে যেন ক্রমাগত তাঁর মনের সরোবরে কালো কালি গুলতে থাকে—কালো, কুটিল এবং কুৎসিত বর্ণের কালি! আস্তে আস্তে কালিমা-লিপ্ত হয়ে যায় সমস্ত মন। অস্থিরতা জাগে এবং উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। অত্যন্ত গোপন ও গভীর প্রদেশে উৎসারিত কণামাত্র কালি ক্রমশ বৃহৎ আকার ধারণ করার আগে তাই তিনি চান অন্য প্রসঙ্গে চলে যেতে—ভুলে থাকতে যে তিনি এক পুত্রসন্তানের জনক, যে পুত্রের দ্বারা আদৌ কোনো অনিষ্ট হবার সম্ভাবনা ছিল না এবং ভবিষ্যতেও থাকবে না। প্রতাপ পূত চরিত্র! তার কোষ্ঠির ফলাফল মিথ্যা হবে। সে হবে যশোরের সিংহাসনের সার্থক উত্তরাধিকারী।

কিন্তু মনে জোর আসছে কই। সেই বিশ্বাস দৃঢ়মূল হচ্ছে না কেন! দিঘির জলে ঢিল ফেলার মতো সাময়িকভাবে মনটা ছড়িয়ে যাচ্ছে বটে, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে লিপ্ত হতে চাইছে, কিন্তু ফের মিলিয়ে-যাওয়া জলবৃত্তের মতো একই কালির বিন্দুতে স্থির হয়ে পড়ছে চিন্তা। ওই কালির বিন্দুটি কিছুতেই অপসৃত হচ্ছে না—বারে বারে ওইখানে ফিরে আসছে মন। কোষ্ঠীর ফলাফল কী এত সত্য হবে? দৈব তো যথেষ্ট অনুগ্রহ করেছে, ধনে-জনে পরিপুষ্ট, যশ ও শক্তি করায়ত্ত, মানুষের সকল বাসনা ও কামনা এক-জীবনেই সার্থক—তবু দুষ্ট গ্রহের মতো কেন ওই কোষ্ঠী-গণনার তাড়না? হেসে উড়িয়ে দিতে পারেন না কেন তিনি? কই, ভ্রাতা বসন্ত-রায় তো এতটুকু বিচলিত নয়! সে সদা হাসিখুশি, সর্বদা রাজকার্যের দুরূহ সমস্যা ও কর্তব্যগুলি সমাধা করে চলেছে মুশকিল-আসানের মতো। দুশ্চিন্তা নেই কণামাত্র। প্রতাপ ওর সর্বাধিক প্রিয়পাত্র। অস্বীকার করার উপায় নেই যে পিতা হয়ে পুত্রকে তিনি সরিয়ে রেখেছেন দূরে, অবহেলা ও অযত্ন এত স্পষ্ট করে তুলেছেন যে বুদ্ধিমান প্রতাপ সহজেই তা ধরতে পেরেছে এবং সেই কারণেই তার যত আদর-আবদার খুড়ো ও খুড়িমার কাছে। শুধু বসন্তরায় নয় তার স্ত্রী কমলা-ছোটরাণীও যথেষ্ট

স্নেহ করেন দুর্দান্ত প্রতাপকে। এখনও কৈশোর পার হয়নি, স্বাস্থ্যে, সাহসে ও শক্তিতে প্রতাপ এমন দুর্দান্ত হয়ে উঠেছে যে ওকে শাসনে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। কারো কথা শুনতে চায় না—একরোখা, জেদী প্রকৃতি। এ বয়সেই যে ছেলে এমন, বড় হলে সে কি রকম হবে কল্পনা করতে গেলেই সামনে এগিয়ে আসে ওই কালো বিন্দুটি, সব যেন ওলোট-পালোট হয়ে যায়।

স্নেহ-মমতা-বাৎসল্য সবই তাঁর আছে, ছিল, হৃদয় নামক বস্তুটি একা বসন্ত-রায় বা তার মহিষী কমলা দেবীর কুক্ষিগত নয়, তিনি পিতা, রক্তের মধ্যে জেগে আছে পুত্রের মঙ্গল-কামনা—তাকে কাছে পাবার ইচ্ছা, তার ডাক শোনার আকাংখা, কৃতিত্বে খুশি হওয়া, নিন্দায় বিমর্ষ থাকা—সমস্ত মানবিক বৃত্তির অধিকারী তিনিও—কিন্তু ওর জন্মকালের পর থেকেই দুঃস্বপ্নের মতো, আতংকের মতো কি-যেন তাড়া করে বেড়াচ্ছে, ক্ষণে ক্ষণে কালো বিন্দুটি দেখা যায়। ঈশ্বর-বিশ্বাসী তিনি, দৈবের উপর নির্ভরশীল—ঈশ্বরের অনুগ্রহ না-থাকলে এবং দৈব সহায়তা না-করলে এমন অপর্যাপ্ত দান তিনি কখনও লাভ করতেন না। রাশি রাশি অর্থ না-চাইতেই পেয়েছেন তিনি। জলা-জঙ্গল এই ভূভাগের অধিপতি হয়ে এত অল্প সময়ের মধ্যে যশ ও খ্যাতির উচ্চ শিখরে উঠতে পারতেন না—দিনে দিনে এমন জন-বসতি ঘটত না। যশোর সদ্য পত্তনকারী নগর কিন্তু খ্যাতিতে গৌড়কেও হার মানায়। এখন যশোরে সর্ব উপকরণ স্তরে স্তরে সাজানো, সুখ সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তার আদর্শ বাসভূমি। অসন্তোষ নেই কোনোখানে, ঘরে ঘরে শান্তি বিরাজমান। প্রভাত-বন্দনায় জেগে ওঠে বিহগকুল—বেরিয়ে আসে বৈতালিকের দল। পাখির গানে ও মানুষের সংকীর্তনে প্রতিদিন স্নাত হয় পুণ্য যশোর। মন্দিরে মন্দিরে বাজে ঘণ্টা, মসজিদে মসজিদে ওঠে আজান। কোথাও বিভেদ নেই—মিলে-মিশে সকলে এক। ভাবলে প্রসন্নতায় ভরে যায় মন। যা তিনি চেয়েছিলেন, পেয়েছেন প্রচুর পরিমাণে।

মেঘের টুকরো সরে গেছে, দিঘির জল সংকীর্তনের মতো স্বচ্ছ। ছোট ছোট ঢেউ উঠেছে বাতাসের বেগে, আহা, যেন আখরের ছড়াছড়ি। ঢেউ-গুলো যেন কীর্তনের সেই আখর যা শুনলে মন জুড়িয়ে যায়! এখন মন চাইছে পদাবলী শুনতে—কীর্তন সুরের মধ্যে এমন এক আত্মলীন তন্ময়তা ও ভাবোদ্বেলতা আছে যে যথার্থ শ্রোতা অচিরে ঈশ্বরের পুণ্য-স্পর্শ পায়। অন্তত তাঁর নিজের ক্ষেত্রে একাধিকবার এ-রকম ভাব-সমাধি ঘটেছে। বিশেষত গোবিন্দদাসের মতো অপূর্ব গায়ক যদি হন তিনি! এই এক দুর্লভ সংগ্রহ। তৃষাতুর চিত্তে সুরের অমৃতধারা বর্ষণ করে দেন সাধক-কবি গোবিন্দদাস। বহু ভাগ্যে পাওয়া গেছে তাঁকে, আছেন তিনি যশোরেই। তাঁকে আনা এবং এখানে রাখার কৃতিত্ব বসন্তরায়ের—সে নিজেও গোবিন্দ-দাসের ভক্ত। দিনারম্ভে, দরবারের ছোটখাটো কাজগুলি সারা হলে, মন চায় ওঁর গান শুনতে। চিত্ত ভরে ওঠে রসে-বশে। সমস্ত গ্লানি দূর হয়ে যায়। কালো কালির বিন্দুটি ফ্যাকাশে হয়। মনে জাগে আনন্দ।

এখন সুন্দর প্রভাত। দরবারে গিয়ে বসতে হবে একটু পরে। প্রজাদের অভাব-অভিযোগ থাকলে শুনতে হবে, কেউ দোষ করে থাকলে তার বিচার করতে হবে। বেশিক্ষণ চলে না দরবার। প্রজাদের অভাব অভিযোগ নেই বললেই হয়, দোষের মাত্রা এখনও বেড়ে ওঠেনি। ভাবতে হয় না বেশি। পাশে বসন্তরায় থাকার দরুন দুরূহ কোনো সমস্যা দেখা দিলে দুজনে পরামর্শ করে সুমীমাংসা করে দেন তৎক্ষণাৎ। অভিযোগকারী খুশি, দণ্ডধারী সন্তুষ্ট।

কিন্তু···

না, ও-ভাবনা তিনি আর ভাবতে চান না। অন্তত এখন, এই সুন্দর প্রভাতক্ষণে, মনের মধ্যে কোনো কালিমা জমতে দেবেন না। ঈশ্বরের বিধান কী কেউ বদলাতে পারে? অন্তর পীড়িত হচ্ছে, পুত্রদ্বেষে বিষাক্ত হয়ে উঠছে মন। থামাতে হবে এই কুচিন্তা, পবিত্রতায় ভরিয়ে দিতে হবে হৃদয়। কীর্তনের মধু-সুরে পূর্ণ করে দিতে হবে শ্রবণ···

'কে আছিস ?

প্রহরী এসে দাঁড়াল

'যা মন্দির থেকে গোবিন্দদাস বাবাজিকে ডেকে আন্। দরবারে যেতে বলিস···গান শুনব।'

প্রহরী চলে গেল।

'ভজহুঁ রে মন, নন্দ-নন্দন, অভয় চরণারবিন্দ রে—'

সকালের সভায় আসতে পারেন নি গোবিন্দদাস, মন্দিরে ব্যস্ত ছিলেন। বিকেলে নিজেই এসেছেন দরবার-শেষে এই গান হচ্ছিল। ভক্তিরসের গান। কানে যেন সুধা বর্ষিত হচ্ছে।

'দুলহ মানুষ জনম, সৎসঙ্গে তরহ, এ ভবসিন্ধু রে—'

চক্ষু নিমীলিত, দুই গণ্ড বেয়ে অশ্রুধারা নেমেছে—ভাব-বিহ্বল চিত্তে গান শুনছিলেন রাজা বিক্রমাদিত্য। ভক্তিরসাত্মক গান শুনলে ভাবে তাঁর চিত্ত দ্রবীভূত হয়। তিনি পরম বৈষ্ণব।

'শীত আতপ বাত, বরিখ এ দিন, যামিনী জাগি রে।

বিফলে সেবিনু, কৃপণ দুরজন, চপল সুখলব লাগি রে—'

রাজসভা-গৃহ নিস্তব্ধ—অমাত্যবর্গ ও আত্মজনেরা নিশ্চুপ। পদকবি গোবিন্দ-দাস ভাবোদ্বেল চিত্তে কীর্তন পরিবেশনে রত। অনুরোধ করেছিলেন রাজ-ভ্রাতা বসন্তরায়—তিনি রাজা বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন পার্শ্বে উপবিষ্ট। জ্যেষ্ঠভ্রাতার মতোই তাঁর চিত্তেও ভাবোদ্বেলতা, চক্ষু নিমীলি[illegible] এবং রসাবেশে হৃদয় বিগলিত। দুই ভ্রাতার অঙ্গেই রাজবেশ—কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত রাজকার্য বিষয়ে প্রাসঙ্গিক কথাবার্তা শেষ করে নতুন গড়ে-ওঠা যশোর নগর সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলাপে মগ্ন ছিলেন উভয়ে। অবকাশ পাওয়া গিয়েছিল সহজ কথাবার্তা বলার। যশোর নগর-পত্তন হয়েছে অল্প কয়েকবছর আগে মাত্র, জঙ্গল পরিষ্কার করে নতুন বসতি নির্মাণের জন্যে

বসন্তরায় চেষ্টা করছিলেন আপ্রাণ, পূর্ববঙ্গ থেকে জ্ঞাতিকুটুম্বদের এনে রাজধানীর চারপাশে তাঁদের বসবাসের বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন—আস্তে আস্তে তিনি গড়ে তুলছিলেন 'যশোর-সমাজ'। এই সমাজের সুখ-সুবিধার প্রতি তাঁর নজর ছিল প্রখর। সে কারণে একটি সমাজমন্দির নির্মাণ করে সেখানে বহু ভক্ত ও গুণীজনের সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন। পদকবি গোবিন্দ-দাস তাঁদের একজন। তিনি সংসার-বিবাগী মুক্ত পুরুষ।

গোবিন্দদাস ঊর্ধ্ববাহু হয়ে কীর্তন পরিবেশন করছিলেন স্বভাবসিদ্ধ মধুর স্বরে :

'এ ধন-যৌবন, পুত্র-পরিজন, ইথে কি আছে পরতীত রে।
কমলদল-জল, জীবন টলমল, জপহুঁ হরিপদ নিত রে॥
শ্রবণ কীর্তন, স্মরণ-বন্দন, পাদ-সেবন দাস্য রে।
পূজন ধেয়ান, আত্মনিবেদন, গোবিন্দদাস অভিলাষ রে—'

শুনতে শুনতে বিক্রমাদিত্যের মনে পড়ছিল—গৌড়ে কৃষ্ণলীলা পদ-গানের আসরে পদকবির সঙ্গে তাঁদের প্রথম আলাপ। তখনই দুভাই আকৃষ্ট হয়েছিলেন গোবিন্দদাসের প্রতি। বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন কাব্যরসিক কনিষ্ঠ ভ্রাতা বসন্তরায়। তখন থেকেই, যুদ্ধ-বিধ্বস্ত হৃত-গৌরব গৌড় ত্যাগ করে যশোরে চলে আসার পরও বসন্তরায় বিস্মৃত হন নি গোবিন্দদাসের অপূর্ব পদাবলী—নতুন রাজ্য যশোরে একটু স্থিতু হয়ে বসার পর পূর্ববঙ্গ থেকে যেমন জ্ঞাতিকুটুম্ব আনার সুবন্দোবস্ত হচ্ছিল তেমনি দরদী-কণ্ঠ পদকবিকে যশোরস্থ করেছিলেন বসন্তরায়। ভক্ত ও কবি উভয়ের প্রাণে প্রাণে ভাব-রসের আশ্চর্য মিল।···নিমীলিত নেত্র ঈষৎ বিস্ফারিত করে তিনি তাকিয়ে দেখলেন পার্শ্বোপবিষ্ট ভ্রাতা কীর্তন শুনছেন তদ্গত চিত্তে, যেন এই কীর্তন-শ্রবণ ব্যতীত অন্য কোনো সাধ তার নেই। এত গভীর তন্ময়তা মানুষ কেমন করে পায়—এ মুহূর্তে ভেবে পেলেন না রাজা বিক্রমাদিত্য। যেন একাত্মতা। মাঝে মাঝে আশংকা হয় এই ভাব-তন্ময়তা বুঝি

তাকে সংসার-পাশ ছিন্ন করে বিবাগী করে তুলবে ভবিষ্যতে। তখনই একটা শিহরণ খেলে যায় রাজা বিক্রমাদিত্যের মনে। শিহরণ জাগে এ কারণে যে ভাই বসন্তরায় যদি ভক্তিভাবস্রোতে ভেসে যায় তা-হলে একা তিনি নবগঠিত যশোর-রাজ্য পরিচালনা করবেন কী ভাবে? প্রকৃতপক্ষে যশোরের বল ও বুদ্ধি তো বসন্তরায়ই,—রাজ্য-পরিচালনার সর্ববিধ পরামর্শ একা ওই কনিষ্ঠ ভ্রাতারই প্রাপ্য। যদিচ তাঁরা দুজনে সহোদর ভ্রাতা নন কিন্তু শৈশব থেকেই উভয়ে হরিহর-আত্মা—বড় হয়েছেন রাম-লক্ষ্মণের মতো একাত্মতায়। এমন অনুগত, শক্তিমান ও বুদ্ধিমান ভ্রাতা এ যুগে অতি দুর্লভ—সহস্র বাহু প্রসারিত করে বসন্ত-রায় রক্ষা করছেন সমগ্র যশোর-রাজ্য, তাঁর যেমন দূরদৃষ্টি তেমনি নিখুঁত পরিকল্পনা। কে বলবে সে রাজা বিক্রমাদিত্যের খুল্লতাত ভাই। সহোদর ভ্রাতাও এমন করে না!

শুধু ভয় আর আশংকা ওই অকপট ভক্তিবাদ। কীর্তন শুনতে শুনতে কোনো হুঁশ থাকে না বসন্তরায়ের—সর্বচিত্তে তার বিপুল সাড়া জাগে। তখন মনে হয় না এই লোক কত জ্ঞানী, কত দক্ষ রণ-নিপুণ, কী অসীম বুদ্ধি—কত ক্ষুদ্র জিনিসকে সে কী বৃহৎ আকারে পরিণত করতে পারে। অসাধারণ পরিশ্রমী, তেমনি নির্ভীক ও অটুট চরিত্রবল। ছেলে বেলা থেকে দুজনে একসঙ্গে বড় হয়েছেন,—জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দেখেছেন বসন্তরায় কোনো অবস্থাতেই হার স্বীকার করতে রাজি নন, বড় বড় ব্যাপারে পাঞ্জা বাড়িয়ে দিয়েছেন নির্দ্বিধায়। বলিষ্ঠ, কর্মঠ পুরুষ—প্রায় ক্ষেত্রেই তার মুঠো ফিরে আসে নি শূন্য অবস্থায়। সেই দাউদ খাঁর আমলে যেমন, এখনও তেমনি। সমস্ত প্রতিকূলতা বিচূর্ণ করে এই জলা-জঙ্গলের দেশে অল্পদিনে এমন সুন্দর রাজ্য গড়ে তোলা কী চাড্ডিখানি কথা! একা তিনি কী পারতেন উত্তরাধিকারীহীন চাঁদ খাঁয়ের এ রাজ্যে নতুন করে প্রাণের বন্যা ডেকে আনতে? অন্য কেউ কী পারত যদি বসন্তরায়ের মতো…?

আগে কী ছিল এ অঞ্চলটা—আর এখন কী হয়েছে। ভাবলে বিস্ময় জাগে। তাঁদের তুজনের কৃতিত্ব বটে, তবু স্বীকার করতে হবে, সর্বাধিক কৃতিত্ব একা বসন্তরায়ের প্রাপ্য। বঙ্গেশ্বর দাউদ খাঁ-র পরাজয়ে মোগল আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করার উপযুক্ত স্থান অন্বেষণ এবং সেই পরিত্যক্ত জঙ্গলাকীর্ণ স্থানকে মানুষের বাসোপযোগী করে তোলা—এই বিরাট কর্মকাণ্ডের সকল স্তরে হিসাবী পদচারণা খুব সহজ ব্যাপার নয়। ভ্রাতা বসন্তরায় তাই করেছে এবং বর্তমানে রাজ-পরিবারের অতন্দ্র প্রহরীর মতো ঘরে-বাইরে সদাজাগ্রত প্রখর দৃষ্টি রেখেছে।

এই লোক, যে একাধারে রণদক্ষ ও কূটকৌশলী, সমাজ-ধারক ও মানব-প্রেমিক, তার পক্ষে ঈশ্বর-প্রেমে একেবারে বিগলিত হয়ে যাওয়া কীভাবে সম্ভব,—মাঝে মাঝে চিন্তা করে কূল-কিনারা পান না রাজা বিক্রমাদিত্য। যদিচ তাঁরা আজন্ম বৈষ্ণব এবং ঈশ্বর-প্রেম তাঁদের রক্ত-ধারায় ওতঃপ্রোতভাবে মিশ্রিত তবু এই নতুন রাজ্যের চিন্তা, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও অন্যান্য সত্তাগুলিকে ডুবিয়ে এক-প্রাণ হয়ে ভক্তিরসে অবগাহন কী সম্ভব? তিনি নিজে পরম বৈষ্ণব—অস্বীকার করা যায় না যে পদকবি গোবিন্দদাসের মতো কান্তকোমল পদাবলী শুনলে তাঁর চিত্ত আপ্লুত হয় এবং ভাবাবেগে শিহর জাগে অঙ্গে এবং গণ্ড বেয়ে নেমে আসে অশ্রুজল; কিন্তু তৎসত্ত্বেও বৈষয়িক ও সাংসারিক চিন্তাগুলি থেকে তিনি অব্যাহতি পান কই! বৈষয়িক চিন্তা অবশ্য তেমন প্রবল নয়, কারণ যে অপরিমিত অর্থ তিনি সংগ্রহ করে এনেছেন বিপর্যস্ত গৌড় থেকে তা অধস্তন দশম পুরুষেও নিঃশেষ হবে না; অজস্র দান, গৃহ নির্মাণ, জঙ্গল পরিষ্কার ও জ্ঞাতিকুটুম্ব আনয়ন, মন্দির ও দিঘি নির্মাণ, সৈন্য সংগ্রহ ইত্যাদি ব্যাপারে কখনও কখনও অর্থ-ভাণ্ডারে সঞ্চয়ের সন্ধান নিতে হয় বইকি! নিজে মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা না করলেও সংবাদগুলি যথাযথ তাঁর কানে আসে এবং হিসাব দাখিলপত্র ঠিক পাঠিয়ে দেয় রাজস্ব বিভাগ, যে বিভাগের ভার বসন্তরায় গ্রহণ করেছে নিজে। কোনো

ত্রুটি নেই—হিসাব একেবারে জলের মতো পরিষ্কার। মনে পড়ল, বসন্তরায় পূর্বে দাউদ খাঁর রাজস্বমন্ত্রী ছিল। হিসাবে সে বরাবর পাকা।··· এত খরচ করেও দিঘির জল আর কতটুকু কমেছে!

বৈষয়িক ব্যাপারে দুশ্চিন্তা তত নয়—যত সাংসারিক বিষয়ে। তা-ও ঠিক নয়, সংসার সম্বন্ধে তাঁর দুশ্চিন্তা করার আর কী আছে। বহুকাল হল প্রথমা স্ত্রী বিগত, দ্বিতীয়া স্ত্রী লোকান্তরিতা হয়েছেন সম্প্রতি, শুভানুধ্যায়ী-দের অজস্র অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি আর দারপরিগ্রহ করেন নি। এখন বয়স হয়েছে, তৃতীয় বিবাহের চিন্তা আদৌ নেই, ধর্মকর্মে আত্মনিয়োগ করে জীবনের বাকি কটা দিন কাটিয়ে দিতে পারলে আর কিছু চান না তিনি। ভোগ যথেষ্ট হয়েছে, না চাইতে ঈশ্বর অনেক-কিছু দিয়েছেন, অর্থ যশ প্রতিপত্তি—আজ এ বয়সে কোনো জিনিসের অভাব নেই। সংসার-ধর্মের কাম্য ফল, সন্তান, তা-ও তিনি পেয়েছেন। দুশ্চিন্তা সেই সন্তানকে নিয়ে, তার ভবিষ্যতের কথা ভেবে। প্রথমা স্ত্রীর একমাত্র সন্তান গোপীনাথ, যুবরাজ হওয়ার পর থেকে যার নাম প্রতাপাদিত্য—এই অল্প বয়সে সে এমন দুর্দান্ত হয়ে উঠেছে যে···

'দাদা, কী ভাবছো?'

সচকিত হলেন রাজা বিক্রমাদিত্য। নড়ে চড়ে বসলেন একটু।

'গান শেষ হয়ে গেছে বুঝি?'

বললেন ঈষৎ বিস্মিত হয়ে, গোবিন্দদাসকে না দেখে।

'হ্যাঁ।' বসন্তরায় বললেন, 'গোবিন্দদাস চলে গেলেন তোমাকে প্রণাম করে, অমাত্যগণ চলে গেলেন একে একে, কিন্তু তুমি সাড়া দিলে না দেখে সন্দেহ হয়—'

অপ্রতিভ হলেন রাজা বিক্রমাদিত্য।

'ভাবছিলাম। ভাবতে ভাবতে এমন তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম যে—'

'কীর্তন শুনতে শুনতে আমিও এমনি আত্মহারা হয়ে যাই, কোনো জ্ঞান থাকে না।' বসন্তরায় বললেন, 'আমাদের রাজ্য তো এখন সুপ্রতিষ্ঠিত,

জনবসতি পরিপূর্ণ। চাঁদ খাঁর বেওয়ারিশ পতিত জমি এখন থইথই করছে জনে-ধনে। বাড়িঘর ছবির মতো সাজানো, রাস্তাঘাট ঝকঝকে তকতকে, কোথাও কোনো অশান্তি নেই। দেবমন্দিরে ঘণ্টা বাজছে ছুবেলা, মসজিদ থেকে আজান শোনা যাচ্ছে বাতাসে, সৈন্য-সামন্ত টহল দিচ্ছে নিয়মিত। মোটামুটি পুরনো যশোর জমে উঠেছে নতুন করে, তবে দাদা, যশোর নামটা আমার তেমন ভাল লাগে না—আমি আর একটু বড় করে নাম রাখতে চাই, তোমার কেমন লাগবে জানি না—'

'কী নাম?'

বসন্তরায় বললেন, 'যশোর শব্দটার কোনো অর্থ হয় না। প্রকৃতপক্ষে আমরা গৌড়ের যশ হরণ করে এ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছি। গৌড়ের গণ্যমান্য ব্যক্তি, পাঠানরাজ দাউদ খাঁর সঙ্গে মোগলের যুদ্ধের পর যারা জীবিত ছিলেন, প্রায় সকলেই চলে এসেছেন যশোরে। গৌড়ের ধনসম্পত্তি নিয়েই আজ আমাদের এত রবরবা। তাই আমার ইচ্ছা নামটা ঈষৎ লম্বা করে 'যশোহর' রাখি—'

মৃছু হাসলেন রাজা বিক্রমাদিত্য।

বললেন, 'ছেলেবেলা থেকেই তোর কাব্যিরোগ, ছিমছাম করে প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করা—অর্থহীন শব্দগুলিকে সামান্য অদল-বদল করে অর্থবহ করে তোলা তোর স্বভাব। যেহেতু মাথায় এসেছে গৌড়ের যশ হরণ করে এ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছি অমনি মগজের কাব্যিপোকা-গুলো নড়ে উঠল,—মাঝখানে একটি 'হ' ঢুকিয়ে দিয়ে অর্থকৌলীন্যে ও উচ্চারণ-সৌকর্যে নামটি সর্বাঙ্গসুন্দর করার বাসনা। পুরনো নামটা থাকলে ক্ষতি কী? য-শো-র—খুব খারাপ শোনাচ্ছে না তো?'

'আমার কানে কিন্তু খটকা লাগছে। এর চেয়ে কত মিষ্টি য-শো-হ-র, কত ভরাট। তুমি নিজেই পাশাপাশি ছুটো উচ্চারণ করে ছাখ—'

'বেশ বাপু তাই হল। আমি পুরনো দিনের মানুষ, আমার কান হালকা,

আমার যশোর যা যশোহর তা-ই। তুই যে নামে ইচ্ছা ডাকতে পারিস। কিন্তু আমি ভাবছি আমার পরে এই রাজ্য কে ভোগ করবে?'

'তার মানে?'

বসন্তরায় সোজাসুজি জ্যেষ্ঠভ্রাতার পানে তাকালেন।

'খুব স্পষ্ট। একটু চিন্তা করলেই আমার কথার মানে বুঝতে পারবে—'

ক-মুহূর্ত চুপ করে রই'লন বসন্তরায়।

বললেন, 'দাদা, তুমি অনর্থক উদ্বিগ্ন হচ্ছো। আমি বলছি, তুমি প্রতাপের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারো। প্রতাপ সবে কৈশোর ডিঙিয়েছে বটে কিন্তু সে আর-দশটা তরুণের চেয়ে স্বতন্ত্র। আমি তার অস্ত্রশিক্ষাগুরু, সকালে উঠে আমরা তুজনে একসঙ্গে অশ্বারোহণে বেড়াতে যাই, ফিরে এসে আমার কাছেই অস্ত্রশিক্ষা ও ব্যায়ামশিক্ষা করে। তলোয়ার চালনায় ও ধনুর্বিদ্যায় ইতিমধ্যে সে অনেককেই টপকে গেছে। নিয়মিত কুস্তি অভ্যাস করে স্বাস্থ্যে যেমন ভরপুর শরীরে তেমনি দশাসই হয়ে উঠেছে—আমার বড় ছেলে রাঘব ওর চেয়ে এক বছরের ছোট, তাকেও আমি মনের মতো গড়তে চেয়েছিলাম কিন্তু সে তা হয়ে ওঠেনি, অথচ প্রতাপের পানে তাকালে গর্বে ও আনন্দে আমার বুক ভরে ওঠে। দাদা, সর্ববিষয়ে পারঙ্গম এমন ছেলে আমার জীবনে আমি বড়-একটা দেখি নি—'

রাজা বিক্রমাদিত্য গম্ভীর হয়ে উঠছিলেন। সংক্ষেপে তিনি শুধু বললেন, 'হুঁ।'

'শুধু অস্ত্রবিদ্যা ও শরীর-গঠনের দিকেই তার নজর আছে তা কিন্তু নয়। তুমি জানো, প্রতাপ আমার কাছে নিয়মিত বিদ্যাশিক্ষাও করে। বাংলা ও সংস্কৃত-পাঠে তার মেধা দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছি—তীক্ষ্ণ স্মৃতি-শক্তি, অসাধারণ মেধা। একবার কিছু শুনলে বা দেখলে সে কখনও বিস্মৃত হয় না। সংস্কৃতের সঙ্গে ফারসীও শিখেছে রীতিমত—ওর ফারসী-

শিক্ষক সেদিন আমাকে বলছিলেন যে প্রতাপ এ বয়সে নিজে নিজেই ফারসী কবিতা রচনা করতে পারে। খেয়াল-খুশি-মতো ফারসী কবিতা লেখে প্রতাপ, মুখে মুখে দু-চার লাইন এমন কবিতা বলে যে—'

আরও গম্ভীর একটি শব্দ উদ্‌গীরণ করলেন রাজা বিক্রমাদিত্য : 'হুঁ।'

'ওর সহোদর কোনো ভাই-বোন নেই, জন্মের পর মা-কে হারিয়েছে। হয়তো একটু খেয়ালী হয়ে উঠেছে প্রতাপ, কিন্তু দাদা, আমি ওর মধ্যে অসাধারণ কয়েকটি গুণের সন্ধান পেয়েছি—যে কারণে তাকে আমার এত ভালো লাগে। আমার মনে হয় প্রতাপ বেঁচে থাকতে যশোহরের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুশ্চিন্তার কারণ ঘটবে না। ছাখ দাদা, তুমি-আমি ভাগ্যবলে অগাধ ধন-সম্পত্তির অধিকারী হয়েছি, গৌড়ের প্রসাদ না পেলে এতদিন আমাদের ঘোড়দৌড় করে বেড়াতে হত এখানে ওখানে—ভাগ্যান্বেষণে কত জায়গায়-না ঘুরেছেন আমাদের পূর্বপুরুষেরা, আমরাও নিতান্ত গরীব অবস্থা থেকে ধাপে-ধাপে উন্নতি করে দাউদ খাঁয়ের বিশ্বাস ও অনুগ্রহলাভ করেছি—সে সব দিন ভুলি নি। তবু মনে হয় প্রতাপ যে বলিষ্ঠ চরিত্র পেয়েছে তার সঙ্গে যদি সামান্য পরিমাণে দৈবানুগ্রহ মেশে, এবং তা মিশবে বলে আমার ধারণা, তাহলে এই যশোহর রাজ্য তার হাতে চতুর্গুণ সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী হবে—'

বিক্রমাদিত্য ফের একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন, 'হুঁ।'

এবার বিস্মিত হলেন বসন্তরায়। পুত্রের প্রশংসা শ্রবণকালে কোন্ পিতা এমন নির্বিকার থাকে। নির্বিকার বলা যায় না, অমনোযোগিতা। বরং সোজাসুজি বিরক্তই বলা যায়। পিতা যেন বিরক্ত পুত্রের প্রশংসায় —যে পুত্র অসাধারণ গুণাবলীর অধিকারী এবং সর্বতোভাবে রাজ-সিংহাসনের উপযুক্ত। কোথায় কী ঘটেছে? কেন এত পুত্র-বিরক্ত পিতা?

বসন্তরায় হয়তো আরও অনেক কথা বলতেন ভ্রাতুষ্পুত্র তরুণ প্রতাপা-

দিত্য সম্বন্ধে, থেমে গেলেন অকস্মাৎ। সংহত করে নিলেন আবেগ। এখন অবকাশ প্রচুর, রাজকর্ম সমাধা হয়ে গেছে, গোবিন্দদাস ও অন্যান্য রাজকর্মচারীরা অনুপস্থিত—এখন দুই ভ্রাতা মন খুলে কথা বলতে পারেন, পারস্পরিক আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট করে তুলতে পারেন নানা বিষয়ে। প্রতাপ সম্বন্ধে কোথাও একটা ক্ষোভ জমে আছে দাদার মনে সেটা দূর করে দিতে না পারলে সদা-সর্বদা বিরূপতা জাগবে—প্রতিনিয়ত কাঁটার মতো বিঁধতে থাকবে পিতৃ-অন্তর, সদ্য যৌবনপ্রাপ্ত পুত্রের মনে দেখা দেবে প্রবল অশান্তি। কোনোমতেই তা হতে দেওয়া উচিত নয়। বিপুল বিত্তের অধিকারী আজ তাঁরা, এই সম্পত্তি বা রাজ্য রক্ষা করতে পারে একমাত্র প্রতাপাদিত্যের মতো সর্বগুণান্বিত বংশধর। কিন্তু পিতৃ-আশীর্বাদ তার উপর বর্ষিত না হলে ভবিষ্যৎ জীবন সুখময় হতে পারবে না। দাদার মনে কোথায় দুঃখ? কিসের ক্ষোভ? ভাবছিলেন বসন্তরায়।

'কী হল? থেমে গেলে যে। আমার পুত্রের এত গুণ তা তো জানতাম না! শোনাও আরও প্রতাপ-গুণগান—'

কেমন বক্র দৃষ্টি, স্বরে ব্যঙ্গের ছলকানি। বসন্তরায় চোখ নামিয়ে নিলেন, ব্যঙ্গ শুনে গম্ভীর হয়ে গেল মুখ। উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইলেন। বুঝতে পারলেন যে এবার দাদার পালা, তিনি পালটা আক্রমণ চালাবেন। তা তিনি চালাতে পারেন, বসন্তরায় ভাবলেন, তাহলে ভালোই—দাদার মনের ভেতরটা পরিষ্কার দেখা যাবে। তাছাড়া আশৈশব দুজনের হৃদয় অভিন্ন, একজনের ক্ষতে অপরজন প্রলেপ দিয়েছেন, একের দুঃখে অপরে চোখের জল ফেলেছেন। আজ পরিণত বয়সে যদি তেমন কিছু ঘটে থাকে তাহলে আর-একবার চোখের জল ফেলবেন দুজনে একসঙ্গে। দাদাকে বলার সুযোগ দিয়ে তিনি তাই নির্বাক হয়ে গেলেন একেবারে।

'আমাদের পূর্বপুরুষদের কথা তুমি সব জানো—'

বসন্তরায় বুঝতে পারলেন এ হল ভণিতা, দাদা আরও গভীরে প্রবেশ

করবেন। তিনি শংকিত হলেন এই ভেবে যে ভনিতা করতে গিয়ে দাদা যদি আদি পুরুষ বিরাট গুহ থেকে বক্তব্য বিস্তার করেন তাহলে একখানি মহাভারত হবে—সে যে বহুদূর অতীতের কাহিনী! বিরাট গুহ সম্বন্ধে জ্ঞান কারই বা আছে, কেউ তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ-কিছু জানেন না, তিনিও না দাদাও না। এইটুকু মাত্র জানা যায় যে বিরাট গুহ আদিশূরের সময়ে আগত পঞ্চকায়স্থের মধ্যে একজন—তিনি বঙ্গদেশে এসে কোথায় ছিলেন, কোন্ কর্ম করতেন, কেউ তা জানে না। মনে পড়ছিল তাঁর অধস্তন নবম পর্যায়স্থ অশ্বপতি বা আশ্ গুহ বঙ্গজ কায়স্থদের এক বীরপুরুষ। এঁর সম্বন্ধে যেটুকু জানা যায় তা এই যে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে যখন চন্দ্রদ্বীপের রাজা পরমানন্দ (বসু) রায় সমাজ সমীকরণ করে বঙ্গজ কায়স্থদের 'ব'ক্‌লা সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন, তখন আশ্ গুহ শ্রেষ্ঠ কুলীন বলে স্বীকৃত হন। এই আশ্ গুহের এক প্রপৌত্রের নাম রামচন্দ্র। তাঁকেই বলা যায় যশোহর-রাজবংশের আদিপুরুষ।

'ভাগ্যফল ও দৈবানুগ্রহ যশোর-রাজবংশের উপর বর্ষিত হয়েছে বরাবর।' বিক্রমাদিত্য বললেন, 'পূর্বপুরুষ রামচন্দ্র তখনকার হিসাবে কৃতবিদ্য ব্যক্তি ছিলেন বটে, কিন্তু ধনসমৃদ্ধ ছিলেন না আদৌ, বরং তাঁর পিতার অবস্থা শোচনীয় ছিল বলেই আমরা বংশ-পরম্পরায় জানি। কিন্তু তিনি ছিলেন যেমন কষ্টসহিষ্ণু তেমনি উদ্যমশীল। ভাগ্যদেবীর দুই সহচর হল কর্ম ও উদ্যম। রামচন্দ্র অবস্থার উন্নতির জন্যে অর্থান্বেষণে বাক্‌লা থেকে চলে এলেন সপ্তগ্রামে। সপ্তগ্রাম তখন গৌড়ের অধীন একটি শাসন-কেন্দ্র। সেখানে প্রাদেশিক পাঠান শাসনকর্তার অধীনে রাজস্ব সংগ্রহ ও শাসনকার্য নির্বাহের জন্যে ছিল বহু কর্মচারীর বাস। কারণ সরস্বতী নদীর তীরে সপ্তগ্রাম তখন প্রসিদ্ধ বাণিজ্য বন্দর। নিত্য বহুলোকের সমাবেশ। নানা লোক নানাভাবে সেখানে অর্থোপায় করে নিচ্ছে।'

বসন্তরায় বুঝতে পারছিলেন দাদা পিতামহের গল্প শুরু করেছেন। পিতামহ রামচন্দ্র অর্থোপার্জনের আশায় বাক্‌লা পরিত্যাগ করে সপ্তগ্রামে উপস্থিত

হন এবং সৌভাগ্যবশতঃ সপ্তগ্রামের নিকটবর্তী পাটমহলে এক ঘোষ-পরিবারে আশ্রয়লাভ করেন। মনে পড়ছিল পরিবারের কর্তার নাম শ্রীকান্ত ঘোষ। তিনিও কুলীন কায়স্থ এবং পূর্ববঙ্গে তাঁর নিবাস ছিল। সেই সূত্রে উভয়ের পরিচয় গাঢ় হয় এবং পিতামহের রূপে ও গুণে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে কন্যা সম্প্রদান করেন। তাঁর শ্বশুর ও শ্যালকেরা সপ্তগ্রামে চাকরি করতেন বলে বেকার তরুণ পিতামহ প্রথমে মুহুরীরূপে চাকরিক্ষেত্রে প্রবেশলাভ করেন এবং ক্রমে উন্নতি করে অবস্থা ফিরিয়ে আনেন। তিনি সেখানে 'নিয়োগী' উপাধি পেয়েছিলেন এবং সুখে চাকরি করছিলেন।

'কিন্তু সপ্তগ্রামে আসার পূর্বে,' বিক্রমাদিত্য বলছিলেন, 'দেশে তিনি প্রথম বিবাহ করেছিলেন—ষষ্ঠীধর বসু মহাশয়ের কন্যার গর্ভে তখন তাঁর তিন পুত্র—ভবানন্দ, গুণানন্দ ও শিবানন্দ। পুত্রেরা সংস্কৃত ও পারসীক ভাষায় কৃতবিদ্য হয়ে সপ্তগ্রামে এলেন এবং রাজ-সরকারে কার্যারম্ভ করলেন। তিনজনে কানুনগো দপ্তরে কার্য করে খ্যাতিমান হলেন। তাঁদের বয়স বাড়ছিল। রামচন্দ্র তিন পুত্রের বিবাহ দিলেন—'

'তুমি ভবানন্দ জেঠামশায়ের ছেলে শ্রীহরি আর আমি গুণানন্দের পুত্র জানকীবল্লভ—পিতৃপ্রদত্ত আমাদের এই দু নাম—'

বিড়বিড়ানি শোনা গেল বসন্তরায়ের কণ্ঠে। তিনি ভেবে পাচ্ছিলেন না—পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটার কী প্রয়োজন? দীর্ঘ ইতিহাস,—সব কথা মনে থাকা সহজ নয়। বহু উত্থান-পতন ঘটেছে তাঁদের বংশে, ঘটনার পাকদণ্ডী পথ বেয়ে তাঁরা আজ যশোহরে প্রতিষ্ঠিত না হলে খুড়া শিবানন্দ ও তাঁর পুত্রদের মতো হয়তো পূর্ববঙ্গেই স্থায়ী বসবাস করতে হত। খুড়া শিবানন্দ ও তাঁর পুত্রেরা কেউই যশোহরে আসেন নি, তাঁরা সুখে বাস করছেন পূর্ববঙ্গে। কিন্তু সেদিন? এই শিবানন্দ খুড়া মশায়ের জন্যেই সপ্তগ্রাম ত্যাগ করে গৌড়ে যেতে হয়েছিল তাঁদের সবাইকে···

'ছেলেবেলার কথা তোর মনে আছে, জানকী? আমার কিন্তু স্পষ্ট মনে পড়ে সেদিনের কথা—'

অতীত কাহিনীতে আচ্ছন্ন হয়ে গেলে দাদা কখনও কখনও পুরনো নামে সম্বোধন করেন। ভালো লাগে শুনতে। এ নামে ডাকার লোক আজ আর নেই। পিতা ও পিতামহ বিগত, খুড়ো তো পূর্ববঙ্গে, একমাত্র দাদা ব্যতীত 'জানকীবল্লভ' নামে ডাকার মতো বয়োজ্যেষ্ঠ স্বজন আর কে আছে! দাদাকে 'শ্রীহরি' নামে সম্বোধন করার মতো লোক কেউ নেই। বসন্তরায় আকৃষ্ট হচ্ছিলেন দাদার কণ্ঠস্বরে, যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিলেন অতীত দিনের কাহিনীতে। মনে হচ্ছিল মাঝে মাঝে অতীত-কাহিনী আলোচনা করা ভালো, তাতে মন পরিশুদ্ধ হয়। বংশ-কাহিনী শ্রবণ পুণ্যকর্মও বটে।

'তুই আমার চেয়ে দু বছরের ছোট।' দাদা বলছিলেন, 'আমি তখন বেশ বড় হয়েছি। ভাইদের মধ্যে তোর সঙ্গেই আমাব সবচেয়ে বেশি মেলামেশা, খুব মিল। সপ্তগ্রামে এসে খেলাধূলার মধ্যে দিয়ে সেই স্নেহ-ভালোবাসা আরও প্রকট হয়ে উঠেছিল, দুজনে একসঙ্গে সরস্বতী নদীতীরে বেড়াতাম, বাজারে ঘোরাঘুরি করতাম, কোথাও কৃষ্ণগান হলে দুজনে জমে যেতাম সে-আসরে। বেশ হেসে-খেলে দিন কাটছিল আমাদের—'

'...ই একটা ব্যাপারে খুড়া শিবানন্দের সঙ্গে তৎকালীন শাসনকর্তার মত-বিরোধ উপস্থিত হয়, আমার মনে পড়ছে।'

'হ্যাঁ। মত-বিরোধ প্রবল হয়ে ওঠে।' বিক্রমাদিত্য বললেন, 'তখন দেশে অরাজকতা চলছিল। শেরশাহের অকর্মণ্য বংশধর আদিল শাহ দিল্লীর তখ্‌তে উপবিষ্ট আর বঙ্গের শাসনকর্তা মহম্মদ খাঁ সুর স্বাধীনতা ঘোষণা করে 'মহম্মদ শাহ' উপাধি ধারণ করেছেন। ফলে, সপ্তগ্রামের শাসন-কর্তাও আর গৌড়ের অধীন থাকতে সম্মত নন। খুড়া শিবানন্দের সঙ্গে এ বিষয়েই মত-বিরোধ উপস্থিত হয়—খুড়া মশায় এ প্রস্তাব সঙ্গত নয় বলে নিজমত প্রকাশ করার ফলে যত অনর্থের উৎপত্তি। পুত্রের সঙ্গে মত-পার্থক্যহেতু রাজ-দরবারে অকারণ অপদস্থ হলেন ঠাকুরদা

রামচন্দ্র—তিনি প্রায় চল্লিশ বছর প্রতিষ্ঠার সঙ্গে রাজকার্য চালিয়ে আসছিলেন সপ্তগ্রামে। এখন, পঁয়ষট্টি বছর বয়সে, অসম্মান বরদাস্ত করতে পারলেন না তিনি। রাজরোষ থেকে আত্মরক্ষার কথাও হয়তো ভেবেছিলেন। তাই ভাগ্যান্বেষণে পুনরায় তিনি যাত্রা করলেন গৌড়ে —সপ্তগ্রামের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে। গৌড়ের নবীন নৃপতি মহম্মদ শাহের দরবারে তাঁর সুখ্যাতি পৌঁছেছিল, দেশ-বিপ্লবের সেই সন্ধিক্ষণে তিনি এমন করিতকর্মা ব্যক্তিকে ছাড়লেন না,—পিতামহ পুত্রদের কর্মসংস্থান করে অল্পদিন পরে গৌড়েই শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন—'

'বাবা-কাকা-জেঠা, পরিবারের আমরা সবাই গৌড়ে এসেছিলাম।'

'আমরা তখন ছেলেমানুষ।' বিক্রমাদিত্য তন্ময় হয়ে গেছেন অতীত কাহিনীতে, 'ভারতবর্ষের ইতিহাসে সে বড় বিষম গোলযোগের সময়। গৌড়েশ্বর মহম্মদ শাহ কিছুকাল পরে শেরশাহের অনুকরণে দিল্লীশ্বর হবার কল্পনায় সসৈন্যে যাত্রা করলেন আগ্রা অভিমুখে—পথে ছাপরা-মৌএর যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও নিহত হলেন। তাঁর পুত্র খিজির খাঁ 'বাহাদুর শাহ' নাম ধারণ করে গৌড়ের সিংহাসনে বসলেন —'

'ওদিকে দিল্লিশ্বর আদিল শাহের সেনাপতি হিমু পরাজিত ও নিহত হলেন পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে,—স্বয়ং আকবর যুদ্ধ পরিচালনা করে-ছিলেন সেনাপতি বৈরাম খাঁর সঙ্গে। আদিল শাহ পালিয়ে যান এবং আকবর দখল করে নেন দিল্লির সিংহাসন।'

'কিন্তু পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারেন নি আদিল শাহ।' স্মরণ করিয়ে দিলেন বিক্রমাদিত্যঃ 'তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন মুঙ্গের দুর্গে। পর বৎসর গৌড়েশ্বর বাহাদুর শাহ ও মগধের শাসনকর্তা সুলেমান কররানী উভয়ে আক্রমণ করেন মুঙ্গের দুর্গ এবং সে যুদ্ধেই আদিলের কাল হয়—তিনি মারা যান।...বাহাদুর শাহ নিষ্কণ্টক হলেন এবং নির্বিবাদে বঙ্গদেশ শাসন করতে লাগলেন। আমার মনে হয়, সেই সময় আমার বাবা ও দুই খুড়ো রাজদপ্তরে কার্যদক্ষতার গুণে 'মজুমদার'

উপাধি লাভ করেন। কারণ তারপরের গৌড়ের ইতিহাস তো নাটুয়ার নাট—কে কতদিন রাজত্ব করেছেন তার হিসাব রাখা কঠিন—'

'নিঃসন্তান বাহাদুর শাহ পরলোকগমন করলে তার ভাই জেলাল-উদ্দীন প্রায় তিন বছর রাজত্ব করেন।' বসন্তরায় হিসাব দেবার চেষ্টা করলেন, 'জেলালের দেহান্ত ঘটলে তাঁর এক শিশুপুত্রকে সিংহাসনে বসানো হয় বটে, কিন্তু সাত মাস যেতে না-যেতেই গিয়াসউদ্দীন নামে এক ব্যক্তি সেই শিশুকে হত্যা করে এগারো মাস রাজত্ব চালান। তখন কররানী বংশীয় পাঠানবীর তাজ খাঁ রাজদণ্ড কেড়ে নেন। কিন্তু অল্পকাল মধ্যে তাঁর মৃত্যু ঘটার ফলে তাঁর ভাই সুলেমান রাজতখতে উপবিষ্ট হন। তুমি ঠিকই বলেছ দাদা, গৌড়ের ইতিহাস তখন নাটুয়ার নাট। এই অবিরত রাজপরিবর্তন দেখে নরোত্তম ঠাকুর গান বেঁধে-ছিলেন ঃ

'রাজার যে রাজ্যপাট, যেন নাটুয়ার নাট,
দেখিতে দেখিতে আর নাই—'

'সুলেমান চতুর শাসনকর্তা।' বিক্রমাদিত্য বললেন, 'তিনি অরাজকতার যুগে কঠোরভাবে রাজদণ্ড পরিচালনা করে শান্তি সংস্থাপনে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি গুণীর সমাদর করতেও জানতেন। কারণ, কোনো রাজনৈতিক বিদ্রোহে যোগদান না করে সব কাজে কৃতিত্ব দেখানোর ফলস্বরূপ আমার বাবা, তোমার বাবা ও ছোট খুড়ামশায় তিনজনেই সুলেমানের কৃপালাভে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁরা ক্রমে উচ্চ-পদ পেলেন,—আমাদের বংশে সৌভাগ্যের প্রত্যক্ষ সূচনা তখন থেকেই। কারণ বাবার হল মন্ত্রিত্ব লাভ আর অন্য দুই ভ্রাতা পেলেন কানুনগো দপ্তরের অধ্যক্ষ ও সহকারী অধ্যক্ষের পদ···'

'মনে পড়ছে, তুমি আর আমি তখন যুবক।'

'সুলেমানের দুই ছেলে, বয়াজিদ ও দাউদ। নতুন সম্মান লাভের ফলে তুমি ও আমি এত গৌরবান্বিত হয়ে উঠি যে, রাজপুরীতে আমরা

দুজন সঙ্গী করে নিয়েছিলাম বয়াজিদ ও দাউদকে—তাঁদের সঙ্গেই আমরা খেলতাম, বেড়াতাম ও শিক্ষালাভ করতাম। সেজন্যে আমাদের চারজনের ভেতরে খুব বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে—আমরা পরস্পর বন্ধু হয়ে পড়ি—'

'দাদা, সে সময়ে তোমার প্রথম বিবাহ হয়েছে এবং একটি পুত্র-সন্তানের জনক হয়েছো তুমি।'

'সেই হতভাগ্য পুত্রসন্তানের কথাই বলতে চাইছি আমি।' বিক্রমাদিত্যের কণ্ঠস্বরে আবেগ নিশ্চিহ্ন, তিনি পুনরায় গম্ভীর হয়ে উঠলেন। বললেন, 'তার নাম হল প্রতাপ। যেমন জেদী তেমনি উগ্র স্বভাব। জানকীবল্লভ, তুমি জানো প্রতাপের জন্মের পাঁচদিন পরেই তার মাতৃদেবী ইহলোক পরিত্যাগ করেন—অশুভ লক্ষণ এই পুত্রের জন্মকোষ্ঠী তোমার অবিদিত নেই। তার জন্মকোষ্ঠীতে স্পষ্টত উল্লেখ আছে সে পিতৃহন্তা হবে। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সে গর্ভধারিণী মা-কে হারিয়েছে, এখন যেভাবে সে বড় হচ্ছে তাতে আমার আশংকা হয়—'

'দাদা', বসন্তরায়ের কণ্ঠস্বর সামান্য চাপা কিন্তু অতিশয় দৃঢ়ঃ 'কোষ্ঠীর ফলাফল আমি মানি কিন্তু তার চেয়েও বেশি বিশ্বাস করি মানুষের পুরুষকারে। তোমার অবহেলায়, বলতে গেলে, জন্ম থেকে প্রতাপ মানুষ হচ্ছে আমার হাতে বউ ঠাকুরানী মারা যাবার পর সেই সূতিকাগৃহেই তাকে কোলে তুলেছেন আমার নিঃসন্তান প্রথমা স্ত্রী—আজও তাঁর কোলই মাতৃক্রোড় বলে জানে প্রতাপ। মা বলে ডাকে। অপরপক্ষে তার ভালো-মন্দ সমস্ত ভার গ্রহণ করেছি আমি। প্রতাপকে আমি ছেলের মতো ভালোবাসি এবং স্নেহ করি—'

'জানি, জানকী। তোমার জন্যে তার বহু অপরাধ আমি ক্ষমা করেছি। তোমার ওপর আমার অগাধ আস্থা। শুধু এই একটা ব্যাপারে…'

'দাদা', বসন্তরায় তেমনি গম্ভীরকণ্ঠে নিবেদন করলেন, 'আমার ওপরে তোমার যদি এই আস্থা থেকেই থাকে, তাহলে কথা দিচ্ছি প্রতাপ

তার জন্মদাতার হন্তারক হবে না; আমি তার জামিন রইলুম। আজ পর্যন্ত আমার কথার খেলাপ হয় নি তুমি জানো।'

'কিন্তু জানকী, কোষ্ঠীর ফলাফল কী মিথ্যা হবে?'

'তা জানি না।' বসন্তরায় বললেন, 'তবে আজ যে প্রতিশ্রুতি তোমাকে দিলাম অসাধ্য না হলে আমি তা পালন করব।'

'তুই কোষ্ঠীর ফলাফল বদলে দিতে পারিস। তোর অসাধ্য কিছু নেই। যেভাবে তুই এই যশোর নগর প্রতিষ্ঠা করেছিস তাতে তোকে দ্বিতীয় ঈশ্বর বলা যায় এবং তা বলা উচিত।' আস্তে একটি নিশ্বাস বেরিয়ে এল তাঁর: 'কিন্তু প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে গিয়ে যে খেসারত তোকে দিতে হবে, আমার মনে হয়, সেটা হবে আরও ভয়াবহ। হয়তো···'

'যা-কিছু হোক, আমি সেজন্যে তৈরি।' বসন্তরায় আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন, বাইরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দাদা, বেলা পড়ে আসছে। চলো অন্দরমহলে যাই—'

'চলো।'

রাজা বিক্রমাদিত্যের ক্লান্তি লাগছিল, তিনি ভ্রাতাকে অনুসরণ করলেন।

সভাগৃহ পরিত্যাগ করে তাঁরা অন্দরমহলের দিকে যাচ্ছিলেন। অনেকক্ষণ কেটেছে আলাপে—কখন অপরাহ্ণ নেমেছে দুজনের কেউই খেয়াল করেন নি। অন্দরমহলের দিকে যেতে যেতে উভয়ে লক্ষ্য করলেন দিনের আলো অনেক কমে এসেছে, সন্ধ্যা আগত। আকাশগাত্রে মুমূর্ষু আলোর ছটা এবং বিহগ-কূজনে আকাশ-পথ মুখরিত। বোঝা যাচ্ছিল সারাদিন আকাশ-ভ্রমণের পর ক্লান্ত পাখিরা কুলায় ফিরছে কূজনে গগন মুখরিত করে। দীর্ঘ টানা দালান। রাজা বিক্রমাদিত্য অন্যমনস্কভাবে পথটুকু অতিক্রম করছিলেন, সহসা থমকে দাঁড়ালেন। যেন শিহরিত হলেন। তাঁর পদপ্রান্তে বাণবিদ্ধ একটি পক্ষী।

'এ কী! কে এ কাজ করলে?'
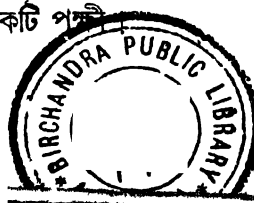
তিনি চারিদিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করলেন। যূথভ্রষ্ট পক্ষীটিকে কেন্দ্র করে শূন্যপথে আর্ত বিহগ-রব শোনা যাচ্ছিল। দিনশেষের ম্লান আলোয় যেন একটি বিস্রস্ত রাগিণী। করুণ ও ব্যাকুল।

'কার এ ঔদ্ধত্য? নিরীহ পক্ষীকে বাণবিদ্ধ করেছে? কে সে?'

উত্তপ্ত হয়ে উঠছিলেন রাজা বিক্রমাদিত্য।

'যে কেউ এ কাজ করে থাক্', বসন্তরায় বললেন, 'উড্ডীন পক্ষীকে বাণবিদ্ধ করা সহজ কর্ম নয়। সে রীতিমত দক্ষ তীরন্দাজ—'

'থামো।' রাজোচিত কণ্ঠস্বরে ধমক দিলেন বিক্রমাদিত্যঃ 'আমার অন্তঃপুরে এসব চলবে না। লক্ষ্যভেদের পরীক্ষা-ক্ষেত্র এটা নয়। আমি জানতে চাই কে একাজ করেছে? প্রহরী—'

'আদেশ করুন।'

সুসজ্জিত প্রহরী অভিবাদন করে দাঁড়াল।

'দ্যাখ তো কে এ কাজ করেছে? ধরে আনো তাকে—'

প্রহরী চলে যাচ্ছিল কিন্তু তৎপূর্বেই তরুণ প্রতাপাদিত্য এসে দাঁড়িয়েছে, হাতে ধনুর্বাণ। তেজোদীপ্ত, বলিষ্ঠ ও উন্নত চেহারা। সুগঠিত শরীর, প্রশস্ত ললাট, তীক্ষ্ণ চক্ষু। যদিচ বিনীত ভঙ্গী তবু যেন মনে হয় অকপট নির্ভীকতা– যা পিতার চোখে ঔদ্ধত্যের পরিচায়ক। পলকমাত্র তার পানে দৃষ্টিপাত করে বিক্রমাদিত্য যেন গর্জন করে উঠলেন, 'প্রতাপ, তুমি এ পক্ষীকে বাণবিদ্ধ করেছো?'

'বাগানে আমরা খেলা করছিলাম', প্রতাপাদিত্য নম্রস্বরে উত্তর দিল, 'সকলের হাতেই তীর-ধনুক ছিল। খেলতে খেলতে কে যেন বললে, কার লক্ষ্য কত অভ্রান্ত পরীক্ষা করা যাক্। কীভাবে পরীক্ষা হবে? তখন প্রস্তাব হল, উড়ন্ত পক্ষীকে বাণবিদ্ধ করতে পারলে তাকে শ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ বলা হবে। সবাই তীর ছুঁড়ল একে একে—কিন্তু কারো তীরেই উড়ন্ত পক্ষী বিদ্ধ হল না। তখন আমি ধনুকে শরসন্ধান করলাম, লক্ষ্য স্থির রেখে—'

'থাক্। বুঝতে পেরেছি। তুমি ছাড়া এ দুষ্কর্ম আর কে করবে? মস্ত তীরন্দাজ হয়েছো তাই না? আচ্ছা, দেখা যাবে তুমি কত বড় তীরন্দাজ। শিগগির এ সবের পরীক্ষা হবে।' তাঁর স্বরে কঠিনতা, বিক্রমাদিত্য বললেন, 'তুমি জানো অকারণ জীবহত্যা আমি পছন্দ করি না তদুপরি সেটা যদি রাজপুরীতে ঘটে থাকে তাহলে তার ক্ষমা নেই। তোমাকে শাস্তি পেতে হবে প্রতাপ—'

বসন্তরায তাড়াতাড়ি ডাকলেন, 'দাদা—'

'বলো?'

বসন্তবায বললেন, 'খেলাচ্ছলে উড়ন্ত পক্ষী বিদ্ধ করা বীতিমত প্রশংসার কাজ নয় কি। আমি তো প্রতাপের কোনো দোষ দেখি না। তবে বলতে পারো রাজপুরীতে এ পরীক্ষা না করে বনে-জঙ্গলে করলে শোভন হয়। শোনো প্রতাপ, এমন কাজ রাজপুরীতে আং কখনও কোরো না—'

প্রতাপাদিত্য মৃদুস্বরে বললে, 'আমি ভাবতে পারি নি যে বাণবিদ্ধ হয়ে পাখিটা উড়তে উড়তে এতদূবে চলে আসবে এবং আপনাদেব সামনেই পড়বে—'

'আচ্ছা যাও।'

প্রতাপাদিত্য নতমুখে চলে গেল।

রাজা বিক্রমাদিত্য কিছুক্ষণ ভ্রাতার মুখের পানে তাকিয়ে রইলেন। তারপর কাটা-কাটা ভাবে ধীরস্বরে বললেন, 'ভাই, কতদিন তুমি ওকে এরকম আগলে রাখবে জানিনে, কিন্তু পিতা হয়ে আমি বলছি প্রতাপ আমাদের শাসন মানবে না—বড় হয়ে সে সকলের অবাধ্য হবে। তাকে শাসন করা দরকার। কিন্তু তোমার জন্যে তা বুঝি আর হবে না। এখন থেকে তার স্বভাবের যে রূপ ও জীবনের যে ধারা দেখছি তাতে—'

বসন্তরায় বললেন, 'দাদা, প্রতাপ সম্বন্ধে হতাশ হয়ো না। সে আমাদের

বংশের মুখোজ্জ্বল করবে। তোমার কাছে বলতে আমার লজ্জা নেই, প্রতাপের মতো ছেলে আমি স্বপ্নে দেখেছি। আমার বিশ্বাস, অনেক ভাগ্যে প্রতাপকে আমরা পেয়েছি। সে এ রাজ্যের মানসপুত্র—'
বলে আপন-মহলে ঢুকে গেলেন তিনি। বিক্রমাদিত্য একটা গম্ভীর আওয়াজ ত্যাগ করলেন, 'হুম্।'

২

রাত্রে শুয়ে প্রতাপের কথাই ভাবছিলেন বসন্তরায়। ভাবনার কারণ দাদা স্বয়ং। হিসাব করে দেখলেন আঠারো বছর বয়স হল প্রতাপের—কিন্তু পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ সহজ হতে পারল না আজও। বিশেষতঃ দাদা, তাঁর আচরণে পুত্রের প্রতি প্রসন্নতা দেখা গেল না একদিনও। যেন তাঁর শত্রু প্রতাপ। প্রতি পদে খুঁত ধরা, তার সর্ব আচরণে সমালোচনা। ধূমায়িত বিদ্বেষ ও পুঞ্জীভূত বিরাগে দাদা যেন ফেটে পড়তে চান প্রতাপের কথা উঠলেই—আদৌ সহ্য করতে পারেন না তিনি পুত্রের প্রশংসা। কখনও কখনও এমন মনে হয় যে পুত্রের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলতে চান তিনি পিতা হওয়া সত্ত্বেও। জন্ম থেকে প্রতাপের সঙ্গী এই প্রবল পিতৃ-বিরূপতা। অবশ্য অকারণ নয়। মানতেই হবে যে প্রতাপের জন্মকোষ্ঠী অতি ভয়ংকর—বারংবার গণনার দ্বারা তার কোষ্ঠীতে পাওয়া গেছে 'পিতৃহন্তার' সংকেত। কিন্তু তা বলে তার অন্য দিকগুলো স্বীকার করা যাবে না কেন? বিদ্বেষহীন স্বচ্ছ দৃষ্টিতে তাকালে দাদা দেখতে পেতেন তাঁর এ পুত্র অন্য সকলের পুত্র অপেক্ষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—অনেকগুলি দুর্লভ গুণের অধিকারী সে। জন্মক্ষণে দৈব [illegible]-বাণী তার ললাটে লিখে থাকুক, তার এ গুণগুলো তো মিথ্যা নয়! প্রতাপ শিশুকালে অত্যন্ত শান্ত ও নিরীহ ছিল—সে যত বড় হচ্ছে তার স্বভাব তত বদলে যাচ্ছে। এখন সে দুর্দান্ত হয়ে উঠেছে সত্যিকথা, যেমন সাহসী তেমনি নির্ভীক—এ শক্তি আধার খুঁজছে, তাকে সেই পথে চালিত হতে দিলে ভবিষ্যতে সে অনমনীয় চরিত্র-বল পাবে। শুধু লক্ষ্য রাখা দরকার তার শক্তি যেন ভুল পথে ধাবিত না হয়—আত্মক্ষয়ী সংঘর্ষে যেন লিপ্ত না হয়। দাদার সেদিকে দৃষ্টি রাখা উচিত ছিল, কিন্তু তিনি তা করেন নি, বরং বিতৃষ্ণায় তাকে বিধ্বস্ত করতে চেয়েছিলেন শিশুকালেই। জন্মকোষ্ঠীর বিচার শুনে তিনি···

'কে ?'

রাত্রি গভীর হয়েছে—প্রাক-গ্রীষ্মের স্নিগ্ধ মধুর বাতাস ভেসে আসছে। সারা যশোহর নগর প্রগাঢ় সুষুপ্তি নিমগ্ন। অন্যদিন হলে ঘুমিয়ে পড়তেন তিনি, কিন্তু আজ কেন যেন ঘুম আসছে না, ফিরে ফিরে কেবলই আত্মচিন্তা ও প্রতাপের কথা ভিড় করছে মনে। তলিয়ে গিয়েছিলেন তিনি প্রতাপের চিন্তায়—তার শৈশবের টুকরো টুকরো ছবি মনে আসছিল। বিশেষ করে তার জন্ম-কোষ্ঠীর বিচার শোনার পর হিতাহিতজ্ঞানশূন্য দাদার নির্দয় আচরণ। ছবিটা ফুটে উঠছিল চোখের সামনে। সেই সঙ্গে ভিড় করে আসছিল দাউদ খাঁর গৌড়ের পতন ও যশোহরের সমৃদ্ধি। সমস্ত ঘটনাগুলি যেন দৈব-সংঘটিত। প্রতাপ, গৌড় ও যশোহর যেন একই সূত্রে গাঁথা হয়ে এলোমেলো রঙ ছড়াচ্ছিল নিদ্রাহীন নিঃসঙ্গ শয্যায়। পাতলা তন্দ্রার মতো ঘোর নেমে এসেছিল চক্ষে, যেন রঙিন আবেশ। ঘোর কেটে গেল। সন্তর্পণে কেউ ঢুকেছে কক্ষে। সমগ্র যশোহর নগরের সুরক্ষার ভার তাঁর ওপর, তিনি প্রধান মন্ত্রী, অত্যন্ত সুশাসনে রেখেছেন এ রাজ্য। কোথাও কোনো গোলমাল নেই। রাজপ্রাসাদ তো আরও সুরক্ষিত। তবে কে ঢুকল ?

'কে ?'

আচমকা তন্দ্রা ভেঙেছে বলে প্রথমটা তিনি ঠাহর করতে পারলেন না কোথায় শুয়ে আছেন, চোখ মেলে দেখলেন এ তাঁর শয়ন কক্ষ—তিনি শুয়ে আছেন মণিমুক্তাখচিত পালংকে, নিজস্ব শয্যায়। বাতায়নের বাইরে জ্যোৎস্না, অস্পষ্ট আলোকাভাসে কক্ষ উদ্ভাসিত। বহিঃপ্রকৃতি যেন রহস্যময়ী। চারিদিক নিঃসাড় ও নিস্তব্ধ।

'বীরপুরুষ !—'

নারীকণ্ঠে মৃদু হাস্যধ্বনি শোনা গেল।

'কে ?'

দরজা বন্ধ হবার শব্দ হল।

'জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছো নাকি ? আশ্চর্য মানুষ !'
শাড়ির খসখসানি। বাতাসে দেহসৌরভ। অলংকারের রিনিঠিনি।
'জেগে জেগে কেন,' সচেতন হয়ে উঠেছেন তিনি, সরস প্রত্যুত্তরে স্নিগ্ধ করে তুললেন কক্ষের আবহাওয়া : 'ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও স্বপ্ন দেখি। কেবল স্বপ্নের মানুষটি কখন্ আসে যায়, টের পাইনে। এসো রাণীকুলতিলকা। এমন জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনী—'
'আ-হা মিথ্যা বলো না। শুধু আমাকেই বুঝি স্বপ্ন দেখ তুমি ?'
স্বামীর শয্যায় এসে বসলেন প্রথমা পত্নী কমলা। রাজেন্দ্রাণী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর অঙ্গে সাধারণ সজ্জা—তুহাতে ও গলায় রত্নখচিত স্বর্ণালংকার ব্যতীত আড়ম্বর নেই কোনোখানে। বয়স মধ্য তিরিশ, গৌরবর্ণ দেহে শিথিলতা নেই এতটুকু। মেদহীন টান শরীর বলে তাঁর বয়স আরও কম দেখায়। চোখ তুটি বেশ টানা, ছোট কপাল, মুখের গড়নে প্রতিমাব সৌন্দর্য। প্রকৃতপক্ষে তিনি অন্তঃপুরের কর্ত্রী, সর্বদা কাজের মধ্যে ডুবে থাকেন। তবু একটি গোপন ব্যথা কখনও কখনও তাঁর অন্তর পীড়িত করে। তিনি সন্তানহীনা। বাইবে থেকে তা বোঝা যায় না কিন্তু তাঁর এই গোপন ব্যথার সংবাদ স্বামী বসন্তরায় ঠিকই রাখেন। সে কারণে তিনি প্রথমা স্ত্রীর কক্ষে বেশি আসেন এবং রাত্রি কাটান। ইদানীং স্বামী-সোহাগে পত্নীকে বিশেষ তুষ্ট দেখা যায় না, সন্তানের অভাব নাড়া দেয় প্রতি মুহূর্তে। অতি ক্ষীণ সপত্নী ঈর্ষা যে তাঁর আছে একথা জানেন বসন্তরায়, সর্বতোভাবে সেটা চাপা দেবার চেষ্টা করেন তিনি। এখন হাসি-ঠাট্টার মধ্যে সে ইংগিতই করেছেন কমলা দেবী।
বুঝতে পেরে সাবধানে পালটা রসিকতা করলেন তিনি : 'সংসারে সত্য কথা বলার বিপদ এই যে প্রায়ই সেটা মিথ্যা হয়ে ওঠে আর মিথ্যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সত্যের রূপ নেয়—বিশেষতঃ দাম্পত্য জীবনে। লোকে বলে আমি নাকি অনেক গুণের অধিকারী। হায়, তারা একথা জানে না যে রমণীর কাছে রমণীয় মিথ্যা ভাষণের মহৎ শিক্ষাটুকুও আমি আয়ত্ত

করতে পারি নি—অথচ বিবাহ করেছি তুটি। বিজ্ঞজনেরা একেই বলেন শাঁখের করাতের মধ্যে বাস। নড়তে চড়তে কেবলই কাটা পড়ছি—'

'থাক, খুব হয়েছে।' কমলা দেবী হেসে ফেললেন স্বামীর বাক-চাতুরীতে। বললেন, 'কথায় তোমার সঙ্গে পারার যো নেই, তার ওপর কবি। রসিয়ে কথা বলার ঢঙটুকু আয়ত্ত করেছো বেশ। এতই যদি আক্ষেপ, তুমি ইচ্ছা করলে আরও বিয়ে করতে পারো। সরস মেজাজের কমবয়সী, স্থন্দরী মেয়ে দেখে আরও গোটাকতক বিয়ে করে তোমার রানী-মহল ভরিয়ে ফেলতে পারো—আমার আপত্তি নেই। আমি যা পেয়েছি এই যথেষ্ট—'

'আ-হা তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। গিন্নী, আরও বছর দশেক আগে যদি এই পরামর্শ দিতে—'

'কী করতে তাহলে?'

'বাংলাদেশের রমণীকুল ঝাড়াই-বাছাই করে পটাপট বিয়ে করে ফেলতুম—রাণী-মহল ভরে যেত তাদের রূপে গুণে—'

'আর এখন?'

'বড্ড দেরি হয়ে গেছে গিন্নী, এখন কী আর অত স্থখ সইবে—'

'বটে! শখ তাহলে পুরোপুরি আছে!'

'গিন্নী, ও-সখ কী চিতায় ওঠার আগে পর্যন্ত মেটে? সব পুরুষেরই অল্প-বিস্তর ওই শখ আছে। নবাব-বাদশার হারেমগুলোর পানে চাইলেই আমার কথার সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবে—'

'বুঝি গো সব বুঝি। পুরুষ মানুষকে চিনতে আমার বাকি নেই। নবাব-বাদশার হারেমগুলোর পানে তুমি চেয়ে থাকো আর দীর্ঘশ্বাস ফেল, আমার এত বড় সংসার আর ওই দস্যি ছেলে প্রতাপ—তুদিক সামলাতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি—'

'তত্নপরি ফের একটা সতীন চাইছো—বলিহারি বুদ্ধি!' স্ত্রীকে বাহুবেষ্টনে টেনে আনলেন তিনি, মৃতু অথচ গাঢ়কণ্ঠে বললেন, 'না গো না, বিয়ে করার ইচ্ছে আর নেই, নবাব-বাদশার হুরী-পরী ঠাসা হারেমগুলোর

পানে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাসও ফেলি না। আমি ভাবছিলাম তোমার কথা। বয়স হয়েছে। কতদিন বাঁচব কে জানে। তাই মাঝে মাঝে ভাবি আমার অবর্তমানে—'

'কী?'

'তোমাকে কে দেখবে?'

'বালাই, তুমি এখনও অনেকদিন বাঁচবে।' স্বামীর মুখে আলতোভাবে হাত চাপা দিলেন রাণী কমলা: 'তোমাকে বাঁচতে হবে আরও কীর্তি আরও স্থনামের জন্যে। তুমি বাঁচলে যশোর বাঁচবে। আমার কথা ভেবো না। আমি গোবিন্দের চরণে একটাই শুধু প্রার্থনা জানাই, তোমার আগে যেন আমি যেতে পারি, তোমার গুণগান শুনতে শুনতে আমার এই চোখ দুটি—'

'বেশ বললে যা-হোক!'

'কেন?'

'যদি তিনি প্রার্থনা মঞ্জুর না করেন—'

'তাতেই বা কী।' কমলা দেবী একটুক্ষণ থামলেন, ধীর স্বরে বললেন, 'তিনি ইচ্ছাময়, সকলের ইচ্ছা তিনি পূর্ণ করেন—নিতান্তই যদি আমার ইচ্ছা পূর্ণ না হয় তবে তাঁর ইচ্ছাই মাথা পেতে নেব। আমার তো কোনো অভাব নেই, সম্মান করে সবাই। বাইরে লোকে তোমাকে যেমন শ্রদ্ধা-ভক্তি করে অন্দরে তেমনি সকলে ভালবাসে আমায়। সকলের ভালবাসার মধ্যে তখন বেঁচে থাকব আমি—'

'তবু দেখাশোনা করার জন্যে তো লোক চাই একজন?'

'সে ভাবনাও করি না। আমার প্রতাপ যতদিন আছে ততদিন ভাবনা কিসের? সে-ই আমার দেখাশোনা করবে—'

'বড্ড যে নির্ভরতা!'

'কেন নির্ভর করব না? জন্মের পর থেকে প্রতাপ তো আমাকেই তার গর্ভধারিণী মা বলে জানত—এখনও সে-রকম শ্রদ্ধা-ভক্তি করে। বড় হয়ে

বুঝতে শিখেছে বলেই শুধু মা না বলে ছোট-মা বলে ডাকে। আমি ওকে ওই নামে ডাকতে শিখিয়েছি। আমার সন্তানহীন জীবনে প্রতাপ এসেছে আশীর্বাদের মতো—'

তাঁর কণ্ঠস্বর আবেগে গাঢ় হয়ে উঠছিল বুঝে বসন্তরায় কৌতুকে হালকা করতে চাইলেন পরিবেশ ঃ 'বটে! আমি বুঝি অভিশাপ?'

কমলা দেবী কটাক্ষ হেনে বললেন, 'আ-হা কথার কী ছিরি!'

'প্রতাপ তোমার কাছে আশীর্বাদ হতে পারে কিন্তু কারো কারো কাছে সে সত্যি অভিশাপ—'

বাহুবেষ্টন শিথিল করে সোজা হয়ে শুলেন তিনি। কৌতুক অপসৃত। বললেন, 'প্রতাপ ইদানীং দাদার দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে। তার জন্মের পর থেকেই দাদা দুশ্চিন্তিত। আমি না থাকলে প্রতাপের এতদিন বেঁচে থাকা কঠিন হত। তুমি জানো তার কোষ্ঠীর ফলাফল বিশেষ শুভ নয়। যেহেতু তার কোষ্ঠীতে পিতৃহন্তা-দোষ আছে, দাদা ছেলেবেলাতেই তাকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন—সেবার অনেক কষ্টে আমি তাকে রক্ষা করেছি। দাদার ক্রোধ বড় ভীষণ, কখন্ কী কারণে জ্বলে ওঠে বোঝা শক্ত। এখন নতুনভাবে সেই ক্রোধের প্রকাশ দেখছি—'

'কেন প্রতাপ কী করেছে?

তাঁর কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠা। স্বামীর ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে সরে এসেছেন তিনি, বড় বড় চোখ দুটিতে গভীর উদ্বেগ।

'ধনুর্বিদ্যায় সে কতখানি দক্ষতা অর্জন করেছে বন্ধুদের কাছে তার পরীক্ষা দিতে গিয়ে সে আজ একটি উড়ন্ত পক্ষীকে তীরবিদ্ধ করে।' বসন্তরায় ধীরস্বরে ঘটনাটি বিবৃত করলেন, 'আমি ও দাদা তখন দরবার থেকে অন্দর-মহলের দিকে আসছিলাম, তীরবিদ্ধ পক্ষীটি উড়তে উড়তে আমাদের সামনে এসে পড়ল। বিষ্ণু ভক্ত দাদা খুব উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। সন্ধান নিতে যাচ্ছিলেন কে এ কাজ করেছে—প্রতাপ এসে দাঁড়াল সামনে এবং জানাল যে তার নিক্ষিপ্ত তীরেই পক্ষীটি বিদ্ধ হয়েছে,

উড়ন্ত পক্ষীকে তীরবিদ্ধ করা যায় কিনা তারা পরীক্ষা করছিল। তুমি জানো বোধ হয়, আমি প্রতাপের অস্ত্র-শিক্ষাগুরু, শুনে আমার আনন্দ হল। মনে মনে বললাম, সাবাস প্রতাপ—'

কমলা দেবী বললেন, 'আমারও খুব আনন্দ হচ্ছে। তুমি দেখো আমার প্রতাপ একদিন মস্ত বীর হবে। ওর অনেক গুণ।'

'তা আমি জানি।' বসন্তরায় ম্লান হয়ে গেলেন ঃ 'তোমার-আমার আনন্দ হতে পারে কিন্তু রাগে যিনি ফেটে পড়লেন তিনি অপর কেউ নন— স্বয়ং ওর পিতা। আমার মনে হয় তাঁরই সবচেয়ে বেশি আনন্দিত হবার কথা, অব্যর্থ লক্ষ্যভেদের জন্যে তাঁর পুরস্কার দেওয়া উচিত ছিল। আমি হলে তাই দিতাম। পরিবর্তে দাদা দিতে চাইলেন কঠিন শাস্তি— অসংগত ক্রোধে ক্ষেপে গেলেন তিনি। আমি অতি কষ্টে নিরস্ত করেছি তাঁকে—'

'বলো কী?'

'কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানলুম সেই পুরনো বিদ্বেষ ফিরে এসেছে আবার।' বসন্তরায় বললেন, 'দাদাকে যতটুকু চিনি তাতে এই ক্রোধ সহজে উপশম হবে বলে আমার মনে হয় না। একটা কিছু ঘটতে পারে। এবং তা ভয়াবহ। দাদা নিশ্চয় পুত্রের শক্তি খর্ব করতে চাইবেন। সেজন্যে আমাদের সতর্ক থাকা দরকার—'

'হুঁ।' মুখের সামনে হাত চাপা থাকার ফলে তাঁর কণ্ঠস্বর মোটা শোনাল ঃ 'মুশকিল কী জানো, আমি অন্তঃপুরে ব্যস্ত থাকি আর প্রতাপ ব্যস্ত থাকে বাইরে। কতক্ষণই বা তার সঙ্গে আমার দেখা হয়। আহারের সময়টুকু ছাড়া সে তো সারাদিন বাইরে—কেবলই ফন্দী-ফিকির আঁটছে আর বন্ধুদের নিয়ে হই-হুল্লোড় করে বেড়াচ্ছে। শুধু অন্দর-মহল হলে আমি সামলাতে পারি কিন্তু বাহির-মহল—'

'তুমি যদি অন্দর সামলাতে পারো, বাহির সামলানোর ভার আমি নিলাম।'

'তা কী পারবে?'

'চেষ্টা করে দেখি। এত বড় রাজ্য সামলাতে পারছি আর ও তো ছেলে-মানুষ—'

'ছেলেমানুষ বলেই ভয়। তুমি ওকে এত বেশি প্রশ্রয় দাও যে—'

'কমলা, প্রতাপের মধ্যে আমি এমন কতকগুলো গুণের সমন্বয় দেখেছি যা আমার নিজের ছেলেদের ভেতরেও নেই। তাই সময়-বিশেষে তাকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকি। তা বলে ভেবো না প্রশ্রয় দেওয়াই আমার স্বভাব। ওর পিতার মতো অকারণে কঠোর হতে পাবি না বটে কিন্তু প্রয়োজনে শাসন আমার মধ্যেও অপ্রতুল নয়, সন্তানের মঙ্গলের জন্যে কখনও কখনও আমি অতিশয় কঠোর—'

'বেশ। ওর শিকারে যাওয়া আটকাতে পারো?'

'শিকার—'

'হাঁ শিকার। প্রতাপ আগামীকাল সকালে শিকারে যাবে। একা নয় সদলবলে, আজ রাত্রে খেতে খেতে বলছিল। সূর্যকান্ত যাবে শংকর যাবে,—ওরা দুজনই তো ওর ঘনিষ্ঠ অনুচর। যেখানে প্রতাপ যায় সেখানেই সূর্যকান্ত আর শংকর। ওদের সংস্রবে থেকে প্রতাপ আরও দুর্দান্ত হয়ে উঠছে—কোনো কিছুতেই বাধা মানতে চাইছে না। ভয়-ডরহীন, দিনে-দিনে বেপরোয়া হয়ে উঠছে। নইলে ওই কচি-বয়সে কেউ শিকারে যায়? সুন্দরবনে কত রকম হিংস্র জন্তুর বাস—বাঘ আছে গণ্ডার আছে, সাপ জড়িয়ে থাকে গাছের শাখায়, মৃত্যুর মতো বুনো শুয়ার ঘোঁত ঘোঁত করে তেড়ে আসে—প্রতি পদে পদে বিপদ। শিকার করতে হবে বলে বারে বারে ওই সুন্দরবনে যাওয়া কেন? যে কোনো-দিন তো বিপদে পড়তে পারে। পারে না?'

'পারে। নিশ্চয় পারে। সুন্দরবনে বিপদের সম্ভাবনা প্রচুর।' পত্নীর উদ্বিগ্নতা দেখে হাসলেন বসন্তরায়, বললেন, 'কিন্তু শিকারে যারা বেরোয় —বিপদ আছে জেনেই বেরোয়। বিপদের আশংকা না থাকলে শিকারে

কোনো আনন্দ নেই। প্রতাপ প্রতিবার শিকারে বেরিয়ে সেই বিপদ উত্তীর্ণ হয়ে ফিরে আসে অক্ষত শরীরে—এ তার মস্ত কৃতিত্ব। আর ওর বন্ধু-সংসর্গের জন্যে তুমি যতই উদ্বিগ্ন হও, আমি জানি, সূর্যকান্ত ও শংকর ওর যথার্থ বন্ধু, খাঁটি ছেলে—ওদের দ্বারা প্রতাপের অপকার তো হবেই না বরং উপকার হবে। প্রতাপ কাদের সঙ্গে মেশে, কখন্ কোথায় যায়, গোপনে সব সংবাদ রাখি আমি। আমাকে লুকিয়ে প্রতাপ কিছু করতে পারে না। যে ছেলে উড়ন্ত পক্ষী তীরবিদ্ধ করতে পারে সে ছেলে শিকারে গিয়ে ঠিক ফিরে আসবে তুমি দেখে নিও—'

'বেশ জ্যোৎস্না ছিল,' কমলা দেবী অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন, 'হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গেল যেন। ঘরের মধ্যে অন্ধকার। চারিদিক বড় বেশি নীরব।'

বসন্তরায় বললেন, 'চাঁদ ঢাকা পড়েছে মেঘের আড়ালে। রাত অনেক হল। তুমি ঘুমোও।'

কমলা দেবীর হাই উঠছিল। তিনি পাশ ফিরলেন। ঘুমে জড়িয়ে এসেছে তাঁর চোখ।

বসন্তরায় অন্ধকার কক্ষে জেগে জেগে চিন্তা করতে লাগলেন একা। ঘুমিয়ে পড়েছেন কমলা দেবী। কক্ষ আবছা অন্ধকার। দীপাধারে মোমের শিখা ক্ষীয়মাণ, অস্পষ্ট আলোয় কক্ষের অভ্যন্তর যেন রহস্যময়। চিন্তার সূত্র ধরে ফুটে উঠছিল নানা ছবি। বার বার ভিড় করে আসছিল অতীতের কথা। কী সামান্য অবস্থা থেকে আজ কোথায় উঠে এসেছেন তাঁরা। রূপকথার মতো বিস্ময়কর পরিবর্তন। অবিশ্বাস্য উন্নতি। দাদা বলেছিলেন, 'ভাগ্যফল। ভাগ্যে না থাকলে এমন উন্নতি কারো হয় না। ঈশ্বর করুণা করেছেন…'

বাস্তবিক ভাগ্য সুপ্রসন্ন না হলে এবং ঈশ্বরের অযাচিত করুণা না থাকলে সাধারণ মানুষের পক্ষে এত উচ্চে ওঠা কোনোমতেই সম্ভব হত না। কক্ষে মোমের নিস্তেজ আলো-ছায়া, বসন্তরায় আধো-জাগরণে আধো-তন্দ্রার মধ্যে সেই ভাগ্যফলের ছবিগুলি যেন দেখতে পাচ্ছিলেন স্পষ্ট—অতীত

নেমে এসেছে কোন্ মায়াবলে। তাঁর চক্ষু নিমীলিত, কিন্তু ছবিগুলি দেখতে কোনো অসুবিধা হচ্ছিল না। তিনি সুস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন, প্রধান সেনাপতি লোদী খাঁ-র চেষ্টায় সুলেমানের কনিষ্ঠ পুত্র দাউদ খাঁ গৌড়ের সিংহাসনে উপবিষ্ট হলেন পনেরো শো তিয়াত্তর সালে। আর তখনই দাউদ পুরনো বন্ধু ও বয়স্য শ্রীহরি ও জানকীবল্লভকে টেনে নিলেন দুর্লভ অমাত্যপদে। সুলতান দাউদের মনে উদারতা ছিল, তিনি শ্রীহরিকে 'বিক্রমাদিত্য' ও জানকীবল্লভকে 'বসন্তরায়' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করে-ছিলেন। উপাধির দ্বারা সম্মানিত হয়েছিল আরও একজন। সে বিক্রমা-দিত্যের একমাত্র পুত্র গোপীনাথ। তার উপাধি হয় প্রতাপাদিত্য···

মনে পড়ছিল অনেক কথা। দাদা হলেন প্রধান মন্ত্রী আর তিনি নিজে হলেন খালিসা বিভাগের কর্তা ও কোষাধ্যক্ষ। কিন্তু লোদী খাঁই রাজ্য-মধ্যে ছিলেন সর্বপ্রধান ব্যক্তি এবং তাঁরই বুদ্ধিবলে রাজ্য শাসিত হত। লোদী খাঁ বুদ্ধিমান ব্যক্তি, গৌড়-সিংহাসনের যথার্থ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তাঁর সঙ্গে বিরোধ ছিল না কোনোখানে। কেন-বা থাকবে? বন্ধু ও বয়স্য পদ অপেক্ষা তাঁরা দুই ভ্রাতা উচ্চ রাজপদ লাভ করেছেন, অর্থ সুখ ও শান্তি বিরাজ করছে ঘরে-বাইরে, সম্মান প্রভাব ও প্রতিপত্তি বেড়েছে সমাজের সর্বস্তরে—ধনী ও নির্ধন সকলেই মান্য করে তাঁদের। বন্ধু-প্রসাদাৎ যা লাভ করেছেন তাতেই সন্তুষ্ট। অধিক প্রত্যাশা ছিল না। অতএব অশান্তি দেখা দেবে কেন?

কিন্তু অশান্তি বাধিয়ে দিলেন নব্য সুলতান দাউদ খাঁ স্বয়ং। দৈবাৎ পিতৃ-রাজ্য লাভ করে তিনি গা ভাসিয়ে দিলেন উচ্ছৃংখলতার স্রোতে। কারণ অবশ্য ছিল। অগাধ সম্পত্তি তদুপরি নব্য যুবক—বিলাস-ব্যসনে গা ভাসিয়ে দেওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু শুধু উচ্ছৃংখল জীবন-যাপন করলে অশান্তি এত প্রকট হয় না, উচ্ছৃংখলতার সঙ্গে দেখা দিল শক্তিমদমত্ততা। তাঁর সৈন্যবল নিতান্ত অল্প ছিল না—তিনি যখন দেখলেন তাঁর অধীনে ন্যূনাধিক দেড়লক্ষ পদাতিক, চল্লিশ হাজার সুসজ্জিত অশ্বারোহী, সাড়ে

তিন হাজার হাতি, কুড়ি হাজার বন্দুক ও কামান এবং বহুশত রণতরী তাঁর করায়ত্ত রয়েছে তখন বাদশাহের অধীন হয়ে থাকা কেন, সোজাসুজি স্বাধীনতা ঘোষণা করে মাথা উচিয়ে থাকা ভাল। তিনি অপরিণামদর্শী যুবকের মতো স্বাধীনতা ঘোষণা করে রাজ্যসুখ ভোগ করতে চাইলেন পুরোপুরি। দাদা সুপরামর্শ দিতে চেয়েছিলেন, চারিদিক বেঁধে এরূপ গুরুতর কাজে নামতে বলেছিলেন—কিন্তু নবীন সুলতান দাউদ খাঁ শক্তির দম্ভে সে-সব কথা কানে না-তুলে কতলু খাঁ-কে পাঠিয়ে দিলেন পুরীর শাসনকর্তা করে আর লোদী খাঁর পরামর্শে আক্রমণ করে বসলেন জৌনপুরে জমানিয়ার মোগল দুর্গ। লোকে জমানিয়ার দুর্গ বলে বটে, কিন্তু বসন্তরায় জানতেন সেটা প্রাচীন জমদগ্নি মুনির আশ্রম। এত ভাল নামটি কালক্রমে কী বিকৃত হয়েছে, কানে খট করে বাজে। এ দেশে নামের এত বিকৃতি হয় যে বলবার নয়। যেন কানের কাছে কেউ 'জমানিয়া জমানিয়া' উচ্চারণ করছে ভেবে তিনি অস্বস্তির সঙ্গে কান চাপা দিতে গেলেন, হাত তুলতে গিয়ে স্ত্রীর অঙ্গে হাত ঠেকে গেল, তিনি একবারমাত্র চোখ মেলে স্ত্রীকে নিদ্রিতা দেখে সাবধানে সামান্য সরে গেলেন। আবার চোখ বুজলেন।

শক্তিমদেমত্ত হয়ে দাউদ খাঁ বিস্মৃত হলেও, বসন্তরায় ও বিক্রমাদিত্য জানতেন, দিল্লীর সিংহাসনে তখন উপবিষ্ট বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ দূরদর্শী বাদশাহ আকবর। এবং একথাও তাঁদের অজ্ঞাত ছিল না যে দাউদের পিতা সুলেমানের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখবার জন্যে বাদশাহ অনেক আগে থেকেই সুযোগ্য মোগল-সেনাপতি মুনেম খাঁকে জৌনপুরে রেখে-ছিলেন। মুনেম খাঁ সুলেমানের দ্বারা বিশেষ বিব্রত হন নি, সেজন্য একটু ঢিলেঢালাভাবে দিন কাটাচ্ছিলেন জৌনপুরে অবস্থানকালে। অকস্মাৎ দাউদের আক্রমণে বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন তিনি। সেই সুযোগে জামানিয়া দুর্গ সম্পূর্ণরূপে নিজের কুক্ষিগত করার অভিপ্রায়ে দাউদ খাঁ বিপুল তেজে সৈন্য চালনা করে অগ্রসর হতে লাগলেন। বঙ্গে পাঠান-শক্তির এই

বিদ্রোহের সংবাদ পেয়ে আকবর খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন এবং বুঝতে পারলেন, অবিলম্বে এ বিদ্রোহ দমন করতে না পারলে কালক্রমে তা ভয়াবহ আকার ধারণ করবে। অন্য কারো উপর দায়িত্বভার অর্পণ না করে তাই তিনি নিজেই অগণ্য সৈন্যসহ দ্রুতবেগে বঙ্গাভিমুখে রওনা হলেন। অশ্বক্ষুরে কেঁপে উঠল দেশ-দেশান্তরের মাটি।

দাদা প্রধান মন্ত্রী, তিনি প্রথম থেকেই সুলতান দাউদের এ যুদ্ধ যাত্রার বিপক্ষে ছিলেন।

বিনীতভাবে তিনি সাবধান কবে দিয়েছিলেন, 'জাঁহাপনা, অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে কাজে নামুন। আমার মনে হয় একা লোদী খাঁর ওপর নির্ভর কবে এ যুদ্ধে নামা উচিত হবে না। শক্তিমান মোগলের সঙ্গে বিরোধের পবিণাম ভযাবহ হতে পারে।'

দাউদ খাঁ বলেছিলেন, 'এখন আমার ফেরার পথ খোলা নেই, বিক্রমাদিত্য। কতলু খাঁ চলে গেছে পুরী দখল করতে, সে হবে সেখানকার শাসনকর্তা। আমাব রাজ্য-অধিকারের সীমা বেড়েছে এ সংবাদ জানতে পারলেই মোগল--বাদশাহ আকবরেব বিরাগভাজন হব আমি। পাঠানেরা মোগলের অনুগ্রহ চায় নি কোনোদিন। আমি পাঠান, আমার মনে স্বাধীনতা ভোগের ইচ্ছা অতি প্রবল। মোগল শক্তিমান বলে আমি তার পদানত হয়ে থাকতে পারি না। একবাব বিদ্রোহের আগুন যখন জ্বালিয়েছি তখন তা আর নিবতে দেব না।'

'আপনার উচ্চাশাকে সেলাম জানাই।' দাদা আন্তরিকভাবে বলেছিলেন, 'কিন্তু মোগলের তুলনায় আমরা হীনশক্তি এটুকু স্মরণে রাখতে বলি—'

'না। আমি হীনশক্তি নই। লোদী খাঁ সঙ্গে থাকলে আমি দিগ্বিজয় করতে পারি।'

'জাঁহাপনা, লোদী খাঁ বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি, স্বীকার করি। কিন্তু তাঁর ওপর বড্ড বেশি নির্ভর করা হচ্ছে নাকি?'

'অন্ততএক্ষেত্রে নয়। আপনার আর-কিছু বলবার আছে?'

'আজ্ঞে না—'

চুপ করে গিয়েছিলেন দাদা। চুপ করে গিয়েছিলেন তিনি নিজেও। অস্বস্তি বোধ করেছিলেন তাঁরা দুই ভ্রাতা। কারণ, লোদী খাঁর যত গুণই থাক, একটি বিশেষ গুণের জন্যে তার ওপর নির্ভর করা যায় না। নব্য সুলতান না-জানতে পারেন কিন্তু তাঁরা দুই ভ্রাতা উত্তমরূপে জ্ঞাত ছিলেন যে, লোদী খাঁ অর্থের বশীভূত এবং সে-কারণে তার পক্ষ-পরিবর্তন ঘটতে পারে যে কোনো সময়ে। বিগত সুলতান সুলেমানের সময় থেকে লোদী খাঁর সঙ্গে মুনেমের আলাপ-পরিচয়—যুদ্ধে পরাজিত হলে মুনেম খাঁ সেই সুযোগ গ্রহণ করবে এ তো স্বাভাবিক। এবং জানা গেল ঘটেছেও তাই। আকবর তখনও এসে পৌঁছোন নি, মুনেম খাঁ পরাজিত। আত্মরক্ষার জন্যে মুনেম অগত্যা দুই লক্ষ টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সন্ধি স্থাপন করলেন। জমানিয়া দুর্গ হাতছাড়া হয়ে গেল।

এই ঘটনায় লোদী খাঁর ওপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার সুযোগ পেলেন একজন—তিনি দাউদ কর্তৃক নিযুক্ত পুরীর শাসনকর্তা কতলু খাঁ।

কতলু খাঁর সঙ্গে লোদীর পূর্বশত্রুতা ছিল। দাউদ সর্ববিষয়ে লোদীর পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তাঁর সকল কথায় সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন, কতলু খাঁ তা বিশেষ পছন্দ করতেন না। তাঁর স্বার্থসিদ্ধির পরিপন্থী হয়ে উঠেছিলেন লোদী খাঁ। তাঁকে সরাতে না পারলে ভবিষ্যতে আরও বেশি ক্ষমতা ও অর্থ সংগ্রহ করা অসুবিধা হবে বুঝতে পেরে কতলু খাঁ তলে তলে তাঁর ছিদ্রান্বেষণে তৎপর ছিলেন। সেই ছিদ্রটি অকস্মাৎ দেখা দিল ওই সন্ধির প্রস্তাব গ্রহণের মধ্যে। কতলু খাঁর পক্ষে দাউদকে বোঝানো সহজ হল যে এর পেছনে লোদীর বিরাট স্বার্থ নিহিত রয়েছে, যে ব্যক্তি অনিবার্য জয় জেনে বিপক্ষের সন্ধির প্রস্তাবে এক কথায় রাজি হয়ে যায়, বুঝতে হবে, সে-ব্যক্তির মনে অন্য গূঢ় অভিসন্ধি আছে। প্রচুর অর্থ-উৎকোচ সে তো পেয়েছেই, গোপনে আরও কোনো কুটিল শর্তে রাজি হয়েছে কিনা কে জানে। উৎকোচ গ্রহণকারী ব্যক্তির পক্ষে গোপনে বিরুদ্ধ দলে সহায়তা

দান বিচিত্র নয়। এ ধরনের ব্যক্তিই ঘর-শত্রু বিভীষণ হয়ে দাঁড়ায়···
'আমি এতখানি তলিয়ে ভাবি নি।' দাউদ গম্ভীর হয়ে গেলেন খুব: 'বরাবর বিশ্বাস করে এসেছি লোদীকে। এখন মনে হচ্ছে তোমার কথা একেবারে মিথ্যা নয়, কতলু খাঁ। লোদী বড্ড বাড়াবাড়ি সুরু করেছে। ওকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার যে এ-সব হীন চক্রান্ত আমি নির্মমভাবে উৎখাত করে দিতে পারি—'
'জাঁহাপনা', কতলু খাঁ বিনয়ে বিগলিত: 'আমি যদি আপনাকে কণামাত্র উত্তেজিত করে থাকি তাহলে আমার গোস্তাকি মাফ হোক। কিন্তু, ব্যাপারটা মোটেই ভালো বুঝছি নে। এ ধরনের লোকের স্বভাব-চরিত্র অতি ভয়ংকর হয়। এদের মনের গভীরে অন্য কোন্ গূঢ় অভিসন্ধি আত্মগোপন করে আছে, বাইরে থেকে কেউ তা বুঝতে পারে না। সুয়োগ পেলে বিষাক্ত সাপের মতো অব্যর্থ ছোবল বসায় এরা, তখন প্রতিরোধ করার কোনো উপায় থাকে না, সারা অঙ্গ বিষে নীল হয়ে যায়—মানুষ ঢলে পড়ে মৃত্যুর কোলে—'
'কিন্তু জাঁহাপনা', দাদা মৃদু প্রতিবাদ করেছিলেন, 'ওই লোদী খাঁ-ই আপনাকে সিংহাসনে বসিয়েছিলেন। আপনার প্রতি তাঁর যথেষ্ট আনুগত্য, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা আছে—'
'চুপ করুন আপনি।' কতলু খাঁ যেন ধমক দিয়ে উঠেছিলেন: 'মনুষ্য-চরিত্র আপনি কতখানি জানেন, কতটুকু চেনেন অর্থলোভী, স্বার্থপর লোদীকে। মানুষ পীর নয় বলেই অবস্থা-বিশেষে তার পরিবর্তন সম্ভব—আজ যে-ব্যক্তি সাধু কাল সে শয়তান হতে পারে। পারে না?'
'ঠিক বলেছো।' দাউদ খাঁ সমর্থন করলেন।
দাদা হতাশাভাবে চুপ করে গেলেন। কারণ তিনি বিলক্ষণ বুঝতে পারছিলেন, লোদীর অনুপস্থিতির অবকাশে কতলু খাঁ ধাপে ধাপে কোন্ লক্ষ্যে অগ্রসর হচ্ছেন এবং কী সাংঘাতিকভাবে বিষাক্ত করে তুলছেন আবেগপ্রাণ নব্য সুলতানের চিত্ত। পরিণাম ভয়াবহ হতে বাধ্য। তিনি

ভ্রাতার পানে অপাঙ্গে তাকিয়ে সরে যেতে চাইছিলেন, বসন্তরায় তা হতে দিলেন না। চক্ষু ইশারায় বসন্তরায় জানালেন, এ মুহূর্তে স্থানত্যাগ করে নাট্যরস বরবাদ করা উচিত হবে না। কতলু খাঁ সুলতানের চিত্ত কতদূর কলুষিত করেন তা দেখা দরকার…

বিক্রমাদিত্য অগ্রসর হতে গিয়ে বসন্তরায়ের পাশে থেমে দাঁড়ালেন।

দুই ভ্রাতা উন্মুখ হয়ে উভয়ের কথাবার্তা শুনছিলেন।

বসন্তরায় দেখতে পাচ্ছিলেন, দাউদের মুখ নিরতিশয় গম্ভীর হয়ে উঠেছে এবং উত্তেজনাকালে তিনি যেমন সিংহাসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ান তেমনি সোজাভাবে দাঁড়িয়ে রত্নখচিত বহুমূল্য কণ্ঠহার ধরে টান দিলেন, মনে হল কণ্ঠহার ছিঁড়ে মণিমুক্তো বুঝি ছড়িয়ে যাবে ইতস্ততঃ। এ তাঁব ক্রোধের লক্ষণ। উত্তেজনায় সিংহাসনের উচ্চাসন থেকে একবার দু'ধাপ নেমে এসে পুনর্বার উঠে গেলেন, উপবেশন করার আগে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। ঝলমল করে উঠল অঙ্গাবরণ—বিচিত্র শব্দে বেজে উঠল অঙ্গের অলংকার' নিচের ধাপে পেছনের পা, সর্বোচ্চ ধাপে অন্য পদ, ঘাড় ফিরিয়ে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন সুলতান দাউদ। বসন্তরায় বুঝতে পারছিলেন, কতলু খাঁর সযত্ন প্রয়াস এইবার বিষক্রিয়া শুরু করেছে—সুলতান দাউদ খাঁ হিংস্র হয়ে উঠেছেন।

'আমি আপনার দীনাতিদীন সেবক, আমার কর্তব্য আপনাকে সচেতন করে দেওয়া। তাই…'

আরও কী বলতে যাচ্ছিলেন কতলু খাঁ, দাউদ হাত তুলে বাধা দিলেন।

বললেন, 'আমি সব বুঝতে পেরেছি কতলু খাঁ। অধিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। তুমি উচিত কথা বলেছো। এখন আমার সাবধান হওয়া দরকার। আমি এবার সে-ব্যবস্থাই করব এবং আজই। তুমি দেখে নিও লোদী আর কোনোদিন ঘুষ নিতে পারবে না, তার সকল কুচক্রান্তের এখানেই অবসান…'

দাউদের ইংগিতে গুপ্তঘাতক চলে গেল এবং তস্যার্থ উভয় ভ্রাতাই উত্তম-

রূপে বুঝতে পারলেন। লোদীকে প্রাণ দিতে হল গুপ্তঘাতকের হাতে। লোদীর প্রাণ-সংহারের সংবাদ পেয়ে কতলু খাঁ উল্লসিত হয়েছিলেন নিশ্চয়, দাউদ হয়তো বা নিশ্চিন্ত, কিন্তু বসন্তরায় খুশি হতে পারেন নি আদৌ। তিনি বিমর্ষ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর কেবলই মনে হয়েছে, যে-ব্যক্তি ক্ষমতা-দখলের সেই বিপর্যয়ের মধ্যে দাউদকে সিংহাসনে বসিয়েছিলেন এবং তদবধি বুদ্ধি ও পরামর্শ দিয়ে রাজ্য রক্ষা করে আসছিলেন তাঁকে এ রকম গুপ্তঘাতক দিয়ে অন্যায়ভাবে হত্যা করা যেমন অধর্ম তেমনি মূর্খতার পরিচায়ক। এর পরিণতি কখনও শুভ হতে পারে না। প্ররোচনার বিষে দাউদ বুঝি নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরেছেন···

তাঁর আশংকা যে মিথ্যা নয় সে-প্রমাণ পাওয়া গেল কিছুদিন পরে। কারণ তিনি অনুমান করেছিলেন সন্ধির প্রস্তাবে মুনেম খাঁ আপাতত আত্মরক্ষা করলেও, যুদ্ধের পরাজয়-সংবাদে বাদশাহ অসন্তুষ্ট হবেন এবং তিনি অচিরাৎ ভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। হলও তাই। সেনাপতি মুনেম খাঁ-কে সরিয়ে সেই পদে টোডরমল্লকে নিযুক্ত করে জৌনপুরে পাঠিয়ে দিলেন আকবর। মুনেম বুঝতে পারলেন বাদশাহ তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তৎপূর্বে তিনি লোদী খাঁ-র মৃত্যু-সংবাদ অবগত হয়েছেন। দু-একদিনের মধ্যে টোডরমল্ল এসে যাবেন, তাঁর হাতে তুলে দিতে হবে জৌনপুরের শাসনভার, ইতিমধ্যে হৃত-সম্মান পুনরুদ্ধার করা যায় কিনা চিন্তা করে তিনি গৌড়-জয় করবার জন্যে পাটনা অবরোধ করে বসলেন প্রবল শক্তিতে। তখন শোন নদের মোহানায় এক যুদ্ধে পরাজিত হয়ে দাউদ আশ্রয় নিয়েছিলেন পাটনা দুর্গে···

'জানকীবল্লভ, যুদ্ধের অবস্থা কেমন বুঝছো ?'

বিক্রমাদিত্য যুদ্ধের ডামাডোলে একফাঁকে ভ্রাতার মতামত জিজ্ঞাসা করলেন।

'খুব ঘোরালো। তোমার কী মনে হয়, দাদা ?'

পালটা প্রশ্ন করে জ্যেষ্ঠভ্রাতার মনোভাব বুঝতে চাইলেন তিনি।

'মোটেই ভাল বুঝছি না। পাঠানেরা একটা দৃপ্ত জাত বটে কিন্তু শক্তি-মান মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধে পেরে উঠবে না। তা ছাড়া পায়ের ওপর পা দিয়ে এই যুদ্ধ…'

তিনি ঘাড় নাড়তে লাগলেন।

'তুমি কী করতে বলো?'

'এখন চুপচাপ থাকতে হবে। দাউদের নিমক খাই আমরা, এ বিপদে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া উচিত হবে না। এরকম একটা বিপদের আভাস পেয়েই দূরদর্শী আমার পিতৃদেব দক্ষিণবঙ্গে যমুনার পূর্বপারে একখণ্ড জমির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, মনে আছে?'

বসন্তরায় বললেন, 'হাঁ প্রাচীন যশোররাজ্যের অন্তর্গত সেই ভূভাগ চাঁদ খাঁ মছন্দরী নামে এক ভূস্বামীর জায়গীরভুক্ত। চাঁদ খাঁ তো নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেছে—তাঁর উত্তরাধিকারী নেই কেউ। জায়গাটা নদীবহুল এবং বেশ জঙ্গলাকীর্ণ বটে, সে কারণে দুর্গম অঞ্চল—'

'আমার পিতা সেজন্যেই জায়গাটি পছন্দ করেছেন এবং আমাদের ভবিষ্যৎ ভাগ্যক্ষেত্র বলে নির্দেশ দিয়েছেন। মোগল-পাঠানে যে রকম ভীষণ যুদ্ধ চলছে তাতে আমাদের নিরাপদ ও দুর্গম দূরত্বে চলে গিয়ে বসবাস করাই বুদ্ধিমানের কাজ। অবস্থা খারাপ বুঝলে ওখানে চলে যাওয়াই ভাল।'

'দাউদ এখন পাটনা দুর্গে আশ্রয় নিয়েছেন —'

'তিনি পরাজিত ও বিধ্বস্ত হবেন বলে আমি আশংকা করি। জানকী, তুমি তো বাবার পরামর্শে চাঁদ খাঁর জায়গীর পরিদর্শন করে এসেছো। জায়গাটা কেমন?'

'জায়গাটা আমার ভাল লেগেছে। বাসযোগ্য করার জন্যে কিছু কাজ করেও এসেছি। তুমি গেলে আরও সুন্দর হবে হয়তো—'

…মনে পড়ছিল, উদ্যমী ও কর্মক্ষম বলে তাঁকেই চাঁদ খাঁর জায়গীর পরি-দর্শনে পাঠিয়েছিলেন ভবানন্দ। তিনি যাত্রা শুরু করে গঙ্গা থেকে হুগলী-ত্রিবেণীর সন্নিকটে যমুনাতে প্রবেশ করেছিলেন প্রথমে, কারণ নদীপথে

যাওয়াই সবচেয়ে সহজ পথ। যমুনা প্রচণ্ড নদী—প্রবল তরঙ্গ-ভঙ্গে সমুদ্রগামিনী। তিনি সঙ্গে নিয়েছিলেন বহুসংখ্যক নৌকা, রসদ তো বটেই, লোকজনও ছিল। অন্য কোনোদিকে না গিয়ে যমুনার পথ ধরে তিনি যথাসময়ে চাঁদ খাঁ চকে এসে পৌছুলেন এবং যেহেতু প্রচুর লোকজন ও রসদ সঙ্গে ছিল সেহেতু চারিদিক পরিক্রমা করে সেদিনই লেগে গেলেন জঙ্গল পরিষ্কারের কাজে। কিছুকাল অতিবাহিত করে, বাসের উপযুক্ত এক নতুন রাজ্যের পত্তন করে ফেললেন তিনি। গড়বেষ্টিত স্থানে উচ্চভূমির ওপর যথাসম্ভব সত্বরতার সঙ্গে গৃহাদি নির্মাণ করে পরিবারবর্গকে নিয়ে গেলেন সেখানে।

অবশ্য একদিনে তিনি এ-সব কাজ করতে পারেন নি, পারা সম্ভব নয়। তবে তাঁর মস্তিষ্ক উর্বর এবং কল্পনাশক্তি প্রখর ছিল বলে যশোরের রাজ্যের মোটামুটি একটা কাঠামো বাস্তবে রূপায়িত করেছিলেন। তাঁর মনে পড়ছিল, উপবঙ্গে যশোর রাজ্যের সীমাটি নিতান্ত কম নয়। যশোহর রাজ্যের পূর্বভাগে মধুমতী নদী, উত্তরে কেশবপুর, পশ্চিমে কুশদ্বীপ ও প্রাচীন ভাগীরথীব খাত এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। কুশদ্বীপ বা কুশদহ ছাড়িয়ে গোবরডাঙ্গাব দক্ষিণে যমুনা ও ইছামতী সম্মিলিত হয়ে দক্ষিণ বাহিনী হয়েছে এবং টাকী ও হাসনাবাদের দক্ষিণে এসে এই যুক্ত নদী কালিন্দী নামে ক্ষুদ্র শাখা রেখে বামদিকে প্রবাহিত। কালিন্দী একটি ক্ষুদ্র খাল মাত্র—অন্তত বসন্তরায়ের তখন তাই মনে হয়েছে। তার মোহানার দক্ষিণভাগে সমস্ত ভূভাগই ভীষণ সুন্দরবন। ঐ যমুনা ও কালিন্দীর মোহানার নিকট তিনি প্রথম পত্তন করেন, মনে পড়ছিল। এবং নিজের নাম অনুসারে জায়গাটির নাম রাখেন—বসন্তপুর।…

কিন্তু এদিকে তখন ভীষণ গোলযোগ। জলে-স্থলে দলে দলে মোগল সৈন্য এগিয়ে আসছিল অপ্রতিহত গতিতে। স্বয়ং আকবর পাটনায় এসে পৌছলেন এক সহস্র রণতরী সঙ্গে নিয়ে। তখনই বেঁধে গেল যুদ্ধ। বাদশাহ আকবরের সেনাপতি আলম খাঁ গঙ্গার অপর পারে হাজিপুরে

উপস্থিত হয়ে আক্রমণ করলেন ছুর্গ। আকবর নিজে উপস্থিত ছিলেন সে-যুদ্ধে। ফলতঃ, আক্রমণের বেগ ও পরিণতি হয়ে উঠল ভয়াবহ। অপরদিকে সেটাই হল যাশোহরের সৌভাগ্যের সূচনা। বাংলা প্রবাদ, কারো সর্বনাশ কারো পৌষমাস।···বসন্তরায় ভাবলেন, কথাটার মধ্যে ব্যঙ্গের অংকুশ থাকলেও অসত্য নয়। কারণ, দাউদের সর্বনাশ আর তাঁদের পৌষমাস দেখা দিয়েছিল সেই ঘটনার পর থেকেই।

ছুর্ধর্ষ মোগল-বাহিনী জয়লাভ করল হাজিপুরের যুদ্ধে। আর, পরাজিত ছুর্গাধ্যক্ষ ও সেনানীদের ছিন্নশির নৌকা বোঝাই করে দাউদের নিকট পাঠিয়ে দিল বিজয়ী মোগলেরা। ফলে দারুণ ত্রাস ও আতংক ছড়িয়ে পড়ল দাউদের ভয়ার্ত আমীরদের মধ্যে। তাঁরা একযোগে পরামর্শ দিলেন, এক্ষেত্রে পলায়ন বা আত্মসমর্পণই একমাত্র উপায়। কিন্তু দাউদ বড় জেদী —কোনো সৎ-পরামর্শই তিনি গ্রহণ করলেন না। তাঁর সেই এক কথা: 'পলায়ন! পাঠানেরা পলায়নে তৎপর নয় এবং আত্মসমর্পণ কাকে বলে তা তাদের অজ্ঞাত। হয়তো আমার জীবন-নাট্যের শেষের অভিনয় খুবই নিকট-বর্তী, হয়তো কেন নিশ্চয়ই, তবু পলায়ন বা আত্মসমর্পণ আমি করতে পারি না—বাঁচার অন্য কোনো পথ আছে কিনা আপনারা ভেবে বলুন—'

আমীরেরা ঢোঁক গিললেন: 'জাঁহাপনা, আমরা অন্যপথ দেখছি না। আপনি নিজে যদি কিছু চিন্তা করে থাকেন, করেছেন বলে মনে করি, 'তাহলে সেটা জানতে পারলে আমরা আনন্দিত হব।'

'আপনাদের মনঃপূত হবে কিনা জানি না', দাউদ স্পষ্টস্বরে ঘোষণা করলেন, 'পলায়ন বা আত্মসমর্পণ ভিন্ন একটিমাত্র পথই আমি দেখতে পাচ্ছি। সেটা হল আত্মোৎসর্গ এবং আমি তা করব। আশা করি আপনাদের সকলের সহযোগিতা পাব আমি—'

আমীরেরা একযোগে অনেকগুলি ঢোঁক গিললেন: 'পাবেন জাঁহাপনা, নিশ্চয় পাবেন। আপনি আত্মোৎসর্গ করলে আমরা কী আর আত্মরক্ষা করতে পারব? আপনার সঙ্গে আমরা অবশ্য আছি।'

'প্রতিজ্ঞা করছেন ?'

গলা শুকিয়ে কাঠ, আমীরেরা শুষ্ক ওষ্ঠে জিভ বুলিয়ে ঘন ঘন মাথা নাড়লেনঃ 'এ বিষয়ে কখনও অন্যথা হবে না জাঁহাপনা। আপনি আত্মোৎসর্গের আয়োজন করুন—আমরা একে-একে ঝাঁপ দিয়ে পড়ব। আমরা তো আপনারই দাসানুদাস—'

'শুনে খুশি হলাম। এ মনোভাব শেষ পর্যন্ত যেন অটুট থাকে।'

খটকা লেগেছিল···তিনি তাঁর অমাত্যবর্গকে উত্তমরূপে চেনেন। হয়তো গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে। আত্মরক্ষার জন্যে অভাবনীয় কিছু করে বসতে পারে। আর, আত্মোৎসর্গ অর্থাৎ যুদ্ধ যখন সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত তখন গৌড়ের ওই বিপুল ধন-সম্পত্তি সংরক্ষণ-ব্যবস্থাও দরকার। যুদ্ধে জয়-পরাজয় আছে, এক্ষেত্রে পরাজয় অথবা মৃত্যুর আশংকা বেশি. তাহলে গৌড়ের ধন-সম্পত্তি রক্ষা করবে কে ? মোগলেরা এসে লুটে নিয়ে যাক্—এ কখনও কাম্য হতে পারে না। তার চেয়ে বিলিয়ে দেওয়া বরং ভালো। সবচেয়ে উত্তম ব্যবস্থা হয় যদি কারো কাছে গচ্ছিত রাখা যায়। কাব কাছে রাখা যাবে ? কে সেই বিশ্বস্ত ব্যক্তি ! চিন্তা করছিলেন সুলতান দাউদ—একে একে অমাত্যবর্গের মুখগুলি ভেসে উঠছিল। অমাত্যের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়, পদস্থ ব্যক্তি তো অনেকেই আছেন, কিন্তু কার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা যায় ? কতলু খাঁ—কতলু খাঁর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা যেত কিন্তু মনে হচ্ছে সে অত্যন্ত চতুর আর স্বার্থপর। তা না হলে, এখন, এই ঘোর দুঃসময়ে কেন বার বার মনে পড়ছে লোদী খাঁকে ! ঘুস কে খায় না ? যুদ্ধে সন্ধি করে না কোন্ বীর ? কতলু খাঁর প্ররোচনায় তাকে হত্যা করা উচিত হয় নি—সে যথার্থ উপকারী বন্ধু ছিল তাঁর। কিন্তু গতস্য শোচনা নাস্তি—নির্বোধের মতো ভুল হয়ে গেছে একটা, এখন সংশোধনের উপায় নেই। লোদী মৃত এবং কতলু খাঁ জীবিত। কতলু খাঁর চরিত্রে সংশয় যখন দেখা দিয়েছে তখন তাকে বিশ্বাস করে দ্বিতীয় ভুল করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

ধন-সম্পত্তির কথা চিন্তা করে অস্থির হয়ে পড়ছিলেন দাউদ। কালক্ষেপ না করে আজই বন্দোবস্ত করা দরকার—মোগলেরা যেভাবে নৌকা বোঝাই করে পাঠান-সৈন্যদের ছিন্ন-শির উপহার পাঠিয়েছে এবং স্বয়ং আকবর যে-রকম ক্ষিপ্ত হযে উঠেছেন তাতে বিলম্বের অর্থ বিপদ বরণ।··· মনের মধ্যে উঁকি মারছে একটি নাম, অতীতে বাল্য-সহচর এবং বর্তমানে প্রধান অমাত্য বিক্রমাদিত্য। দীর্ঘদিনের পরিচয়—ওরা দু-ভাই কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করে নি, সৎ ও সরল। ধর্মভীরু অথচ দৃঢ়চেতা। ওদের ওপর নির্ভর করা যায়। বিশেষত বিক্রমাদিত্য। এই ডামাডোলের সময় ওকেই সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য মনে হচ্ছে।

তিনি ডেকে পাঠালেন প্রধান অমাত্যকে। বিক্রমাদিত্য এসে দাঁড়ালেন তাঁর সামনে। কনিষ্ঠ ভ্রাতা সঙ্গে ছিলেন।

'আপনার ওপর একটি গুরু-ভার অর্পণ করতে চাই—'

তিনি স্পষ্ট ভাষায় বক্তব্য রাখতে চাইলেন।

'আদেশ করুন জাঁহাপনা। সাধ্যাতীত না হলে যত গুরু-ভার হোক, আমি বহন করতে প্রস্তুত—'

বিনীতভাবে দাঁড়িয়ে আদেশের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন বিক্রমাদিত্য

'আপনারা দুই ভ্রাতা আমার দরবারের গৌরব।' দাউদ বললেন, 'গৌড়ের আকাশ যত মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠছে, আপনাদের দুজনের গৌড়-সেবা তত পরিষ্কার হচ্ছে আমার কাছে। কলংকের কোনো মালিন্য নেই আপনাদের চরিত্রে—নিঃস্বার্থভাবে গৌড়ের তথা আমার মঙ্গল চেয়েছেন আপনারা। আপনাদের সৎ-পরামর্শ আমি কখনও গ্রহণ করেছি কখনও-বা বর্জন করেছি, তবু সব সময় অবস্থান করেছেন আমার পাশে। আপনারা আমার যথার্থ উপকারী বন্ধু—'

বিক্রমাদিত্য বললেন, 'আপনি নিজে মহৎ তাই—'

'বন্ধু, এখন আমার ঘোরতর বিপদ। হয়তো শিগগির বিরাট পরিবর্তন দেখা দেবে গৌড়ে। সেদিন আমি থাকব কিনা জানি না—'

'থাকবেন। নিশ্চয় থাকবেন। এ যুদ্ধে আপনি জয়ী হবেন জাঁহাপনা।'

'আপনি বিচক্ষণ দূরদর্শী, তবু আপনার সঙ্গে একমত হতে পারছি না। বৃথা স্তোকবাক্য থাক্। শুনুন আমি যা বলতে চাইছি—'

'বলুন জাঁহাপনা।'

দাউদ বললেন, 'মোগল আমাদের আক্রমণ করেছে জলে-স্থলে। পাটনার দুর্গ জয় করে নৌকা-ভর্তি তারা কী ধরনের উপহার আমার কাছে পাঠিয়েছে তা আপনাদের অজ্ঞাত নয়। আমি নিজে আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সচেতন। অমাত্যগণ মুখে যা-ই বলুক, আমি আশংকা করি, এই বিপদকালে তাঁরা পূর্ণ সহযোগিতা করবেন না। এবং যেহেতু আমি আমার সিদ্ধান্তে অটল সেহেতু ধরে নিচ্ছি আমার পরাজয় নিশ্চিত। দয়া করে এ বিষয়ে কোনো পরামর্শ দেবেন না। কারণ এখন অন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি চাইছি এসপার কিংবা ওসপার কিছু একটা হয়ে যাক। হারতেও পারি কিংবা জিততেও পারি···হারার সম্ভাবনাই বেশি, এ অবস্থায় আমার দুর্ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে গৌড়ের ধন-সম্পত্তি। আমি কখন কোথায় কীভাবে থাকব তার কোনো স্থিরতা নেই। তাই ধন-সম্পত্তির একটা সুব্যবস্থা করে যেতে চাই—'

'কোনো বিশ্বস্ত লোকের জিম্মায় রেখে যেতে পারেন আপনার ধন-সম্পত্তি।'

দাউদ বললেন, 'সে কথাই এতক্ষণ চিন্তা করছিলাম আমি। কে সেই বিশ্বস্ত লোক? কার কাছে গচ্ছিত রেখে যেতে পারি এই বিপুল ধন-সম্পত্তি? প্রধান মন্ত্রী, সমস্ত দিক চিন্তা করে আপনাকেই উপযুক্ত ব্যক্তি মনে হয়েছে আমার। আপনার কাছে গচ্ছিত রাখতে চাই আমার যা-কিছু ধন-দৌলত—'

'আমার কাছে?'

বিক্রমাদিত্য যেন আঁতকে উঠলেন: 'আমি কী এই গুরু দায়িত্ব বহনের উপযুক্ত ব্যক্তি? জাঁহাপনা আপনি অন্য ব্যক্তির সন্ধান করুন—'

'বললাম তো আমি অনেক ভেবেচিন্তে আপনার ওপর এ দায়িত্বভার অর্পণ করতে চাইছি। আপনি ব্যতীত দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম মনে পড়ছে না। শুধু একটি সর্ত, যুদ্ধের পরে আমি যদি জীবিত থাকি তাহলে এই ধন-দৌলত আমাকে প্রত্যার্পণ করবেন। অন্যথায় আপনার যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। আপাতত আমাকে ভারমুক্ত করলে আমি নিশ্চিন্ত হই—'

বিক্রমাদিত্য বললেন, 'তবে তাই হোক। আপনি যখন দ্বিতীয় ব্যক্তির সন্ধান পাচ্ছেন না তখন অগত্যা এ ভার আমি নিলাম। কিন্তু বর্তমানে চারিদিকে যে রকম ডামাডোল তাতে ওই ধন-দৌলত এখানে সংরক্ষণ করা ঠিক হবে না। আপনার আদেশ পেলে আমি ওগুলো নিরাপদ দূরত্বে নিয়ে যেতে চাই—'

'কোথায় নিয়ে যাবেন?'

বিক্রমাদিত্য বললেন, 'জাঁহাপনার হয়তো স্মরণে আছে, উপবঙ্গে নদীবহুল ও বনাকীর্ণ স্বর্গত চাঁদ খাঁর জায়গীর আমাকে ইনাম দিয়েছেন—নিরাপত্তার জন্যে আমি সেখানে নিয়ে যেতে চাই আপনার ধন-রত্ন—'

'কে নিয়ে যাবে?'

বিক্রমাদিত্য পার্শ্বে দণ্ডায়মান ভ্রাতাকে দেখিয়ে বললেন, 'আমার ভ্রাতা এর আগে ওখানে গেছে এবং মোটামুটি আমাদের বাসস্থান নির্ণয় করে এসেছে। আপনার অনুমতি পেলে ধন-রত্ন সহ ওকে ওখানে পাঠাই। আপনি যেমন আমাকে উপযুক্ত ব্যক্তি বলে দুর্লভ সম্মান দিলেন আমি তেমনি ওকে এ দায়িত্ব বহনের সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি বলে মনে করি। ওর দ্বারাই সুচারুরূপে এ কর্তব্য পালন সম্ভব।'

'বেশ। আমার পাঞ্জা নিয়ে আসুন। আমি এখনি আদেশ লিখে দিচ্ছি—'

পাঞ্জা এল। দাউদ আদেশ লিখে দিলেন যে অতঃপর বিক্রমাদিত্য তাঁর ধন-সম্পত্তির জিম্মাদার, নিরাপত্তার জন্য তিনি এই ধন-সম্পত্তি যেখানে খুশি নিয়ে যেতে পারেন, কেউ যেন বাধা না দেয়। লিখে পাঞ্জায় ছাপ মেরে দিলেন তিনি।

বিক্রমাদিত্য বসন্তরায়কে পাঠিয়ে দিলেন গৌড়ে।

ধন-সম্পত্তির পরিমাণ বিপুল এবং তা যে কত বিপুল, ধারণা করতে পারেন নি বসন্তরায়। যুদ্ধের জন্যে গৌড়ের অবস্থা তখন ভালো নয়। যে কোনো মুহূর্তে মোগল-বাহিনী এসে গৌড় দখল করে নিতে পারে এবং যুদ্ধ-বিজয়ী দলের যা রীতি, চারিদিকে লুটতরাজ সুরু করে দিতে পারে সঙ্গে সঙ্গে—এই আতংক গৌড়ের সর্বত্র এবং প্রত্যেকেই ধন-প্রাণ রক্ষার জন্য ব্যাকুল। তদুপরি মারী-মড়কের ঝাপটা। গৌড়ের নাগরিকবৃন্দ বেশ বিভ্রান্ত ও বিপর্যস্ত। তারা জানল এবং দেখল যে গৌড়ের খালিসা-বিভাগের কর্তা ও কোষাধ্যক্ষ বসন্তরায় রাজকোষ শূন্য করে লোক-মারফত ধন-রত্নাদি বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন গঙ্গাতীরে। অধিবাসীরা দলে দলে ভিড় করল তা দেখতে। সারি সারি অসংখ্য নৌকা। প্রয়োজন মতো বহু নৌকা সংগ্রহ করেছিলেন বসন্তরায়। সেগুলি পূর্ণ হয়ে গেল। বসন্তরায় কল্পনা করতে পারেন নি গৌড়েশ্বরের ধন-সম্পত্তিব পরিমাণ কত বিপুল—নৌকা, আরও নৌকা সংগ্রহের আদেশ দিলেন তিনি। নৌকা আসতে লাগল ক্রমাগত এবং তা পূণ হল ধনরাশিতে। ঠিক কতগুলো নৌকা এভাবে পূর্ণ হল তিনি গণনায় আনতে পারলেন না, গঙ্গার বেশ কিছু অংশ জুড়ে নৌকা, শুধু নৌকা। সারিবদ্ধ নৌকা নিয়ে তিনি ভেসে পড়লেন যশোহরের উদ্দেশ্যে।

গৌড়ের অধিবাসীদের ধারণা, নৌকার সংখ্যা সহস্রাধিক।

…এদিকে দাউদের ঘোষণা শুনে আমীরদের মধ্যে প্রবল অসন্তোষ ও ভীতির সঞ্চার হল। অসন্তোষের কারণ, দাউদ তাঁদের সৎপরামর্শ গ্রহণ করেন নি। আর ভীতির কারণ একটাই, সেটা হল প্রাণ-সংশয়। মোগলদের সঙ্গে এ যুদ্ধে দাউদের পরাজয় অনিবার্য তা তাঁরা দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছিলেন এবং এক্ষেত্রে বিদ্রোহীর পরাজয় মানে বন্দীত্ব ও মৃত্যু। জেনে-শুনে তাঁকে সহযোগিতা করা মানে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনা। গভীর দুশ্চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেলেন আমীরগণ। আত্মরক্ষার একটা পথ

আবিষ্কার করতে না পারলে ঘুমিয়ে সুখ নেই, জেগে থাকা আরও [illegible]

'কতলু খাঁ, আমাদের মধ্যে তুমি সর্বচেয়ে বুদ্ধিমান।' এক আমীর অবশেষে মুখ খুললেন : 'তুমি যেভাবে তোমার প্রতিবন্ধক লোদী খাঁকে উচ্ছেদ করেছো তাতে বিশেষ কূটবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া গেছে। আমরা অসহায় এতজন আমীর, তোমাকে পীর বলে স্বীকার করছি। অর্থ যা চাও সব তোমার পায়ে ঢেলে দেব, তুমি বুদ্ধিবলে কিংবা কৌশলে যেমন করে হোক আমাদের প্রাণরক্ষা করো—'

'তোমরা সকলে আমার প্রিয়জন।' কতলু খাঁ চিন্তা করছিল, বললে, 'এবং বর্তমানে আমরা সকলে একই সংকটে আবদ্ধ। মুক্তির উপায় যে একেবারে নেই তা নয় কিন্তু তোমরা রাজি হবে কিনা সেটাই সন্দেহের বিষয়।'

'সন্দেহ-টন্দেহ চুলোয় যাক।' আমীরগণ একসঙ্গে চিৎকার করে উঠলেন, 'তুমি যা বলবে আমরা বিনা বাক্যব্যয়ে মানব। শুধু বলো, দাউদের এই দুর্গ থেকে কী করে পালিয়ে সকলে আত্মরক্ষা করতে পারি। সবখানে সজাগ পাহারা—পালাবার পথ বন্ধ। আর আমরা পালিয়ে যাচ্ছি একথা দাউদ যদি একবার জানতে পারে—'

'আমি সেদিক দিয়েই চিন্তা করেছি। দাউদ জানতে পারবে না অথচ আমরা পালিয়ে যাব।'

'বটে বটে।' আমীরগণ উত্তেজনায় সরে এলেন কাছে : 'বিলম্ব কোরো না কতলু খাঁ। খোলসা করে বলো—'

কতলু খাঁ বললে, 'এত উত্তেজিত হবার দরকার নেই। কাজটা অতি সামান্য। আমাদের মধ্যে যে কেউ করতে পারে।'

'কাজটা কী সেটা বলবে তো। কেবল বকবক করছো—'

কতলু খাঁ বললে, 'দাউদের মদ্যাসক্তি আছে। তার মাত্রা কিছুটা বাড়িয়ে দেওয়া। পরিমাণটা এমন হওয়া চাই যাতে সে অনেকক্ষণ বেহুঁস হয়ে থাকে। সেই ফাঁকে আমরা—'

হলে সাক্ষাৎ হতে পারে, এই মনে করে তিনি রওনা হলেন ভেতরের দিকে। মুনেম খাঁ তাড়া করেছিলেন পেছনে, তাঁর সঙ্গে ছিলেন টোডরমল্ল। তাণ্ডা বিনা রক্তপাতে মোগলের করায়ত্ত হল দেখে টোডরমল্ল তাড়া করে চললেন দাউদ খাঁকে। বেগে ধেয়ে আসছিলেন টোডরমল্ল।

'বিক্রমাদিত্য, আর বুঝি রক্ষা নেই—'

দাউদ যেন হতাশ হয়ে পড়লেন।

বিক্রমাদিত্য বললেন, 'জাঁহাপনা, আমার মন বলছে উড়িষ্যার পাঠান সৈন্যদলের সঙ্গে শিগগির আমাদের সাক্ষাৎ ঘটবে। আপনি জোরে ঘোড়া ছোটান—'

তাঁর অনুমান একেবারে মিথ্যা নয়। কিছুক্ষণ পরেই উড়িষ্যার পাঠান সৈন্যদলের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ ঘটল। এই আকস্মিক বাধার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না টোডরমল্ল। তাছাড়া সৈন্যশক্তিতে হীনবল হয়ে পড়ছিলেন তিনি। দাউদের আত্মীয় জুনেদ খাঁ ও সেনাপতি গুজর ভীম পরাক্রমে পালটা আক্রমণে বিধ্বস্ত করে দিলেন মোগল-বাহিনী। টোডরমল্ল পরাজিত হলেন।

কিন্তু দাউদেব দুর্ভাগ্য। মুনেম খাঁর সতর্ক দৃষ্টি ছিল দাউদের প্রতি। যুদ্ধে মোগলের পরাজয় স˙বাদ শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে মুনেম স্বয়ং এসে যোগ দিলেন সসৈন্যে···বেঁধে গেল ভীষণ যুদ্ধ। হয়তো দাউদ এ যুদ্ধে জয়লাভ করতেন, কারণ গুজর খাঁ দারুণ পরাক্রমে সৈন্য-চালনা করছিলেন। কিন্তু অতর্কিতে একটি তীর এসে গুজরের বক্ষে লাগল এবং তিনি আহত হয়ে পড়ে গেলেন অশ্বপৃষ্ঠ থেকে। একা জুনেদ খাঁ সামলাতে পারলেন না সেনাপতিহীন পলায়নপর সৈন্যদের। নিশ্চিত জয়ের যুদ্ধে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল পাঠান-বাহিনী। দাউদ পরা˙ত হয়ে মোগলের বশ্যতা স্বীকার করে সন্ধি প্রস্তাব পাঠালেন। সন্ধির সর্ত অনুযায়ী দাউদ পেলেন শুধু উড়িষ্যা আর মুনেম খাঁ নিজে বঙ্গ-বিহারের কর্তা হয়ে গৌড়ে রাজধানী স্থাপন করলেন।

'বিক্রমাদিত্য, এই কী আমি চেয়েছিলাম?'

দাউদ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন।

'জাঁহাপনা, গোস্তাকি মাপ করবেন, কোথাও আপনার ভুল হয়েছে।' বিক্রমাদিত্য বললেন, 'হয়তো মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া আপনার উচিত হয় নি। মোগলের শক্তি অনেক বেশি—'

'যাদের আমি বিশ্বাস করেছিলাম তারা যদি আমাকে ত্যাগ না করত, তাহলে দেখে নিতাম কার কত শক্তি। আমার দুর্ভাগ্য যে আমি পূর্ণ-শক্তিতে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারলাম না।'

'তার সময় এখনও যায় নি—'

'আশা করবার কিছু কী আর আছে?'

'আছে জাঁহাপনা।' বিক্রমাদিত্য তেমনি বিচক্ষণতার সঙ্গে বললেন, 'ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করলে সুযোগ নিশ্চয় একদিন আসবে। সাময়িক পরাজয়ের গ্লানি ভুলে গিয়ে আপনি হৃত-গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্যে সচেষ্ট হোন—তৈরী হতে থাকুন ভেতরে ভেতরে—'

'হুঁ।'

পরামর্শটি মনঃপূত হল দাউদের। অপেক্ষা করা এবং ধৈর্য ধরে থাকা। বাস্তবিক সুযোগ একদিন আসবেই—সেটা যেন ব্যর্থ হয়ে না যায়। তবু যে-সংবাদ তিনি পাচ্ছিলেন তাতে ব্যথিত হয়ে উঠছিল তাঁর চিত্ত। কারণ গৌড়ের সে গৌরব আর নেই, এখন সেখানে নানা ব্যাধির প্রাদুর্ভাব—মহামারী ও মড়কে গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়ে যাচ্ছে, প্রতিনিয়ত মানুষ মৃত্যুর শিকার হচ্ছে। অথচ মুনেম খাঁর সেদিকে লক্ষ্য নেই। মহামারীর ভয়ে প্রতিদিন জনশূন্য হয়ে যাচ্ছে গৌড়। অধিকাংশ লোকই আশ্রয়ের আশায় নতুন নগর যশোহরের দিকে ধাবিত হচ্ছে ধন-প্রাণসহ। দিনে দিনে জনশূন্য হচ্ছে গৌড় আর বসতিপূর্ণ হয়ে উঠছে যশোহর। বসন্তরায় তাদের সাদরে অভ্যর্থনা করে বসবাসের সুবিধা করে দিচ্ছেন। ভাইয়ের বুদ্ধির তারিফ করলেন বিক্রমাদিত্য।

'দলে দলে লোকে গৌড় ছেড়ে চলে যাচ্ছে যশোরে।' তিনি বললেন, 'বসন্তরায় তাদের জন্যে গৃহনির্মাণ করে দিচ্ছে, জমি দিচ্ছে ; যশোর জনপূর্ণ হয়ে উঠছে ক্রমশ—'

'আপনারা কী যশোরে বাস করবেন স্থির করেছেন ?'

'আজ্ঞে হাঁ—'

'বসন্তরায়কে অনেকদিন দেখি নি। তিনি কী এখানে আসবেন না ?'

'সংবাদ পাঠিয়েছে সে খুব ব্যস্ত। তবে আসবে শিগগির—'

'আমি গৌড়ের একটি সংবাদ প্রত্যাশা করছি।'

'কী সংবাদ ?'

মুনেম খাঁ অসুস্থ। তাঁর বাঁচার আশা নেই—'

'তাই নাকি ? সুসংবাদ বলতে হবে। আপনি কী প্রস্তুত হয়েছেন ?'

'হাঁ। এ সুযোগ আমি ছাড়ব না—'

সংবাদ পাওয়া গেল মুনেম খাঁ ভীষণ ব্যাধিতে আক্রান্ত এবং তাঁর লোকান্তর ঘটেছে। তাঁর স্থলে বঙ্গেশ্বর হয়ে এসেছেন হুসেন কুলি খাঁ—'খাঁ জাহান্' উপাধি ধারণ করে। দাউদ ভাবলেন, খাঁ জাহান সবে এসেছেন—এই হল আক্রমণের মহামুহূর্ত। সে পোক্ত হয়ে সিংহাসনে বসার আগেই আক্রমণ করতে পারলে যুদ্ধে জয় ও হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার সহজ হবে। খাঁ জাহানের পায়ের নিচে মাটি আলগা—এখনই সবশুদ্ধ চেপে ধরতে পারলে তার সমাধি অনিবার্য।

দিন-ক্ষণ ভাবা ছিল, লগ্ন চিনতে ভুল হয় নি দাউদের—সৈন্য সংগ্রহ ছিল প্রচুর, উড়িষ্যা ও বঙ্গের সামন্তরাজগণের সাহায্যে সৈন্য-শক্তি বর্ধিত করেছিলেন গোপনে। অতএব অস্ত্রধারণে বাধা কোথায় ? লাহোর থেকে সসৈন্যে খাঁ জাহানের বঙ্গে পৌঁছুতে একটু বিলম্ব হল, তৎপূর্বে দাউদ ঝড়ের বেগে এসে তাণ্ডা অধিকার করে নিলেন। এবার তাঁর সহায় ও শক্তি বেশি। সেনাপতি গুজর খাঁ জীবিত নেই বটে কিন্তু দুই পার্শ্বে আছে জুনেদ খাঁ ও কালাপাহাড়—তাঁর ডান ও বাম বাহুর মতো। জুনেদ খাঁ ও

কালাপাহাড় যুদ্ধকৌশলী ও অসীম সাহসী।
গত যুদ্ধের শিক্ষা অনুযায়ী দাউদ শক্তি সংগ্রহ করেছিলেন সাধ্যমতো, বুদ্ধি ও পরামর্শ দেবার জন্যে বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু নিতান্ত মন্দভাগ্য দাউদের। কারণ, খাঁ জাহান বহু সৈন্যসহ বঙ্গে পদার্পণ করে আকমহলের সন্নিকটে যে ভয়াবহ যুদ্ধ বাঁধিয়ে তুললেন তাতে দাউদের দুই বাহুই ভগ্ন হল—জুনেদ খাঁ ও কালাপাহাড় অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করে হত হলেন অকস্মাৎ। তথাপি যুদ্ধজয় দাউদের অনুকূলে ছিল, তিনি প্রাণপণে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। মনে হচ্ছিল বিজয়লক্ষ্মী এবারে তাঁকে কৃপা করলেন বুঝি—বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় আশান্বিত হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু কেউ বুঝতে পারেন নি, সামনের ফাঁকা জায়গাটি জলাভূমি, আসন্ন জয়ের উল্লাসে ঘোড়া ছোটাতে গিয়ে দাউদ সেই জলাভূমিতে গিয়ে পড়লেন এবং ঘোড়া থেমে দাঁড়িয়ে গেল আপনা থেকে। তার পা বসে গেছে জলাভূমির নরম মাটিতে। চাবুকে ক্ষতবিক্ষত হল তার সর্বাঙ্গ তবু সে পা তুলতে পাবল না। তখন ধরা পড়া ব্যতীত অন্য উপায় নেই। বিজয়লক্ষ্মীর এই ছলনা অতি মারাত্মক হল দাউদের পক্ষে।
চারিদিক থেকে মোগল সৈন্য ঘিরে ফেলল তাঁকে। খাঁ জাহানের প্রকৃতি মুনেম খাঁর মতো নয়—তিনি কোনোপ্রকার সন্ধিপ্রস্তাবে রাজি হলেন না। তাঁর নীতি হল, শত্রুর শেষ রাখতে নেই। তিনি হত্যার আদেশ দিলেন এবং দাউদের ছিন্নমুণ্ড পাঠিয়ে দিলেন বাদশাহের কাছে।
···বঙ্গে পাঠান রাজত্বের এখানেই অবসান, ভাবছিলেন বসন্তরায়। অবশ্য যুদ্ধান্তে তাঁরাও নিষ্কৃতি পান নি সহজে। কখনও বশ্যতা, কখনও বা উপঢৌকন দ্বারা আনুগত্য প্রকাশ করে তাঁরা যশোহরে চলে আসেন পাকাপাকিভাবে। জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলে বিক্রমাদিত্য বসেছিলেন যশোহরের রাজসিংহাসনে, তদুপলক্ষে নতুন রাজধানীতে উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল নানা রকম। গৌড়ের সমস্ত ধন-রত্নের অধিকারী তাঁরা—কেউ ভাগীদার নেই। নদী নালা ও বনজঙ্গলে ঘেরা নিরাপদ রাজ্য এই যশোহর—ধনে-

জনে পূর্ণ হয়ে উঠেছে দিনে দিনে। রাজ্যের সর্বত্র বিরাজ করছে শান্তি। বহু পরিশ্রমে তিনি গড়ে তুলেছেন এই শান্তির রাজ্য—তাঁর স্বপ্নের যশোহর। হোক গৌড়ের যশ হরণ করে এ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা তবু বড় সুন্দর, বড় মনোহর এ রাজ্যের প্রকৃতি ও পরিবেশ। প্রতিদিনের সাধ, ইচ্ছা, স্বপ্ন দিয়ে তৈরী এ রাজ্য যদি উত্তর-পুরুষের হাতে···

চিন্তার স্রোতে বাধা পড়ল। বেশ তীক্ষ্ণ ও কর্কশ শব্দ—প্রাসাদতোরণ-শীর্ষে তূর্যধ্বনি হচ্ছে। কারো আগমন নাকি কারো বহির্গমন? এ সময়ে তূর্যধ্বনি কেন? চোখ মেলে তাকালেন বসন্তরায়। এতক্ষণ আত্মগত ছিলেন অতীত-চিন্তায়, যেন খানিকটা আচ্ছন্ন ভাব নেমে এসেছিল চোখের তারায়, বেশ কষ্ট হচ্ছিল চোখ মেলে তাকাতে—তন্দ্রাজড়িত আলস্যে চোখের পাতা ভারি। চোখ মেলে দেখলেন কক্ষের মধ্যে অস্বচ্ছ আলো—যেন জ্যোৎস্নার ঢল নেমেছে ঘরে। এমন আলো থাকে না সচরাচর, বেলজিয়ম কাচের ঝাড়ের ভিতরে প্রায় নিবন্ত মোমের আলো কেউ উসকে দিয়েছে নাকি? ঘুমের সময়ে তিনি মোমের আলো অনেক কমিয়ে দেন নইলে চোখে লাগে এবং ঘুমের ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়, অথচ অন্ধকারেও তাঁর ঘুম আসে না। মৃদু, আবছা মোমের আলো থাকে সারা রাত। সেই আলো সারা কক্ষে ছড়িয়ে প"ার কথা নয়। এত আলো এল কোথা থেকে?

চোখের তারায় অতীতের আচ্ছন্ন ভাব বিদূরিত—স্পষ্ট বুঝতে পারলেন এ মোমের আলো নয়, প্রকৃতির অকৃপণ দান। ভোর হয়ে আসছে, তারই আলোর সংকেত দেখা দিয়েছে পুব আকাশে। অন্ধকার বহিঃ-প্রকৃতি আলোকাভাসে ক্রমশ স্বচ্ছ হয়ে উঠছে। রাত্রি বিগত, উষার আভাস দেখা দিয়েছে দিকমণ্ডলে। তারই কোমল আলোকচ্ছটা কক্ষের অভ্যন্তরে।

সাধারণত উষা-লগ্নেই শয্যাত্যাগ করেন তিনি কিন্তু আজ আলস্য জড়িয়ে

রয়েছে সর্বাংগে, বিনিদ্র রাত্রির ক্লান্তি ও অবসাদ সারাচিত্ত জুড়ে—ভাবতে চেষ্টা করছিলেন এই অনিদ্রার হেতু কী? অতীতের চিন্তা কখনও কখনও নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটায় বটে, খানিক সুখ আর স্বপ্নে আন্দোলিত হয় হৃদয়, কিন্তু সারারাত্রি বিনিদ্র থাকার মতো গুরুতর চিন্তা ইতিপূর্বে হয়েছে কিনা সহসা স্মরণ করতে পারলেন না তিনি। গৌড়ের ঘটনা তো দূর-অতীতের ইতিহাস, সুলতান দাউদের গচ্ছিত অর্থের দাবিদার নেই কেউ, মোগলদের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে মোটামুটি সুসহ যশোহরের দিনযাত্রা,···তবে কোথায় রাত্রি-জাগরণের মতো দুশ্চিন্তার অংকুর? কেন তিনি গতরাত্রি জাগরণে অতি-বাহিত করলেন? শুধু গৌড়ের পতনের ইতিহাস পর্যালোচনা, নিজেদের অযাচিত ভাগ্যলক্ষ্মীর করুণা-লাভের স্মৃতিচারণ? না, তা নয়। কোথাও কোনো গভীর কারণ নিহিত। কী সে কারণ? অবচেতন মনের কোন্ গূঢ় চিন্তা এই ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে?

ত্বরিতু—ত্বরিতু—ত্বরা—

তূর্যধ্বনি হচ্ছে স্নিগ্ধ প্রভাতের নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করে। সম্মানীয় কোনো ব্যক্তির আগমন ঘটলে প্রাসাদে কর্ম-চাঞ্চল্য জেগে উঠত, তাঁকে সংবাদ জানাতে দৌড়ে আসত দৌবারিক। অধিকন্তু তেমন ব্যক্তির আকস্মিক আগমন ঘটে না বড়-একটা। পূর্বাভাস না জানিয়ে তাঁরা কেউ আসবেন কেন। তবে কী প্রাতঃভ্রমণে বেরুলেন মহারাজা বিক্রমাদিত্য? কোনো-কোনোদিন তিনি প্রাতঃভ্রমণে নির্গত হন বটে কিন্তু এত ভোরে কখনও বেরিয়েছেন বলে স্মরণ হয় না। দাদা কিঞ্চিৎ নিদ্রা-বিলাসী—তাঁর ঘুম ভাঙতে আরও কিছু বেলা হয়। তবে কে?

ত্বরিতু—ত্বরিতু—ত্বরা—

তূর্যধ্বনি হচ্ছিলই। তিনি বাতায়ন-পার্শ্বে গিয়ে দাঁড়ালেন। রাত্রে সামান্য গরম ছিল—এখন ভোরের স্নিগ্ধ বাতাসে শরীরের উত্তাপ যেন শীতল হয়ে আসছে। পূর্ব দিগন্তে আলোর ছটা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠছে। যদিচ বহিঃপ্রকৃতির সবটা তাঁর দৃষ্টি পথে স্পষ্ট নয় এবং অন্যান্য দিনের

মতো আজ তিনি প্রাতঃভ্রমণে নির্গত হন নি তথাপি অনুমান করতে অসুবিধা হচ্ছিল না যে এখন, এই শুভ মুহূর্তে, ভোরের পাখিরা কলরব তুলেছে এবং গৃহস্থরা শ্রীগোবিন্দের নাম স্মরণ করে সাংসারিক ও বৈষয়িক কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছে। তিনি নিজে গোবিন্দ-নাম স্মরণ করলেন ভক্তিভরে।

'কখন্ উঠেছো ?'

কমলা দেবী এসে দাঁড়ালেন পাশে। আলস্যজড়িত ঈষৎ ভারি মুখ। উস্কখুস্ক চুল, নিপাট শাড়িতে ভাঁজ। স্বামীর মতোই প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ তাঁর অভ্যাস।

'অনেকক্ষণ।'

পত্নীর মুখের পানে পলক মাত্র তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিলেন তিনি।

'আমাকে ডাকো নি কেন ?'

'তুমি ঘুমুচ্ছিলে—'

'কী ভাবছো ?'

'আর-একটা বিবাহ করা যায় কিনা—'

'স্থির করেছো কিছু ?'

'হাঁ। ভেবে দেখলুম বয়সটা একেবারে বুড়িয়ে যায় নি। দু-একটা বিবাহ এখনও করা যায়—'

'শুনে সুখী হলুম। আজ থেকে ঘটক লাগিয়ে দিই। শুভস্য শীঘ্রম।'

'ও-কষ্টটুকু আর তুমি কেন করবে ? আমার ওপর ছেড়ে দাও—'

'এত বাজে বকতে পারো তুমি !—কী ভাবছো বলবে না ?'

'তূর্যধ্বনি হচ্ছে কেন সেই কথাই ভাবছিলাম। কারো আগমন ঘটে নি—তাহলে সংবাদ পেতাম। প্রাসাদ থেকে কেউ প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছেন। বুঝতে পারছি না তিনি কে—'

কমলা দেবী বললেন, 'প্রাতঃভ্রমণ নয়, শিকার। প্রতাপ তার দল নিয়ে শিকারে বেরুচ্ছে।'

'এই কথাটা আমার মাথায় আসে নি এতক্ষণ। আশ্চর্য—'

তৎক্ষণাৎ তাঁর মনে হল প্রতাপ-বিষয়ে দুশ্চিন্তাই তাঁকে গতরাত্রে জাগিয়ে রেখেছিল। দাদা ক্রমশ কঠোর হয়ে উঠছেন প্রতাপের ব্যাপারে। আর প্রতাপের মধ্যে দেখা দিচ্ছে স্বাধীন-চিত্ততা। দুটি শক্তির মধ্যে অনিবার্য সংঘাতের কথা চিন্তা করেই কী বিনিদ্র কাটালেন একটি রাত?

এখন মনে হচ্ছে, হয়তো তাই।

৩

প্রতাপ বেরিয়েছে শিকারে।

প্রাসাদতোরণশীর্ষে তূর্যধ্বনি আর শ্রুতিগোচর হচ্ছে না—ওরা এগিয়ে চলেছে বিপদসংকুল সুন্দরবনের দিকে। বেলা বেড়ে উঠেছে—উজ্জ্বল রৌদ্রে চারিদিক উদ্ভাসিত। পথ পরিষ্কার, বাধাবন্ধবিহীন ওরা এগিয়ে গেছে অনেকদূর। ঘন বসতি ক্রমে পাতলা হয়েছে—এখন কোনোদিকে বাড়িঘর বিশেষ দেখা যায় না। পরিবর্তে জঙ্গল—সীমাহীন জঙ্গলে প্রকৃতি আচ্ছন্ন। বড় বড় গাছগাছালিতে দৃষ্টিপথ রুদ্ধ। অরণ্যেরও যে একটা নিজস্ব জগৎ আছে তা প্রতি মুহূর্তে উপলব্ধি করা যায়।

'পিড়িক্—'

অরণ্য যত ঘন হয়েছে পাখ-পাখালির স্বচ্ছন্দ বিহার বেড়েছে তত। কোনোটা মাথার ওপর দিয়ে কোনো পাখি গাছের ঝোপঝাড় থেকে উড়ে যাচ্ছে মানুষজনের সমাগমে। সুন্দরবনের বিচিত্র সব পাখি। তাদের বাহার যেমন বিহার তেমনি। খুব কাছ থেকে উড়ে গেল যে পাখিটা তার দিকে তাকিয়ে প্রতাপ বললে, 'ফিঙে—'

প্রতাপের ডানদিক ঘেঁসে চলেছিল অশ্বারোহী সূর্যকান্ত। সে অন্য একটা পাখির পানে চেয়ে বলে উঠল 'ওটা কিন্তু দোয়েল—'

'আর আমার এদিকের ঝোপে যে পাখিটা উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে', প্রতাপের বামপার্শ্ব ধরে অশ্ব চালনা করতে করতে বললে শংকর: 'ওটা হচ্ছে এক জাতের বাটাং—'

ওরা দুজন প্রতাপের বন্ধু ও অনুচর। দুজনেই সেজেছে শিকারের বেশে। সূর্যকান্তের গায়ের রঙ টকটকে ফর্সা, তার বুকে ঝকঝকে একখানি বর্ম আঁটা। বলিষ্ঠ গড়ন। সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘ চেহারা বলে তাকে যুবকের মতো দেখায়। হাতে তীক্ষ্ণাগ্রে বর্শা—রজত-মণি-মণ্ডিত। সে বলছিল, 'আমি শিকার ছাড়াও মাঝে মাঝে সুন্দরবনে আসি। নানারকম পাখি দেখেছি।

এ অঞ্চলে প্রায়ই যে সব পাখি দেখা যায় তারা হল ঘুঘু, দ'লো, দোয়েল, হলদে পাখি, ফিঙে আর নানা জাতের বাটাং। কুকড়োবাটাং খুব বড় আর চিড়েবাটাং অত্যন্ত ছোট। এইমাত্র যে পাখিটা শংকরের পাশের ঝোপ থেকে উড়ে গেল ওটা না-খুব বড় না-খুব ছোট—অথচ জাতের দিক থেকে বাটাংই। সাধারণতঃ যে জাতের পাখি সহজে দেখা যায় না ওটা সেই হট্‌টিটি বাটাং—'

বলে সূর্যকান্ত তাকাল শংকবের পানে।

'আমারও তাই মনে হয়।' শংকরের অঙ্গসজ্জাও দেখবার মতো। বয়সে কিছু বড় হবে শংকর, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যের অধিকারী, সুগঠিত দেহ। কাঁচা সোনার মতো তার গাত্রবর্ণ। প্রশস্ত ললাটে অগুরুচন্দনের ফোঁটা, সাদা পোযাক—সাদা রঙেব ঘোড়াব সওয়ার। তার হাতে উন্মুক্ত কৃপাণ, কণ্ঠে পুষ্পমালা, বুকে দুলছে ধনুক, পিঠে বাঁধা তূণীর—চোখ দুটি বেশ বড় এবং তীক্ষ্ণতায় উজ্জ্বল। সে বলছিল. 'তোমার মতো কখনও কখনও আমিও একা আসি এ অঞ্চলে. সূর্যকান্ত। হট্‌টিটি বাটাং-এব মতো গতবারে আমি দেখেছিলাম একটা দুর্লভ পাখি। তুমি হয়তো দুধরাজ পাখি দেখেছো, শ্বেতবর্ণ. সরু আর সাদা লেজ খুব লম্বা। এই জাতের রক্তরাজ পাখিও ঠিক ওই রকম, শুধু তার রঙটি রক্তবর্ণ। আমি বলতে যাচ্ছিলাম ও-জাতেবই তৃতীয় পাখিটির কথাঃ ভীমরাজ। তার বর্ণটি গাঢ় কালো। ভীমবাজ জনশূন্য বানর পাখি, অথচ আশ্চর্য এই, সে নাকি বনে থেকেও মানুষেব মতো কথা কয়—প্রকৃতির ভাণ্ডারে এমন অনেক জিনিস আছে যার খবর আমরা জানি না—'

'প্রকৃতির রাজ্যে সুন্দরবন সেই অজানা জ্ঞানের ভাণ্ডাব। ছোটবেলা থেকেই সুন্দরবন তাই আমাকে এত টেনেছে—'

কথা শেষ করে রাশ টেনে ধরল প্রতাপ। বাঁক দিতে হচ্ছিল। পাশাপাশি যেতে পারছিল না ঘোড়া—রাশ টানার ফলে ঘোড়ার পায়ে অসম ঘুঙুরের ছন্দ বেজে উঠল। গতি সংহত করার জন্যে প্রতাপের ঘোড়াটি যেন

অসন্তুষ্ট। অসন্তুষ্ট হবারই কথা। সকল অশ্বের চেয়ে ভালো সাজ হয়েছে তার। টকটকে লাল জরির কামদার মখমলের আস্তরণ, তাতে মুক্তার ঝালর, কণ্ঠে ঝুলছে মণিমধ্য সুবর্ণপদক—চার পায়ে সোনার তৈরী ঘুঙুর, রেশমি বল্গায় দুলছে মুক্তার খোপ। প্রতাপ আল্‌গাভাবে ধরে আছে লাগাম, অশ্বটি তার অতি প্রিয়, পদচাপেই বুঝতে পারে আরোহী তাকে কিসের ইংগিত করছে। প্রথম দিকে সে দ্রুতবেগে এলেও এখন সে শান্ত এবং প্রতাপের নির্দেশমতো মন্থরগতি। বাঁক ঘুরে যাবার পর সে যথারীতি এগিয়ে এল সবার আগে। তাকে অনুসরণ করে একপাশে সূর্যকান্ত এবং অন্যপার্শ্বে শংকর সামিল হল।

বন ক্রমশ ঠাস হচ্ছে—প্রতাপ মাথার উষ্ণীষ ঠিক করে নিল। তার মাথায় ঢেউ-খেলানো মণি বসানো উষ্ণীষ, ললাটে ত্রিপুণ্ড্রক, কানে প্রবালে তৈরী কুণ্ডল। বাহুতে যেমন অক্ষয়-কবচ বুকে তেমনি সূর্য-কবচ আর কণ্ঠে দুলছে মতিমালার লহর—যা প্রভাতসূর্যকিরণে ঝলমল করে উঠছে অঙ্গক্ষেপের সঙ্গে। তার পরিধানে কিংখাবের চুড়িদার পায়জামা ও চাপ-কান, পায়ে জরির নাগরা। ডানহাতে তীক্ষ্ণধার উন্মুক্ত তরবারি—কারণ সে এখন জঙ্গলে প্রবেশ করেছে, কোমরে জরির কারুকাজ-করা বহুমূল্য কটিবন্ধ, তাতে বাঁধা বস্ত্রকোষ যা আপাততঃ শূন্যগর্ভ। বাঁহাতে অশ্ববল্‌গা। দৃপ্ত ও তেজিয়ান ভঙ্গিতে সে অশ্ব চালনা করছে।

বাঁক ঘুরে যাবার পর অশ্বের গতি বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিছুদূর গিয়ে রাশ টেনে ধরতে হল আবার। একটি মূর্তির সামনে কয়েকজন কাঠুরে শ্রেণীর লোক ভক্তিনম্রচিত্তে দাঁড়িয়ে—ওদের দলের এক ব্যক্তি সেই মূর্তি পূজা করছে। প্রতাপ দেখেই চিনতে পারল মূর্তিটি দক্ষিণ রায়ের, এ অঞ্চলে যার বিশেষ খ্যাতি। শিকার বা ঃ.বিকার উদ্দেশ্যে সুন্দরবনে প্রবেশকারী প্রত্যেক ব্যক্তি এই ব্যাঘ্রদেবতাটির পূজা বা মানত করে থাকেন—এতদঞ্চলে এর দাপট অতি প্রবল। তার ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম ঘটে নি। প্রথম দিকে শিকারে বেরিয়ে যদিচ সে এ-সব মানতে চায় নি কিন্তু দেখা গেছে, সে না

মানলেও তার সঙ্গী বা অনুচরবৃন্দ দক্ষিণরায়ের পূজা না দিলে সুন্দরবনে প্রবেশ করতে চায় না। বাধ্য হয়ে তাই সে গাছের ডালে 'বারা' বেঁধে তাদের সন্তুষ্ট করেছে। এই দেবতার আশীর্বাদ থাকলে বাদাবনে নাকি বিপদের আশংকা থাকে না—বাঘ বা ওই জাতীয় জীবজন্তুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পায় মানুষ।—সংস্কার ছাড়া আর কী!

ভাবছিল প্রতাপ আব দেখতে পাচ্ছিল দক্ষিণরায়ের মাথার ওপর খড়ে ছাওয়া আচ্ছাদন, জাঁক নেই তেমন, মাটির থান। বোঝা যায় এ গভীর বনেও তিনি যথোপযুক্ত পূজা পেয়ে থাকেন এবং তাঁর নিয়মিত ভক্তের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নয়। এই থানে তিনি অধিষ্ঠান করছেন বহুকাল। লৌকিক দেবতাদের মধ্যে তিনি সুশ্রী ও সুপুরুষ বটেন। কারণ, প্রতাপ দেখতে পাচ্ছিল তাঁর বর্ণ হলুদ, মাথায় বাবরিচুলের ওপর উষ্ণীষ বা মুকুট, কানে কুণ্ডল আর কপালে রক্ততিলক। মূর্তির চোখ দুটি বিশাল, একটু রক্তাভ। নাক টিকালো, আকর্ণ বিস্তৃত গোঁফ, পরিধানে যোদ্ধার বেশ—হাতে তীর-ধনুক, পিঠে ঢাল ও তূণীর। জানু পেতে বসে আছেন দৃঢ়ভাবে. পাশে ক্ষুদ্রাকৃতি একটি ব্যাঘ্র মূর্তি। সুন্দরবন অঞ্চলে বসবাস-কারী এবং ব্যবসার উদ্দেশ্যে যারা যাতায়াত করে—মউলে, বাউলে, মালঙ্গী, ধীবর, নৌজীবী প্রভৃতি সকলেই এই দেবতার পূজা দিয়ে থাকে, এ পূজায় কোনো পুরুত থাকে না, নির্দিষ্ট সময়ও নেই।

'শংকর, শুনতে পাচ্ছ লোকটা মন্ত্র আউড়াচ্ছে?'

শংকর পাশাপাশি যাচ্ছিল। বললে, 'এ পূজাব ওটা বীজমন্ত্র। ওঁ দম্ দম্ দম্—'

'আরও কী যেন বলছে মনে হয়।'

শংকর বললে, 'কান পাতলে বোঝা যায়। আমি একটুখানি উদ্ধার করতে পেরেছি—'

'শুনি।'

শংকর বললে, 'চন্দ্রবদন চন্দ্রকায়। শার্দুল বাহন দক্ষিণরায়—'

'এত শুনি এঁর নাম, আমার জানতে ইচ্ছে করে প্রকৃতপক্ষে ইনি কে ? তুমি তো অনেক পড়াশোনা করেছো, এঁর সম্বন্ধে কিছু জানো নাকি ?'
শংকর একটুক্ষণ চুপ করে রইল। ঘোড়ার পিঠে মৃতুচ্ছন্দে তার শরীর দুলছিল। বললে, 'গরীব ঘরের ছেলে আমি, লেখাপড়া শিখতে আর পারলাম কই। ফারসি পড়তে ভাল লাগে না, হিন্দু ব্রাহ্মণ বংশের ছেলে, সংস্কৃত পড়তে চেয়েছিলুম, কিন্তু তা হল না। গৌড়ে এবং দেশের সর্বত্র মুসলমানী শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব দেখে চিত্ত বিকল হয়ে উঠেছিল, কোথায় গেলে একটুখানি সুস্থ হওয়া যায়, হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে পারি, হিন্দু-ধর্মের হাওয়ায় নিশ্বাস নিয়ে দেশের ও দশের কাজ করতে পারি, ভাবতে ভাবতে দেশের বাড়ি ছেড়ে নানা জায়গা ঘুরে অবশেষে আপনার আশ্রয়ে এসে পড়েছি সপরিবারে। তখন সন্তবিবাহিত, গৌড় বিধ্বস্ত হবার পর যশোরের সুখ্যাতি বেড়ে গিয়েছিল প্রচুর—যার কোথাও কোনো আশ্রয় নেই সে-ও একবার যশোর ঘুরে যায়। আর একবার যে যশোরে এসেছে সে আর অন্যত্র চলে যায় নি। যশোরের আলো-হাওয়ায় আত্মীয়তার এমন এক টান আছে যাকে এড়িয়ে যাওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। আমিও এসেছিলুম দ্বিধাগ্রস্ত মনে, চলে যাব ভেবেছিলুম, কিন্তু এখানকার মানুষের সঙ্গে মিশে এবং আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে কেবলই মনে হয়েছে এখানেই আমার প্রকৃত স্থান, এটাই আমার কর্মকেন্দ্র, যশোরের জন্যে আমার জান্ কবুল। অন্য অর্থে যশোরকে আমি ভালোবেসে ফেলেছি—'
আবেগ এসে গিয়েছিল, গলা কাঁপছিল। সংবরণ করে নিয়ে আবার বললে, 'দক্ষিণরায় সম্বন্ধে আমার বিশেষ পড়াশোনা নেই তবে তাঁর বিষয়ে অনেকে অনেক কথা বলেন। যেমন, কারো মতে তিনি ছিলেন ঐতিহাসিক মানুষ। আদি পাঠান যুগে স্বধর্ম ও সমাজরক্ষক হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল প্রবল—পরাক্রম ছিল তেমনি। সে সময়ে সশস্ত্র ইসলাম প্রচারকদের সঙ্গে তাঁর ভয়ংকর যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছিল এবং সে কারণেই

তাঁর পূর্ণ মূর্তি সর্বদা যোদ্ধা বেশেই দেখা যায় আজও।'

'অথচ আমরা জানি', প্রতাপ বললে, 'তিনি ব্যাঘ্রদেবতা—'

শংকর তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলে, 'ব্যাঘ্র উপাসনা থেকেই দক্ষিণরায়ের পূজা এসেছে একথা ঠিক। বহু প্রাচীন যুগের ধারা এটা—একেবারে প্রাগৈতিহাসিক কালের বলা যায়। আদিম যুগে যখন সুন্দরবন ও অপর অরণ্যময় অঞ্চলের অধিবাসীরা ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র পশুর প্রতিবেশী ছিল, সে সময় তাদের ভয়ের একমাত্র কারণ ছিল ওই পশুটি। দৈব উপায়ে তার গ্রাস থেকে রক্ষা পাবার জন্যে ব্যাঘ্রের উদ্দেশ্যে বা কোনো একটি সদা ক্রুদ্ধ প্রতিহিংসাপরায়ণ অশরীরী আত্মাকে ব্যাঘ্রকুলের অধিদেবতা কল্পনা করে তাঁকে নানারকম প্রক্রিয়া দ্বারা সন্তুষ্ট করে কৃপালাভের প্রয়াসী হয়। এইভাবে ক্রমে ব্যাঘ্র পূজার প্রবর্তন ঘটে।'

'তবে যে বললে তিনি একজন ঐতিহাসিক মানুষ—'

শংকর ঈষৎ অসহিষ্ণুস্বরে বললে, 'সেটা তো ইতিহাসের কথা। নানা জন নানাভাবে তাঁর পূজার উৎস অনুসন্ধান করেছেন। কেউ বলেছেন, বাঙলা দেশে প্রাচীন যুগে মিশরীয়রা আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে যিনি এর দক্ষিণ অংশ শাসন করতেন তিনি পরবর্তীকালে দেবতায় পরিণত হয়ে যে নাম গ্রহণ করেন সে নামই 'দক্ষিণরায়'। এই মতেব পিছনে যথেষ্ট যুক্তি আছে বলে আমি মনে করি না। কথা-উপকথায় মিশে তিনি ব্যাঘ্রদেবতা রূপেই সমধিক খ্যাতিলাভ করেছেন।'

'তোমরা লক্ষ্য করেছো কিনা জানি না', প্রতাপ বিতর্কে ক্ষান্তি দিয়ে অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করল, 'আমরা এতখানি পথ আসতে আসতে নানা গাছগাছালির সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। সুন্দরবনের গাছগাছালির একটা বৈশিষ্ট্য আছে—'

সূর্যকান্ত এতক্ষণ কথা বলবার জন্যে ছটফট করছিল। বড় বড় তত্ত্বকথা সে বোঝে না কিন্তু সুন্দরবনের প্রাকৃতিক ধন-ভাণ্ডার সম্বন্ধে সে অবহিত। বনে বসবাসকারী লোকেদের সঙ্গে মিশে এ-বিষয়ে মোটামুটি জ্ঞান তার

'বুঝলুম।' এক আমীর কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বললেন, 'কিন্তু কাজটা করবে কে ? দাউদ তো ছেলেমানুষ নয় যে তাকে খুশিমতো মাদক-সেবন করানো যাবে, বিশেষত এখন তার মনের যা অবস্থা—'

'সেজন্যেই পারা যাবে।' কতলু খাঁ প্রত্যয়ের সঙ্গে বললে, 'এমনিতে তার মাদক-সেবনের মাত্রা বেড়ে গেছে। তদুপরি আসন্ন যুদ্ধের দুশ্চিন্তায় রাত্রে তার সুনিদ্রা হচ্ছে না। উপকারী বন্ধুর মতো পাশে থেকে দফায় দফায় মাদক-সেবন করালে সে আদৌ সন্দেহ করতে পারবে না যে তাকে বেহুঁস করার বন্দোবস্ত হচ্ছে, মাঝ থেকে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি রাজি না হও তো আমি এ কাজের ভার নিতে পারি।'

'পারো ? তাহলে খুব ভালো হয়। কারণ তোমাকে সে বিশ্বাস করে—'

কতলু খাঁ বললে, 'আমি সেই সুযোগই নেব।'

কতলু খাঁ করিতকর্মা ব্যক্তি। বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান। দাউদের বিলাস-মজলিশে রসজ্ঞর মতো পাশে উপস্থিত থেকে দফায় দফায় মাদক-সেবন করিয়ে সুলতানকে অচৈতন্য করে ফেলে এবং সুযোগ বুঝে আমীরগণ সহ নিরাপদ স্থানে পালিয়ে গেল। দাউদ সঙ্গীহীন, একা।

জ্ঞান ফিরে পাবার পর তিনি দেখলেন তাসের প্রাসাদের মতো তাঁর সকল শক্তি ভেঙে পড়েছে— বিক্রমাদিত্য ব্যতীত কেউ পাশে নেই। তিনি যেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন।

হতাশ, ভগ্নস্বরে দাউদ বললেন, একে একে সবাই চলে গেছে আমাকে ছেড়ে। বিক্রমাদিত্য, আপনি আর কেন ? কী করবেন এখানে থেকে ? আপনিও চলে যান—'

'জাঁহাপনা, বিপদে ভেঙে পড়লে কী চলে ?' বিক্রমাদিত্য শান্তস্বরে বললেন, 'এখন আমার ভাই বসন্তরায় কাছে নেই, সে আপনার ধন-দৌলত নিয়ে চাঁদ খাঁর জায়গীরে রওনা হয়ে গেছে। সে উপস্থিত থাকলে এই ঘোর সংকটকালে কী পরামর্শ দিত জানি না, কিন্তু আমাকে আপনি যখন প্রধান অমাত্যের পদ দিয়েছেন এবং বিশ্বাসের পাত্র বলে মনে করেন তখন আমি

বলি, পরাজিত অবস্থায় আত্মসমর্পণ অপেক্ষা, এখনও সময় আছে, আপনি আত্মরক্ষা করুন।'

'বাঁচতে সাধ যে নেই তা নয়। কিন্তু কী ভাবে আত্মরক্ষা করব সেটাই বুঝছি না—'

বিক্রমাদিত্য বললেন, 'হতাশা ও উত্তেজনায় আপনি হয়তো খেয়াল করতে পারছেন না যে উড়িষ্যা থেকে কিছু পাঠান সৈন্য আসার কথা আছে। তারা এখনও এসে পৌঁছোয় নি। আপনি উড়িষ্যার পথে পলায়ন করলে পথে হয়তো তাদের সঙ্গে মিলত হতে পারেন।'

'আপনি?'

বিক্রমাদিত্য বললেন, 'আমি যাচ্ছি আপনার সঙ্গে—'

'তবে তাই চলুন। আমি বেশি ভাবতে পারছি না। চলুন। পথ দেখান।'

···বসন্তরায় তখন সঙ্গে ছিলেন না। তিনি পরে শুনেছিলেন দাদার মুখে। মনে পড়ছিল।

দাউদের পলায়ন সংবাদ পরদিন প্রভাতে আকবরের নিকট পৌঁছুলে তিনি তৎক্ষণাৎ পাটনা দুর্গ অধিকার করে নিলেন এবং নগরী লুণ্ঠনের আদেশ দিলেন। ফলে পাটনা নগরী লুণ্ঠনের তাণ্ডবতায় বীভৎস আকার ধারণ করল। মোগল সৈন্যরা যখন লুণ্ঠন কার্যে ব্যস্ত সেই অবকাশে দাউদের সেনাপতি গুজর খাঁ কতকগুলি হস্তিপৃষ্ঠে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি চাপিয়ে দুর্গের পশ্চাদ্‌ভাগ দিয়ে পালিয়ে গেলেন। এ সংবাদ আকবর জানতে পারলেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। তিনি মুনেম খাঁকে বাদশাহী সৈন্যের সেনাপতি হিসাবে রেখে নিজেই গুজরের পশ্চাদ্ধাবন করলেন এবং কিছুদূর গিয়ে দারিয়াপুরের সন্নিকটে হস্তিগুলি হস্তগত করলেন—গুজর পালিয়ে গেলেন প্রাণ নিয়ে। তিনি দাউদের সঙ্গে মিলিত হলেন তাণ্ডায়।

দাউদ তাণ্ডায় এসেছিলেন অনেক আশা নিয়ে। কিন্তু পথিমধ্যে সাক্ষাৎ হল না উড়িষ্যার পাঠান সৈন্যদের সঙ্গে, যে কোনো কারণেই হোক পাঠান সৈন্যগণ এতদূর পর্যন্ত আসতে পারে নি হয়তো আরও কিছুদূর অগ্রসর

হয়েছে। পার্শ্ববর্তী গাছের সারির দিকে আঙুল নির্দেশ করে সে বললে, 'এগুলো যে সুন্দরী গাছ তা না বললেও চলে। এর পাতাগুলো ছোট, অনেকটা লবঙ্গ পাতার মতো, উপরে মসৃণ এবং নিম্নে ধূসরবর্ণ—বাতাসে পাতাগুলো যখন কাঁপে তখন ভারি সুন্দর দেখায়। গাছগুলো খুব দীর্ঘ হয় কিন্তু স্থূলতায় বটগাছ বা আমগাছের মতো নয়, সাদৃশ্য বরং জামগাছের সঙ্গে। অল্প বয়সী সুন্দরী গাছগুলো বাঁশের মতো দীর্ঘ ও সরল হয়ে ওঠে, তাদের বলে 'ছিট'। সুন্দরীর ছিটে নৌকোর লগি হয়। গাছের গায়ের উপরিভাগের পাতলা আবরণ উঠিয়ে দেখেছি ভেতরে গাবগাছের মতো লাল রঙ—'

শংকর বললে, 'এর কাঠও গাঢ় লালবর্ণ, যেমন শক্ত তেমনি সুন্দর; এবং সুন্দর বলেই একে সুন্দর বা সুন্দরী কাঠ বলে। এই কাঠে মজবুত তক্তা হয়, টেঁকে অনেকদিন, তক্তা ছাড়াও বহু প্রয়োজনে লাগে। সুন্দরবন নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মত থাকতে পারে কিন্তু আমার মনে হয়, এই গাছের নাম-অনুসারে এ অঞ্চলের নাম হয়েছে সুন্দরবন—'

আলোচনা ফের তত্ত্বের দিকে চলে যাচ্ছে দেখে সূর্যকান্ত তাড়াতাড়ি গাছ-গাছালির প্রসঙ্গ টেনে আনল এবং নিকট দূরের বৃক্ষলতার পরিচয় ও গুণাগুণ পেশ করতে লাগল। কোনো গাছের দিকে আঙুল উঁচিয়ে জানাল, 'ওটা পশুর গাছ। সুন্দরী ব্যতীত অন্য সমস্ত কাঠের মধ্যে পশুর হল প্রধান, এমন-কি ঘরের খুঁটিরূপে এ গাছের কাঠ সুন্দরীর চেয়েও ভালো কাজ করে। গাছ বড় হয়, পাতা একটু প্রশস্ত, কতকটা কাঁটাল পাতার মতো।' ততক্ষণে অপর গাছের পানে নজর পড়ে গেছে। 'ওটা বাইন। কাঠের শক্তি ও স্থায়িত্বের হিসাবে বাইন গাছকে সুন্দরবনের তৃতীয় বৃক্ষ ধরা হয়। এ গাছগুলো যেমন দীর্ঘাঙ্গ তেমনি দীর্ঘায়ু—' দেখতে পেয়েছে ধোন্দল বা গামুর, কেওড়া, গরাণ। এগুলো শেষ হবার পরই ধরেছে গেঁয়ো, হেন্তাল ও গর্জন। গর্জন গাছের বর্ণনা শেষ করে তার গুণ সম্বন্ধে যোগ করল এই বলে, 'গর্জনের তেল হয়। প্রতিমা বা পুতুলের

গায়ে রঙ ফলাবার জন্যে শিল্পীরা গর্জন তেল ব্যবহার করে। অধিকন্তু, এই তেল কুষ্ঠ প্রভৃতি মহারোগে মহোপকারী।···সুন্দরবনে প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন অফুরন্ত তেমনি ভয়াল জীবজন্তুর বাস। ঝোপের মধ্যে কোন্ জন্তু লুকিয়ে আছে এবং কিভাবে যে তার আক্রমণ আসবে আগে থেকে কল্পনা করাও দুঃসাধ্য—'

'আমাদের সকলের সতর্ক থাকা উচিত।' প্রতাপ বললে চাপা উত্তেজনায়।

কথা বলতে বলতে নদীর তীর ধরে ওরা অনেক দূরে চলে এসেছে। জন-বসতির চিহ্নমাত্র নেই—হেন্তালের ঘন জঙ্গল চারিদিকে। বড় বেশি নিস্তব্ধতা। শক্ত মাটির জমি নেই—নরম জলাভূমি আর ছোট ছোট খেজুর গাছের মতো হেন্তালের ঝোপ। তার সঙ্গে হরগোজা কাঁটাগাছের ঝোপ মিশে জায়গাটা দিনের বেলাতেই এমন অন্ধকার করে রেখেছে যে প্রতি পদক্ষেপে বিপদের আশংকা। শিকারের জন্যে আত্মগোপনকারী বাঘেদের এসব জায়গা অতি প্রিয়। যে কোনো মুহূর্তে তাদের আবির্ভাব ঘটতে পারে। প্রতাপ তৈরী হয়েছিল, আরও সাবধান হল এবং সঙ্গীদের সতর্ক করে দিল।

এখন সুন্দরবন কথা বলছে। মাথার ওপরে সুদীর্ঘ কেওড়ার সারি সূর্যপথ আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে যেন সুন্দরবনের প্রহরী, নিচে হেন্তাল হর-গোজা গোলগাছের ঝোপ নিশ্চুপে তাদের কথা শুনছে। বাতাসে উঠছে একটা বিচিত্র মর্মরধ্বনি—পাতায় পাতায় বেজে চলেছে আরণ্যক সুর-সঙ্গীত। স্তব্ধতার পাকে পাকে জড়িয়ে এই সঙ্গীত এখন ভয়াবহ সুর সাধছে। জলাভূমির সোঁদা গন্ধে মনে হয় এদিকে মানুষ বুঝি আসে নি আগে।

সঙ্গী সাথী সকলেই চুপ করে গেছে—প্রতাপ চলেছে আগে-পিছে অনুচর নিয়ে। সকলের আগে চলেছে একদল সশস্ত্র অনুচর, পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে তারা। পিছনেও আসছে সমসংখ্যক অনুচর ভল্ল, বর্শা ও খড়্গ নিয়ে। সমগ্র দলটি নিতান্ত ছোট নয়। এতক্ষণ পর্যন্ত সকলে যে-রকম

সহজ সুরে কথা বলতে বলতে এসেছে তাতে কোথাও বিপদাশংকার লেশমাত্র ছাপ ছিল না, এখন কথা বন্ধ হয়েছে বটে কিন্তু ভঙ্গির মধ্যে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের ঘোষণা। যেন নিশ্চুপ ভ্রমণে বেরিয়েছে তারা। প্রকৃত-পক্ষে যুবরাজের শিকার-বাহিনীতে যোগদান করে কখনও তারা শূন্যহাতে ফিরে যায় নি এবং দক্ষিণরায়ের কৃপায় কারো প্রাণহানি ঘটে নি কোনো-বার। যুবরাজ স্বয়ং যেন জাগ্রত দক্ষিণরায়ের মতো সকল বিপদ থেকে আগলিয়ে রেখেছেন তাদের। কারণ তারা দেখেছে এবং বিশ্বাস করে যে তাদের যুবরাজ অব্যর্থ-লক্ষ্য শিকারী। জংগল খেদিয়ে যে-কোনো শিকারীকে লক্ষ্যের ভিতরে আনতে পারলে যুবরাজের হাতে তার মৃত্যু অনিবার্য, প্রতিবার তাই ঘটেছে। আর যুবরাজকে রক্ষা করবে যে দুজন, যদি দরকার পড়ে, সেই সূর্যকান্ত ও শংকর আরও ভয়ংকর। জংগলের বিভীষিকা যারা তারাও ওদের দেখলে ভয় পায়। এদের সঙ্গে শিকারে আসাও সুখ। অর্থ ও আনন্দ দুই-ই পাওয়া যায়।

এবারে শিকারের কিছু রকম-ফের ঘটেছে। ওরা জানে সুন্দরবনে বাতাসের স্তর বিষাক্ত বাষ্পে পরিপূর্ণ হলেও, এখানে হিংস্র জীবজন্তুর আকৃতি ও প্রকৃতি ভয়াবহ। ওরা দেখেছে ও শুনেছে, এ বনে মহিষের মতো প্রকাণ্ড বাঘ যেমন আছে তেমনি অবাধে ঘুরে বেড়ায় বাঘের মতো বিপুলকায় শূকর …কখনও মুখোমুখি কখনও-বা আকস্মিকভাবে তাদের আবির্ভাব ঘটলেও তারা কেউ নিস্তার পায় নি যুবরাজের কিংবা তাঁর ঘনিষ্ঠ সহচর শংকর ও সূর্যকান্তের নিপুণ অস্ত্রচালনায়। ওরা শিকার বয়ে নিয়ে গেছে রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত—যুবরাজ দরাজ হাতে পুরস্কার দিতে কোনোবার কার্পণ্য করেন নি। শুধু কী বাঘ আর শূকর? ওদের মনে পড়ছিল, জংগল-খেদাদের হাতেই কতবার মারা পড়েছে গোরুর মতো বড় বড় হরিণ। তাছাড়া জলে আছে নৌকোর মতো বড় বড় কুমীর, যেমন শক্তিশালী তেমনি ভয়ংকর।… কুমীর শিকারের জন্যে বেরনো হয় নি কোনোবার, তবে একথা ঠিক, ইচ্ছা করলে অনায়াসে কুমীর শিকার করে নিয়ে যেতে পারেন যুবরাজ। সে

রকমভাবে প্রস্তুত হয়ে এলে কুমীর-শিকার মোটেই কঠিন নয় তাঁর মতো পাকা শিকারীর পক্ষে। নদীর তীর ধরে জলাভূমির মধ্যে দিয়ে তিনি দলবল সমেত যেভাবে এগিয়ে চলেছেন তাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে এবারে তিনি সেই উদ্দেশ্যেই বুঝি বেরিয়েছেন, কিন্তু তা নয়। কুমীরের পরিবর্তে তিনি যে-জন্তু শিকারের উদ্দেশ্যে চলেছেন তার দাপটও কম নয় স্থলে, হিংস্রতায় সে কম যায় না কারো চেয়ে, শক্তিও ভীষণ। তাদের আকৃতি ও প্রকৃতি দেখবার মতো। জংগলের ভিজে অংশেই তাদের বাস —হাতীর মতো প্রকাণ্ড এক-একটি গণ্ডার। সুন্দরবনে ইদানিং কমে আসছে এই ভয়াল জন্তুর সংখ্যা, তবু এখনও যা আছে তার দাপটে বনস্থলী অস্থির। যুবরাজ প্রতাপের এবারের লক্ষ্য ওই গণ্ডার শিকার।

বন ভেঙে, চারিদিকে সতর্ক চক্ষু রেখে, গাছের পাতায় পাতায় আরণ্যক সঙ্গীতের সুর শুনতে শুনতে ওরা তাই চলেছে গণ্ডারের সম্ভাব্য আবাস-স্থানের উদ্দেশ্যে। ভিজে ও কর্দমাক্ত মাটি ঘোষণা করে দিয়েছে এটা ওদের এলাকা—পায়ের ছাপে ধরা পড়েছে ওদের অস্তিত্ব। কাছাকাছি কোথাও আছে ওরা। অগ্রবর্তী বাহিনী চলে গেছে ওদের সন্ধানে। খেদিয়ে নিয়ে আসবে এদিকে। সাক্ষাৎ ঘটতে পারে যে কোনো মুহূর্তে·· আর সে সাক্ষাৎ মানে··

হুড়মুড়িয়ে কে যেন ছুটে আসছে। দুলে দুলে উঠছে সম্মুখের ঝোপ। হেন্তালের বন তছনছ হয়ে যাচ্ছে। পদচাপে মাটিতে বসে যাচ্ছে হরগোজার শক্ত কাঁটা। মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি লেগে যাচ্ছে কেওড়ার জংগলে—মনে হচ্ছে যেন ছুটে আসছে এক সাক্ষাৎ বিভীষিকা। ভেসে আসছে জংগল-খেদাদের দূরবর্তী বিকট হল্লা, শোনা যাচ্ছে তাদের টিন-পেটানো কর্কশ বাজনা। তারা দেখতে পেয়েছে এবং প্রতাপও দেখতে পেল, জংগলের মধ্যে প্রলয়ংকর তাণ্ডব সৃষ্টি করে ছুটে আসছে তাদের প্রার্থিত শিকার—ক্রোধোন্মত্ত বিরাটকায় এক গণ্ডার। তাড়া খেয়ে যেভাবে ছুটে আসছে তাতে কোনো বাধা সে মানবে না।

প্রতাপ সকলকে সচকিত করে হাঁক দিলে, 'ভাই সব হুঁসিয়ার—'
বলে তৈরী হল নিজে।
শংকর বলে উঠল পাশ থেকেঃ 'যুবরাজ, প্রথম আক্রমণের ভার দিন আমাকে—'
সে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছিল ঝোপের আন্দোলন ক্রমশ নিকটবর্তী হচ্ছে।
প্রতাপ বললে, 'বেশ যাও। তবে একা নয় তোমার সঙ্গে থাকবে সূর্যকান্ত ও মদন আর কিছু অনুচর। সাবধানে এগোবে। সামনেই কিন্তু খাদ—'
খাদটা আছে বলেই ওরা সাহস করে দাঁড়িয়েছিল এপারে। কাদাভর্তি নিচু খাদ। প্রতাপের সম্মতি পেয়ে শংকর এগোল খাদ ঘুরে, তার একপাশে মদন অপর পাশে সূর্যকান্ত। পিছনে আসতে লাগল সশস্ত্র কিছু অনুচর। সমগ্র অনুচর বাহিনীর সর্দার হল মদন—তার দেহে যেমন শক্তি মনে তেমনি সাহস। সে প্রতাপের ভীষণ অনুরক্ত।
ওরা সম্পূর্ণ খাদটা ঘুরে যায় নি, গণ্ডার গতিবেগ সংবরণ করতে না পেরে খাদের মধ্যে এসে পড়ল। শংকরের কানের কাছে কে যেন বললে, 'দেরী কোরো না, এই হল সুযোগ—'
বাস্তবিক সুযোগই বটে। খাদের মধ্যে পড়ে ভীষণ দর্শন, এক শৃঙ্গ, বিরাট বপু গণ্ডারটির গতি শ্লথ হয়ে গিয়েছিল। সে প্রতাপের মুখোমুখি হেঁটে পাড়ে ওঠবার চেষ্টা করছে দেখে শংকর তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে পড়ল খাদে এবং নিমেষমধ্যে ভল্ল তুলে প্রচণ্ড প্রহার করল গণ্ডারের বামপার্শ্বে। কতখানি শক্তিতে ভল্ল প্রহার করেছে তা সে জানত না, অকস্মাৎ দেখল তার ভল্ল দ্বিখণ্ড হয়ে গেছে এবং ভল্লাগ্র বিদ্ধ হয়ে আছে শিকারের পার্শ্ব ও পদের গ্রন্থির নিচে হাত-পরিমাণ স্থানে। আহত পশু দারুণ ক্রোধোদীপ্ত হল এবং ভীম গর্জনে ধাবিত হয়ে এমন তাড়া দিল যে শংকর আত্মরক্ষা করতে গিয়ে ছিটকে পড়ে গেল সেখানেই। এবার পালটা আক্রমণ। শংকর বুঝতে পারছিল তাকে রক্ষা করবার জন্যে সঙ্গী-সাথীরা তৎপর হবে

কিন্তু সাক্ষাৎ মৃত্যুর মতো যম তার শিয়রে, এখন একটি মুহূর্ত বিনষ্ট করা যায় না। সে ভূপাতিত হলেও সব সময় শত্রুকে চোখে চোখে রেখেছিল এবং আত্মরক্ষার স্বাভাবিক প্রেরণায় ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করে কোমর থেকে কোষবদ্ধ তরবারি টেনে বার করল কোনো রকমে। গণ্ডার তখন শৃঙ্গাঘাত করবার জন্যে উদ্যত—শংকর তার চোখের কোটরে তরবারির তীক্ষ্ণ-মুখ ঢুকিয়ে দিল সজোরে। বিকট গর্জন করে লাফিয়ে উঠল গণ্ডার এবং ভীষণ ক্রোধে মাটি ফুঁড়ে আঘাত করল খড়্গ দ্বারা। মাটি ফুঁড়ে প্রতি-আক্রমণ করায় আঘাত আংশিকভাবে প্রতিহত হল বটে কিন্তু ক্ষিপ্ত পশুর শক্ত চোয়ালের ধাক্কা এসে লাগল তার বুকে—শংকর অর্ধ মূর্চ্ছিত হয়ে গড়িয়ে যেতে লাগল নিচু জমির দিকে, হরগোজা কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হল তার শরীর। শংকর উত্থানশক্তি রহিত, কাদার মধ্যে মুখ গুঁজে পড়েছিল মৃতের মতো।

আহত পশু প্রতিশোধ নেবার জন্যে গর্জন করছিল আর বড় বড় নিশ্বাস ফেলে কাদার রাজ্যে ঘূর্ণি সৃষ্টি করছিল। কাছাকাছি ছিল মদন, সে দেখতে পেল আহত পশু গজরাতে গজরাতে এগিয়ে চলেছে নিস্পন্দপ্রায় শংকরের পানে, আঘাত করবে আবার এখনি এবং সে আঘাত হবে অতি ভয়ংকর। চোখের সামনে এ দৃশ্য দেখা যায় না। চকিতে কর্তব্য স্থির করে নিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল গণ্ডারের সামনে এবং তার গতি রুদ্ধ করার অন্য পথ না পেয়ে মল্লযোদ্ধার মতো সবলে জাপটে ধরল গলদেশ। মানুষে-গণ্ডারে সে এক ভীষণ মল্লযুদ্ধ। খাদের উপরে উৎকণ্ঠিত সঙ্গী-সাথী, উত্তেজনায় সকলের নিশ্বাস রুদ্ধ। কখনও সামান্য পিছু হটে পশু কখনও বা অনেকখানি সরে যায় মানুষ। মদন দেখতে পাচ্ছিল, সুযোগ পেয়ে শংকর কোনোমতে হামা-গুড়ি দিয়ে সরে গেছে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ দূরত্বে। সে নিজেও আঘাতে জর্জরিত, পিছু হটে শেষ শক্তিতে আক্রমণ করে সে বিধ্বস্ত করতে চাইল শত্রুকে। কিন্তু লক্ষ্য করে নি পিছনেই আছে খানা, পা পিছলে পড়ে গেল তার ভেতরে। মদন তথাপি মল্ল-আলিংগন ছাড়ে নি বরং আরও সুদৃঢ়

করল হস্তের বন্ধন, যেন খানার মধ্যে টেনে নামাতে চায় শত্রুকেও। উপরে গণ্ডার আর নিচে মদন—পশুতে-মানুষে টানাটানি। কেউ কাউকে ছাড়ে না।

দৃশ্যটি আদৌ মনোরম নয়। অন্তত সূর্যকান্তের মনে হল এতে বিপদ জড়িয়ে আছে পাকে পাকে, মদন বুঝি মৃত্যুকেই আলিংগন করে রয়েছে বাহুর ফাঁসে। অন্যদিকে ক্লান্ত শংকর উঠে দাঁড়িয়েছে সোজা হয়ে—তার বুক এবং চোয়াল শক্ত। নিশ্বাস পড়ছে ঘন ঘন। সে উত্তেজিত এবং একটা-কিছু করার জন্যে অস্থিরভাবে হাতের মুঠি খুলছে আর বন্ধ করছে। যেন সে নিজেই এক হিংস্র জানোয়ারে রূপান্তরিত। উৎকণ্ঠিত হল সূর্যকান্ত। কেননা সে দেখতে পেল শংকর ঠিক হুঁসে নেই, পা পা করে এগিয়ে গেছে গণ্ডারের অত্যন্ত কাছে, অস্ত্রহীন মানুষের পক্ষে যা অস্বাভাবিক। গণ্ডার তার এই দুঃসাহস বেয়াত না করতে পারে।

'শংকর, ওভাবে এগিও না।' চেঁচিয়ে উঠল সূর্যকান্ত: 'আমি অস্ত্র ছুঁড়ে দিচ্ছি গ্রহণ করো—'

মুহূর্তমাত্র থমকে দাঁড়াল শংকর। সূর্যকান্তের পানে তাকিয়ে বললে, 'অস্ত্রের প্রয়োজন নেই। আমি পরাস্ত্র গ্রহণ করি না—'

লোহার মতো শক্ত হয়ে উঠেছিল মুঠি। পরক্ষণে সবেগে প্রবিষ্ট করে দিল উন্মত্ত পশুর মুখ গহ্বরে। কঠিন, নির্মম একটি মুষ্টিবদ্ধ হাত।

আকস্মিক প্রহারে বিভ্রান্ত হল পশু। ঝটকা দিয়ে ছিন্ন করে ফেলল মদনের বাহুপাশ এবং ক্রোধে দিশাহারার মতো পিছু হটে সজোরে দিল এক লাফ। শংকর সরে গেল। লম্ফ প্রদানের লক্ষ্য শংকর ছিল না, মদন তো পরিত্যক্ত, খাদের কিনারে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিল প্রতাপ অশ্বসমেত—লম্ফটি গিয়ে পড়ল সেই অশ্বের ওপর। প্রতাপ সতর্ক ছিল, তৎপূর্বেই সে ঘুরিয়ে দিয়েছিল অশ্বরশ্মি, গণ্ডার মুখ থুবড়ে পড়ল মাটিতে। ওকে আর আস্ফালন করতে দেওয়া উচিত নয়, বন্য আক্রোশে বিপর্যস্ত করে দিতে পারে এতগুলি মানুষের প্রাণ, হাতে যখন রয়েছে উন্মুক্ত তরবারি এবার সেটা ব্যবহার

করা যেতে পারে নির্দয়ভাবে। প্রতাপ তৎক্ষণাৎ তরবারি দ্বারা প্রচণ্ড আঘাত করল খড়্গের ওপর। আঘাত এত জোরে হল যে খড়্গ গেল ভেঙে আর তরবারি হল দ্বিখণ্ডিত। খড়্গহীন জানোয়ার অন্ধের মতো পাক খেতে লাগল ঘোড়ার পায়ের কাছে অসহ্য যন্ত্রণায়।

'সাবাশ—'

মদন ও শংকর উঠে এসে তার যন্ত্রণা-কাতর অভিব্যক্তি দেখছিল আর তেজোদৃপ্ত অশ্বারোহী প্রতাপের উদ্দেশ্যে বাহবা দিচ্ছিল। তারা দুজনে যা পারে নি একা প্রতাপ তা করেছে, অতএব প্রশংসা তার অবশ্য প্রাপ্য।

ভিড় করে এসেছিল অনেকেই। কিন্তু বেশি লোকের দরকার হল না। মদন ও শংকরই কাঁধের ধাক্কায় জানোয়ারটিকে ঠেলে নিয়ে গেল খাদের কিনারে, ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল খাদের মধ্যে। শব্দ হল ধপাস করে—ভারি শরীর অনেকখানি বসে গেল নরম কাদায়। যতবার উঠে দাঁড়াতে চাইল ততবার শিলাবৃষ্টির মতো আঘাত পড়তে লাগল পিঠে মুখে সর্বাংগে। যেন একটা মারণোৎসব। কাদার শয্যা থেকে গণ্ডার আর উঠে দাঁড়াতে পারল না, অন্তিম যন্ত্রণায় চারিদিকে অজস্র কাদাজল ছিটিয়ে সে নিস্পন্দ হল এক সময়। খাদের মধ্যে সে পড়ে রইল যেন একটা মরা হাতি। বীভৎস, করুণ।

প্রতাপ ইংগিতে দশটি অনুচরকে ডাকল। গণ্ডারের চর্মচ্ছেদন ও খড়্গ গ্রহণের ভার দিল তাদের ওপর। আনন্দে হই হই করতে করতে তারা নেমে পড়ল খাদের মধ্যে।

বেলা বেড়ে উঠেছিল, ওরা ফেরার পথ ধরল।

'আমি এত বড় গণ্ডার কখনও দেখি নি—'

ওরা ফিরে আসছিল হালকা আলাপে বনের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে। গাছের ফাঁক বেয়ে ডোরাকাটা সূর্যালোকে বনপথ উদ্ভাসিত। কোথাও

গা-ছমছম অন্ধকার। বনে দৃষ্টির অন্তরালে শুকনো পাতায় কিসের সর-সরানি। অগ্রবর্তী বাহিনীর হাতে মারা পড়েছে কয়েকটি মারাত্মক এবং বিষধর সাপ। বানরের উৎপাত গাছের ডালে। হরিণ দেখা গেছে দূরে—শিকারের জন্যে অনুচরেরা ছুটে যেতে চেয়েছিল তীর-ধনুক বাগিয়ে, কিন্তু প্রতাপ বাধা দিয়েছে। কী দরকার অনর্থক নিরীহ হরিণ মেরে, এমনিতেই তো ওরা বড় শিয়াল অর্থাৎ বাঘের শিকার হয়। তার চেয়ে গল্প করতে করতে একসঙ্গে ফেরাই ভালো। এতখানি পথ যাওয়া-আসায় বাঘের সাক্ষাৎ ঘটে নি বটে, তারা অত্যন্ত চালাক, হয়তো বনান্তরালে অনুসরণ করেছে তাদের। দল-ছুট হলে কেউ না-কেউ তার হয়ে যাবে। গাছের ডোরা-কাটা ছায়া দেখে প্রতাপের কেবলই মনে হচ্ছিল সরু পথ জুড়ে সুন্দরবনের বাঘ শুয়ে আছে। তাছাড়া শিকার তো হয়েছে একটা, সেটা নিয়ে যাওয়া গেল না প্রাসাদে শিকারের সাক্ষ্য হিসাবে, বাবা নিরামীষ বৈষ্ণব, মস্ত একটা গণ্ডারের হত্যা দেখে শিউরে উঠতে পারেন। কী দরকার। অনুচরেরাই ওর খড়্গ ও চামড়া নিক। সামান্য এক পক্ষী তীরবিদ্ধ করায় তিনি যে রকম ক্ষেপে উঠেছিলেন, অতঃপর তাঁকে চটানো ঠিক হবে না। যে কোনো কারণেই হোক, জ্ঞান হওয়া অবধি সে পিতার বিষনজরে—এটা সুলক্ষণ নয়। এই শ্বাপদ-সংকুল পথ ধরে ফিরে যেতে যেতে, আশ্চর্য, কেন যেন মনে হচ্ছে পিতাও বুঝি শ্বাপদের মতো ভয়াবহ শিকারের—জন্যে ওৎ পেতে বসে আছেন। এক্ষেত্রে শিকার নিজ পুত্র···সন্দেহ দেখা দিচ্ছে, আশংকা উঁকি দিচ্ছে মনে। সম্ভব হলে পিতা সরিয়ে দেবেন তাকে পৃথিবী থেকে, হয়তো প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে, সে টের পাচ্ছে না। যেমন করে হোক চূর্ণ করে দিতে হবে পিতার এ পুত্রহত্যার চক্রান্ত। হাঁ সে দুর্বিনীত, অস্থির—বৈষ্ণব-ধর্মের প্রতি কণামাত্র আগ্রহ নেই, সে শক্তি সংগ্রহ করতে চায়, শক্তির উপাসক হবে সে। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা, বীরের মতো শক্তি সঞ্চয় করতে না পারলে···

‘আমিও দেখি নি। সত্যি মস্ত গণ্ডার। হাতীর মতো।’

পাশ থেকে ভেসে আসছে বিক্ষিপ্ত কথার টুকরো। ওরা আলাপ করছে নিহত গণ্ডারের বিষয়ে। সত্যি মস্ত গণ্ডার। সুন্দরবনে ক্রমশ কমে আসছে গণ্ডারের সংখ্যা···কিছুদিন পরে হয়তো একেবারে অবলুপ্ত হয়ে যাবে। কত রকম শিকারী আসে সুন্দরবনে, কত-কী শিকার করে নিয়ে যায়। অনেকের কাছে গণ্ডার শিকার বাঘের চেয়েও আনন্দদায়ক। সে নিজেও আনন্দ পায় গণ্ডার শিকার করে। এখন সেই গণ্ডার সম্বন্ধেই কথা বলছে ওরা। প্রথম বক্তা ছিল মদন, স্বগতোক্তির মতো বিড়বিড় করে সে জানিয়েছিল বিস্ময়; তার দেহে কয়েক স্থানে ক্ষতচিহ্ন, রক্ত জমে আছে সেই সব ক্ষতস্থানগুলিতে। দেখলে মনে হয় যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এলোমেলো তলোয়ারের খোঁচা খেয়ে ফিরে চলেছে। প্রতাপ সস্নেহে ডেকে নিয়েছিল কাছে, সামান্য পশ্চাতে সে চলেছে ঘোড়ার পিঠে।

শংকর দ্বিতীয় বক্তা। সমর্থন জানিয়েছে মদনকে। ওরা তুজনেই লড়েছে গণ্ডারের সঙ্গে, শংকরের ক্ষত অপেক্ষাকৃত কম। ধাক্কা খেয়ে সাময়িকভাবে সংজ্ঞা হারিয়েছিল বটে কিন্তু ওর বুদ্ধি ও কৌশল-জ্ঞান বেশি। শক্তির পরীক্ষায় গোঁয়ারের মতো চেপে ধরে নি মহাশক্তিধর গণ্ডারের কণ্ঠদেশ,— মদন আদৌ রক্ষা পেত না যদি ঠিক সময় মতো বুদ্ধি ও সাহসে ভর করে শংকর ওর মুখ গহ্বরে মুষ্টি প্রয়োগ না করত। অবশ্য তাতে আকস্মিক বিপদের সূচনা হয়েছিল। ক্রোধক্ষিপ্ত গণ্ডার লম্ফ দিয়ে আচমকা এসে পড়েছিল তার ঘোড়ার ওপর এবং সেই ক্ষণে লাগাম টেনে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে না দিলে বিপন্ন হত তার নিজের জীবন। সাবধান থাকায় তা ঘটে নি। এবং এ সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে নিজে বিপদোত্তীর্ণ হয়েছে তো বটেই অধিকন্তু গণ্ডার-নিধনের সবটুকু খ্যাতি বর্তেছে তার ওপর। সে কথা বললে সূর্যকান্ত। শোনা গেল তার কণ্ঠে যুবরাজের প্রশংসা-বাণী :

'তোমরা তুজনে হিমসিম খেয়ে গেলে ওই গণ্ডার কাবু করতে, আর দেখ, আমাদের যুবরাজ একা এককোপে দ্বিখণ্ড করে ফেললেন তার খড়্গ। কব্জির জোর চাই, বুঝলে, আর চাই অব্যর্থ লক্ষ্য। যুবরাজ তীর-ধনুকে

যেমন তরবারিতেও তেমনি অপরাজেয় যোদ্ধা। তাঁর হাতে অস্ত্র থাকলে তিনি বিশ্বজয় করতে পারেন…'

যত সহজে কথাগুলো বললে সূর্যকান্ত তত সহজে বিশ্বজয় করা যায় না। তার জন্যে প্রচুর রণ-নিপুণ সৈন্যবল দরকার। যুদ্ধ-কৌশল জানা চাই আরও বেশি। কূটবুদ্ধি থাকা চাই। যুদ্ধ-পরিচালনার দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা না থাকলে বিশ্ব কেন কোনো দেশই জয় করা যায় না। একাধারে এ-সব গুণ যাঁর আছে তিনি খুড়ো বসন্তরায় মশায়, তাঁরই হাতে-গড়া শিষ্য সে, অধিকন্তু আছে উচ্চাশা যা খুড়ো মশায়ের নেই। উচ্চাশা না থাকলে মানুষ বড় হতে পারে না। রণ-নৈপুণ্যে পিতা বিক্রমাদিত্যও কম যান না, অসি-চালনায় একদা তিনি খ্যাতিলাভ করে ঠাঁই পেয়েছিলেন গৌড়ের রাজ-দরবারে, বুদ্ধি ছিল প্রখর। আজ তিনি বৈষ্ণব-ধর্ম অবলম্বন করে মানসিক দিক থেকে এমনভাবে নির্বীর্য ও নিস্পৃহ হয়…

'বাস্তবিক এ-রকম মস্ত শিকার অনেকের ভাগ্যে জোটে না। যুবরাজ অনু-চরদের মধ্যে বিলিয়ে না দিয়ে প্রাসাদে নিয়ে যেতে পারতেন। স্মরণীয় শিকার হিসাবে তাঁদের দেখাতে পারতেন…সকলের কাছে গর্ব ও আনন্দের বিষয় হত…'

'হত কী? আমার সন্দেহ হয়—'

বহুক্ষণ চুপ করে থাকার পর প্রতিবাদ করল প্রতাপ।

'কেন?'

বিস্মিত সূর্যকান্ত জিজ্ঞেস করল, কারণ কথাগুলো সে-ই বলেছিল।

প্রতাপ বললে, 'প্রথমত, আমার আপনজন কেউ আছে কিনা আমি অন্তত জানি নে। প্রকৃতপক্ষে এ সংসারে আমি সম্পূর্ণ একা। পিতা কোনোকালেই আমার প্রতি প্রসন্ন নন, দুঃখজনক হলেও একথা সত্য এবং তুমি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলে একথা তোমার অজ্ঞাত নয়। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার জন্মের পরই মা বিগত. আমি তাঁকে আদৌ স্মরণে আনতে পারি না; পিতার আমি একমাত্র সন্তান, সহোদর ভাই-বোন নেই। দ্বিতীয়ত, মাতৃস্বরূপা

খুড়িমা আছেন বটে, অপত্যস্নেহে তিনি আমাকে মানুষ করেছেন মাতৃ-বিয়োগের পর সেই অতি শৈশব থেকে, কিন্তু এখন আমি বড় হয়েছি এবং তাঁর প্রতিটি কথা অপ্রতিবাদে মানি না বলে তিনি ধরে নিয়েছেন আমি তাঁর শাসনের বাইরে। নিতান্ত অমূলক নয় তাঁর এ ধারণা। আমি নিজেও সসেচতনভাবে কাটাতে চাইছি এই-সব অন্ধ আনুগত্য। পিতা-পুত্রের রক্তের সম্পর্ক যেখানে বিদ্বেষে পূর্ণ, আমার বিশ্বাস, দূরাত্মীয়ের সম্পর্ক সেখানে দুরাত্মার মতো পরিহার্য। অন্তত, নিবিড়তা না থাকাই ভাল। তাতে আঘাত লাগে কম আর প্রত্যাশা থাকে ক্ষীণ। তৃতীয়ত, পিতৃতুল্য খুড়ো বসন্তরায় মহাশয় আমার এ শিকার দেখলে খুশি হতেন নিশ্চয়, তাঁর চরিত্রে ধর্ম ও কর্ম উভয় গুণের আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছে, নানাদিক দিয়ে আমি তাঁর কাছে গভীরভাবে ঋণী ; তথাপি একথা কোনোমতেই অস্বীকার করা যায় না যে রাজ্যপ্রাপ্তির ব্যাপারে তিনি আমার সবচেয়ে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী। কে বলতে পারে ভবিষ্যতে তাঁর কূটবুদ্ধির চালে এই সমৃদ্ধ যশোর-রাজ্য খণ্ড-বিখণ্ড হবে না ? তিনি কী আমার কথা ভেবে তাঁর পুত্রদের বঞ্চিত করবেন ?. তা কখনও হয় না। অতএব আমার শিকারের আনন্দ একা আমার এবং তোমাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ···'

বিজ্ঞজনের মতো তার এই বিশ্লেষণে তাকে বয়স্ক ব্যক্তি বলে ভ্রম হচ্ছিল, গম্ভীর শোনাচ্ছিল তার কণ্ঠস্বর। জঙ্গলের ডালপালা সরিয়ে ওরা এগোচ্ছিল, শুক্‌নো পাতায় মর্‌ মর্‌ শব্দ উঠছিল। কেউ কোনো কথা বলছিল না থমথমে হয়ে উঠেছিল আবহাওয়া। ঘোড়ার লাগাম ঢিলে করে দিয়েছিল প্রতাপ, সে ক'পা এগিয়ে গেল। সূর্যকান্ত ঘোড়ার পাঁজরে উরুর চাপ দিল, গতিবেগ বেড়ে গেল তারও।

'মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো পাপ,' শংকর বিড়বিড় ক'রে উঠল, 'বিশেষত যারা স্বজন এবং আত্মীয়···'

সূর্যকান্ত বললে, 'আমার পূর্বপুরুষেরা ছোট একটি রাজ্যের রাজা ছিলেন, শুনেছি। উত্তরাধিকারের দাবী নিয়ে লোভ ঈর্ষা ষড়যন্ত্র এমন-কি গুপ্তহত্যা

এত বীভৎস আকার ধারণ করল যে আমার পিতৃদেব তাঁর ন্যায্য অধিকার পরিত্যাগ করে গোপনে বেরিয়ে এলেন রাস্তায়। আত্মীয়-কলহ এমন তুঙ্গে উঠেছিল যে ঘৃণায় তিনি আর ফিরে গেলেন না স্বরাজ্যে। গৌড়ে এসে দাউদ খাঁর দরবারে প্রথমে ছোট চাকরি পরে অমাত্যের পদ অলংকৃত করেছিলেন। তিনি যুদ্ধে মারা যান। আমি নিতান্ত শিশু তখন। বিধবা মায়ের অবস্থা আরও শোচনীয়। গৌড়ে সে-সময় প্রচণ্ড ডামাডোল চলেছে। আমাদের তুজনের কোনো নিরাপত্তা ছিল না। বসন্তরায় মহাশয় অনুগ্রহ করে আমাদের তুজনকে তাঁর নৌকায় আশ্রয় দিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গেই মা ও আমি চলে আসি এই যশোরে। আমাদের বসবাসের সুব্যবস্থা করে দেন তিনি। আমরা তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ পেয়েছি একথা স্বীকার করতেই হবে। তবু আপনার কথাগুলো একেবারে অস্বীকার করতে পারি না। কারণ লোভ ঈর্ষা ষড়যন্ত্রের কুটিল পাকে পড়ে আমার বাবা এক নিদারুণ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন···'

'তোমার মায়ের সঙ্গে অনেকদিন দেখা নেই', প্রতাপ বললে, 'কেমন আছেন তিনি?'

'ভালো—'

'আর-একজন?'

'কার কথা বলছেন আপনি—'

'গৌড় থেকে আসার সময় খুড়োমশায়, শুনেছি, একটি শিশুকন্যা সঙ্গে এনেছিলেন। কেউ নেই তার। সম্ভবত যুদ্ধেই সে বাপ-মা আত্মীয়-স্বজন সকলকে হারিয়েছে। অতটুকু ছোট মেয়েকে কোথায় রাখা যায়, কে নেবে তার ভার, এগিয়ে এসেছিলেন তোমার মা, তিনি কোলে তুলে নিয়েছিলেন তাকে। এখন সে বেশ বড় হয়েছে এবং দেখতেও সুন্দর। আমি জিজ্ঞেস করছিলাম সেই সুন্দরী অরুন্ধতী দেবীর কথা—'

হাসছিল প্রতাপ আর মুখ লাল হয়ে উঠছিল সূর্যকান্তের।

'ভালোই আছে সে। তবে আপনার কথাও তার কাছ থেকে কিছু কিছু

শুনতে পাই—'

'আমার কথা ?' কৌতুক বোধ করল প্রতাপ, 'কী কথা ?'

'জিতমিত্র নাগ কন্যা শরৎসুন্দরী তার সখি কিনা—'

'তাতে কী ?'

'অরুন্ধতী প্রায়ই শরৎসুন্দরীর কথা বলে—'

'তাতে কী হল ?'

'হয় নি কিছুই। অরুন্ধতী কেবলই আমাকে জিজ্ঞেস করে যুবরাজ আর আমাদের বাড়ি আসছেন না কেন, কবে আসবেন। তার জিজ্ঞাসাবাদ দেখে কখনই আমার মনে হয় নি এ শুধু তার নিজের প্রশ্ন, পিছনে আর কারো আকুলতা রয়ে গেছে বলে মনে হয়—'

সে আড়চোখে দেখতে পাচ্ছিল যুবরাজের মুখে রক্তাভা ছড়িয়ে পড়েছে। দমনের চেষ্টা সত্ত্বেও কৌতূহলে জ্বলজ্বল করছে চোখ, লজ্জা দিচ্ছে বাধা। শিকার-দক্ষ যুবরাজ যেন শিকার হয়ে পড়েছেন নিজের কাছেই। পাল্টা আক্রমণ করতে পেরে সূর্যকান্ত হাসছিল মৃদু মৃদু। উপভোগ্য হয়ে উঠেছে পরিস্থিতি।

'শরৎসুন্দরীর সঙ্গে অরুন্ধতীর সখিত্ব গড়ে উঠেছে, কই তুমি তো আমাকে বলো নি—'

'আপনি কখনও জিজ্ঞেস করেছেন আমাকে ?'

'শরৎসুন্দরী প্রায়ই আসে নাকি তোমাদের বাড়িতে ?'

'খুব কম। অরুন্ধতী যায় বেশি—'

'তুমি কি এখন বাড়ি ফিরবে ?'

'আজ্ঞে হাঁ। বেলা অনেক বেড়ে উঠেছে। মা হয়তো এখনও আমার অপেক্ষায় অনাহারে আছেন—'

'বিকেলে যমুনা-তটে এসো। কথা আছে। আসবে তো ?'

'আসব। চলি এখন—'

ওরা দুর্গের কাছে এসে পড়েছিল, মুরচা অতিক্রম করার আগে সূর্যকান্ত

অভিবাদন জানিয়ে বিদায় নিল। অন্য সকলে ভিতরে প্রবেশ করল।
দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত।

৪

রোদ—মাথার ওপরে প্রচণ্ড রোদ। শীত চলে গিয়ে এখন ফালগুনের শেষ। সকালে ও সন্ধ্যায় ফালগুনের সামান্য আমেজ পাওয়া যায় বটে, স্নিগ্ধ বাতাস বয় যমুনাতট প্লাবিত করে, কিন্তু বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষত এখন, অতিক্রান্ত দুপুরে খরসূর্য যেন সর্বাঙ্গে আগুন ছড়ায়। ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে—দীর্ঘক্ষণ অশ্বচালনার ফলে শ্রমজনিত ক্লান্তি ও ক্ষুধা দেখা দিয়েছে একযোগে। অবশ লাগছিল শরীর, এতক্ষণ সঙ্গী-সাথীরা থাকায় এই ক্লান্তি তেমন পীড়াদায়ক হয় নি—ক্ষুধা তীব্র হয়ে ওঠে নি। দুর্গের মুরচার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এটুকু পথ আসতে আসতে মনে হচ্ছে এখনি বাড়ি না ফিরে যুবরাজের সঙ্গে ভিতরে চলে গেলে ভাল হত আহার ও বিশ্রাম দুইই পাওয়া যেত তাড়াতাড়ি। যুবরাজের সঙ্গী হিসাবে সে সকলের কাছে পরিচিত, রাজঅন্তঃপুরে তার অবাধ গতায়াত। আলাপে-গল্পে বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে গেলে যুবরজের অনুরোধে কতদিন আহার গ্রহণ করতে হয়েছে অন্তঃপুরে, বসন্তরায়-মহিষী নিজে উপস্থিত থেকে তাদের আহার তদারক করেছেন। যত্নের কোনো ত্রুটি হয় নি। আজ হঠাৎ কেন যে নিজের মায়ের কথা তুলে যুবরাজের কাছ থেকে বিদায় নিল, সূর্যকান্ত তার সঠিক কারণ খুঁজে পেল না। একথা সত্য যে মা তার অপেক্ষায় অনাহারে থাকবেন, এমন বহুদিন তাঁকে থাকতে হয়েছে, কিন্তু অপেক্ষারও একটা সময়-সীমা আছে, সেই সময় পার হয়ে গেলে মা নিশ্চয় আহার গ্রহণ করতেন। তা নয়,—আরও কোনো রহস্য নিহিত আছে এর মধ্যে? কী সেটা? কোন্ রহস্য?

ঘোড়ার লাগাম ঢিলে করে দিয়েছিল সূর্যকান্ত—ঘোড়া ছুটছিল মন্থরপদে। নগর-সীমা পার হয়ে অল্প দূর গেলেই তাদের প্রাসাদোপম অট্টালিকা,—বসন্তরায় মশায় নিজে উপস্থিত থেকে নির্মাণ করে দিয়েছেন এই সুন্দর আবাসগৃহ। অনেক কাছে চলে এসেছে সূর্যকান্ত, এটুকু পথ জোর-কদমে

না গেলেও চলে। তার আগে আবিষ্কার করে নিতে হবে মূল রহস্য কোথায়? কেন সে গৃহ-প্রত্যাবর্তনে আগ্রহী হল নিজের অজান্তে? মা ব্যতীত অন্য কার আকর্ষণ? ভাবতে ভাবতে ঝলসে উঠল একটি মুখ— পনেরো-ষোলো বছরের একটি নিষ্পাপ বালিকা। অরুন্ধতী যার নাম। মায়ের মতো সে-ও অনাহারে আছে এবং উৎকণ্ঠিতা। তার কষ্ট লাঘব হবে বলেই সে বাড়ির পথ ধরেছে—আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে স্নেহ ও করুণায় ভরে উঠল তার মন। বাস্তবিক শিশুর মতো সহজ ও সরল অরুন্ধতী,— গৌড়ের রাষ্ট্রবিপ্লবে সে হারিয়েছে আত্মজন সকলকে, আত্মীয় বলতে কেউ নেই ত্রিভুবনে। শিশুকাল থেকে এ-সংসারে প্রতিপালিত হওয়ার ফলে সে তাদের পরিবারেরই একজন হয়ে গেছে। মা তো আপন কন্যার মতো ভালবাসেন তাকে, সর্বদাই চোখে চোখে রাখেন। প্রতিদানে অরুন্ধতী সংসারের কাজে মাকে সহযোগিতা করে খুব—যদিচ মায়ের শুচিগ্রস্ততা আছে প্রবল। বিধবা হবার পর থেকে মা স্বপাক ব্যতীত অন্ন গ্রহণ করেন না, অন্য সকলের স্পর্শ সযত্নে এড়িয়ে চলেন। আহারের ব্যাপারে পুত্রের ছোঁয়াতেও আহার্য অশুচি হয়ে যায়। এ-সব বাড়াবাড়ি মনে হলেও মায়ের উদারতার তুলনা হয় না। সমস্ত দিকে তাঁর সস্নেহ তীক্ষ্ণ নজর এবং সেই দৃষ্টিপাতে ও শিক্ষার গুণে পথে-থেকে কুড়িয়ে-পাওয়া একটি শিশুকন্যা ক্রমে রুচি ও শালীনতার অধিকারী হতে পেরেছে এ কম কথা নয়। আজ অরুন্ধতীকে দেখে অনেকের বিভ্রম জাগে, স্বয়ং যুবরাজই তো কৌতুকস্বরে একদিন মন্তব্য করেছিলেন, 'শুধু তালিম দিয়ে কারো চরিত্রে এত মাধুর্য আনা যায় না—এ হল বংশগত ঐতিহ্যের ধারা, যদি কোনোদিন খোঁজ পাওয়া যায় তাহলে দেখো অরুন্ধতীর বংশ-পরিচয় তোমার-আমার চেয়ে ছোট নয়! এত রূপ এত গুণ একত্র সহজে মেলে না। তুমি ভাগ্যবান সূর্যকান্ত—'

ঘোড়া এসে পড়েছে যমুনা-তট সংলগ্ন অট্টালিকার কাছে। অট্টালিকায় প্রবেশ করতে হলে প্রথমেই পার হতে হয় দুপাশে পাঁচিল-ঘেরা উদ্যানের

মধ্যবর্তী ফটক—উদ্যানে ফুটে আছে নানা জাতের ফুল, মালীরা কাজ করছে। উদ্যানের মাঝখানে ছোট একটি সরোবর থাকায় সেখানে ঝাঁক বেঁধে নেমেছে পাখির দল—বিচিত্র তাদের রঙের বাহার, সরোবর যেন আলো করে আছে। দেখতে ভারি সুন্দর। ফটকের সামনে পাইক ছিল, তার অভিবাদন গ্রহণ করে সূর্যকান্ত উদ্যানের পথ ধরে অট্টালিকার পানে এগোচ্ছিল। দু-পাশে সাজানো গাছের সারি, পথে স্নিগ্ধ ছায়া। পাখি ফুল সরোবর দেখতে দেখতে মন আরও প্রসন্নতায় ভরে উঠছিল। এই মুহূর্তে ক্ষুধা-তৃষ্ণার পরিবর্তে অরুন্ধতীকেই মনে পড়ছিল বেশি করে। যুবরাজ ওই প্রসঙ্গ না-তুললে কখনই মনে হত না যে অরুন্ধতী নাম্নী তাদের আশ্রিতা বালিকাটি অচেতনভাবে জুড়ে আছে তাব সারা চিত্ত। যুবরাজেব কৌতুকালাপ ভীষণ নাড়া লেগেছে মনের প্রত্যন্তদেশে। চেতনার স্তরে স্তরে নানা রঙের জ্যোতি ফুটে উঠছে, ওই সরোবরের মতো নানা পাখির কূজনক্ষেত্র হয়ে গেছে সেটা। অথচ আশ্চর্য এই, এমনভাবে আত্ম-আবিষ্কার করে নি সে আগে কখনও! অনুভবের জগতে একটি বিস্ময়কর পরিবর্তন লক্ষ্য করে সে অবাক হল।

প্রবেশ দ্বারের দক্ষিণে ছোট অশ্বশালা, বামে পর পর কতকগুলি পরিষ্কার ঘর, উদ্যান-রক্ষক ও অশ্ব-রক্ষকবৃন্দের আবাস। সূর্যকান্ত অশ্বপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করে ডাক দিলে, 'নন্দলাল—'

দীর্ঘ অভিবাদন জানিয়ে অশ্ব-রক্ষক নন্দলাল সামনে এসে দাঁড়াল।

'একে শীতল ছায়ায় ছেড়ে দাও, দানাপানি দিও—'

রক্ষকেব হাতে অশ্ব ছেড়ে দিয়ে সূর্যকান্ত ভিতরে ঢুকল। দৃষ্টি ঘুরছিল এদিক ওদিক। যদিচ বার-মহলে মা কিংবা অরুন্ধতীর সাক্ষাৎ পাওয়া সম্ভব নয় তবু দেখতে ভাল লাগে দেওয়াল-সংলগ্ন শিকারের নমুনাগুলি। কখনও একা, কখনও যুবরাজের সঙ্গে শিকারে বেরিয়ে যে-সব জন্তু-জানোয়ার পাওয়া গেছে নিদর্শনস্বরূপ তাদের টাঙিয়ে রেখেছে দেওয়ালে। শৃংখলা সহকারে কোথাও ব্যাঘ্রচর্ম কোনোখানে ব্যাঘ্রমুণ্ড, হস্তিদন্ত, পাট্টা,

মৃগশৃঙ্গ ইত্যাদি শিকারলব্ধ দ্রব্যগুলি সযত্ন ও সুন্দরভাবে রক্ষিত। এ বিষয়ে তার রুচিজ্ঞান প্রখর। ফাঁকে ফাঁকে যথাযথভাবে সাজানো যুদ্ধের উপকরণগুলি। বর্ম তূণ ধনুক খড়্গ চর্ম ইত্যাদি এমনভাবে স্থাপিত যে সেগুলি যেন দেওয়াল-শোভার অঙ্গ হয়ে গেছে। দেখতে দেখতে দালান পার হয়ে আসছিল সূর্যকান্ত। সর্বশেষ অস্ত্রটির পানে সে ক-মুহূর্ত তাকিয়ে রইল। অস্ত্রটি যেমন সুন্দর তেমনি ভীষণ। তার একদিকে স্বর্ণখচিত বর্ম এবং অন্যদিকে হীরকখচিত কটিবন্ধ। মধ্যস্থলে তিনহাত দীর্ঘ দ্বি-ধার খড়্গ দেওয়ালে দোদুল্যমান। যুবরাজ কর্তৃক প্রদত্ত উপহার। মনে পড়ল, গতবার আহত ব্যাঘ্র আচমকা লাফিয়ে পড়েছিল ঝোপের আড়াল থেকে, যুবরাজ প্রস্তুত ছিলেন না। তার খড়্গ দ্বারা ব্যাঘ্র দ্বিখণ্ডিত না-হলে যুবরাজ অনিবার্য বিপদগ্রস্ত হতেন। তারই পুরস্কার স্বরূপ ওই বর্ম, কটিবন্ধ ও দীর্ঘ দ্বি-ধার খড়্গ। খড়্গের মধ্যস্থলে হাত রেখে সূর্যকান্ত বিড় বিড় করল, যেন প্রতিজ্ঞা, 'যুবরাজ, আমি তোমার, আমি তোমার—'

পায়ের শব্দ হল। শাড়ির চকিত আভাস। কেউ দালানে ঢুকে পরক্ষণে চলে যাচ্ছে।

সূর্যকান্ত ডাকল, 'অরু, যেও না। শোনো—'

পুনরায় শরীর আভাসিত হল দ্বারান্তরালে। ফুটে উঠল একটি অপরূপ সুন্দরী বালিকা মূর্তি।

সূর্যকান্ত বললে, 'এসেছিলে কেন? কিছু বলবে?'

বালিকার বুক ধ্বক ধ্বক করছিল, কর্ণমূল রাঙা। তার কানে তখনও বাজছিল, 'আমি তোমার, আমি তোমার…।' কার সঙ্গে একাকী কথা বলছিলেন সূর্যকান্ত, এখানে কেউ তো নেই! নিজে নিজে কেউ কী কথা বলে? দেওয়ালের অস্ত্রগুলির তো কথা বলার ক্ষমতা নেই! তবে? অস্ত্র-গুলির পাশে আছে একটি সুশোভিত চিত্র—তার নিজের। সূর্যকান্ত কী কথা বলছিলেন সেই চিত্রটির সঙ্গে? কী লজ্জা কী লজ্জা!

বালিকার মুখ নিচু, দৃষ্টি নত। কোমল মুখখানি ঘিরে শ্রী ও লাবণ্যের

বসতি। প্রস্ফুটিত ফুলে উড়ে-বসা ভ্রমরের মতো থিরথির-কাঁপা আঁখি-পল্লব, ধনুকের মতো টানা ভুরু দুখানি অকৃপণ মহিমার মতো দুপাশে বিস্তৃত। মেঘের মতো ঘন কালো চুল পিঠে ছড়ানো বলে ঝিনুকের মতো ছোট কপাল সহজে চোখে পড়ছিল, সূর্যকান্ত দেখতে পাচ্ছিল, ফুলবাগানের পথের মতো দুভাগ করা চুলে সরু সাদা সিঁথি। মাথা নিচু করে থাকায় সমগ্র মুখখানি মনে হচ্ছিল একটি পদ্মের কোরক—ঈষৎ বংকিম বেখায় ফুটে আছে জলেব ওপর। সুগৌর গাত্রবর্ণ—সামান্য লালের আভা থাকায় প্রকৃত রূপসীর মর্যাদা পেয়েছে। অন্তত, যুবরাজেব অভিজ্ঞ দৃষ্টি তাই বলে। এখন মনে হল যুবরাজ অতিশয়োক্তি করেন নি, অরুন্ধতী প্রকৃত সুন্দরী। তাকিয়ে থাকতে থাকতে সূর্যকান্তের মন স্নেহে করুণায় আবার উদ্বেল হয়ে উঠছিল।

সূর্যকান্ত বললে, 'যুববাজকে দুর্গ-মুবচা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে একা এই পথটুকু আসতে আসতে, কেন জানিনা, আমি কেবল একজনের কথাই ভাবছিলাম। বলতে সংকোচ নেই, সে তুমি। আহা, লজ্জা পাবার কী হল, মুখ তোলো।...এমন নয় যে তোমার সঙ্গে আমার বহুদিন সাক্ষাৎ হয় নি, বরং ঠিক উলটো, তোমাকে প্রতিদিন দেখি। প্রকৃতপক্ষে মানুষের জীবনে মাঝে মাঝে দুর্লভ কতকগুলো মুহূর্ত আসে যখন সে নতুন করে সব-কিছু আবিষ্কার কবে। এমন-কি নিজেকেও।...শুনতে কী তোমাব খাবাপ লাগছে ?'

বালিকা মুখ তুলেই নামিয়ে নিয়েছে ফের। চোখের ওপর চোখ রাখা যায় না। সূর্যকান্তের দৃষ্টিতে এত ধার সে আগে কখনও দেখে নি। তাকে নতুন লাগছিল, যেন অপরিচিত অন্য পুরুষ। যদিচ ওই দৃষ্টির খরতায় ও আবেগের তীব্রতায় আরও কিছুক্ষণ অবগাহন করতে ইচ্ছা করছিল তার। কিন্তু যেমন ঝড়ের বেগে আবেগ এসেছে তেমনি ঝড়ের মতোই তা সরে গেল বুঝি। কারণ পরক্ষণে মৃদু হাসি শুনতে পেল সে এবং অত্যন্ত শান্ত কণ্ঠস্বর।

সূর্যকান্ত বললে, 'বড্ড আবোল-তাবোল বকলুম। কিছু মনে কোরো না। কী কারণে তুমি এসেছিলে তা কী জানতে পারি?'

ওর বলার ধরন এ রকম। অতি ভদ্র, শিষ্ট এবং শান্ত। আবেগ অন্তর্হিত। মুখ নিচু ছিল, সেভাবেই অরুন্ধতী বললে, 'আপনার আহার্য প্রস্তুত, মা আপনাকে খাবার-ঘরে যেতে বললেন—'

'আমি যে ফিরেছি মা কী করে জানলেন?'

অরুন্ধতী বললে, 'আমি বাতায়ন-পথে আপনাকে ফিরতে দেখেছি—'

'সঙ্গে সঙ্গে মাকে জানিয়ে দিয়েছো তাই না?'

অরুন্ধতী বললে, 'মা সারাদিন অনাহারে আছেন—'

'তুমি?'

বিব্রত বোধ করল অরুন্ধতী। বললে, 'আজ আমার একটা ব্রত-উপবাস ছিল—'

'কিসের ব্রত?'

অরুন্ধতী আঁচলের খুঁটে আঙুল জড়াতে লাগল, 'আমি ঠিক জানি না। মানে—'

'কে জানে?'

অরুন্ধতীর আঙুলে আঁচল জড়িয়ে যেতে লাগল। মুখ লাল। বিব্রত ভাব বেশি।

'কতদিন বলেছি তোমরা এভাবে উপবাস করে থাকবে না।' সূর্যকান্তের কণ্ঠস্বর গম্ভীর: 'শিকারে বেরুলে আমি কখন্ ফিরি তার কোনো ঠিক নেই। এমনও হতে পারে বাড়ি না-ফিরে যুবরাজের সঙ্গে প্রাসাদে চলে যেতে পারি। আমার জন্যে তুমি বা মা অনাহারে থাকো এটা আদৌ কাম্য নয়। মায়ের অনাহারে থাকার হেতু তবু বোঝা যায়, তিনি বিধবা মানুষ এবং পূজার্চনা শেষ হতে দেরি হয়, কিন্তু তুমি অনাহারে থাকবে কেন? এবং এটা আমি বুঝতে পারি না আমার শিকারে বেরোবার দিনগুলোতেই তোমার ব্রত-উপবাস পড়ে কী করে? তোমার পাঁজির সঙ্গে আমার

শিকারের তিথি-নক্ষত্রের আশ্চর্য মিল। এমন মিল ভবিষ্যতে না-থাকলেই খুশি হব। আচ্ছা যাও, আমি এখনি খাবার-ঘরে যাচ্ছি—'

পরিবর্তন ঘটে গেছে। আগের সেই আবেগদীপ্ত অপরিচিত মানুষটি সম্পূর্ণ বদলে গেছে—এখন তাকে পূর্বের রূপে স্পষ্ট চেনা যাচ্ছে। কণ্ঠস্বরে গাম্ভীর্য এবং দৃষ্টি আবিলতাশূন্য। সুদূর, নিষ্ঠুর পুরুষ। কমনীয়তাহীন এবং শুষ্ক কর্তব্যপরায়ণ। এ মানুষ গভীরে তাকাতে চায় না, নারীত্বের যথোচিত মর্যাদা ছাড়া অতিরিক্ত প্রত্যাশা অবান্তর। একই মানুষের মধ্যে দ্বৈত-রূপের এই আলোছায়ার খেলা ভাবতে ভাবতে অরুন্ধতী দালান পেরিয়ে চলে আসছিল। সামান্য বেজেছে মনে, সংকুচিত হয়েছে চিত্ত, হয়তো জমে আছে অল্প ক্ষোভ। কিন্তু তবু আশ্চর্য মধুমাখা একটি স্বর তখনও বেজে চলেছে কানের কাছে ঃ 'আমি তোমার, আমি তোমার—'

কেন বলছিলেন ? কাকে বলেছিলেন উনি ? সে কে ?

অরুন্ধতী খাবার-ঘরে ঢুকল।

শংকরের বাড়ি ফিরে আসতে যথেষ্ট বেলা হল। যুবরাজের অনুরোধ এড়াতে পারে নি বলে রাজবাড়িতে আতিথ্য স্বীকার করতে হয়েছিল—পরিবেশনের সময় দেবী কমলা স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। রাজকীয় উপাচারে আহার্য পরিবেশিত হয়েছে, কিন্তু আহার্য গ্রহণকালে শংকর অন্যমনস্ক হয়েছে বারংবার। কেবলই মনে হয়েছে সূর্যকান্তের মতো দুর্গ মুরচা থেকে বাড়ি চলে গেলেই ভালো হত। সূর্যকান্তের জন্যে গৃহে কেউ অপেক্ষা করে আছে কিনা সে জানে না কিন্তু তার জন্যে অনাহারে অপেক্ষা করে থাকবে তার ব্রাহ্মণী প্রভাবতী। শিকারে বেরুবার আগে যদিচ বলে এসেছিল, 'আমি কোনোখানে আহার করে নেব, আমার জন্যে অপেক্ষা করে থেকো না তুমি—' তবু নিশ্চিত না-খেয়ে থাকবে প্রভাবতী এত বেলা অবধি।

এই তো প্রথম নয়, এমন ঘটনা ইতিপূর্বে ঘটেছে বহুবার। খাচ্ছিল আর ভাবছিল শংকর—আহারে রুচি চলে যাচ্ছিল। কোনোমতে অল্প-কিছু আহার করেই সে বেরিয়ে পড়েছে ছোট রাজমহিষী ও যুবরাজের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে। দ্রুত ফিরছিল সে বাড়ির পথে।

মধ্যাহ্নের খরতেজ এখন অপেক্ষাকৃত নিষ্প্রভ। পরিষ্কার আকাশে বিহগের বিহার। শান্ত নদীজল—পরপারের সবুজ দিগন্তের কিছু উপরে থালার মতো সূর্য যেন রশ্মি বিকীরণে ক্লান্ত। এ সময়ে যমুনাতটে বেড়াতে ভালো লাগে। বয়স্ক কিছু ব্যক্তি ভ্রমণোদ্দেশ্যে চলেছেন যমুনাতট অভিমুখে—যুবকের দল মাঠে খেলায় মত্ত। পরিচ্ছন্ন সড়ক, বেশ ঝকঝকে, পথিপার্শ্বের বৃক্ষশ্রেণীতে ছায়া পরিপূর্ণ। শংকর দ্রুত হাঁটছিল আর চারিদিক তাকিয়ে দেখছিল। যদিচ এইভাবে তাকে প্রত্যহই বাড়ি ফিরতে হয় তবু নূতনত্বের ঘোর যেন কাটতে চায় না তার চোখে। দিনে দিনে নতুন, আরো নতুন হচ্ছে বই কি যশোর। বিস্তীর্ণ জঙ্গল কেটে বাসোপযোগী করা হলেও, যশোরের সুখ্যাতি যে-রকম বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে এখনও লোকজনের আগমন ও বসতি স্থাপনের বিরাম নেই। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বাড়িগুলি ক্রমশ ঘনবদ্ধ হচ্ছে, ফাঁক ভরাট হয়ে উঠছে। যশোর উপচিয়ে পড়ছে নবাগত মানুষ-জনে।

দেখতে ভালো লাগছিল যশোরের শ্রীবৃদ্ধি। এখন হিন্দুস্থানে মোগলের আধিপত্য, গৌড়েও তাই, তাদের অত্যাচারে গৌড়বাসীর জীবন বিপর্যস্ত। ধন সম্পত্তি এবং পরিবার-পরিজন কেউই নিরাপদ নয় তাদের হাতে। হিন্দু-শক্তি যদি একত্রিত হয় এবং অত্যাচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে তবেই মঙ্গল। যশোরে যেভাবে হিন্দুশক্তি সঞ্চিত হচ্ছে তা যদি ঠিকভাবে পরিচালিত হয় এবং তাই হবে বলে বিশ্বাস, তবে একমাত্র যশোরই পারে…যশোরের পক্ষেই সম্ভব…

হাতের মুঠি শক্ত হয়ে গেল আপনাআপনি।

'নমস্কার শংকরদা—'

বাধা পড়ল আত্মগত চিন্তায়।

'কে ?'

সামনে এসে দাঁড়িয়েছে একটি প্রিয়দর্শন তরুণ। সবে গোঁফের রেখা উঠছে, সুশ্রী মুখ, লাবণ্যমণ্ডিত। বিনয়ী, নম্র। কিন্তু চোখের দিকে তাকালে বোঝা যায় সেখানে কিসের একটা জ্যোতি যেন টলমল করছে, তরুণ-সম্প্রদায়ের মধ্যে এই কারণে সে বিশিষ্ট। সাধারণ প্রকৃতির তরুণ হিসাবে একাসনে তাকে বসানো যায় না।

'আমি সুন্দর—'

ততক্ষণে তাকে দেখে ফেলেছে শংকর। আগে আলাপ হয়েছে ওর সঙ্গে। সংসারে কেউ নেই। স্থায়ী ঠিকানা ছিল না কোনোখানে। বনে-জঙ্গলে মানুষ। ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছে এখানে। ছেলেটির একটি বিশেষ গুণ, সে এ বয়সেই দক্ষ তীরন্দাজ। সম্ভবত বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানোর জন্যেই ও-বিদ্যাটি সে নিখুঁতভাবে আয়ত্ত করছে আত্মরক্ষা এবং প্রাণ-ধারণের নিমিত্ত। শংকরের বাড়ির পিছনেই সে থাকে ছোট একটি চালাঘরে।

'কী খবর সুন্দর ? অনেকদিন দেখা নেই তোমার সঙ্গে, কেমন আছো ?'

'ভালো না শংকরদা।' ছেলেটি আসছিল সঙ্গে, পাশাপাশি হাঁটছিল, 'এখানে মন টিঁকছে না। ভাবছি অন্য কোথাও চলে যাব—'

'সে কি, কোথায় যাবে ?' যেন শিউরে উঠল শংকর ঃ 'চারদিকে মোগলের অত্যাচার। লোকে যশোরে চলে আসছে স্বস্তিতে থাকবে বলে, আর তুমি কিনা যশোর থেকে চলে যেতে চাইছো ! এখানে তোমার দুঃখ কী ?'

'আপনার অনুগ্রহে আমার আহারাদির অভাব নেই, প্রভা-বৌদি নিয়মিত আহার যুগিয়ে যাচ্ছেন। মাথা গোঁজবার ঠাঁইও পেয়েছি আপনার সহায়-তায়। এখানে এসেছিলাম সহায়-সম্বলহীন অবস্থায়, আপনি আমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সব স্বীকার করি, কিন্তু—'

সুন্দর থেমে গেল। মনে হল কী-যেন সে চেপে যেতে চায়।

'কিন্তু কী ?'

উদ্বুদ্ধ করতে চাইল শংকর।

'শংকরদা, আপনি মহৎ। কী কারণে জানি না আপনি আমাকে ভালোবেসে ফেলেছেন।' সুন্দর বললে, 'আমি যখন বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতুম তখন আমার মনে কোনো দ্বিধা ছিল না, বন্যজন্তু শিকার করতুম আর এর-ওর দাওয়ায় রাত কাটাতুম—গাছের তলাতেও রাত কেটে গেছে কখনও। এখানে এসে আমার সবচেয়ে অসুবিধা হয়েছে পরনির্ভরতা, কিছু মনে করবেন না, এতে আমি ঠিক অভ্যস্ত নই। অন্তত একটা বিদ্যা আমার জানা আছে, আমি ভেবেছিলুম, তদ্‌দ্বারাই এখানে কোনো চাকরি এবং বাসস্থান পাব। কিন্তু তা বুঝি ললাটে লেখা নেই—'

'তুমি কী চাকরির চেষ্টা করেছিলে ?'

সুন্দর বললে, 'এখানে আসা অবধি সেই চেষ্টা করছি। কদিন যাবৎ কেবলই ঘোরাঘুরি করেছি, কী করে রাজা বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে দেখা করা যায়। তাঁর সাক্ষাৎ পাই নি। প্রহরীরাই বাধা দিয়েছে প্রাসাদতোরণদ্বারে। ছোটরাজা বসন্তরায় মশায়কে একদিন ধরেছিলুম যমুনাতটে, কিন্তু আমার বয়স কম বলে এখন রাজার ফৌজে না-ঢোকার উপদেশ দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেলেন। বুঝতে পারলুম তিনি আমাকে বাজিয়ে নিতে চান। কিন্তু সুযোগই বা পাচ্ছি কই ? আমার ইচ্ছা, আমি নিজের পায়ে দাঁড়াব। আজ গিয়েছিলাম যুবরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে, যদি তাঁর অনুচর-দলে একটু জায়গা পাই ; শুনলুম তিনি শিকারে গেছেন, কখন্ ফিরবেন তার কোনো ঠিক নেই—'

'আমি তোমার মানসিক অবস্থা বুঝতে পারছি।' শংকর বললে, 'এমনি করে নিজের জায়গা খুঁজে নিতে হয়। আমার সহযোগিতা তুমি সর্বপ্রকারে পাবে। এই তো চাই। যতদিন-না নিজের জায়গা পাও ততদিন যদি তোমাকে একটু সাহায্য করি, তাকে সহজভাবে গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হয়ো না। অনুগ্রহ নয় এ আমার কর্তব্য। তোমার মতো দৃঢ়চিত্ত কয়েকটি ছেলে

নিয়ে একটি শক্তিশালী দল গড়ে উঠুক, মনেপ্রাণে এই আমি চাই। সুন্দর, হিন্দুর আজ বড় দুর্দিন। সকলে যদি একজোট হতে না পারি—'

সুন্দর বললে, আমি আপনার সঙ্গে থাকতে চাই। আপনি যুবরাজের দলে আমার ঠাঁই করে দিন। এভাবে চুপচাপ বসে থাকতে আর পারি না।'

'আমি তোমাকে একটা সুপরামর্শ দিচ্ছি। কিছুদিন অপেক্ষা করো। তোমার গুণপনা প্রকাশ করার সুযোগ হয়ত শিগগির পাবে—'

'আপনি কিছু শুনেছেন নাকি শংকরদা ?'

শংকর বললে, 'তোমরাও শুনতে পাবে। আজ রাজ-অন্তঃপুরে আভাসে যেটুকু জানতে পারলুম তাতে মহারাজ বিক্রমাদিত্য শিগগিরই ক্রীড়াযুদ্ধ দেখবেন বলে বাসনা প্রকাশ করেছেন। ক্রীড়াযুদ্ধ মানে তো তুমি জানো। নামে ক্রীড়াযুদ্ধ হলেও প্রকৃতপক্ষে গুণীর অনুসন্ধান ও তাকে সম্মান-দান। সমগ্র যশোরের মানী ও গুণী ব্যক্তি এতে জমায়েত হন এবং সকলের উপস্থিতিতে এই ক্রীড়াযুদ্ধ চলে। প্রাণহানি যে হয় না তা নয়, কিন্তু খুব জমে ওঠে এই খেলা। ধনুর্বিদ্যার খেলাও নিশ্চয় থাকবে। তুমি যদি সেই খেলায় কৃতিত্ব দেখাতে পারো তবে চাকরির জন্যে তোমাকে আর ঘুরে বেড়াতে হবে না—মহারাজ নিজেই তোমাকে চাকরি দেবেন—'

বাড়ি এসে গিয়েছিল। দরজাব সামনে দাঁড়িয়ে শংকর হাঁক দিল, 'প্রভা, প্রভাবতী—'

'আমি চলি শংকরদা।'

শংকর বললে, 'এসো—'

দরজা খুলে গেল। শংকর ভেতরে ঢুকল। প্রভাবতী দরজা বন্ধ করল।

সুন্দরের মনে শংকরের কথাগুলো গুণ গুণ করে ফিরছিল। বিক্রমাদিত্যের তুষ্টি বিধানার্থে শীঘ্রই রঙ্গক্রীড়ার অনুষ্ঠান হবে এবং তাতে সমগ্র যশোরের

জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিগণ জমায়েত হবেন। এই বিরাট অনুষ্ঠানে যে-সকল প্রতিযোগী গুণপনার পরিচয় দাখিল করতে পারবেন তাঁরা পুরস্কৃত হবেন নানাভাবে। অধিকাংশ পুরস্কারই হল, যশোর-রাজের অধীনে চাকরি-দান, যা সে কোমোমতেই সংগ্রহ করতে পারছে না। স্বাধীন বন্য-জীবনে জীবিকা-নির্বাহের কোনো সমস্যা ছিল না এতদিন, কবে এবং কী করে যে বনবাসের পালা চুকিয়ে দিয়ে সে চলে এল যশোরে আজ ভেবেও কূল মেলে না। কেন এসেছিল সে-ধারণাও অস্পষ্ট। কেবল মনে পড়ে এক শিকার-বাহিনীর পথপ্রদর্শক হয়ে বনের গভীরে অনুপ্রবেশের কালে তাদের পারস্পরিক আলোচনা-মারফৎ রাজা বিক্রমাদিত্য ও যশোরের নাম শুনেছিল এবং জিজ্ঞাসাবাদ করে জেনেছিল, যশোরে আছে সকলের জন্যে আশ্রয়। দীর্ঘ বনবাস অসহ্য হয়ে উঠেছিল, মানুষের মধ্যে ফিরে আসার আকুল বাসনায় সে শিকারী দলেব সঙ্গে বন ত্যাগ করে চলে আসে। যতখানি আশা করেছিল ঠিক সেভাবে যশোর তাকে গ্রহণ করে নি। সুন্দর অবাক হয়ে দেখেছিল পূর্বের জঙ্গলাকীর্ণ জমিগুলি সাফ হয়ে বাড়িঘর উঠেছে এবং মানুষজনে পূর্ণ হয়ে গেছে। অপূর্ব লোকালয় গড়ে উঠেছে। কিন্তু এখানে কোথায় তার আশ্রয়? কী করে পাবে সে ক্ষুধার অন্ন? কর্মহীন কতদিন চলতে পারে আত্ম-সংযম?

রাজার অতিথিশালায় আহার জুটত আর নবরূপে গড়ে-ওঠা যশোরের চাল বুঝবার চেষ্টা করত সুন্দর। হয়তো এভাবেই সে স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে দিতে পারত তার জীবন, তার বয়সী অনেক ছেলে তাই করছে, রাজা বিক্রমাদিত্যের অতিথিশালা সকলের জন্যে খোলা; কিন্তু সুন্দরের মনে কোথায় যেন লাগল, এভাবে অন্নগ্রহণ এবং সম্পূর্ণ অকর্মণ্য দিনযাপন পীড়াদায়ক হয়ে উঠল। যশোর ত্যাগ করে হয়তো চলেই যেত যদি-না আলাপ হত যুবরাজের অনুচর ওই শংকরদার সঙ্গে। শংকরদার মধ্যে একটা বড় হৃদয় আছে, সব সময় কী-যেন খুঁজে বেড়াচ্ছেন, তাঁর অনুসন্ধানী দৃষ্টিপথে একদিন পড়ে গিয়েছিল সুন্দর। সেই-যে ভাই বলে বুকে টেনে নিয়েছিলেন

তিনি, তা থেকে আর মুক্ত হওয়া গেল না। শংকরদা যেন অন্তর্যামীর মতো তার মনের দুঃখ বুঝতে পেরেছিলেন। ছোট একটি ঘর জুটিয়ে দিয়েছেন তিনি আপন গৃহের সন্নিকটে, মুখোমুখি ঘর বলা যায়, মাঝে শুধু রাস্তাটুকু ফাঁক। আর তেমনি হৃদয়বতী মহিলা প্রভা-বৌদি। এই ঘরে আশ্রয় পাবার পর আহারের জন্যে কোনোদিনই আর যেতে হয় নি অতিথিশালায়, প্রভা-বৌদি নিজেই আহার পাঠিয়ে দিয়েছেন কিংবা বাড়িতে ডেকে খেতে দিয়েছেন যত্নসহকারে। শংকরদার ভালবাসা এবং প্রভা-বৌদির যত্ন ও স্নেহ না-থাকলে কবেই সে চলে যেত যশোর ছেড়ে। তবু যত দিন যাচ্ছে সুন্দর ততই অধৈর্য হয়ে উঠছে। এভাবে নয়—এমন পরানুগ্রহের মতো দিন কাটানো যায় না। শংকরদার সাহায্য না-নিয়েই সে স্বপ্রতিষ্ঠিত হতে চায়। কিন্তু রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় না কিছুতেই। বারংবার চেষ্টা করেও আজ পর্যন্ত সফল হয় নি। পদমর্যাদার দিক দিয়ে ছোটরাজা বসন্তরায় দ্বিতীয় ভাগ্যবিধাতা—তিনি যাচাই-মানসে অথবা কম বয়সী দেখে তার আবেদন বিশেষ গ্রাহ্য করেন নি, যুবরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎও ব্যর্থ হয়েছে। হতাশাই জমছিল কেবল, এখন শংকরদার সংবাদে কিছু আশার সঞ্চার হয়েছে। সর্বসমক্ষে দেখাতে হবে গুণপনা—যাচাই হবে বিদ্যা। তাকে হতে হবে সর্বশ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ।

উত্তেজিত হল সুন্দর। এ সুযোগ সে ব্যর্থ হতে দেবে না। গোপনে চলল তার শর-সন্ধান সাধনা।

রাজ্যের প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে যশোর সেজেছে অপরূপ সাজে। দুর্গের তোরণের থামগুলি বহুমূল্য কিংখাবের দ্বারা বিমণ্ডিত—প্রবেশ পথের ঊর্ধ্বদেশে সাটিনের চাঁদোয়া। দ্বারে দ্বারে ফুল ও পাতার সমারোহ। কোথাও সংকীর্তন হচ্ছে কোথাও-বা জটলা। রাত্রি ভোর হতেই দলে দলে

বেরিয়ে পড়েছে নগরবাসী। দুর্গ-শোভা নিরীক্ষণ অপেক্ষা তাদের কাছে অধিকতর আকর্ষণ ভবানী মন্দিরের সম্মুখস্থ উন্মুক্ত প্রান্তরটি, কারণ সকলেই ঘোষণা শুনেছেন যে রাজ্যপ্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষে ওই প্রান্তরে অনুষ্ঠিত হবে আকর্ষণীয় ক্রীড়াযুদ্ধ। নগরবাসীর বৈচিত্র্যহীন জীবনে আজ এসেছে আনন্দ, এসেছে উত্তেজনা। আজ তারা দেখতে পাবে নানা ক্রীড়া-কৌশল, নানা গুণীর আশ্চর্য কৃতিত্ব। স্বয়ং মহারাজ তাদের জানাবেন সংবর্ধনা, দেবেন শিরোপা। আগে গিয়ে উপস্থিত হতে না-পারলে লোকের ভিড় বেড়ে যাবে, ভিড়ের মধ্যে উঁকি মেরে দেখে পুরো আনন্দ পাওয়া যায় না। কাতারে কাতারে লোক চলেছে কৃত্রিম যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে।

'তুমি যাবে না ?' কে যেন বললে।

উত্তর দেবার আগেই ভিড়ে হারিয়ে গেল প্রশ্নকারীর মুখ। সুন্দর সরে দাঁড়াল রাস্তার একপাশে। ক্রমশ ভিড় বাড়ছে। সমগ্র যশোরবাসী যেন হুমড়ি খেয়ে পড়তে চায় ভবানী মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রান্তরে। বেলা বেড়ে উঠছে। মহারাজের বেরুবার সময় হয়েছে। সুন্দরের অনভ্যস্ত চোখে সবই কেমন বিস্ময়কর ঠেকছিল। যেন রাতারাতি বদলে গেছে যশোর। এই উত্তেজনা, এমন আনন্দের প্রকাশ সে ইতিপূর্বে কখনও দেখে নি। ভোরেই সে বেরিয়েছিল ঘর থেকে, কিন্তু চারিদিক তাকাতে তাকাতে দুর্গ-তোরণ পর্যন্ত এসে সে কেমন আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে উত্তেজনা বোধ করছিল সে নিজেও।

সুন্দর দেখতে পাচ্ছিল তোরণ-দ্বারে সুসজ্জিত হাতি এসে দাঁড়াল অনেক-গুলি। গুনে দেখল পঞ্চাশটি। এত হাতির সমাবেশ কেন সে বুঝতে পারল না কিন্তু হাতিগুলির পানে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা করছিল। প্রত্যেকটি হাতির আকার ও সৌষ্ঠব একই রকম এবং প্রত্যেকেই নিপুণ-ভাবে সজ্জিত। তাদের গলায় রৌপ্যনির্মিত ঘণ্টামালা, মাথায় আঁকা খড়ির রেখা। কান দুটি সিন্দূরলিপ্ত এবং কপালের মধ্যখানে সিঁদুরের এক প্রকাণ্ড ফোঁটা। পিঠের ওপর রজ্জুবদ্ধ হাওদা, বদ্ধরজ্জুগুলিও রক্তবর্ণ। মাহুত

বসে আছে কাঁধের ওপর, তার হাতে বাঁকানো অংকুশ। প্রত্যেক হাতির হাওদায় চারজন করে সজ্জিত যোদ্ধা। দুভাগে বিভক্ত হয়ে হাতির সারি এগিয়ে যাচ্ছিল আর সুন্দরের চোখের সামনে ফুটে উঠছিল দুই শ্রেণীতে বিভক্ত শতাধিক রথের দুই পঙক্তি। তাদের পেছনে অশ্বারোহী সৈন্যের দল এবং সর্বপশ্চাতে সহস্রাধিক পদাতিক। এই দীর্ঘ সারির পাশে কিছু তফাতে বাদ্যকার বাহিনী তূরী, ভেরী, জয়ঢাক, নাগরা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাজাতে বাজাতে চলেছে।

'ওমা, তুমি এখনও দাঁড়িয়ে ? যাবে না ?'

এবারের প্রশ্নকারিণীকে চেনা গেল। পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। রাধা।

'যাব। কিন্তু এখানকার কাণ্ড-কারখানা দেখে তাক লেগে যাচ্ছে—'

'প্রতি বছরই এ-রকম হয়। তুমি নতুন বলে অবাক হচ্ছো, আমরা বরাবর দেখে আসছি। আমাদের চোখে সয়ে গেছে।'

রাধার বয়স কম। সবে বারো পেরিয়েছে। ওর মা শংকরদার বাড়িতে দাসীগিরি করত, গত বছরে মারা গেছে, বাবা নেই। অনাথিনী বালিকার আশ্রয়হীনা হয় দেখে শংকরদা ওকে অন্য কোথাও যেতে না-দিয়ে নিজের কাছেই রেখে দিয়েছেন। রাধা যতখানি পারে প্রভা-বৌদিকে সাহায্য করে। রোজ দুপুরে রাধাই খাবার বয়ে আনে সুন্দরের জন্যে।

'তুইও যাচ্ছিস নাকি ?'

রাধা বললে, 'সবাই যাচ্ছে, আমি আর থাকি কেন। তুমিও এসো—'

'তুই যা। আমি পরে যাচ্ছি।'

'তাড়াতাড়ি এসো কিন্তু, নইলে, জায়গা পাবে না—'

রাধা চলে গেল দৌড়ে।

সুন্দরের বিস্ময় ক্রমে সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল আয়োজন দেখে। সে যেতে পারল না। কারণ তার সামনে তখন ভেসে উঠেছে আর-এক দৃশ্য। তোরণ-দ্বারের অনতিদূরে এসে দাঁড়িয়েছে শোভন রাজবেশধারী ক্ষুদ্র একটি দল। তাদের একজনের হাতে রূপার দণ্ডশীর্ষে রেশমের নিশান,

অন্যজনের হাতে রূপার বড় পানপত্রাকৃতি বিচিত্র অভয় প্রতীক, তৃতীয়-জনের হাতে রাজচিহ্ন স্বর্ণনির্মিত ছত্রদণ্ড। বোঝা যাচ্ছিল মহারাজ বিক্রমাদিত্য এবার দর্শন দেবেন, এসব তার অগ্রিম আয়োজন।

কারণ, অশ্বটি ততক্ষণে তার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। ওদের পেছন থেকে দুটি অশ্বের বলগা ধরে দুজন রাজপুরুষ সামনে এসে দাঁড়ালেন। দুটি অশ্বই দেখবার মতো। যেমন বলিষ্ঠ গড়ন তেমনি শ্বেত গাত্রবর্ণ। দুটি অশ্বের গায়ে নানা রত্ন শোভা পাচ্ছে। একভাবে সজ্জিত। উভয়ের পিঠের খলীন সোনার এবং বল্‌গা জরির কারুমণ্ডিত। রেকাব রূপার। অশ্ব দুটি যে অত্যন্ত তেজী তা তার দাঁড়াবার ভঙ্গি দেখলেই বোঝা যায়, স্থির নয় এক মুহূর্ত, পদ-বিক্ষেপে ক্রমাগত মৃত্তিকা খনন করছে। গ্রীবা বক্র, কান দুটো উঁচু।

নজরে পড়ছিল প্রকাণ্ড একটি রেশমের পতাকা—সুন্দর দেখতে পেল, স্বর্ণনির্মিত দণ্ডশীর্ষে উড্ডীন পতাকাটি রাজকীয় কায়দায় বহন করে নিয়ে এল এক ব্যক্তি, দাঁড়াল অশ্বদ্বয়ের পাশে। পতাকায় অংকিত মধ্যাহ্নের সূর্যচিহ্ন। তার সঙ্গে এল ছোট একটি বাহিনী। প্রত্যেকের বাম কটিদেশে কোষবদ্ধ তীক্ষ্ণ খড়্গ। কজন উচ্চপদস্থ অশ্বারোহী রাজপুরুষ এসে বাহিনীর সামনে স্থির হয়ে দাঁড়াল। দলটি ক্রমশ ভারি হয়ে উঠছিল। বিশ জনের অপর একটি বাহিনী প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এসে থামল ওদের কাছে—তাদের হাতে রাজ-প্রতীক রূপার আশা ও সোঁটা। সকলে নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে শুধু অশ্বারোহী সেনাপতি পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছিলেন, তাঁর ঘোড়ার খুর থেকে একটি ধাতব ছান্দিক শব্দ উঠছিল।

সুন্দর সচকিত হল হঠাৎ তূরী ধ্বনি শুনে। সচকিত হল সেনাবাহিনীও। তারা নিশ্বাস রুদ্ধ করে তাকাল দ্বারপ্রান্তে। সুন্দরেরও নজর পড়ল সেদিকে। সে দেখতে পেল দ্বার-সন্নিকটে দণ্ডায়মান পতকাধারীরা পতাকা ওঠাচ্ছে দ্রুতহাতে। শেষ পতাকাটি যখন উঠে গেল শীর্ষদেশে তখন শোনা গেল তোপধ্বনি—মহারাজার আগমনের শুভ-সংকেত এটি। এবং হল তাই। দেখা দিলেন মহারাজা বিক্রমাদিত্য। পরিধানে শুভ্রবস্ত্র, সুন্দরের

পক্ষে দেখতে অসুবিধা হচ্ছিল না, কারণ মহারাজ একলাফে অপেক্ষমান অশ্বের পৃষ্ঠে উঠে বসেছেন, তাঁর মাথার উষ্ণীষ শুভ্র। যে রকম অনায়াসে অশ্বারূঢ় হলেন তাতে মনে হল তিনি অশ্বারোহণে সবিশেষ পটু। রাজপুরুষ অশ্বের বল্‌গা তুলে দিলেন মহারাজের হাতে। অশ্বের গ্রীবা আরও বক্র হল, তার দন্ত ঘর্ষণ শোনা যাচ্ছিল, পদবিক্ষেপে ধুলো উড়ল এবং সে চতুর্দিকে পাক খাচ্ছিল ঘাড় বেঁকিয়ে। দ্বিতীয় অশ্বের আরোহী হলেন বসন্তরায়, তাঁর পোশাক মহারাজার অনুরূপ, শোভন ও শুভ্র। সৈন্যরা পুনর্বার জয়ধ্বনি দিল। আবার একটি তোপ দাগল। বাদ্যকাররা একসঙ্গে জয়বাদ্য বাজাতে লাগল। হস্তিদলের বৃংহতি শোনা গেল। যোদ্ধারা সম্মানসূচক তূরীধ্বনি করল। সবগুলো প্রায় একসঙ্গে হওয়ার জন্যে কিছুক্ষণ তুমুল শব্দে গগন মথিত হল। মহারাজ সকলের দিকে একবার স্মিতহাস্যে দৃষ্টিপাত করে অশ্বের পঞ্জরে মৃদু আঘাত করলেন—শিক্ষিত অশ্ব তৎক্ষণাৎ ছুটতে আরম্ভ করল। বসন্তরায় অনুগামী হলেন। পিছনে চলল সৈন্যদল।

সুন্দর আত্মস্থ হয়ে দেখল তোরণ-দ্বারে প্রহরীগণ ব্যতীত আর কেউ নেই। সমস্ত দলটি চলে গেছে কৃত্রিম যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে। মহারাজা উপস্থিত হলেই যুদ্ধ শুরু হবে।

সুন্দর দৌড়তে লাগল। সকলের পিছনে পড়ে গেছে সে।

এখন বনান্তরাল ভেদ করে শেষ-ফাল্গুনের সূর্য উদিত হয়েছে—তার অমলিন রশ্মিপাতে সারা যশোর উদ্ভাসিত। সুন্দর দেখতে পাচ্ছিল বহুদূর বিস্তৃত বৃত্তাকারে রচিত কৃত্রিম যুদ্ধক্ষেত্র জনসমাগমে পরিপূর্ণ, কোথাও তিলমাত্র জায়গা নেই যেখানে সশরীরে অনুপ্রবেশ করা যায়। একেবারে পিছন থেকে উঁকি মেরে সামনের মাঠে কিছুই যে দেখা যায় না!

দেরি করে আসার জন্যে আক্ষেপ হল তার। ব্যাপারটা এ রকম এলাহি তা সে কল্পনা করতে পারে নি। স্থান পরিবর্তন করে ক্রমাগত ভিড় ঠেলে সে ভিতরে প্রবেশের চেষ্টা করছিল আর তারই ফাঁকে ফাঁকে দেখতে পাচ্ছিল, সুপরিসর যুদ্ধক্ষেত্রটি সমতল করা হয়েছে আর বুক-সমান উঁচু শক্ত কাঠের বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে যাতে ভিতরে কেউ প্রবেশ করতে না পারে। স্থানে স্থানে প্রহরী মোতায়েন করা হয়েছে, ভিড়ের চাপ ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে তারা। আলাদা বেড়ার মধ্যে বসবার আসনও আছে, সেখানে অভিজাত শ্রেণীর দর্শকবৃন্দ উপবিষ্ট।
দক্ষিণদিকে আধখানা চাঁদের আকারে কাঠের মঞ্চ, সুন্দর ওদিকে জায়গা না পেয়ে উত্তর প্রান্তে আসতে আসতে দেখে এসেছে, মঞ্চের ওপরে নানা-প্রকার সুদৃশ্য কাঠের আসন শ্রেণীবদ্ধভাবে সুসজ্জিত, মনোরম বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত। মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড ঠেশ, অপেক্ষাকৃত উচ্চ কাষ্ঠবেদিকার উপরে সেটি স্থাপিত। বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত রাজছত্র শোভা পাচ্ছে তার উপরে, সুমুখে অপূর্ব কারুমণ্ডিত রক্তচন্দনের দণ্ডশীর্ষে যশোরের রাজচিহ্ন খড়্গ ও চর্ম। সুন্দর দেখে এসেছে রাজছত্রের তলে আসনে উপবিষ্ট মহারাজা বিক্রমাদিত্য, তাঁর ডানপাশে ছোটরাজা বসন্তরায় এবং বামপাশে যুবরাজ প্রতাপাদিত্য। মহারাজের আগমনের অপেক্ষায় ছিলেন সকলে, মহারাজ এসে গেছেন, অনুষ্ঠান সুরু হতে বিশেষ বিলম্ব নেই।
উত্তরদিকে প্রকাণ্ড দ্বার, ভিড় ঠেলতে ঠেলতে সুন্দর অন্যমনস্কভাবে সেই দ্বার-সন্নিকটে গিয়ে পড়েছিল, অমনি এক হুমকি : ‘এই ছোঁড়া কোথা যাচ্ছিস? এদিকে নয়। তফাৎ যা—’
সুন্দর সভয়ে তাকিয়ে দেখল এক কৃপাণধারী অশ্বারোহী, তার আগে-পিছে আরও কুড়ি-বাইশজন। এখানে ভিড় বেশি। আজকের প্রথম অনুষ্ঠানে মল্লবীরগণ এখানে পোশাক পরিবর্তন করে তৈরি হচ্ছেন, তাঁদের দেখবার জন্যে কৌতূহলী জনতা ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। তাঁদের নাম জানা যায় নি তবে চেহারা দেখে সবাই তারিফ করছে, হাঁ মল্লবীর বটে! বিশাল চেহারা

এক-একজনের, যেমন সুগঠিত তেমনি শক্তসমর্থ।

'সুন্দরদা এদিকে—'

ভিড়ের ভেতরে কে যেন হাত ধরে টানল। নরম হাত। সুন্দর ছিটকে দূরে চলে যাচ্ছিল, হাতের টানে কাছে এসে দেখল, রাধা।

'এই ভিড়ে তুই!' সুন্দরের কণ্ঠে বিস্ময়ঃ 'মেয়েদের মধ্যে গিয়ে বসলি না কেন? চিকের আড়ালে কী সুন্দর দেখতে পেতিস—'

'আমাকে ঢুকতেই দিল না।' রাধা বললে, 'আমি আসার আগে সব ভর্তি হয়ে গেছে। জায়গা না পেয়ে এখানে এসে দাঁড়িয়েছি। মল্লযুদ্ধ এখানেই হবে। বেশ দেখতে পাব। তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

'আমি তো খেলা দেখব বলেই এসেছি। কিন্তু দাঁড়াবার জাযগা পাচ্ছি না—'

'বড্ড ভিড় হয়েছে এবারে।' রাধা বললে, 'তুমি আমার গা ঘেঁসে দাঁড়াও। লোকে মনে করবে তুমি আমার বাড়ির লোক, কেউ কিছু বলবে না।'

'মন্দ নয়। মেয়েছেলে বলে তোকে খানিক রেয়াত করতে পারে—'

সুন্দর দাঁড়িয়ে গেল রাধার গা ঘেঁসে।

'তোমার পিঠে ও-সব কী?'

সুন্দর বললে, 'তীর-ধনুক—'

'এসেছো খেলা দেখতে, তীর-ধনুকে কী হবে?'

সুন্দর বললে, 'দরকার আছে—'

'তুমি খেলবে নাকি?'

সুন্দর বললে, 'খেলতে পারি—'

'সুন্দর-দাদা', রাধা যেন আঁতকে উঠল, চোখ বড় বড় করে বললে, 'ও কাজটি কোরো না। আজকের অনুষ্ঠানে যশোরের সবচেয়ে বড় বড় তীরন্দাজেরা উপস্থিত হয়েছেন, যশোরের বাইরে থেকেও এসেছেন অনেক গুণী ব্যক্তি। তাদের হারানো সহজ নয়।'

সুন্দর হেসে বললে, 'কে হারবে কে জিতবে আগে থেকে কিছু বলা যায় না—'

'আমি পারি। তার কারণ লক্ষ্যভেদের খেলায় অবতীর্ণ হবেন স্বয়ং যুবরাজ। কে না জানে যুবরাজের লক্ষ্য অব্যর্থ। তুমি মিছিমিছি লোক হাসাবে।'

সুন্দর বললে, 'দেখা যাক—'

ততক্ষণে অনুষ্ঠান সুরু হবার সংকেতসূচক জয়ঢাক বেজে উঠেছে। জনতার মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা গেল। কাঠের বেড়ার যত কাছে যাওয়া যায় তার জন্যে হুড়াহুড়ি লাগল। বিশেষত মল্লযুদ্ধ-ক্ষেত্রের কাছাকাছি আছে যারা তাদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা যেন বেশি। প্রহরী সৈন্যদের কাজ বাড়ল, তারা ভিড় সামলাতে ব্যস্ত হয়ে উঠল। ভিড়ের চাপে রাধার পিঠে সুন্দরের বুক চেপ্‌টে গেছে, দুহাতে রাধাকে ঘিরে আছে সুন্দর। রাধা বললে, 'কী ভিড়, কী ভিড়! সুন্দরদা, তুমি না থাকলে আমি একেবারে চেপ্‌টা হয়ে যেতুম। আরও শক্ত করে চেপে ধরো—'

নিমন্ত্রিত মল্লবীরগণ যথোপযুক্ত সজ্জায় একে একে একে এসে দাঁড়িয়েছেন প্রাঙ্গন মধ্যে। তাঁরা প্রস্তুত। উত্তর প্রান্তের সমাবেশ থেকে মাঠের ওপর দিয়ে ধীরে অশ্বচালনা করে এগিয়ে আসছিলেন দুই ব্যক্তি। দুজনেরই পরিধানে শুভ্র পোশাক এবং হাতে ছোট পঞ্চরঙের নিশান। সুন্দর বললে, 'ওঁরা এই মল্লযুদ্ধের বিচারক—'

রাধা নিজেকে একটু আলগা করে নিয়ে বললে, 'তুমি ওঁদের চিনতে পারছো?'

সুন্দর বললে, 'হ্যাঁ। এইমাত্র যিনি অশ্বপৃষ্ঠ হতে নামলেন তিনি শংকরদা—'

'দ্বিতীয় জন?'

সুন্দর বললে, 'ওঁকে আমি দেখেছি, চেনা চেনা মুখ, কিন্তু ঠিক—'

'উনি ছোট রাজা বসন্তরায় মশায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র গোবিন্দ রায়।'

সুন্দর বললে, 'তুমি দেখি সবাইকে চেনো। এখান থেকে আর নড়ছি না আমি। তোমাকে ছাড়া চলবে না—'সে রাধাকে আর-একটু কাছে টেনে নিল।

ঘোষকের উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা গেল: 'আমাদের প্রথম অনুষ্ঠান মল্লযুদ্ধ সুরু হচ্ছে। আজকের মল্ল-আসরে বহু মল্লবীর উপস্থিত হয়েছেন। প্রথম যিনি

আসরে অবতীর্ণ হচ্ছেন তিনি এসেছেন সুদূর পাটনা নগরী থেকে—বিখ্যাত মল্লবীর কেদার বক্স—'

নাম ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বিশালদেহী কেদার বক্স দেখা দিলেন মল্ল-আসরে। সমবেত জনতার দিকে তাকালেন যেন অবহেলার চোখে। জনতা অস্ফুটে উচ্চারণ করল, হাঁ, একখানা চেহারা বটে!

ঘোষক বললে, 'মল্লযুদ্ধের জন্যে যে কেউ এই বীরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাও, অগ্রসর হও—'

জনতা নিশ্চল হল।

কারণ দেখা গেল, মল্ল-শ্রেণীর মধ্যে থেকে এক মোগল বংশীয় দীর্ঘকায় ব্যক্তি ধীর পদবিক্ষেপে অগ্রসর হয়েছেন কেদার বক্সের দিকে। তিনিও বিশাল-দেহী এবং মজবুত শরীর। বয়স অপেক্ষাকৃত অল্প। ছোট করে মাথার চুল ছাঁটা। টান টান বাহুর মাংসপেশী।

ঘোষকের ঘোষণা ঃ 'মোগল সেনাপতি খাঁনজহানের দ্বিতীয় পুত্র জহান্দাব খাঁ—'

'আমার বাপু কুস্তি দেখতে ভালো লাগে না।' রাধা বললে।

'দারুণ জমবে।' সুন্দরের গরম নিশ্বাস পড়ছিল উত্তেজনায়, রাধার গাল যেন পুড়ে যাচ্ছিল।

'তোমাকে কেউ কুস্তি লড়তে বলে নি। এত উত্তেজিত কেন? মুখ সরিয়ে নাও, গরম নিশ্বাসে আমার গাল পুড়ে যাচ্ছে—'

উভয় যোদ্ধা তখন মল্ল-প্রাঙ্গনে নেমে পড়েছেন। পৃথকভাবে মাটি মাখামাখি চলল কিছুক্ষণ। বিচারক হিসাবে এক প্রান্তে শংকর এবং অন্য প্রান্তে গোবিন্দরায় আগে থেকেই উপস্থিত ছিলেন।

তাঁদের হাতে ছোট সাদা নিশান ছিল। দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রস্তুতি দেখে তাঁরা পরস্পরের পানে একবার তাকিয়ে দুলিয়ে দিলেন হাতের নিশান। অর্থাৎ এবার তোমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা স্থুরু করো।

মল্লদ্বয় পরস্পরের সম্মুখীন হল। যথারীতি অভিবাদন জানিয়ে প্রথমে

হস্ততাড়ন, তারপর মুণ্ডাঘাত, জানুঘাতন, বাহ্বাস্ফোটন প্রভৃতি পর্বগুলি পার হয়ে জহান্দার খাঁ হঠাৎ কেদার বক্সের কটিদেশ চেপে ধরলেন দৃঢ়হস্তে। কেদার বক্স যেন জানতেন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর আক্রমণ আসবে এভাবে, তৈরি ছিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি জানুর আঘাত করলেন জহান্দার খাঁর চিবুকে। জহান্দার খাঁর রক্ত গরম হয়ে উঠল। কটিদেশ ত্যাগ করে তিনি বলপূর্বক শক্তহাতে টেনে ধরলেন প্রতিদ্বন্দ্বীর বাম পদ—বিচক্ষণ কেদার বক্স বুঝতে পারলেন এখনই প্রতিপক্ষের শক্তি প্রতিহত করতে না পারলে বেকায়দায় পড়বেন তিনি। উপায়ন্তর না দেখে জহান্দার খাঁর কণ্ঠদেশ দৃঢ়শক্তিতে চেপে ধরতে হল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রবল মুণ্ডতাড়নে জহান্দার খাঁ তাঁকে দশহাত দূরে নিক্ষেপ করলেন এবং সুযোগ বুঝে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করে তাঁর বুকের ওপর জানু চেপে বসলেন তাঁর ভূমিশয্যা ত্যাগ করার আগেই। এতদ্বারাই স্পষ্ট হয়ে উঠল কেদার বক্সের পরাজয়।

'সাবাস—'

সুন্দর উত্তেজিত হয়ে হাত-পা নাড়ছিল, রাধার শরীরে তার আঘাত লাগছিল।

'কী ব্যাপার!' রাধা নিজেকে সামলাতে গিয়ে বললে, 'তুমি কী আমার সঙ্গে কুস্তি লড়বে?'

'আরে ছি ছি!' সুন্দর লজ্জিত হল: 'ওদের খেলা দেখতে দেখতে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম, তুমি কিছু মনে কোরো না—'

'অন্য মেয়ের বুকে-পিঠে এরকম কিল-ঘুসি পড়লে সে কিন্তু ছেড়ে কথা কইত না। হাত যেন শক্ত লোহা। ব্যথা হলে তোমাকে মালিশ করে দিতে হবে তা বলে রাখছি।'

'সে দেখা যাবে। চুপ কর্। ফের কুস্তি সুরু হচ্ছে—'

বাস্তবিক কেদার বক্স পরাজিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শংকর ও গোবিন্দরায় একযোগে নিশান অবনত করেছিলেন, যোদ্ধারা থেমে গিয়েছিল। দুজন

রক্ষী কেদার বক্‌সকে বেষ্টন করে বাইরের কানাতে নিয়ে গেল বিশ্রামের জন্যে আর জয়ী জহান্দার খাঁ রাজসন্নিধানে উপস্থিত হয়ে সেলাম করে পুনরায় স্বস্থানে ফিরে এলেন। তস্যার্থ তিনি আরও কুস্তি লড়তে প্রস্তুত।
ঘোষকের কণ্ঠস্বর ঃ 'যে কেউ জহান্দার খাঁর সঙ্গে মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে ইচ্ছা করো, অগ্রসর হও—'
এগিয়ে এলেন তৃতীয় মল্লযোদ্ধা। বলিষ্ঠকায়, গৌরকান্তি এক যুবক। দেখে মনে হয় অমিত শক্তিধর। গরিলার মতো হেলেদুলে এগিয়ে গেলেন জহান্দার খাঁর দিকে।
ঘোষক জানালেন ঃ 'সপ্তগ্রাম নগররক্ষকের জ্যেষ্ঠপুত্র রামভদ্র রায়—'
পূর্বের মতো নিশান দুলল এবং দুজনে প্রবৃত্ত হলেন মল্লযুদ্ধে।
চেহারার অনুপাতে বেশিক্ষণ লড়তে পারলেন না রামভদ্র রায়। সূচনা করেছিলেন ঠিক ভাবেই, কিন্তু জহান্দার খাঁর প্রচণ্ড মুষ্টাঘাতে স্থিরভাবে দাঁড়াতে পারলেন না তিনি, হনুভগ্ন দশায় পড়ে গেলেন মাটিতে। রক্ষীরা যথারীতি ধরাধরি করে নিয়ে গেল স্থানান্তরে। জহান্দার খাঁ রাজোদ্দেশে সেলাম জানালেন। জনতা অভিনন্দন দিতে লাগল।
'এবার সুবিখ্যাত মগযোদ্ধা কুচাণ্ডু অবতীর্ণ হচ্ছেন—'
কী করে যে তিনি সুবিখ্যাত হয়েছেন, সুন্দর ভেবে পেল না। কারণ তিনি এলেন এবং অল্পক্ষণ পরেই চিত হয়ে গেলেন।
'চন্দ্রদ্বীপাধিপতির পালিত জ্ঞাতিভ্রাতা সুপ্রসিদ্ধ রামমোহন বসু—'
এই মল্লযুদ্ধটি পূর্বাপেক্ষা বেশিক্ষণ স্থায়ী হল। রামমোহন বসু মশায় কেন প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন আর কেনই বা তাঁকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে দেখে জনতা জয়ধ্বনি দিয়েছিল, রুদ্ধশ্বাস সুন্দর তা যেন টের পাচ্ছিল। রীতিমত যুদ্ধই বলা যায়। অথচ রামমোহন বসু মশায়ের চেহারা আর-দশজন বাঙালির মতোই সাধারণ, শুধু পেশীগুলি সুগঠিত এবং দীর্ঘকায় হওয়ার দরুন কিছু সুবিধা হয়তো পেয়েছিলেন। কারণ তাঁর দীর্ঘবাহুর বজ্রবন্ধন জহান্দার খাঁ সহজে বিমুক্ত করতে পারছিলেন না। দেহে শক্তি

যে ছিল তার প্রমাণ জহান্দার খাঁকে মাটিতে ফেলে দিলেন তিনি—জহান্দার খাঁ ভূমিবক্ষ হয়ে কোনোমতে পরাজয় থেকে রক্ষা পেলেন। রামমোহন প্রতিদ্বন্দ্বীকে শক্তি সঞ্চয়ের অবকাশ দিতে চাইলেন না, তিনি তাঁর পা দুটি ধরে সোজা ঊর্ধ্বে ওঠালেন, ইচ্ছা ভূমিতে আঘাত করে এই মোগল বীরের গর্ব চূর্ণ করবেন। জহান্দার খাঁ তা অনুমান করেছিলেন, কাষ্ঠখণ্ডের মতো যখনই তিনি লম্বিত হলেন তখনই বুঝতে পারলেন এ মুহূর্তটি তাঁর কাছে অসীম মূল্যবান, একে হেলায় নষ্ট হতে দেওয়া চলবে না। কৌশলে আত্মরক্ষা করতে হবে। তাঁর পদযুগল উঠে গেছে প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখের কাছে, হস্তদ্বারা কিছু করা সম্ভব নয়। অতএব পদদ্বারাই এ সংকট হতে মুক্তি পেতে হবে। তড়িদ্বেগে এবং ভীষণ শক্তিতে সেই পদদ্বয় তাড়না করে তিনি এমন আঘাত করলেন যে রামমোহন কিছুক্ষণ চোখে অন্ধকার দেখলেন, মনে হল তাঁর চিবুকের অস্থি বুঝি চূর্ণ হয়ে গেছে, তিনি কেঁপে উঠলেন আঘাতের প্রচণ্ড তীব্রতায়। পড়ে যেতে যেতে জহান্দারের গ্রীবাদেশ চেপে ধরে টাল সামলে নিলেন। জহান্দার বালকের মতো কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ রইলেন। বুঝতে পারলেন যে প্রতিপক্ষ তাঁকে সহজে ছাড়বে না, তৎক্ষণাৎ তাঁর মাথায় আর-এক বুদ্ধি এল। বিপরীতভাবে তাঁর হাঁটু রামমোহনের উদর-সংলগ্ন ছিল, তিনি তীব্র জানুতাড়নে তাঁর অন্ত্রপ্রদেশে ভীষণভাবে আঘাত করলেন। এই দ্বিতীয় আঘাতে রামমোহন স্থির থাকতে পারলেন না, মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। ভূমিবক্ষ হয়েই পড়েছিলেন তিনি, মুক্ত হয়ে জহান্দার খাঁ তাঁকে ভূমিপৃষ্ঠ করবার বারংবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সব বৃথা, সে পর্বত আর নড়ল না। আঘাত তাঁর গুরুতর কিন্তু সংজ্ঞা তখনও ছিল, কিছুতেই তাঁকে ভূমিবক্ষ ত্যাগ করানো গেল না। শংকর গোবিন্দরায়ের পানে তাকালেন, গোবিন্দ রায় সাদা নিশান তুলে ধরলেন। রক্ষীগণ ধরাধরি করে রামমোহনকে নির্দিষ্ট বস্ত্রাবাসে তুলে নিয়ে গেল।…জহান্দার খাঁ সেলাম জানালেন, রাজা ইংগিতে দূর থেকে অভিনন্দন পাঠালেন, দর্শকেরা তারিফ করল।

'আপনি কী আর লড়বেন ?' শংকরের জিজ্ঞাসা।

'আলবাত—' জহান্দার খাঁর জবাব। তিনি ক্ষুধার্ত জন্তুর মতো মাটি আঁচড়াচ্ছিলেন আর সারা গায়ে ছিটিয়ে দিচ্ছিলেন। চারিদিকে তাকাচ্ছিলেন ভয়ংকর দৃষ্টিতে। যেন সুন্দরবনের আহত হিংস্র বাঘ একটি।

'ও-লোকটা আর মানুষ নেই।' সুন্দর বললে, 'জানোয়ার হয়ে গেছে। যদি কেউ লড়তে আসে তাহলে তার মৃত্যু অনিবার্য। ক্ষেপে গেছে—'

ঘোষক হাঁক দিল। কেউ এগিয়ে এল না। থমথমে মল্ল-প্রাঙ্গন।

'কী হল ? কেউ আসবে না নাকি ? ওই বিজয়ী হবে ?'

সুন্দর যেন আক্ষেপ করে উঠল।

'সকলে ভয় পেয়েছে বোধহয়—'

রাধা বললে।

'তুই যেভাবে আমাকে জড়িয়ে আছিস তাতে তোর ভয়ের কোনো কাবণ নেই।' সুন্দর বললে, 'আমি তোকে ঠিক রক্ষা করব—'

'তোমার কাছে থাকলে আমি কাউকে ভয় পাই না।'

'আমার কাছেই থাকবি তুই।' সুন্দরের বাহুবন্ধন শক্ত হল, 'এখন চুপ কর্। ওই দেখ কে আসছে ? লোকটার মরবার জন্যে তর্ সইছে না—'

ঘোষকের তৃতীয় ও শেষ ঘোষণায় এক ব্যক্তি সাড়া দিয়েছে। এই সাড়া না পেলে জহান্দার খাঁকে বিজয়ী ঘোষণা করা হত। জহান্দার খাঁ লোকটার পানে তাকালেন জ্বলন্ত দৃষ্টিতে—যেন চোখের আগুনে ভস্ম করে দিতে চাইলেন।

'ওমা এ যে মদনদা—'

রাধা হাঁ করে তাকিয়ে রইল নবাগন্তুক মল্লযোদ্ধার পানে।

'মদনদা কে ?'

রাধা ছোট করে জবাব দিলে, 'যুবরাজের সহচর। যুবরাজ যতবার শিকারে যান মদনদা ততবার তাঁর সঙ্গী হয়। বাঘের সঙ্গেও লড়েছে। গায়ে ভীষণ জোর—'

'তবে তো জমবে।' সুন্দর উদগ্রীব হল।

ঘোষকও তাই ঘোষণা করল। মদন দুপাশের জনতার অভিনন্দন নিতে নিতে ধীরপদে মল্ল-চত্বরে প্রবেশ করল। শংকর ও গোবিন্দ রায় ওদের প্রস্তুত দেখে নিশান দুলিয়ে দিলেন। যুদ্ধ সুরু হল যথারীতি। মদন ভাবল যশোরের সম্মান রক্ষা করছে তার ওপর, সে যুবরাজ প্রতাপাদিত্যের সহচর, পরোক্ষভাবে তাঁর সম্মান রক্ষার ভার বর্তেছে। এ লড়াই তাকে জিততে হবে। সুন্দরবনের দোর্দণ্ডপ্রতাপ হিংস্র গণ্ডারের চোয়াল চেপে ধরতে পারে যে ব্যক্তি, তার পক্ষে মানুষ জহান্দার খাঁকে কব্জায় রাখা এমন-কি কঠিন কাজ!···ভাবল বটে কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তত সহজ মনে হল না। জহান্দার খাঁ বাস্তবিক ক্ষেপে গেছে এবং তাঁর দেহে অমানুষিক শক্তি প্রকাশ পেয়েছে। একটি বজ্র-আক্রমণ কোনোমতে সামলে নিল মদন, তার রক্ত গরম হচ্ছিল, ঘাত-প্রতিঘাতে উভয়েই পরিশ্রান্ত। হেরে গেলে চলবে না। মদন জহান্দার খাঁর কটিবেষ্টন করে বলপূর্বক চেপে ধরল। এক্ষেত্রে জহান্দার খাঁ যা করে থাকেন সেই কৌশল প্রয়োগ করলেন। পূর্ব প্রথানুসারে বিপরীত আঘাত দ্বারা প্রতিপক্ষকে কাবু করতে চাইলেন, রামমোহন এই ফাঁদে পড়েছিলেন, সকলেই তাই পড়েন; কিন্তু মদন, সতর্ক ছিল বলে তৎপূর্বে জানু বিস্তার করে দিল, আঘাত প্রতিহত হল তার জানুদেশে লেগে। মুহূর্তমাত্র অপেক্ষা করা উচিত নয়. প্রতিদ্বন্দ্বী সুচতুর মল্লযোদ্ধা। মদন প্রচণ্ড আক্রমণে বিপুল শক্তিতে তৎক্ষণাৎ তাকে মাটিতে আছড়ে ফেলল—জহান্দার ভূমিবক্ষ হলেন। এখন একটা সুযোগ এসেছে, মদন ভাবল, এ সুযোগের অপব্যবহার করলে বিপরীত ফলোদয় হতে পারে। ওকে ভূমিপৃষ্ঠ করা যাবে না কিছুতেই অথচ এ সুযোগ গ্রহণ করতে হবে। অন্তত এমন চাপ সৃষ্টি করতে হবে যাতে প্রাণরক্ষার্থে ভূমিপৃষ্ঠ হয়। মদন তাঁর পিঠের ওপর চেপে বসল—বাহুপাশে কণ্ঠনালী চেপে চিত হবার জন্যে জোরে চাপ দিল। জহান্দার খাঁ মাটি আঁকড়ে পড়ে রইলেন। উপর্যুপরি কবার এরকম ভীষণ চাপ পড়ায় তাঁর অঙ্গশক্তি শিথিল হয়ে

গেল, ঝিম ঝিম করে উঠল মাথা, নাক আর মুখ দিয়ে গলগল করে বেরিয়ে এল রক্ত। অক্ষিতারকায় চাপ চাপ রক্ত জমে গেল—পর্দা ফেটে কানের ভেতর ভোঁ ভোঁ করতে লাগল। জহান্দার খাঁ সংজ্ঞা হারালেন। নিশান অবনত হল। মদন থামল। জহান্দারের সংজ্ঞাহীন দেহ রক্ষীরা স্থানান্তরিত করল। মদন পরবর্তী যোদ্ধার আগমনের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

ঘোষক আহ্বান জানাল, 'যদি কেউ…'

মদন অপেক্ষা করল কিন্তু কেউ অগ্রসর হল না।

ঘোষক আবার বললে, 'যুবরাজের সহচর মদন…'

তথাপি কোন প্রান্ত থেকেই সাড়া পাওয়া গেল না।

ঘোষক বললে, 'এক তুই তিন…'

কেউ এল না।

ঘোষক মদনকে বিজয়ী ঘোষণা করল। তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে মদন রাজ-সমীপে এগিয়ে গেল এবং মস্তক অবনত করে রাজার হাত থেকে ফুলের জয়মাল্য ও বিচিত্র স্বর্ণহার উপহারস্বরূপ গ্রহণ করে, জনতার উদ্দেশ্যে প্রত্যাভিবাদন জানিয়ে ধীরে ধীরে মল্লভূমি ত্যাগ করল।

'মদনদা যশোরের মান রেখেছেন।' গর্বে রাধার বুক স্ফীত হল, 'মদনদা সত্যি বীর।'

সুন্দর বললে, 'যুবরাজের যে কটি সহচর, মদনদা শংকরদা সূর্যদা সকলেই বীরত্বের অধিকারী। একত্রে এত গুণী সহচর পেয়েছেন বলেই যুবরাজ প্রতাপাদিত্য—'

'কী ?'

সুন্দর সামান্য থতমত খেল, 'না, মানে, তিনি যেভাবে যখন-তখন শিকারে বেরোন এবং বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ান—'

'যুবরাজ নিজেও অদ্বিতীয় বীর। তার পরিচয় পাবে শিগগিরই। ওই দেখ আয়োজন চলছে। এখনই সুরু হবে লক্ষ্যভেদের খেলা—'

দেখা গেল বেষ্টনীর বহির্ভাগে তিনশত গজ দূরে, প্রায় শত হাত উচ্চ

একটি কাষ্ঠস্তম্ভ খাড়া করা হয়েছে। তার শীর্ষদেশে সোলার প্রকাণ্ড একটি পাখি, চক্ষু দুটিও রঙ-করা সোলা। দূর থেকে মনে হল যেন একটা কুল্যা পাখি বসে আছে স্তম্ভের মাথায়। কুল্যা সুন্দরবনের খুব বড় আকারের পাখি। সুন্দর সে-কথা জানাল। রাধা বললে, 'ওমা তাই নাকি!'

শংকর ও গোবিন্দ রায়ের ইংগিতে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করল তীরন্দাজের দল। সারি বেঁধে দাঁড়াল তারা। সংখ্যায় নিতান্ত অল্প নয়।

রাধা বললে, 'বাব্বা এত! কুল্যা পাখিকে শেষে ভীষ্মের মতো শরশয্যা নিতে না হয়—'

'বকবক করিস নে।' 'সুন্দর রীতিমত উত্তেজনা বোধ করছে: 'চুপ করে দাঁড়িয়ে দ্যাখ্ কোথাকার জল কোথা দাঁড়ায়। বাতাসে বেগ রয়েছে, হাতের টিপুনি ঠিক না থাকলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা বেশি। কে লক্ষ্যভেদ করে দেখা যাক।'

'তুমি যেন যেও না বাপু। ওই তীরধনুকে—'

সুন্দর বললে, 'কী?'

'লোকে হাসবে—'

সুন্দর গম্ভীরভাবে বললে, 'হুঁ।'

সুন্দরের তীরধনুক অতি সাধারণ। সে অপমানিত বোধ করলেও প্রতিবাদ করল না এইজন্যে যে প্রতিযোগিতা তখন সুরু হয়ে গেছে। রাধা তা বুঝতে পারল। তার পিঠ থেকে হাত তুলে নিয়েছে সুন্দর, ঘেঁসাঘেঁসি ভাবটা কমে গেল। সুন্দর হাত রেখেছে নিজের পিঠে যেখানে তীরের ছোট ফলাসহ তূণীর বাঁধা রয়েছে। রাধা আগে লক্ষ্য করে নি বলে এখন দেখতে পেল সুন্দরের তূণীতে একটিমাত্র তীর এবং ফলায় তার নাম খোদিত। অর্থাৎ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে বলে একেবারে প্রস্তুত হয়ে এসেছে সুন্দর। তার বুক ঢিবঢিব করে উঠল।

ঘোষকের নাম ঘোষণা অনুযায়ী পর পর প্রতিযোগীরা অবতীর্ণ হচ্ছিল এবং প্রত্যেকেই মুখ নিচু করে ফিরে যাচ্ছিল। কেউ চক্ষু বিদ্ধ করতে পারে

নি। কারো তীর পক্ষীর ললাটে কারো কণ্ঠায় কারো বুকে কারো বা শরীরে বিদ্ধ হয়েছে। দর্শকগণের কাছে হাস্যাস্পদ হয়ে তারা ফিরে গেছে একে একে।

'সপ্তগ্রামের শান্তিরক্ষকের পুত্র হরিহর শৌণ্ডিক—'

ঘোষক পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিল।

হরিহর বেশ কিছুক্ষণের সময় নিয়ে, নানা রকম মহড়া করে, স্থির হয়ে দাঁড়াল। দর্শকেরা অধৈর্য হয়ে পড়ছিল। একটা-কিছু ঘটবে তারা আশা করছিল। হরিহর চোখের সম্মুখে ধনুক চেপে অবশেষে জ্যামুক্ত করল। মুহূর্তমাত্র! আবার একটি হাস্যরোল উঠল। তীব পক্ষীর মুখগহ্বরে প্রবিষ্ট হয়েছে।

'বিষ্ণুপুরাধিপতির সেনাপতি-পুত্র জালিম সিংহ—'

ইনিও দীর্ঘ সময় মহড়া নিয়ে তীর নিক্ষেপ করলেন এবং ব্যর্থ হয়ে মুখ নিচু করে ফিরে গেলেন। তাঁর তীর পক্ষীর বক্ষ বিদ্ধ করেছে।

'যুবরাজ। আমাদের যুবরাজের লক্ষ্যভেদ দেখতে চাই—'

জনতার মধ্যে অস্ফুট গুঞ্জনধ্বনি উঠল।

রাজছত্রের তলে সিংহাসনে উপবিষ্ট মহারাজা বিক্রমাদিত্যের ডানপার্শ্বে বসন্তরায় এবং বামপার্শ্বে যুবরাজ প্রতাপাদিত্য আসন গ্রহণ করেছিলেন। জনতার মৃদু গুঞ্জন তাঁর কর্ণে প্রবেশ করল, তিনি চঞ্চল হয়ে উঠলেন। মহারাজা বললেন, 'যাও প্রতাপ, তোমার ডাক পড়েছে—'

প্রতাপাদিত্য উচ্চ মঞ্চ থেকে নেমে এসে নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়ালেন। দীর্ঘ চেহারা, সুঠাম ও বলিষ্ঠ, উজ্জ্বল রাজকীয় পোশাকে তাঁকে ছবিতে-দেখা তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন বলে ভ্রম হচ্ছিল। তিনি নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে জয়ধ্বনি উঠেছিল—তিনি যখন চলে গেলেন তখনও তুমুল জয়ধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। যুবরাজ সামান্যক্ষণ এসে দাঁড়িয়েছিলেন, পলকমাত্র দূরস্থ পক্ষীর পানে তাকিয়ে ধনুক তুলে শর যোজনা করেছিলেন এবং তারপরও একটি পলকমাত্র অপেক্ষা। দর্শকেরা বিস্ময়ে লক্ষ্য করেছে পক্ষীর বাম চক্ষুর

গোলকে তীরবিদ্ধ ! বিপুল হর্ষধ্বনিতে অভিনন্দিত হতে হতে যুবরাজ ফিরে গেলেন স্বস্থানে।

'কেমন দেখলে তো,' রাধা সগর্বে তাকাল সুন্দরের দিকে : 'এই আমাদের যুবরাজ প্রতাপাদিত্য।'

সুন্দর কোনো মন্তব্য করল না। বাস্তবিক যুবরাজ প্রতাপাদিত্যের কৃতিত্ব অসীম। তাঁর পদপ্রান্তে ডালি রাখতে ইচ্ছা হয়। এত সহজে, এমন অবলীলায় সে আর-কাউকে লক্ষ্যভেদ করতে দেখে নি।

ধন্য প্রতাপ ! ধন্য তাঁর ধনুর্বিদ্যাশিক্ষা !

সুন্দর বুঝি অভিভূত হয়ে গিয়েছিল যুবরাজের অনায়াস লক্ষ্যভেদ দেখে। তার চমক ভাঙল ঘোষকের পরবর্তী ঘোষণায় : 'যদি কেউ...'

একবার দুবার ওই একই কথা ঘোষণা কবল ঘোষক। কেউ অগ্রসর হল না। তৃতীয়বার ঘোষণা হবার সঙ্গে সঙ্গে রাধা এবং উপস্থিত দর্শকমণ্ডলী সচকিত। গোবিন্দ রায় ভুরু কুঞ্চিত করলেন এবং শংকরের চোখে বিস্ময়ের ঢেউ খেলে গেল। কিন্তু তা মুহূর্তমাত্র! তাঁর মনে পড়ল কিছুদিন আগে এ বিষয়ে সুন্দরের সঙ্গে কথা হয়েছিল বটে। এখন যদি কৃতিত্ব দেখাতে পারে তাহলে সে প্রতিষ্ঠিত হবে জীবনে, সারাদেশ স্বীকার করে নেবে তার প্রতিভা। কিন্তু বড্ড দেরি করে ফেলেছে সুন্দর, যুবরাজের বিপুল কৃতিত্বের পর আসরে অবতীর্ণ হওয়া উচিত হয় নি। এখন সে কথা বলা যায় না, প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র।

যেতে যেতে নানা রকম মন্তব্য শুনল সুন্দর। ব্যঙ্গ, কটূক্তি, বিদ্রূপের প্রবল ঝাপটায় বিভ্রান্ত হত যে কেউ, বিচলিত হত। রাধার বুকের দপদপানি বেড়ে গেছে অসম্ভব। সে এতটুকু বুঝতে পাবে নি তার দেহের উত্তাপ ছেড়ে সুন্দর এমন নির্বোধের মতো কাজ করবে। বুঝতে পারলে সে প্রাণ-পণে বাধা দিত। ভিতরে উত্তেজনা, রাধার মুখ শুকিয়ে গেছে ভয়ে লজ্জায়। ছি ছি এ কী করল সুন্দর ! তার কী মাথা খারাপ ? এভাবে আসরে নামার মানে কী বোঝে না ? মুখ দেখাতে পারবে পরে ? লোকে

আঙুল দেখিয়ে বলবে না ওই ছেলেটা তীর ছুঁড়তে গিয়েছিল বোকার মতো ? সবাই ব্যর্থ হয়েছে লক্ষ্যভেদে, একমাত্র যুবরাজ ছাড়া। কত রথী-মহারথী গেল তল, এখন ওই ব্যাঙ বলে কত জল। আশ্চর্য দুঃসাহস ! ক্ষোভে দুঃখে লজ্জায় রাধা চোখ তুলতে পারছিল না।

পাশ থেকে কে যেন মন্তব্য করল, 'ও কী করতে যাচ্ছে তা জানে না, ঈশ্বর ওকে ক্ষমা করুন···'

এক পর্তুগীজ খ্রীশ্চান। যশোরে এসে ভাঙা ভাঙা বাংলা শিখেছে। খেলা দেখছিল একমনে।

রাধাও মনে মনে প্রার্থনা জানাল, 'ভগবান, তুমি ওকে রক্ষা করো।'

'প্রতিযোগী যশোরে নবাগত কিশোর সুন্দর···'

ঘোষণার মধ্যে তেমন সপ্রাণতা ছিল না, কিছু তাচ্ছিল্য, অবহেলা। দর্শকেরা যেন কৌতুক-রঙ্গ দেখছে এমনভাবে তাকিয়েছিল। রাধার চোখ তো বন্ধ ছিলই। একযোগে সকলেই চমকে গেল। নিজের চক্ষুকে যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না। কেউ কেউ চোখ কচলে নিল। এ কী অসম্ভব কাণ্ড ! তারা ঠিক দেখছে তো ! প্রথমে অস্ফুট বিস্ময়সূচক অব্যয় ধ্বনি, পরে তুমুল হর্ষধ্বনিতে ফেটে পড়ল সমস্ত ক্রীড়াপ্রাঙ্গন। নবাগত প্রতিযোগী কিশোরকুমার সুন্দরের তীর পক্ষীর ডানচক্ষু বিদ্ধ করে স্থির হয়ে রয়েছে। যুবরাজ প্রত্যাপাদিত্যের মতো সম-কৃতিত্ব তার—দুজনের তীর দুই চক্ষু ভেদ করেছে। অভাবিত সংঘটন !

'স্বর্গ ও মর্তে অঘটন আজও ঘটে।'

খ্রীস্টান পর্তুগীজের বিড়বিড়ানি।

রাধা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়েছিল। চেতনা অসাড়। আনন্দে তার চোখে জল এসে গেছে। আবেগে বুকের ভেতরে কেঁপে কেঁপে উঠছিল। ঝাপসা দৃষ্টিতে সে দেখতে পাচ্ছিল চতুর্দিকের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন কুড়োতে কুড়োতে সুন্দর এগিয়ে চলেছে রাজ-সমীপে—সঙ্গে যুবরাজের অনুচর শংকরদা। ওরা দুজনে গিয়ে দাঁড়ালেন মহারাজার মঞ্চ-সিংহাসনের সামনে।

প্রসন্ন দৃষ্টিতে মহারাজা তাকালেন সুন্দরের পানে, কি-যেন বললেন, সম্ভবতঃ প্রশংসা বাক্য। সুন্দর আভূমি নত হয়ে তা গ্রহণ করল। মহারাজ আপন কণ্ঠ হতে সাতনরী হার খুলে তার গলায় পরিয়ে দিলেন, জনতা জয়ধ্বনি করে উঠল। প্রতাপাদিত্য একটি স্বর্ণনির্মিত ধনুক তুলে দিলেন হাতে, গলায় পরিয়ে দিলেন জয়মাল্য। অভিনন্দন জানিয়ে বললেন, 'তুমি অবশ্যই আমার সঙ্গে দেখা কোরো। শংকরদা, আপনি ওর দিকে একটু লক্ষ্য রাখবেন···' সুন্দর নত হয়ে অভিবাদন জানাল। বসন্তরায় মণিখচিত সোনার তীর উপহার দিলেন। বললেন, 'তুমি যশোহরের গৌরব, আমার অভিনন্দন নাও।' সুন্দর অভিভূত হয়ে গেল, ভূমি স্পর্শ করে অন্তরের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করল।

সে ফিরে এল একরকম অভিভূত হয়েই। আশার অতিরিক্ত প্রাপ্তিযোগ ঘটেছে। যশোর গুণীর সমাদর জানে।

রাধা ছটফট করছিল। টগবগ করছিল আবেগে উৎসাহে উদ্দীপনায়। কঠিন হচ্ছিল নিজেকে ধরে রাখা।

'আমি তোমাকে কী দিই বলো তো ?'

'কী আবার দেবে।' সুন্দর হেসে বললে, 'কিছু না।'

'তা কী হয়।' রাধা বললে 'আমার যে ভীষণ দিতে ইচ্ছা করছে—'

'কী দেবে ?'

রাধা বললে, 'নিতে হবে তোমাকে। আমার সর্বস্ব দিলাম তোমাকে—'

'মনে থাকে যেন।' সুন্দর হেসে তাকাল তার আবেগোজ্জ্বল সুশ্রী মুখের পানে। বললে, 'দরকার হলে চেয়ে নেব। তখন যেন কুণ্ঠিত হয়ো না।'

রাধা বললে, 'তোমাকে অদেয় কিছুই নেই—'

'বেশ।'

জয়ঢাক বেজে উঠল। সুরু হয়েছে তৃতীয় খেলা। আজকের অনুষ্ঠানে এটাই সবচেয়ে-আকর্ষণীয় খেলা। অসি যুদ্ধের খেলা। নামে খেলা হলেও, প্রকৃত-পক্ষে অসিযুদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় আত্মসম্মান রক্ষার জন্যে। এক্ষেত্রে পরাজয় মানে

আত্মসম্মানের পরাজয় এবং সেজন্যে অসিক্রীড়া জমে ওঠে ঘোরতররূপে—প্রাণপণে পারস্পরিক সম্মানরক্ষার লড়াই চলে। দূর দূরান্ত হতে এসেছেন প্রতিযোগিগণ, সকলের মনেই জয়ের প্রত্যাশা।

জয়ঢাক বাজছিল আর প্রতিযোগিগণ সারি বেঁধে সমবেত হচ্ছিলেন শংকর ও গোবিন্দ রায়ের নির্দেশে। প্রত্যেকেই দুর্ভেদ্য শিরস্ত্রাণ ও হস্তত্রাণ পরিহিত, বক্ষে লৌহ আবরণ। রৌদ্রালোকে চক্ষু যেন ধাঁধিয়ে যাচ্ছিল। কোমরে কোষবদ্ধ দীর্ঘ তরবারি। জমকালো পোশাক, বিভিন্ন পদ্ধতিতে পরিহিত, দেখে মনে হয় প্রত্যেকেই অভিজাত বংশীয়। পোশাক পরিধানের বিভিন্নতা দেখে বোঝা যায় দলে হিন্দু যেমন আছে মুসলমান এবং ফিরিঙ্গি যোদ্ধাও আছে তেমনি। তরবারি-চালনায় বিশেষ দক্ষ সকলেই, কেউ কেউ বা দুর্জয়।

রাজসিংহাসনের পাশে মঞ্চোপরি মণিরত্নখচিত সুবর্ণনির্মিত একটি অপূর্ব ময়ূর—বিজয়ীর পুরস্কার। এ পুরস্কার সহজলভ্য নয়। সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে এ পুরস্কার লাভ করতে হবে। কঠিন কাজ।

'মোগল কুলতিলক খাঁ খানান মুনিমের পুত্র ইমদাদ আলি খাঁ ও তাম্রলিপ্ত নগরীর শাসনকর্তা উৎকল গঙ্গা বংশীয় বাজজ্ঞাতি অনন্ত রায়ের সহোদর জগন্নাথ রায়—'

উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদ্বয় রাজোদ্দেশ্যে অভিবাদন জানিয়ে পরস্পরের সম্মুখীন হলেন। কোষবদ্ধ তরবারি উন্মুক্ত করে মুখোমুখি দাঁড়ালেন। শংকর একজনের উত্তোলিত বাহুমূল ধরে অপেক্ষা করছিলেন, গোবিন্দ রায় থামিয়ে রেখেছিলেন অন্যজনকে। স্বয়ং মহারাজা সংকেত জানালেন হাত নেড়ে। সুরু হল খেলা। অসিতে-অসিতে বেধে গেল সংঘর্ষ। সীমাবদ্ধ জায়গার মধ্যে পিছু হটে আসা আবার এগিয়ে যাওয়া। বিদ্যুতের মতো তরবারির চকিত চমক, রৌদ্রালোকে খরশান ঝলকানি। সামান্য অন্যমনস্ক হলেই বিপদের সম্ভাবনা—হয়তো প্রাণ-সংশয়। বাজের মতো নেমে আসতে পারে মৃত্যু। দর্শকেরা রুদ্ধশ্বাস, সীমাহীন আশংকা ও কৌতূহলে

জড়ীভূত। প্রতিদ্বন্দ্বীর কেউ কম যায় না। উভয়ের শক্তির আধার হয়ে উঠেছে তরবারি।

কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলেন বসন্তরায়ও। এ তাঁর অত্যন্ত প্রিয় খেলা। এখনও পর্যন্ত তরবারি চালনায় তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। দাদার অনুরোধে তিনি সঙ্গে করে এনেছেন কারুকাজ-করা সুদৃঢ় 'গঙ্গাজল' তরবারি, কোষ-বদ্ধ হয়ে আছে কোমরে। এই তরবারির সাহায্যে বহু যুদ্ধ জয় করেছেন তিনি, অসংখ্য বিপদ থেকে মুক্ত হয়েছেন অবলীলায়। কে যেন ভর করে, কী যেন ঘটে যায় রক্তের মধ্যে এই তরবারি স্পর্শ করলে। দৈবী প্রেরণা আসে, নিজেকে অসীম শক্তিধর মনে হয়। আজ পর্যন্ত কখনও তিনি পরাস্ত হন নি—যত জায়গায় 'গঙ্গাজল' ব্যবহার করেছেন প্রতি ক্ষেত্রেই দেখা গেছে তাঁর জয় অনিবার্য। যশোরের প্রতিটি মানুষ জানে 'গঙ্গাজলে'র মহিমা—আজ কেন যে 'গঙ্গাজল' সঙ্গে নিয়ে আসতে অনুরোধ করেছিলেন দাদা, তাঁর মাথায় ঢোকে নি আদৌ। রণক্রীড়া দেখতে আসছেন তিনি দর্শকরূপে, যে কোনো সাধারণ তলোয়ার সঙ্গে আনা যেত, না আনলেও কিছু আসে যায় না; 'গঙ্গাজলে'র কী প্রয়োজন? দাদার যত উদ্ভট অনুরোধ!

তিনি বসেছিলেন দাদার বামপার্শ্বে, খেলা দেখছিলেন মনোযোগ সহকারে। খেলা যত এগিয়ে যাচ্ছিল, তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন দর্শকদের উল্লাস তত ফেটে পড়ছে। এক-একজন প্রতিযোগী হটে যাচ্ছে আর দর্শকেরা অভি-নন্দন জানাচ্ছে বিজয়ী প্রতিদ্বন্দ্বীকে। পরাজিত ব্যক্তিদের কেউ অক্ষত রয়ে গেছে কেউ বা রক্তাক্ত, তবে সহজে পরাস্ত করা যায় নি কোনো প্রতি-যোগীকেই। রীতিমত অসিযুদ্ধ! সমস্ত মনোযোগ হরণ করে নিয়েছে ওরাই। কোনো কোনো খেলা দেখে বাহবা দিয়েছে প্রতাপ, তারিফ জানিয়েছেন মহারাজা। প্রতাপ বসে আছে চুপচাপ—মাঝে মাঝে উত্তে-জনায় স্পর্শ করে ফেলছে কোমরের তরবারি। প্রতাপ বড় চঞ্চল, স্থির হয়ে বসে থাকতে পারে না বেশিক্ষণ। ভঙ্গি দেখে মনে হয় সে নিজেই

বুঝি নেমে পড়বে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে। কিছু আশ্চর্য নয়। প্রতাপ কোনোদিন অগ্র-পশ্চাত বিবেচনা করে নি। ওর চরিত্রের মধ্যে একটা উদ্দাম ভাবাবেগ আছে, কখন কী করে বসে তার ঠিক নেই। নিজেকে চেনে না প্রতাপ, সংযত করে না রাখলে শক্তির এই উদ্দামতাই তাকে বিপদে ফেলতে পারে।—অবশ্য ততদিন তিনি বেঁচে থাকবেন কিনা সন্দেহ!

প্রতাপাদিত্যের চাঞ্চল্য যেমন তিনি লক্ষ্য করছিলেন তেমনি দেখতে পাচ্ছিলেন পার্শ্বে উপবিষ্ট দাদার মধ্যেও পরিবর্তন ঘটেছে, তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে তাঁর দৃষ্টি, রাজোচিত গাম্ভীর্য এসে গেছে তাঁর মুখে। উৎফুল্ল ভাব বিদূরিত। গাম্ভীর্যের পাশাপাশি কুটিল রেখার আভাস। দাদা যেন বিশেষ চিন্তামগ্ন। হঠাৎ চিন্তার কী কারণ ঘটল? এখন রণক্রীড়ার আনন্দোভোগ ব্যতীত অন্য কোনো চিন্তা থাকা তো উচিত নয়! কী চিন্তা করছেন দাদা? তিনি জানেন এবং তাঁকে জানিয়েই দেশ-বিদেশ থেকে তলোয়ার-বীরদের আমন্ত্রণ করে এনেছেন দাদা, বিশেষ যত্নে রাজ-অতিথিরূপে তাঁদের রাখা হয়েছে তাঁরই নির্দেশে, কারণ তিনি আগ্রহ দেখিয়েছিলেন বেশি। অনুষ্ঠানের এই নূতনত্বে সাড়া পাওয়া গেছে যেমন দেশবাসী আনন্দও পাচ্ছে তেমনি। এরকম দ্বৈত-প্রতিদ্বন্দ্বিতা পূর্বে কখনও হয় নি, এর আকর্ষণ, আলাদা, পূর্বে যা হয়েছে তা দলগতভাবে—এক দলের সঙ্গে আর-এক দলের লড়াই। দলগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা। সেক্ষেত্রেও পুরস্কার ছিল বটে কিন্তু এমন লোভনীয় পুরস্কার নয়; অন্য খেলাতেও নেই। তলোয়ার-বীরের সম্মান-রক্ষা অবশ্য কর্তব্য, কিন্তু এই পুরস্কার কেন? কোথায় যেন একটু বেসুর লাগছে।

বসন্তরায় একের পর এক খেলা দেখছিলেন আর চিন্তা করে যাচ্ছিলেন। দাদা যেন হঠাৎ দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছেন তাঁর কাছে। আভাসেও ধরা যাচ্ছে না তাঁর মনোগত বাসনা। কেবলই মনে হচ্ছে আজ একটা-কিছু ঘটতে পারে। কী ঘটবে?

একটি করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শেষ হচ্ছিল আর ঘোষক ঘোষণা করে যাচ্ছিল :
'আহমদ নগরের সেনাপতি-পুত্র মীর্জা আসগার হোসেন—'
'তাহেরপুরের রাজবন্ধু মহাবলীপ্রসাদ।'
'সলেমান মানক্‌লির ভ্রাতুষ্পুত্র ও বাবু মানক্‌লির পুত্র হায়দার মানক্‌লি—'
'হিজলী অধিপতির সহকারী সেনাপতি বলবন্ত।'
'প্রসিদ্ধ জলযোদ্ধা ফিরিঙ্গি-তনয় আগস্টাস পেড্রো—'
'ভূষণাধীশ্বরের কনিষ্ঠ পুত্র নৃসিংহ সহায়।'
পাটনা নবাবজাদার মধ্যম ভ্রাতা নাসিরুদ্দীন শাহ—'
তৎপূর্বে প্রতিযোগী ছিল আরও অনেকে,—শেষ কজনের মধ্যেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা জমে উঠেছিল খুব। মীর্জা আসগার হোসেন পরাস্ত হয়েছিলেন মহাবলী প্রসাদের কাছে ; বসন্তরায় ভেবেছিলেন মহাবলীপ্রসাদ যে ধরনের তলোয়ারবাজ তাতে তিনি পরবর্তী প্রতিদ্বন্দ্বিকে পরাস্ত করতে পারবেন কিন্তু হায়দার মানক্‌লি সহজেই জয়ী হয়ে গেলেন কৌশলে তাঁর মস্তকে আঘাত করে। মহাবলীপ্রসাদ ফিরে যাবার পর সেনাপতি বলবন্ত বিপুল বিক্রমে আক্রমণ চালিয়ে গেলেন, কেউ কিছুতেই পরাজয় স্বীকার করতে চান না। কেবল তলোয়ারে তলোয়ারে ঝনঝনি। অবশেষে বলবন্ত জয়ী হলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁকেই আবার সম্মুখীন হতে হল দুর্ধর্ষ অসি-যোদ্ধা আগস্টাস পেড্রোর সুনিপুণ আক্রমণে। অসিযোদ্ধা বটে আগস্টাস পেড্রো! যেমন বিশাল চেহারা তেমনি বি'ল শক্তি। শুধু বলবন্ত নন, তাঁর শক্তি ও কৌশলের কাছে নতি স্বীকার করলেন অবশিষ্ট দুজন নৃসিংহ সহায় ও নাসিরুদ্দীন শাহ। পর পর তিন মহারথীকে হারিয়ে পেড্রো এমনভাবে চারিদিকে তাকাতে লাগলেন যেন তাঁর হাতের সুখ হয় নি, সমকক্ষ যোদ্ধা যদি কেউ থাকে তবে এগিয়ে আসুক। তরতাজা ভঙ্গি। ক্লান্তির লক্ষণ নেই এতটুকু, অমিত শক্তির উৎস বলিষ্ঠ বক্ষদেশ সাহসে ও উৎসাহে পরিস্ফীত, সংকুচিত ও বিস্ফারিত হচ্ছে ক্রমাগত। ছোটরাজা বসন্তরায়ের মনে হচ্ছিল এখন যদি কেউ ওঁর সম্মুখীন হয় তাহলে তা'র নিস্তার নেই

কোনোমতেই, তলোয়ারের বিষাক্ত ছোবলে তার জীবন-সংশয় ঘটতে পারে: আজকের অসিক্রীড়া অনুষ্ঠানে আগস্টাস পেড্রো নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ বীর, বিজয়ীর সম্মান ওঁর অবশ্য প্রাপ্য। বসন্তরায় মনে মনে ওঁকে বিজয়ীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

রীতি অনুসারে ঘোষক বিজয়ীর নাম ঘোষণা করতে যাচ্ছিল, কিন্তু বাধা পড়ল।

বাধা দিলেন মহারাজা স্বয়ং। হাত তুলে তিনি বাধা দিলেন ঘোষকের ঘোষণায়। ইংগিতে জানালেন, অপেক্ষা করো, আরও প্রতিদ্বন্দ্বী আছে।

কিন্তু কে? কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী তো দেখা যাচ্ছে না! এভাবে বাধা দেওয়ার অর্থ?

বসন্তরায় চোখ তুলে দাদার পানে তাকালেন। দাদার মুখ আরও গম্ভীর হয়েছে, চোয়াল শক্ত। তিনি কাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পাঠাবেন ওর যমসদৃশ পেড্রোর কাছে? শিহরিত হলেন, কার কথা ভাবছেন মহারাজা বিক্রমাদিত্য? কে?

মৃদু অথচ সুস্পষ্ট কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন তিনি. বামপার্শ্বে ঈষৎ ঝুঁকে মহারাজা বলছেন: 'প্রতাপ, তোমার তলোয়ার খেলা আমি কখনও দেখি নি। শুনেছি অসি-চালনায় তুমি অদ্বিতীয়। এজন্যে আমি গর্বিত। আজ সর্বসমক্ষে তোমার সেই খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত করতে আপত্তি আছে কী?'

'না বাবা। আমি প্রস্তুত। আমার খ্যাতি যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে আমি সর্বতোভাবে তার চেষ্টা করব, আপনি আশীর্বাদ করুন-- '

প্রতাপাদিত্য তৎক্ষণাৎ নেমে এলেন মঞ্চ থেকে, অকম্পিত পদক্ষেপে এগিয়ে চললেন প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে। তাঁর যাত্রাপথের পানে অপলকে তাকিয়েছিলেন শিক্ষাগুরু বসন্তরায়, একটিও কথা বলতে পারেন নি, স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। দাদা, প্রতাপের পিতা, জেনেশুনে এ কী করলেন? প্রিয়পুত্রকে ঠেলে দিলেন একেবারে মৃত্যুর মুখে? তৎক্ষণাৎ ঝলসে উঠল অতীত, পুরানো দিনের কথা, মনে পড়ল প্রতাপ তাঁর প্রিয়-শিষ্য হতে পারে কিন্তু

সে প্রিয়পুত্র নয় পিতার কাছে। তাকে নিধনের চেষ্টা হয়েছিল বহুদূর অতীতে, এখন স্পষ্টত আবার সেই হত্যার কূট কৌশল। কী সাংঘাতিক! এ রকম আভাস ইতিপূর্বে পাওয়া গিয়েছিল কিন্তু তা যে এত সন্নিকট এবং এমন সুচিন্তিত পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে আসবে তা তিনি আদৌ ভাবতে পারেন নি। পরিকল্পনা কত নিখুঁত। পুত্র-হত্যার জন্যে পিতার বুদ্ধি ও দূরদৃষ্টির প্রশংসা করতে হয়! পিতাকে অপরাধী করতে পারবে না কেউ, পুত্র স্বেচ্ছায় অসিযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে, ফলাফলে তার যদি মৃত্যু বা অঙ্গহানি ঘটে সেজন্যে পিতার কোনো দায়িত্ব নেই—পুত্রের অসর্তকতা ও-শক্তিহীনতাই হবে দায়ী। এতক্ষণে বোঝা গেল মহারাজা কেন একক অসি-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এত উৎসাহী এবং দেশ-বিদেশ থেকে তাবৎ অসিযোদ্ধা আহবানের নির্দেশ দিয়েছিলেন। মনে পড়ল, আগস্টাস পেড্রোকে তিনি আমন্ত্রণ জানিয়ে এনেছিলেন। পেড্রো তাঁর আমন্ত্রণ ও নিজের সম্মান রক্ষা করেছে। এখন প্রতাপাদিত্য তার খ্যাতি রক্ষা করতে পারে কিনা কে জানে। পেড্রো ওকে সহজে ছাড়বে না।

বসন্তরায় উৎকণ্ঠিত চিত্তে দ্বৈত অসিযুদ্ধে গতিবিধি লক্ষ্য করছিলেন আর মনে মনে প্রার্থনা জানাচ্ছিলেন, প্রতাপ যেন জয়ী হয়। এই দ্বৈত অসিযুদ্ধে শুধু প্রতাপের খ্যাতি নয় তাঁর নিজের সম্মানও বিশেষভাবে জড়িত। প্রতাপ তাঁর সর্বাধিক প্রিয় শিষ্য, অসি-চালনায় সত্য সে অদ্বিতীয়, শিষ্যের জয়-পরাজয়ে গুরুও সমান অংশভাগী।

এমন উৎকণ্ঠা তিনি কখনও ভোগ করেন নি। যতক্ষণ অসিযুদ্ধ চলছিল ততক্ষণ তিনি এতটুকু অন্যমনস্ক না হয়ে সর্বক্ষণ দৃষ্টি রেখেছিলেন ওইদিকে। দুই নিপুণ যোদ্ধার তলোয়ারের বিকট ঝনঝনানিতে তাঁর চিত্ত অবশ হয়ে আসছিল ক্রমশ, পেড্রোর তরতাজা ভঙ্গি অন্তর্হিত, ক্লান্ত হয়ে পড়েছে তরুণ প্রতিপক্ষের বিদ্যুৎচকিত আক্রমণ ঠেকাতে ঠেকাতে। 'সাবাস—'তিনি উৎফুল্ল হয়ে উঠছিলেন শিষ্যের হিংস্র-চতুর আক্রমণ দেখে। কব্‌জির জোরে কখনও কখনও নুয়ে পড়ছে বটে প্রতাপ কিন্তু পরক্ষণে পাল্টা চাপে

বিব্রত করে তুলছে প্রতিপক্ষকে। রুদ্ধশ্বাস সকলেই, দর্শক-সাধারণের মধ্যে কোনো শব্দ বা মন্তব্য নেই। উৎকণ্ঠা—সকলের চিত্তে প্রবল উৎকণ্ঠা। যদি কেউ উৎকণ্ঠা বোধ না করে থাকেন তবে একমাত্র মহারাজা বিক্রমাদিত্য। একেবারে নির্লিপ্ত ও নির্বিকার তিনি। কী কঠিন পিতৃহৃদয়! তাঁর মনে আরও কোনো অভিসন্ধি আছে কিনা কে জানে।

হঠাৎ উল্লাসে ফেটে পড়ল সারা প্রান্তর। জয়ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত। আগস্টাস পেড্রো পরাজিত। তার বজ্রমুঠি থেকে তলোয়ার ছিটকে পড়ে গেছে প্রতাপের প্রচণ্ড আঘাতে। দুহাত মাথার ওপরে তুলে হাঁপাচ্ছে জানোয়ারের মতো।...

গর্বে ভরে উঠল তাঁর বুক। সর্বসমক্ষে প্রমাণিত হল প্রতাপ যথার্থ বীর, অসিযুদ্ধে অদ্বিতীয়। নিজের খ্যাতি ও গুরুর সম্মান রক্ষা করেছে প্রতাপ। সর্ববিপদে গোবিন্দ এমনি করে রক্ষা করুন ওকে।...মহারাজার উচিত ওকে বুকে টেনে নেওয়া, পুত্রের কৃতিত্বে তাঁরই তো সর্বাধিক আনন্দ প্রকাশ করা উচিত। কিন্তু কই, মহারাজা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন না, আনন্দের কণামাত্র প্রকাশ দেখা গেল না তাঁর মধ্যে। বরং গাম্ভীর্য আরও চেপে বসেছে মুখে, পাথরের মতো কঠিন হয়ে উঠেছে ভঙ্গি। যেন তিনিই পরাজিত হয়েছেন এ যুদ্ধে। যোদ্ধা পেড্রোর মতো তিনি তা স্বীকার করতে চান না, বসন্তরায় দেখলেন, গোপন স্থান থেকে মহারাজা বার করেছেন দ্বিতীয় মারাত্মক অস্ত্র। থামানো গেল না, মহারাজা নিজেই ঘোষণা করে দিলেনঃ 'যুবরাজ প্রতাপাদিত্যের কৃতিত্বে আমরা মুগ্ধ, তিনি যশোরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অসিযোদ্ধা। কিন্তু আমরা জানি আরও একজন অসিযোদ্ধা আছেন যশোরে, যিনি শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখেন। যুবরাজ যদি তাঁকে পরাজিত করতে পারেন তবেই বুঝব তিনি যশোরের সর্বশ্রেষ্ঠ অসিযোদ্ধা...'

এই ইংগিতটুকু যথেষ্ট ছিল। মহারাজার সুচতুর প্রস্তাব শুনতে শুনতে বসন্তরায়ের শরীর হিম হয়ে আসছিল। এ কী হৃদয়হীন কৌশল অবলম্বন করেছেন তিনি! পুত্র-নিধনে তিনি বুঝি বদ্ধপরিকর। এমন প্রস্তাব কেউ

কী করে? গুরু-শিষ্যে যুদ্ধ, তা-ও সকলের উপস্থিতিতে! 'অসিযোদ্ধা হিসাবে শিষ্য বড় কী গুরু বড় সে পরীক্ষা কী একান্তই প্রয়োজনীয় ছিল? দাদা অতি নিষ্ঠুর পরিণতির দিকে ঘটনার মোড় ঘোরাতে চাইছেন। সমর্থন করা যায় না এ প্রস্তাব। ছটফট করে উঠলেন বসন্তরায়।

দাদার কথা শেষ হতে না হতেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। ব্যর্থ করে দিতে হবে এই হীন ষড়যন্ত্র। কণ্ঠস্বরে সমান জোর এনে বললেন, 'যশোরবাসী সকলেই জানেন প্রতাপ আমার প্রাণাধিক প্রিয় শিষ্য। অসিযোদ্ধা হিসাবে তাকে আমি সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করি। তাছাড়া প্রতাপ এখন ক্লান্ত, এ পরীক্ষা বরং অন্যদিন হতে পারে। আজ বেলা বেড়ে উঠেছে, এবেলার মতো অনুষ্ঠান এখানেই শেষ হতে পারে...'

কিন্তু ততক্ষণ গুঞ্জন সুরু হয়েছে জনতার মধ্যে। এমন মজার খেলা ভবিষ্যতে দেখা যাবে কিনা সন্দেহ। সবচেয়ে চমৎকার খেলাটি হোক আজ সকাল-বেলার শেষ অনুষ্ঠান।

'আমরা এ খেলা দেখব—'

গুঞ্জন ক্রমশ চিৎকারে পরিণত হচ্ছিল।

'ছোটরাজা ভয় পেয়ে গেলেন নাকি।'

জনতার একাংশে ব্যঙ্গাত্মক ধ্বনি উঠছিল।

'কোমরে অত বড় তলোয়ার, সেটা কী গঙ্গাজলের মতো পবিত্র থাকবে?'

কারা যেন মন্তব্য করল।

'এই প্রথম দেখা যাচ্ছে ছোটরাজা অসিযুদ্ধে পরাঙ্মুখ—'

বক্তার বক্তব্যে তীক্ষ্ণতা।

'তাছাড়া এটা অসিক্রীড়া সত্যিকার যুদ্ধ নয়, এতে ভয় পাবার কী আছে? বোঝা যাচ্ছে ছোটরাজার বয়স হয়েছে যুবরাজের শক্তির সামনে দাঁড়াতে সাহস পাচ্ছেন না—'

দ্বিতীয় ব্যক্তির সুনিপুণ বিশ্লেষণ।

'দাদা—'

বসন্তরায় নিদারুণ বিচলিত।

'জনগণের দাবি তোমার মানা উচিত—'

মহারাজা নিয়তির মতো নির্বিকার।

'প্রতাপের সঙ্গে লড়ব আমি?'

বসন্তরায়ের কণ্ঠে যেন আর্তনাদ ফুটে উঠল।

'জনগণ তাদের ইচ্ছা জানিয়ে দিয়েছে—'

অমোঘ অটল নির্দেশ। তবে তাই হোক। জনগণের নামে মহারাজার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। একদিকে শিষ্যের জন্যে অগাধ স্নেহ অপরদিকে আত্মসম্মান রক্ষার প্রবল তাড়না—বসন্তরায় ধাপে ধাপে নেমে এলেন মঞ্চ থেকে। এখন তিনি জীবনের সবচেয়ে কঠিন অসিযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে যাচ্ছেন, দুঃস্বপ্নেও ভাবেন নি এমন সংকট কখনও আসতে পারে। এ যুদ্ধে হেরে গেলে আত্ম-সম্মান থাকে না, জিতলে দুঃখের কারণ হয়। তাঁর মতো স্থিতধী ব্যক্তিও বিচলিত হয়ে পড়েছেন। মাথাব ওপরে তীব্র রোদ—জনতা চোখের শিরা টান করে উদগ্রীব এই খেলা দেখবে বলে। ওদের দাবি মানতে হবে। প্রকৃতপক্ষে এই হৃদয়হীন খেলার জন্যে দায়ী মহারাজা বিক্রমাদিত্য। মহা-রাজার চিন্তা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, দুর্ধর্ষ পেড্রোকে তিনি নিয়োগ করে-ছিলেন পুত্র-হত্যার জন্যে, প্রতাপের সৌভাগ্য যে সে পেড্রোকে পরাস্ত করেছে। এখন বোঝা যাচ্ছে মহারাজার চিন্তা আরও সুপরিকল্পিত। ঘটনা-ক্রমে পেড্রো হেরে গেলে অতঃপর কে দাঁড়াবে প্রতাপের অস্ত্রের মুখোমুখি সে-চিন্তা পর্যন্ত তিনি করেছিলেন, তা না-হলে কৌশলে অস্ত্রসজ্জায় তৈরি হয়ে ক্রীড়া-প্রাঙ্গনে উপস্থিত হতে অনুরোধ করবেন কেন তিনি? এক্ষেত্রে যথার্থ কূটবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন মহারাজ। বুঝতে না পেরে 'গঙ্গাজল' তরবারি সঙ্গে এনেছেন তিনি—যে তরবারি হাতে থাকলে তিনি দৈবশক্তি লাভ করেন। অজেয় রয়ে গেছেন বরাবর এই তরবারির দাপটে। দাদা তা জানতেন, অনেকেই তা জানেন। এখন তার প্রয়োগ অনিবার্য হয়েছে এবং সে-প্রয়োগ ঘটবে প্রতাপের ওপর, যাকে তিনি প্রাণাধিক ভালবাসেন···

শংকর ও গোবিন্দরায় নির্বাক। বসন্তরায় এসে গেছেন ক্রীড়া-প্রাঙ্গনে প্রতাপের সামনে। দাঁড়িয়ে পড়েছেন অনড় হয়ে। ওঁরা কোনো সংকেত দিচ্ছেন না। বিমূঢ় দুজনে।

জনতা অধৈর্য হয়ে উঠেছে, তাদের মধ্যে সোরগোল।

সংকেত জানালেন বিক্রমাদিত্য স্বয়ং হাত নেড়ে। প্রতাপ এগিয়ে গেলেন গুরুর কাছে, হাতে খোলা তলোযার। কাছে গিয়ে প্রতাপ নত হলেন গুরুর পায়ে, রেখে দিলেন তলোয়ারটি। যেন শ্রদ্ধাঞ্জলি। অকপট জনতাকে উদ্দেশ করে বললেন, 'যশোরের সর্বশ্রেষ্ঠ অসিযোদ্ধার কাছে প্রতাপ হার স্বীকার করে নিচ্ছে, আপনারা শুনুন আমি পরাজিত। পিতৃতুল্য গুরু বলে যাঁকে মনে করি তাঁর কাছে হেরে যেতে আমার কোনো লজ্জা নেই, আমি তাঁর পায়ে অস্ত্রত্যাগ করেছি···'

বসন্তরায় দুবাহু বাড়িয়ে তাঁকে বুকে টেনে নিলেন।

জনতা উচ্ছ্বসিত হল আবার। প্রতাপের নামে গগনভেদী জয়ধ্বনি উঠল। হেরে গিয়েও যশোরবাসীর হৃদয় জয় করে নিয়েছে পুত্র—দেখতে পেলেন মহারাজা বিক্রমাদিত্য। ব্যর্থ আয়োজন। এমন হবে জানলে অনর্থক সময় ও শ্রম নষ্ট করতেন না—গম্ভীর হয়ে গেলেন খুব। সিংহাসন ছেড়ে দ্রুত চলে গেলেন দুর্গমধ্যে।

বেলা বেড়ে গিয়েছিল, সেদিনের মতো ক্রীড়ানুষ্ঠান ওখানেই শেষ। জনতা ফিরে চলল বাড়ির পথে।

৫

আহারাদির পর সূর্যকান্ত বললেন, 'অনেকদিন তোমার আঁকা ছবি দেখি নি—নিয়ে এসো—দেখি কতদূর অগ্রসর হলে—'

সচরাচর এ রকম নিভৃত অবকাশ মেলে না, সূর্যকান্ত গৃহে থাকে না মোটে, আহারের সময়টুকু ব্যতীত সর্বক্ষণ বাইরে, কোনো-কোনোদিন আহারের জন্যে গৃহেও আসেন না, যুবরাজ প্রতাপ অথবা সহচর শংকরের আমন্ত্রণে সেখানেই সমাধা করে নেন—তারপর মেতে যান রাজকার্যে, নানা স্থানে ঘোরাঘুরি—সাক্ষাৎ হয় একেবারে রাত্রিকালে। আজ তার ব্যতিক্রম। আহারাদির পর আজ তিনি খাটে অর্ধশয়ান, অলস ভঙ্গি। তস্মার্থ, অন্য কোথাও বেরুবার তাড়া নেই। থাকবেই বা কেন? আজ সকাল থেকে ক্রীড়াক্ষেত্রে যে ধকল গেছে, সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে ক্রীড়ানুষ্ঠান পরিচালনা করতে গিয়ে ক্লান্তি আসা স্বাভাবিক, এখন মধ্যাহ্ন অপগত, অবেলায় আহারের পর বিশ্রাম একান্ত প্রয়োজন। বিশ্রামের যাতে অসুবিধা না-হয় সেজন্যেই বড় তালপাখা নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করেছিল অরুন্ধতী, ইচ্ছা ছিল চুপিচুপি শিয়রে দাঁড়িয়ে বাতাস করবে। কিন্তু তা হল না। তার প্রবেশ দেখে ফেলেছেন সূর্যকান্ত এবং আদেশ করেছেন আঁকা ছবিগুলি এনে দেখাতে। হাতে কারুকাজ-করা তালপাখা, অরুন্ধতী লজ্জায় আড়ষ্ট। ধরা পড়ে যাবে ভাবে নি প্রথমটা, পাখা সম্বন্ধে কোনো কথাই বলেন নি সূর্যকান্ত, তবু মনে হচ্ছিল অন্তরের নিভৃত বাসনা যেন ধরা পড়ে গেছে তাঁর কাছে, দৃষ্টির মধ্যে রসাভাস অথচ কণ্ঠস্বরে কৌতুকহীনতা, স্বভাবের এই চাতুরী না-বোঝার মতো অল্পবুদ্ধি নয় তার। লজ্জা ও সংকোচ এসেছে আপনা থেকে, মুখ লাল, পদক্ষেপে অসারতা। দাঁড়িয়ে পড়েছে কক্ষে ঢুকেই।

গৃহকর্ম প্রায় কিছুই থাকে না, মা আছেন, পরিচারক-পারিচারিকা যথেষ্ট, অবকাশ আছে বলেই উনি একটি বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন···নিজে সুকুমার কলার চর্চা করেন, হাতের অস্ত্র যেমন স্বচ্ছন্দে চলে, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না

কখনও, তেমনি তুলির টানে সহজেই ফুটিয়ে তুলতে পারেন এক-একখানি ছবি—তাতে সজীবতা ও রঙের বাহার দেখবার মতো, যেন প্রাণবন্ত, বড় বড় চিত্রপটগুলি রক্ষিত আছে আলেখ্যাগারে, প্রকৃতির ছবিই বেশি, যশোরের বিভিন্ন শোভা, জলঙ্গী নদী, তার উভয়তীরে ও আকাশ এবং সুন্দরবনের নানান চিত্রাবলী—যখন যে-ভাব মনে উদয় হয়েছে রঙে ও রেখায় ধরে রেখেছেন চিত্রপটে। বসন্তবায় ও বিক্রমাদিত্যের ছবি এঁকেছেন সেইভাবে। এ-সব আগেকার কাজ। ইদানীং সময়ের স্বল্পতাহেতু রঙ-তুলির সঙ্গে সম্পর্ক নেই বলা চলে, পরিবর্তে সাধের রঙ-তুলি তুলে দিয়েছিলেন তারই হাতে, বলেছিলেন, 'তুমি চর্চা কোরো। আঁকতে পারলে মন ভরে যায় সৃষ্টির আনন্দে। তোমার সময় আছে, যখন অন্য-কিছু ভালো লাগবে না, আঁকার মধ্যে মন বসালে কোথা দিয়ে সময় কেটে যাবে টের পাবে না…' ভারি সুন্দর লেগেছিল তাঁর হাত থেকে রঙ-তুলি নিতে, যেন একটা দান, ভালোবাসার উপহার। চিত্র-রচনায় ওঁর ভালোবাসা তো ছিলই, সেটি সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন তার মধ্যে। এ দান গ্রহণ না-করে কী উপায় ছিল? যদিচ প্রথমদিকে সংকোচ ও দ্বিধা দেখা দিয়েছিল চিত্র-রচনার ক্ষেত্রে, উনি কিন্তু নিরুৎসাহ করেন নি কোনোদিনই, প্রতিবার বলেছেন, 'বাঃ বেশ হচ্ছে 'আঁকো আরো আঁকো, আমার মায়ের মুখটি ভারি সুন্দর ফুটিয়েছো তোমার তুলিতে…এমনি করেই হবে, বেশি করে মানুষের ছবি আঁকো, তোমার রঙ ও রেখার কাজ ওই ধরনের আঁকার পক্ষে উপযুক্ত…' ছবি এঁকে গেছে। তারপর থেকেই অংকন অব্যাহত। নিভৃত অবকাশের সাধনা। অনেক ছবি এঁকেছে।

'দাঁড়িয়ে রইলে কেন? যাও নিয়ে এসো—'

তালপাখা সঙ্গে নিয়েই বেরিয়ে যেতে হল, ওটা কোনো কাজে লাগল না। কিংবা কে জানে উনি হয়তো পছন্দ করেন নি তার আগমন। অভিমানে জল আসছিল চোখে, নানা ভাবের অভিঘাতে দুলছিল মন, নিজের উপরে ধিক্কার জাগছিল, কেন সে আসতে গেল এ কক্ষে? পাশেই আলেখ্যাগার,

অন্যমনস্কভাবে তুলে নিল ছুখানি চিত্রপট, শেষ হয়েছে কিছুকাল আগে। ছবি ছুটি হাতে তুলে নেবার সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত চিন্তাধারায় মনে প্রসন্নতা জাগল। অভিমানের বদলে সামান্য পরিমাণে আনন্দের ঝিলিক ফুটল। ভাবতে ভালো লাগল যে উনি তার সম্বন্ধে একেবারে উদাসী নন, ব্যজন-পরিচর্যা গ্রহণ না করলেও তার অপর একটি বিশেষ গুণের কথা স্মরণ রেখেছেন এবং সে-বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এতদ্দারাই তো বোঝা যাচ্ছে উনি তার সম্বন্ধে চিন্তা করেন এবং শোভনভাবে কাছে টেনে নিতে পারেন। এই চিন্তা যদি আগে আমার মাথায় আসত তাহলে তালপাখা না-নিয়ে চিত্রপট দেখাবার ইচ্ছায় সহজে কক্ষে প্রবেশ করতে পারত তাহলে এমন অপ্রস্তুত হতে হত না!—নিজে নিজেই লজ্জিত সে। তার ঘটে যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকে!

প্রথম ছবিটি যুবরাজ প্রতাপাদিত্যের—চমৎকার ফুটেছে চরিত্রের বীরত্ব-ব্যঞ্জক ভাবটি। সতেজ, সজীব। চোখের দৃষ্টির মধ্যে যেন একটা ভাব-গম্ভীর তন্ময়তা। প্রশান্ত ললাট, তীক্ষ্ণ নাসা, চোয়ালের রেখায় দৃঢ়তা—সমগ্র মুখমণ্ডলে অনিন্দ্য পুরুষকার প্রস্ফুটিত। যুবরাজের চরিত্র অনুশীলন না-করলে ঠিক এমনটি হয় না। বোঝা যায় চিত্রটি অংকনের পূর্বে রীতিমত ধ্যান করেছে শিল্পী, রঙ ও তুলি ব্যবহারের প্রতি ক্ষেত্রে চিন্তা করেছে, মিলিয়ে নিয়েছে ধ্যানমূর্তির সঙ্গে। যুবরাজের প্রতিমূর্তি নয় যেন যুবরাজ স্বয়ং উপস্থিত চিত্রপটে।

'চমৎকার হয়েছে। যুবরাজ খুব খুশি হবেন দেখলে…'

দ্বিতীয় ছবিটি দেখে চোখ ফেরাতে পারলেন না সূর্যকান্ত। সেটি আরও সুন্দর আরও সজীব। লাবণ্যমণ্ডিত মুখখানি দেখে মনে হয় বালিকা, বয়স অল্প, আবক্ষ প্রতিমূর্তি। টানা টানা চোখ, বাঁকানো ভুরু, ছোট কপাল—সিঁথি-বিভক্ত কালো চুলে মুখখানি অন্ধকারের পটভূমিকায় আলোর মতো, কোমল, স্নিগ্ধ। যেন একটা বিচ্ছুরিত দীপ্তশ্রী, দেবী-প্রতিমার মতো অঙ্গ-লীন, মাথায় মুকুট পরিয়ে দিলে দেবী-প্রতিমাই হয়ে যায় বুঝি!…ইনি

কবিশচন্দ্র জীতমিত্র নাগ কন্যা শরৎসুন্দরী। নিখুঁত পর্যবেক্ষণ ও পরিপূর্ণ কল্পনাশক্তি না-থাকলে এত সুন্দর হত না ছবি দুটি। বহুদিন পরে চিত্র-রচনাকার্য দেখলেন বটে, এতখানি উন্নতি আশা করেন নি, শুধু মৌলিক প্রশংসা নয় আন্তরিক অভিনন্দন জানাতে ইচ্ছা হয়, প্রভূত উন্নতি হয়েছে। যুবরাজ অথবা নাগ কন্যা কেহই নিশ্চয় উপস্থিত থাকেন নি চিত্র-রচনার সময়, দেখে দেখে অংকনকার্য সম্পাদন করলেও না-হয় বোঝা যেত যথাযথ পন্থা অবলম্বন করেই চিত্ররচনাকার্য শেষ হয়েছে, তা নয়, সম্পূর্ণ স্মৃতি থেকে উদ্ধার করে এই দুরূহ কর্ম সুসম্পাদিত করেছে অরুন্ধতী। প্রশংসা নিশ্চয় প্রাপ্য। অনুশীলন করলে আরও ভালো হবে হাত। খ্যাতি ছড়াবে।

একেবারেই অ-দেখা নন কেউ। যুবরাজ তো ঘন ঘনই আসেন এ বাড়িতে, প্রায় প্রতিদিন, প্রকৃতপক্ষে অদর্শন বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারেন না যুবরাজ, রাজবাড়িতে পৌঁছুতে দেরি হলে কিংবা হঠাৎ কোনো খেয়াল চাপলে তিনি সোজা চলে আসেন এখানে, গল্প হয়, তারপর মায়ের হাতের কিছু খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করে বেরিয়ে পড়েন উদ্দিষ্ট স্থানে। শংকরদা এসে যান কখনও; কোনোদিন-বা শংকরদার বাড়ি চড়াও করা হয়, তিনজনে এক হয়ে যান। যুবরাজ অত্যন্ত সহৃদয়, তাঁর সহচর-প্রীতি অসাধারণ। তাঁদের তিনজনের মধ্যে আশ্চর্য একটা ঐক্যভাব আছে, পারস্পারিক আকর্ষণ অচ্ছেদ্য।…হয়তো তখন দেখেছে অরুন্ধতী, সাধারণের দৃষ্টির বাইরে আরও যে একটা দেখা আছে, শিল্পীর দেখা, মর্মে গেঁথে-রাখা অতি সূক্ষ্ম দর্শন, সেইভাবে দেখার ফলেই ছবিতে যুবরাজ এত প্রাণবন্ত, সজীবতার নজীর।

নাগ কন্যার ক্ষেত্রেও তাই। সামাজিক সম্পর্কের দূরত্ব থাকলেও, বয়সের স্বভাবের নৈকট্যহেতু দুজনের মধ্যে সখি-সখি ভাব। পিতা কাব্যরসিক ব্যক্তি, দেব ও ব্রাহ্মণে ভক্তি অগাধ, মহারাজা বিক্রমাদিত্য ও ছোটরাজা বসন্তরায়ের সঙ্গে ধর্মগত দিকে এক, পরম বৈষ্ণব, জীতমিত্র নাগ মশায়

আহ্বানের অপেক্ষা না-করেই রাজসভায় এসে পদকবি গোবিন্দদাসের গান শুনে যান প্রায়ই, নিজে সুগায়ক, নদীর ওপারে বাসস্থান। তাঁর স্বভাবের নম্রতায় মুগ্ধ হতে হয়। কন্যাটিও তেমনি। রূপসী ও গুণবতী. অতিথিপরায়ণা। ঘটনাচক্রে একদিন আলাপ অরুন্ধতীর সঙ্গে, কবিশ্চন্দ্রের সঙ্গে নব্য-নগর যশোর বেড়াতে এসেছিলেন কৌতূহলবশে, ফেরার পথে মায়ের সঙ্গে দেখা নদীর ঘাটে, মা গিয়েছিলেন কি-একটা পূজা উপলক্ষে নদীর জলে দেব-নৈবেদ্য বিসর্জন দিতে, কবিশ্চন্দ্র প্রণাম জানিয়েছিলেন, উভয়ের পর্বপরিচয় ছিল। মা আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন বাড়িতে, অরুন্ধতীর সঙ্গে নাগ কন্যার আলাপ হয় তখন। ক্রমে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। সখিত্ব অর্জন। অরুন্ধতীই বেশি যায় নদী পেরিয়ে নাগালয়ে, শরৎসুন্দরী এসেছেন খুব কম।...এই দেখা-সাক্ষাতের ফলশ্রুতি ওই ছবি, সখির দেহ ও অন্তর-সৌন্দর্যের নিখুঁত প্রতিফলন। রেখা-মাধুর্যে ও রূপ-সৌন্দর্যে মুগ্ধ হতে হয়।

'মা বলছিলেন তুমি নাকি আর-একটি নতুন ছবিতে হাত দিয়েছো, সেটা কই?'

অরুন্ধতী বললে, 'সে ছবি এখনও শেষ হয় নি—'

'তুমি এত ভালো ছবি আঁকো দেখে সত্যি অবাক হয়ে গিযেছি। আচ্ছা আনো তো, নতুন ছবিটা কেমন হচ্ছে দেখি—'

অরুন্ধতী দাঁড়িয়ে রইল তবু।

'অনেকদিন পরে দেখছি তোমার আঁকা ছবি। অপূর্ব হয়েছে। তৃতীয় ছবিটা আনো, সেটা নিশ্চয় আরও ভালো হচ্ছে—'

অরুন্ধতী তবু দাঁড়িয়ে। আঙুলে শাড়ির আঁচল জড়াতে লাগল। মুখ নিচু।

'আচ্ছা চলো, আমি দেখছি—'

বলে আলেখ্যাগারের দিকে চললেন সূর্যকান্ত। থামাতে পারলে ভালো হত। অস্থির লাগছিল মনটা। অথচ এই মুহূর্তে এমন কোনো কথা মনে পড়ল না যদ্দারা বাধা সৃষ্টি করে ওঁকে এ কক্ষে আবদ্ধ রাখা যায়। লজ্জা

লাগছিল খুব। তবু যেতে হল আলেখ্যাগারে, উনি নাম ধরে ডেকেছেন। যা ভাবা গিয়েছিল, তাই। উনি সেই অসমাপ্ত ছবিটি দেখছেন। নানা দিকে ঘুরিয়ে, কাছে-দূরে রেখে, মনোযোগ সহকারে নিরীক্ষণ করতে করতে উনি গম্ভীরস্বরে ফের ডাক দিলেন, 'অরু, এদিকে এসো—'

অরুন্ধতী কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

সূর্যকান্ত বললেন, 'আমি যতদূর অনুমান করতে পারছি ছবিটি আমার। নিতান্ত মন্দ হয় নি। উত্তরকালে হয়তো এ-রকম সুন্দরই হবে। কিন্তু ছবির বুকের কাছে এই স্থানটি খালি কেন?'

অরুন্ধতীর কণ্ঠস্বর অতি মৃদু: 'বলেছিলাম তো ওটা এখনও সম্পূর্ণ হয় নি —'

'আমি ভেবেছিলাম; সূর্যকান্তের কণ্ঠে পরিহাসের উচ্ছলতা: 'হয়তো রঙ খুঁজে পাও নি। খালি দেখাতে চেয়েছো ছবির বুকটা। অর্থাৎ—'

'আমি যাই।'

সূর্যকান্ত বললেন, 'তুমি কী বুকে লাগাবার রঙের সন্ধান পেয়েছো?'

'আমি জানি ওখানে কোন্ রঙ লাগাতে হবে—'

'জানো?'

অরুন্ধতী একটু জোরের সঙ্গে বলল, 'জানি—'

'কোন্ রঙ বলো তো?'

অরুন্ধতী বললে, 'এখন বলব কেন? আকা শেষ হলেই দেখতে পাবেন। ও মা, যুবরাজ আসছেন যে! দয়া করে ছবিগুলো রেখে দিন, যুবরাজ যেন না দেখেন। যাই, মাকে খবর দিই গে—'

জানালা দিয়ে দেখা গিয়েছিল বটে যুবরাজ অশ্বারোহণে চত্বরে প্রবেশ করেছেন, যেরকম চঞ্চল প্রকৃতি, মনে হয় এখনই এসে পড়তে পারে এ কক্ষে। অরুন্ধতী ব্যস্তপদে চলে গেল কী সেইজন্যে? মাকে ডেকে কিছু সময় নিচে আটকে রাখার মতলব? অরুন্ধতী প্রখর বুদ্ধিমতী, হয়তো তা করতে পারে। কিন্তু লজ্জার কী আছে? যুবরাজ যদি ছবিগুলি দেখতেই

চান সে তো গৌরব, তাঁর প্রশংসা পাওয়া কী কম কথা! এই ছবিটি বরং না দেখালেই হবে। এর রঙ এত উজ্জ্বল, রঙের এমন প্রাণময় স্পর্শ যে দেখামাত্র যে-কেউ মুগ্ধ হবে এবং যেহেতু যুবরাজের আসা-যাওয়া আছে এ-বাড়িতে, পারস্পারিক সম্পর্ক সম্বন্ধে একেবারে অচেতন নন—সরস মন্তব্য করা অসংগত নয়! অরুন্ধতীর পক্ষে তো বটেই, তাঁর নিজের পক্ষেও লজ্জার কারণ হয়ে উঠবে। এই চিত্র-রচনার মাধ্যমে অরুন্ধতীকে যতখানি বোঝা গেল, ওর নিভৃত মনে কোন্ আসন নিয়ে আছেন তিনি, তার রূপ কেমন, ইতিপূর্বে এত স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি কখনও। অরুন্ধতীর ধ্যানের মধ্যে তার আসন দেবতার মতো, এই পটে যে চিত্র আঁকা হয়েছে তাকে দেখতে সূর্যকান্তের মতো হলেও প্রকৃতপক্ষে সে একটি দেবমূর্তি, অকপটভাবে উজ্জ্বল, স্নিগ্ধ, মনোরম।

'কই হে, কোন্ ঘরে? সাড়া পাচ্ছি না কেন?'

না বাধা দিতে পারে নি অরুন্ধতী, কিংবা বাধা কাটিয়ে উপরে উঠে এসেছেন যুবরাজ। নিশ্চয় কোনো বুদ্ধি খেলছে মাথায়—দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রাম না নিয়ে সোজা চলে এসেছেন এখানে। অবারিত দ্বার। বহুবার এসেছেন এভাবে, কথা শেষ করে নিচে নেমে দেখা করেছেন মায়ের সঙ্গে, খাদ্য গ্রহণ করেছেন কখনও কখনও, 'আবার আসব' বলে চলে গেছেন। আশ্রিত অনুচর হিসাবে দেখেন নি—সর্বদা বন্ধুর মতো ব্যবহার। হৃদয়ের সেই বিশালতার পরিচয় না-পেলে অনুচর হিসাবে থাকা যেত না বেশিদিন, সম্মান রক্ষিত না-হলে উচ্চপদে লাভ কি, যুবরাজ প্রতাপাদিত্য প্রতিটি মানুষকে অকৃপণভাবে সম্মান দিতে জানেন। আজই তার নজির পাওয়া গেছে একটা। ছোটরাজার সঙ্গে তিনি অনায়াসে অবতীর্ণ হতে পারতেন অসিযুদ্ধে, কে হারতেন বলা শক্ত, তথাপি অস্ত্র উত্তোলন না-করে সেটি রেখে দিলেন গুরুর পায়ের কাছে—ধন্যধ্বনি দিয়েছে যশোরবাসী। মানীর সম্মান তিনি রাখতে জানেন। কিন্তু এই অসংগত অসিযুদ্ধের প্ররোচনা ও প্রস্তাব না-থাকলেই যেন শোভন হত। কে প্রস্তাব করেছেন? কার

প্ররোচনা ? আজ একটা অঘটন ঘটে যেতে পারত···

'কি হে, দাঁড়িয়ে কেন চুপচাপ ? হাতে ছবিগুলো কার ? দেখি—'

যুবরাজ প্রবেশ করেছেন কক্ষে। চোখে পড়েছে ছবিগুলি। তৃতীয় ছবিটি সরিয়ে রেখেছিলেন সূর্যকান্ত, বাড়িয়ে দিলেন প্রথম ছবিখানি, যেটি প্রতাপের প্রতিমূর্তি। 'বাঃ—' উচ্ছ্বসিত হলেন তিনিঃ 'তোমার আঁকা?'

'না—'

'তবে ?'

'অরুন্ধতী—'

'চমৎকার এঁকেছে। ভারি সুন্দর হয়েছে। এটি আমি নিয়ে যাব।'

'স্বচ্ছন্দে। ওর চেয়ে ভালো হয়েছে দ্বিতীয় ছবিটি। হয়তো আপনার আরও পছন্দ হবে—'

'কই ? দেখি। কার ছবি ?'

'এই যে—'

ছবিটি হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রক্তাভা জমল যুবরাজের সুশ্রী মুখে, লক্ষ্য করে মৃদু হাসলেন সূর্যকান্ত। চঞ্চলতা ধরা পড়ছিল, কেবলই চোখ সরিয়ে নেবার চেষ্টা, অথচ বারে বারেই দৃষ্টি গিয়ে পড়ছে ছবির উপর। আকস্মিক আবেগে অ[illegible]র, উচ্ছ্বাস প্রকাশে কোথায় যেন বাধা, চুপ করে থাকা আরও কঠিন। শিকারে ও রণক্ষেত্রে যাঁর প্রচণ্ড দাপট, ভীষণাকৃতি গণ্ডার বা বন্যজন্তুর আক্রমণে যিনি কণামাত্র বিচলিত নন, উড়ন্ত পক্ষীকে তীরবিদ্ধ করা কিংবা দুর্ধর্ষ প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে অসিযুদ্ধে দৃঢ়ভাবে মুখোমুখি হতে যাঁর কখনও ভুল হয় না—তিনি, হৃদয়বৃত্তির কী আশ্চর্য প্রকাশ, পটে আঁকা এক মানবীর চিত্র দেখে তিনি এমনই বিভ্রান্ত যে তাঁর ক্ষণপূর্বের স্বাভাবিক আচরণ পর্যন্ত বিস্মৃত, বিপর্যস্ত চিন্তাধারা, বাক-সংযমের প্রাণপণ চেষ্টা—পাছে অসংগত কথা বেরিয়ে আসে, ধরা পড়ে যেতে হয়। উপভোগ্য পরিস্থিতি। অন্তত যুবরাজের হৃদয়ের এই প্রকাশ মাধুরীর দুর্লভ সাক্ষী হয়ে থাকাও কম কথা নয় !

না-পারছেন রেখে দিতে, না-পারছেন ধরে রাখতে। যুবরাজ ঘেমে গেছেন। একটা-কিছু করা বা বলার জন্যে ব্যাকুল। যেন বুঝতে পারেন নি এই রকম নিরীহকণ্ঠে সূর্যকান্ত নিবেদন করলেন, 'আপনার বোধহয় পছন্দ হয় নি। রেখে দিন ছবিটা—'

'এটি সত্যি ভালো হয়েছে। আমি ভাবছিলুম—'

'বলুন ?'

যুবরাজ বললেন, 'না থাক—'

'এ ছবিটাও কী নিয়ে যেতে চান আপনি ? অরুন্ধতী অরাজি হবে না, যদিও এ তার সখির ছবি, আপনি হয়তো দেখেছেন ইনি জীতমিত্র নাগ মশায়ের কন্যা শরৎসুন্দরী—'

যুবরাজ বললেন, 'কান্ত, আমি এজন্যেই তোমার কাছে এসেছিলাম। ভণিতার প্রয়োজন নেই, আমি জানি যে তুমি সব জানো। তোমাকে একটা ব্যবস্থা করে দিতে হবে। অরুন্ধতী ওর সখি, অসুবিধা হবে না। অনেক-দিন দেখি নি আমার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করিয়ে দাও। আমি হঠাৎ ওদের বাড়ি যেতে পারি না, নানান কথা উঠবে, রাজপ্রাসাদে ডেকে আনতেও পারি না, কে কী মনে করবে। সুপ্ত বাসনা আরও প্রবল হয়ে উঠেছে এই ছবি দেখে। ছবিটা নিয়ে যেতে পারলে খুশিই হতাম কিন্তু বাবার চক্ষু বড় তীক্ষ্ণ, কান সজাগ, আমার কোনো কাজেই তিনি প্রসন্ন নন, সর্বদা খুঁত ধরে বেড়ান…আমার নিজেরও ভালো লাগছে না পারিবারিক আবহাওয়া, একটা-কিছু করা দরকার, মাঝে মাঝে মনে হয় বিদ্রোহ করি, নিজের শক্তিতে দাঁড়াই, ঝিমিয়ে যাই পরক্ষণে, ভবিষ্যতের স্পষ্ট কোনো রূপ খুঁজে পাচ্ছি না…এই-সব আলোচনা করার জন্যে তোমার কাছে আসা, স্থির সিদ্ধান্ত নিতে হবে। বাবার সঙ্গে যত কম সাক্ষাৎ হয় ততই মঙ্গল, একেবারে সাক্ষাৎ না হলে আরও ভালো, কারণ যতখানি অবুঝ তিনি আমাকে ভাবেন প্রকৃতপক্ষে ঠিক তা আমি নই, আমার একটা বোধ-শক্তি আছে, বুঝি অনেক-কিছু। যেহেতু এখনও আমি তাঁর অধীনে আছি

এবং অন্নে প্রতিপালিত হচ্ছি সেইহেতু কোথায় একটা অধিকার বোধ আছে তাঁর, ইচ্ছা হলে ধমক দেন, কাজের কৈফিয়ত চান, সমালোচনা করেন। পিতার পক্ষে এগুলো যে খারাপ তা আমি বলি না, অবশ্যই প্রয়োজনে পুত্রকে শাসন করবেন তিনি, সব পিতা তা করে থাকেন—কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য তাঁর শাসনই শুধু আমি পেয়েছি, স্নেহ পাই নি কখনও। এখন বড় হচ্ছি, ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারছি পিতা-পুত্রের এই দূরত্ব অনতিক্রম্য, কোনোদিন কাছাকাছি যেতে পারব না দুজনে—আমার প্রতি তাঁর বিরাগ অত্যন্ত স্পষ্ট। নইলে সর্বসমক্ষে খুড়ো মশায়ের সঙ্গে অসিযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে বাধ্য করতেন না তিনি। তাঁর অভিসন্ধি যেন ধরতে পারছি আমি, বুঝতে পারছি আমার কী সর্বনাশ তিনি করতে চেয়েছিলেন। তাই যদি হয় তবে,···দূর কী-সব বাজে বকছি! কী বলছিলাম যেন···'

'ছবিটা না-নিয়ে যাবার কথা।'

যুবরাজ বললেন, 'আমার ছবিটা নিয়ে যাব। শরৎসুন্দরীর ছবি নিয়ে যাব না এইজন্যে যে ওটা বাবার চোখে পড়ুক কিংবা তাঁর কানে উঠুক এ আমি চাই না। তাতে ফল ভালো নাও হতে পারে। তুমি শুধু একবার শরৎসুন্দরীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটিয়ে দাও—'

'এমন-কিছু কঠিন কাজ নয়। অনায়াসেই তা পারা যায়। বলতে সংকোচ হয়, আপনি কী মনে করেন নাগ কন্যাকে জীবন-সঙ্গিনীরূপে পেলে সুখী হবেন? জিজ্ঞাসা করার কারণ এই যে আমরা তাহলে সেইমতো ভূমিকা গ্রহণ করব। আপনাদের উভয়ের বিবাহযোগ্য বয়স হয়েছে এবং আপনার যেরূপ আকাঙ্ক্ষা দেখছি আর অরুন্ধতীর নিকট থেকে নাগ কন্যার যেরূপ মনোবাসনা শুনেছি তাতে মনে হয় এ বিবাহ বিধি-নির্বন্ধ। সংগত হয় যদি শুভকাজ তাড়াতাড়ি সুসম্পন্ন করা যায়—'

'আমার আপত্তি নেই।' যুবরাজ বললেন, 'জীবনে পূর্ণতা আনার জন্যে বিবাহের প্রয়োজন আছে। তুমি জানো না বোধহয়, আগে আমার একটা বিবাহ হয়েছিল, তখন খুব অপরিণত, বিবাহের কিছুকাল পরে স্ত্রী মারা

যান। জীবনের স্বাদ বোঝার আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল সেই পালা, মাঝে মাঝে স্মৃতি আঘাত করে চিত্তে, কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যাই। বোঝা হালকা না-হলে পথ-চলে আনন্দ পাওয়া যায় না। আমি অনেকদূর যাব বলে ইচ্ছা করি, রাজার কুমার হয়েছি বলে নিষ্ক্রিয় সুখ ও শান্তি আমার কাম্য নয়, জীবনের জটগুলো খুলতে চাই, তারপর দাঁড়াব শক্ত পায়ে মাথা উঁচু করে···এসো অরুন্ধতী, কী খবর?'

'মা আপনাদের ডাকছেন নিচে—'

অরুন্ধতী বললে বিনীতভাবে।

'নিশ্চয় খাবার জন্যে ডেকেছেন। কিন্তু সরবত ছাড়া অন্য-কিছু খেতে পারব না, পেট ভর্তি। আচ্ছা যাও, আমরা এখনই যাচ্ছি—'

অরুন্ধতী চলে যাচ্ছিল, যুবরাজ ডাকলেন, 'শোনো। তোমার আঁকা ছবি দেখছিলাম···অপূর্ব। আমার সহচরটির তালিম ব্যর্থ হয় নি, তুমি তার যোগ্যা শিষ্যা হয়ে উঠেছো। অবশ্য আমি জানি না আরও কোনো কোনো বিষয়ে তালিম পাচ্ছ কিনা, পেলে ভালো, কেননা জীবনকে শিল্পমণ্ডিত করতে হলে নানা রঙের প্রয়োগ শিখে নিতে হয়, মেজাজ বুঝতে হয়, রুচি জানতে হয়। আশা করি সেদিকেও তোমার গুণপনার পরিচয় পাব। আপাততঃ আমি একটি ছবি নিয়ে যাচ্ছি, আমার ছবিটি, তোমার আপত্তি নেই নিশ্চয়?'

'আরও খুশি হব,' অরুন্ধতীর মুখ আরক্ত হয়ে উঠেছিল, সামলে নেবার জন্যে পালটা দিল, 'অনেকের মতে দ্বিতীয় ছবিটি শ্রেষ্ঠ, যদি ওটিকেও প্রথমটির মতো সম্মান দেন। আপনি চিত্র-রসিক, আমার শ্রেষ্ঠ দুটি ছবি সম্মানিত হচ্ছে জানলে উৎসাহ পাব—'

'নিতে হলে অনেক ছবি নিতে হয়,' বুঝতে পারলেন সম্ভ্রমসূচক দূরত্ব বজায় রেখে চপলা হয়ে উঠেছে অরুন্ধতী, তার লক্ষ্যস্থলও সখি-কেন্দ্রিক, যেহেতু উভয়ে সখি সেজন্যে পরস্পরে মনোভাব-বিনিময় অসংগত নয়, অতএব নাগ কন্যার মনোজগৎ তার নিকট উদ্ঘাটিত ধরে নিতেই হবে···এ পক্ষের

উত্তর ও পক্ষের কানে চলে যেতে পারে, প্রতাপাদিত্য সতর্ক হলেন:
'চিত্র-রসিক হিসাবে যদি স্বীকার করো তাহলে বলি, আমার বিচারে সর্বশ্রেষ্ঠ এই অসমাপ্ত তৃতীয় ছবিটি। জানি না কেন এত প্রাণ পেয়েছে ছবিটা, তুলির রঙ অপেক্ষা মনে হয় অংকনশিল্পীর হৃদয়ের রঙের স্পর্শ লেগেছে বেশি। এই ছবিটি যদি নিয়ে যাই তবে কোথাও কী কোনো ব্যথা বাজবে না? এ রকম হাসিমুখেই কী দিতে পারবে ছবিটা?'
সূর্যকান্ত ভেবেছিলেন আড়ালে রাখতে পেরেছেন, লজ্জিত হলেন এখন। বুঝতে পারলেন যুবরাজের দৃষ্টির আড়ালে রাখা যায় না কোনো জিনিস। কিন্তু উত্তর-প্রত্যুত্তর এমন জমে উঠেছে যে সহসা তিনি রসভঙ্গ করতে চাইলেন না। চতুর যুবরাজ এবারে মোক্ষম চাপ সৃষ্টি করেছেন। লাজুক অরুন্ধতী কোণঠাসা।
না ঠিক তা নয়। অরুন্ধতী মুখরা হতে জানে, মাত্রা বজায় রেখে। শালীন কথাবার্তায় সে অভ্যস্ত।
'স্বচ্ছন্দে। সব ছবি নিয়ে যেতে পারেন আপনি। এমন-কি তৃতীয় ছবিটিও। আপনি তো বললেন হৃদয়ের রঙের স্পর্শ লেগেছে বেশি, যদি তাই হয়, হৃদয়ের মধ্যেই থেকে যাবে ছবিটির বিষয়বস্তু, আবার আঁকা যাবে। তখন আরও বেশি রঙ ধরবে না তাই-বা কে বলতে পারে—'
যুবরাজ চুপ। কৌতুকের চোখে তাকালেন সূর্যকান্তের পানে। সূর্যকান্তের মুখ টকটকে লাল।
কী সাংঘাতিক মেয়ে!

নিজের ছবিটা সঙ্গে নিয়ে এলেও, অপর ছবিটি যেন সব সময় ভাসে চোখের সামনে। বড় সুন্দর এঁকেছে অরুন্ধতী—রঙে-রেখায় উজ্জ্বল। বিশেষত চোখ দুটি এমন প্রাণবন্ত যেন মনে হয় কথা বলবে এখনই—শিহরণ খেলে যায় শরীরে, আবিষ্ট হতে হয় কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে,

ভোলা যায় না। এখন ওই চোখের দৃষ্টি যেন অনুসরণ করছে সকল কাজে, মুখখানি ভেসে উঠছে ক্ষণে ক্ষণে।…ছোট-মার ব্রতোদ্‌যাপন উপলক্ষে গত বছর কি তারও আগে রাজবাড়িতে এসেছিল একবার, অনেকেই নিমন্ত্রিত ছিলেন, বহু মহিলার সমাবেশ ঘটেছিল, সবচেয়ে বেশি নজরে পড়েছিল ওই মেয়েটি, শরৎসুন্দরী যার নাম। শরৎকালের মতো স্নিগ্ধ ও মনোরম, মুখখানি যেন হালকা মেঘের ভেলা, ক্রমাগত ভাবরাশির উদয় ও বিলয় —সকলের থেকে বিশিষ্ট মনে হয়েছিল। সেই একবার মাত্র চোখের দেখা ভোলা গেল না কিছুতেই। অধিকন্তু অরুন্ধতীর আঁকা ছবি আকর্ষণ তীব্রতর করে তুলেছে, শিরায়, রক্তের মধ্যে চেতনা অসাড় করা আবেগ উপস্থিত হচ্ছে…ঘোরের মতো, জ্বরো জ্বরো ভাব, অন্তস্থলের উত্তাপ দেহসঞ্চারী হয়ে বিকল করে তুলছে শরীর। চক্ষুলজ্জা ত্যাগ করে ছবিখানি সঙ্গে আনলেই ভালো হত, অন্তত চোখের সামনে দেখা যেত তার কমনীয় শরীর নমনীয় ভঙ্গি। অবোধ্য এবং অদ্ভুত এই আবেগ ভাসিয়ে নিতে চায় হৃদয়ের একূল ওকূল, বড় অসহায় লাগে এখন সেই দশা, অবাক হতে হয় নিজের আচরণেই।

পা পা করে চলে এসেছিলেন নদীর তীরে, কেন এলেন ভেবে বিস্মিত, কিন্তু পরপারের সুউচ্চ নাগ-বাড়ির পানে তাকাতে ভালো লাগল এবং তাকিয়েই রইলেন। নেশা কিংবা ঘোর, কিছু একটা ভর করছে, অনাস্বাদিত এবং অভূতপূর্ব অনুভূতির তাড়নায় আকাশ, নদী, পরপারের সবুজ প্রকৃতির আকর্ষণ তুচ্ছ করে তিনি যেন স্থির লক্ষ্য, উড়ন্ত পক্ষী তীরবিদ্ধ করার মতো একাগ্রচিত্ত। কথা বন্ধ, এতখানি পথ এসেছেন সম্পূর্ণ নীরবে, সাধারণত বিবিধ আলোচনা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ছবিগুলি স্পষ্ট হয় অনুচরদের কেউ সঙ্গে থাকলে, এখন সূর্যকান্ত তাঁর সঙ্গী, কোনো কথাই হয় নি তার সঙ্গে, সচরাচর এমন ঘটে না। বিস্ময় বোধ করছিলেন সূর্যকান্ত নিজেও। মূল রহস্য, অনুধাবন করা কঠিন হচ্ছিল বলে তিনি বিব্রত হয়ে উঠছিলেন আরও, কিভাবে আলোচনার সূত্রপাত করা যায়

ভাবতে ভাবতে দেখতে পেলেন অন্যতম দোসর শংকর আসছেন ঘোড়ায় চড়ে। বললেন, 'যুবরাজ, শংকরদা আসছেন—'

'কই ?'

যেন ছেদ ঘটল চিন্তায়। চকিত হলেন। শংকর কাছে এসে গেলেন। অভিবাদন করে দাঁড়ালেন।

'এই-যে শংকর ! তোমাকেই খুঁজছিলাম—'

শংকর বললেন, 'আদেশ করুন।'

'আদেশ নয় বন্ধু, পরামর্শ চাই। আমাদের মধ্যে তুমি ধীর স্থির ও প্রাজ্ঞ। শোনো—'

এই দুই বন্ধুর কাছে তিনি অকপট, নানা পরামর্শ করতেন, সমস্যার সমাধান খুঁজতেন। প্রায় ক্ষেত্রেই সঠিক পন্থা খুঁজে পেয়েছেন। অতএব পূর্বতন ঘটনা বিবৃত করে মনের সংশয় ও সংকট থেকে মুক্ত হতে চাইলেন। বললেন, প্রথমত শরৎসুন্দরী আমার প্রতি অনুরক্ত কিনা জানতে পারছি না, সেটা কী উপায়ে জানা যায়। দ্বিতীয়ত আমার যা মানসিক অবস্থা তাতে হঠাৎ একটা বিপর্যয় ঘটতে পারে, আর-কিছু না-হোক গুরুতর অসুস্থ হতে পারি, এখনই তার লক্ষণ প্রকট—'

শংকর চিন্তা করলেন ক'মুহূর্ত।

বললেন, 'আপনারা গল্প করুন এখানে, আমি আসছি—'

বলে হাঁক পাড়লেন, 'সদয়, ও সদয়—'

সদয় এক মাঝির নাম। ঘাটে তার নৌকা বাঁধা।

'সদয়কে কেন ? কোথা যাবে—'

শংকর বললেন, 'আমি না ফেরা পর্যন্ত আপনারা অপেক্ষা করুন, এখনই ফিরব। সব উত্তর পাবেন তখন।'

'তুমি কী নাগবাড়িতে যাচ্ছ ?'

শংকর বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ—'

'কিন্তু—'

শংকর হাসলেন ঃ 'কিছু ভাববেন না। আমার পরিচয় কেউ জানতে পারবে না অথচ আপনার প্রয়োজনীয় তথ্যটুকু সংগ্রহ করে আনব ঠিক।'

'পারবে ?'

'সেইজন্যেই তো যাচ্ছি—'

নৌকায় উঠে বসলেন। বললেন, 'সদয়, পাল তুলে দে। তাড়াতাড়ি চল্—'

নৌকায় যেতে যেতেই বুদ্ধি এসে গিয়েছিল মাথায়। নেমে, কাজে লাগালেন সেটা। নদীতীর থেকে কাছেই নাগালয়, খ্যাতিমান ও শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি নাগমশায়, সজ্জন ও অতিথিপরায়ণ। অন্দরমহলে প্রবেশের ওই পথটাই সুগম মনে হল,—অতিথিরূপে গমন। ভেবে মনস্থির করে ফেললেন শংকর এবং সোজা চলে এলেন উদ্দিষ্ট গৃহে। অনেকবার এসেছেন এ পথে, চেনা ছিল নাগমশায়ের বাড়ি। এ অঞ্চলে ওই একটা প্রাসাদতুল্য মনোরম গৃহ, পিছনে আমবাগান, সম্মুখে প্রধান তোরণ।

জিজ্ঞাসাবাদে সন্তুষ্ট হয়ে দ্বারপাল তাঁকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দিল। অন্য ভৃত্য এসে সদর বৈঠকে নিয়ে গেল এবং সেখানে বসাল। ভৃত্যটি জিজ্ঞাসা করল, 'এত বেলা অবধি ঠাকুর অভুক্ত আছেন বোধ হয় ? আমি এখনই ব্যবস্থা করছি—'

শংকর অতোধিক বিনয়ে জবাব দিলেন, 'গৃহস্বামীর অসাক্ষাতে আতিথ্য গ্রহণে আমার বাধা আছে।'

'আচ্ছা আমি খবর দিচ্ছি—'

আলাপ নেই জীতমিত্র নাগমশায়ের সঙ্গে, সাক্ষাৎ হয় নি কখনও, চেনা সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে। নিশ্চিন্তে বসেছিলেন শংকর। অল্প পরে চটির শব্দ তুলে দেখা দিলেন গৃহস্বামী। শংকর দেখলেন অতিশান্ত, সৌম্য একটি মূর্তি, দৃষ্টি করুণামাখা, কণ্ঠে তুলসীর মালা। অধিকন্তু নজরে পড়ল কপালে

তিলক, পরিধানে মিহি সাদা ধুতি। গায়ে হাত-কাটা মেরজাই এবং পায়ে জগন্নাথের চটি। বুক ঢিব ঢিব করছিল, চেহারা ও পোশাক দেখে আশ্বস্ত হলেন তিনি।

অতোধিক মিষ্ট অভ্যর্থনা ঃ 'শুনলাম আপনি ব্রাহ্মণ, আমার গৃহাশ্রম ধন্য হল। প্রণাম গ্রহণ করুন—'

শংকর যথারীতি আশীর্বাদ করলেন।

'মহাশয়ের নিবাস ?'

'বারাসাত—'

'নাম ?'

'শংকর চক্রবর্তী—'

'এ অঞ্চলে আগমনের হেতু ?'

'নব্য-নগর যশোহরের খুব সুখ্যাতি। দেশ-দেশান্তর থেকে লোকেরা আসছে যশোহরে বসবাসের জন্যে। বারাসাত সুরক্ষিত নয়, আমিও সপরিবারে উঠে আসতে চাই। তৎপূর্বে দেখে যেতে এসেছি যে—'

'যশোহর অতি উত্তম স্থান। আপনি স্বচ্ছন্দে আসতে পারেন। বিশেষত রাজা বিক্রমাদিত্য ও তদভ্রাতা বসন্তরায়ের সুশাসনের তুলনা নেই··· অতি সজ্জন।'

'যুবরাজ প্রতাপাদিত্য ?'

'তাঁর বয়স অল্প, যেমন সুদর্শন তেমনি সাহসী। যশোহর-সিংহাসনের উপযুক্ত বটে—'

'আপনার সঙ্গে পরিচয় নেই বুঝি ?'

'সামান্য।···দাঁড়ান, আপনার আহারের ব্যবস্থা করতে বলি। চণ্ডীশরণ—'

ভৃত্য চণ্ডীশরণ এসে দাঁড়াল।

শংকর বললেন, 'এ সময়ে আমি ফলমূল আহার করে থাকি। যদি অসুবিধা না হয়—'

'সে ব্যবস্থাও আছে। চণ্ডীশরণ, দিদিকে বল অতিথির জলযোগের ব্যবস্থা

করে দিতে। শরৎকেও উপস্থিত থাকতে বলবি।'

'আপনি ব্যস্ত হবেন না—'

জীতমিত্র বললেন, 'আপনি অভুক্ত আছেন অনেকক্ষণ। বেলা অবসান প্রায়। আপ্যায়নে ত্রুটি হলে ক্ষমা করবেন।'

ভৃত্য সংবাদ দিল, জলযোগ প্রস্তুত।

জীতমিত্র বললেন, 'চলুন তাহলে—'

তিনি অগ্রবর্তী হলেন, শংকর পিছনে। বক্ষস্পন্দন আগেব মতোই দ্রুত, এখন যেন আরও বেশি। দপদপ করছে বুকেব ভিতবে। প্রথম পবীক্ষায় উত্তীর্ণ হযেছেন। অভিনযে ত্রুটি হয় নি কোথাও, যদিও মিথ্যাভাষণ যতদূর সম্ভব এড়িযে গেছেন। বাবাসাত থেকে আগমন যথার্থই এবং নামও বলছেন সঠিক, উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য ছলনাব আশ্রয যেটুকু নিয়েছেন তা নিতান্ত বাধ্য হযেই। এখন অন্দর মহলেব দিকে যেতে যেতে ভাবছিলেন বাকিটুকু এইভাবে সিদ্ধ হলে তিনি হাসতে হাসতে ফিরতে পারেন। জীত-মিত্র উদার ব্যক্তি, অকপট, মালিন্যের লেশমাত্র নেই চবিত্রে, ক্ষণ-আলাপেই তিনি এতদূর প্রকাশিত যে উচ্চ প্রশংসা তাঁর প্রাপ্য। মনুষ্য চবিত্রে সম্যক জ্ঞান না থাকলেও এক্ষেত্রে ভুল হবে না বলেই বিশ্বাস। কিন্তু কন্যা? জীতমিত্র মহাশয়ের কন্যা যদি এমন না হন? মেযেবা সাধাবণত মনের দিক থেকে রক্ষণশীল, ওদের মনোভাব বোঝা অতীব কঠিন, দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যঃ—শাস্ত্রের বচন। তদুপরি কুমারী কন্যাব মন ·

শোভন প্রকোষ্ঠ একটি। মেঝের একদিকে আসন ও আহ্নিকের সরঞ্জাম, অন্যদিকে শ্বেতপাথরের পাত্রে নানাবিধ মিষ্টান্ন ও ফলাদি পৃথকরূপে যত্নে সজ্জিত। সাজানো দেখে মনে হয় ভৃত্যের হস্ত অপেক্ষা কোমল করপল্লবেব স্পর্শই অধিক। দেখা গেল, অনুমান মিথ্যা নয। আসনে বসে সন্ধ্যাহ্নিক সেরে ওঠবার সময় দেখতে পেলেন দ্বারপার্শ্বে তালবৃন্ত হস্তে কে যেন অপেক্ষা করছেন। বৃন্তাগ্র ও বসনাঞ্চল দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। কে হতে পারেন? নাগমশায়ের দিদি অথবা কন্যা? উভয়েরই নাম শোনা গেছে

ইতিপূর্বে, পত্নীর নামোল্লেখ করেন নি কোনোবার, শংকর বিদিত যে নাগ-মহাশয় মৃতদার···সম্ভবত ওই দিদি এখন গৃহকর্ত্রী। কিন্তু দ্বার-অন্তরালে কেন ?

'নাগমশায়, আপনার সংসারে কে কে আছেন ?'

সন্ধ্যাহ্নিক সেরে অপর আসনে বসেছেন শংকর, ফলাহারে ব্যস্ত। ডানহাতে ফল গ্রহণ করছিলেন এবং বাম হাতে মাছি তাড়াচ্ছিলেন, যদিচ মাছির উৎপাত নেই বিশেষ।

'মা জননী, ওখানে দাঁড়িয়ে কেন ? অতিথির ভোজ্যপাত্রের উপর বাতাস দাও, মাছি বসছে—'

দ্বার-অন্তরালের আভাস স্পষ্ট হল। চোখ তুলেছিলেন, নত করে নিলেন। যথার্থ ছবি একখানি। মনে পড়ল অরুন্ধতীর আঁকা এরকম একটি ছবি সূর্য-কান্ত কবে যেন দেখিয়েছিল, এখন জীবন্তরূপে আগমন। আবির্ভাব বলা যায়। কক্ষ যেন ভরে গেল রূপের আলোয়।

'এটি ?'

জীতমিত্র বললেন, 'আমার একমাত্র কন্যা। মাতৃহীনা। সংসারে আমরা এই দুজন, আর আছেন আমার জ্যেষ্ঠ ভগিনী—এ সময় তিনি জপে বসেন। মা, ঠাকুরকে প্রণাম করো—'

শংকরের আহার সমাধা হয়েছিল, তিনি উঠে দাঁড়িয়েছিলেন।

'থাক্ থাক্—আমি আশীর্বাদ করছি রাজরাজেশ্বরী হও। নাগমশায় আপনার কন্যা অতি সুলক্ষণা—'

জীতমিত্র বললেন, 'আপনি কী গণনা জানেন ?'

'গণনার প্রয়োজন নেই। আমি দিব্যচক্ষে কতকগুলি সুলক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। আপনি আপনার কন্যার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। খুব উচ্চকুলে বিবাহ হবে—'

শরৎসুন্দরীর মুখ লাল হয়ে উঠছিল, সে মুখশুদ্ধি আনার ছলে কক্ষান্তরে চলে গেল।

'নিজের কন্যা বলে গর্ব করছিনে, শরৎ সত্যি লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে। কতকটা স্নেহবশে কতকটা অন্তর হবার ভয়ে এবং কতকটা সুপাত্রের অভাবে ক্রিয়াকর্মে অগ্রসর হই নি। কন্যার বয়স বৃদ্ধি পাচ্ছে, বেশিদিন অনূঢ়া অবস্থায় পিতৃগৃহে রাখলে পিতার অপরাধ হয়। রাজরাজেশ্বর পাত্রের সন্ধান আমি রাখি নি, সে ক্ষমতা আমার নেই, আপনার জানা কোনো সুপাত্র থাকলে তার সন্ধান যদি দেন তাহলে বাধিত হব।'

শংকর বললেন, 'আমি থাকি দূরাঞ্চলে, সেখানে সুপাত্র থাকলেও আপনাকে অতদূরে যাবার পরামর্শ দিতে পারি নে। যশোহর সমৃদ্ধ নগর এবং এখানে সুপাত্রের অভাব হবে না বলে আমার বিশ্বাস। ব্যস্ত হবেন না। আপনার কন্যার পাত্রের সন্ধান এই যশোহরেই করুন, ঠিকমতো যোগাযোগ সাধিত হলে এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা থাকলে রাজরাজেশ্বর পাত্র পেতেও পারেন··· বিশেষত যে সুলক্ষণ আমি দেখেছি—'

পাত্রে মুখশুদ্ধি নিয়ে প্রবেশ করল শরৎসুন্দরী। মুখ নিচু ও লাল। শংকর বুঝতে পারলেন, আড়ালে ওঁদের কথাবার্তা শুনেছে শরৎসুন্দরী, বুদ্ধিমতী। রূপ যে আছে তা তো প্রত্যক্ষ দেখা যাচ্ছে, শান্ত স্বভাব, নম্র, ধীর। গুণের পরিচয় এখনই না পাওয়া গেলেও পরে পাওয়া যাবে নিশ্চয়, এমন কন্যা গুণবতী না-হয়ে পারে না। সুলক্ষণগুলি হুবহু মিলে যাচ্ছে।

যুবরাজের উপযুক্ত কন্যা বটে।

'আপনি বিশ্রাম করুন, কাল প্রত্যুষে সাক্ষাৎ হবে—'

শংকর বললেন, 'আপনি অনুমতি করলে আমি এখনই চলে যেতে চাই। সম্ভবত খেয়া-পারাপার বন্ধ হয় নি এখনও। যশোহরে আমার আত্মীয়েরা আছেন, আজকের রাত্রি সেখানে কাটাব মনস্থির করেছি—'

'তবে অধিক বিলম্ব উচিত হবে না।'

শংকর বললেন, 'আপনার সুমধুর আতিথ্য আমার মনে থাকবে। সুযোগ এবং সুবিধা পেলে আপনার কথা যথাস্থানে নিবেদন করব। আসি—'

···ফিরে আসার পর প্রতাপাদিত্য যতই জিজ্ঞাসা করেন, 'কী হল?' শংকর

শুতই মুচকি হাসেন আর বলেন, 'ঘটক-বিদায়ে কৃপণতা করলে চলবে না।' এটুকু বুঝতে পেরেছিলেন যে নাগমশায় কন্যার কথা চিন্তা করেন বটে কিন্তু নিরীহ স্বভাব বলে বিবাহকার্যে উদ্যোগী হন নি তেমন, অধিকন্তু অশেষ স্নেহপরায়ণ, একমাত্র কন্যা এবং মাতৃহীনা···বয়স-বৃদ্ধির ফলে ইদানীং চিন্তাগ্রস্ত, সুপাত্রের সন্ধান চান। তিনি জানেন না এবং জানা সম্ভব নয় যে তাঁর হাতের কাছেই রাজরাজেশ্বর পাত্র উপস্থিত, সাহসে ভর করে প্রস্তাবটি রাখলে হয়তো একেবারে বিফল না-হতে পারেন, কেননা পাত্র স্বয়ং এ বিবাহে উৎসুক, বারংবার ইংগিত সত্ত্বেও তিনি তা ধরতে পারেন নি। সরল প্রকৃতি।···আর একটি বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। শংকর শংকর ভেবে দেখেছেন, উভয়েই শৈশবে মাতৃহীন এবং পিতার একমাত্র সন্তান, অতএব বিধির নির্বন্ধে এ বিবাহ হবেই, উৎফুল্ল মনে তিনি তাই নৌকা থেকে নেমে দৌড়ে এসেছেন।

সূর্যকান্ত কোনো মন্তব্য করেন নি, কিন্তু রাত্রি বেড়ে যাচ্ছে দেখে একবার শুধু স্মরণ করিয়ে দিলেন, 'এবার আমাদের ফেরা উচিত—'

শংকর বললেন, 'যুবরাজ, সংবাদ শুভ। প্রস্তাব পাঠালেই ও-পক্ষ রাজি হবেন। কন্যার বিবাহের জন্য নাগমশায় সুপাত্রের সন্ধান চাইছিলেন।'

প্রতাপাদিত্য ক্লান্ত, অসুস্থতা বোধ করছিলেন। হঠাৎ স্তিমিত হয়ে গেলেন তিনি। বললেন, 'চলো ফিরি—'

পুত্রের বিষয়ে যতখানি উদাসীন থাকতে চেয়েছিলেন ঠিক ততখানি নির্লিপ্ত থাকতে পারেন নি বিক্রমাদিত্য। সকলের প্রিয় হয়ে উঠেছে পুত্র, সারা যশোহর তার নামে জয়ধ্বনি দেয়, তেজে বীর্যে সাহসিকতায় সে ক্রমশ ছাড়িয়ে যাচ্ছে অন্য সবাইকে, দেশখ্যাত যোদ্ধাদের পরাস্ত করে অবহেলায়

অপরদিকে মান্য করে গুরুজনদের, কোনো প্রকার উদ্ধতভাব জেগে ওঠে নি, বরং রঙ্গক্রীড়াক্ষেত্রে তার খুড়োমশায়কে যেভাবে শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছে তাতে প্রশংসাই ওর প্রাপ্য, গর্ব জাগে মনের প্রত্যন্তে, হৃদয় ভবে ওঠে ভাবতে গেলে। কিন্তু তবু, পুত্র হলেও, শক্তি চিনতে ভুল হবার কথা নয়। প্রতাপের মধ্যে একটা ভীষণ শক্তির জাগরণ ঘটবে, হয়তো যশোর তাতে ধন্য হবে কিংবা ধ্বংস হয়ে যাবে, অভিজ্ঞ চোখে স্পষ্ট তার স্ফুরণ ধরা পড়ছে। যশোরের অমঙ্গল হয় এমন কোনো শক্তিকে কখনই তিনি পরিপুষ্ট হতে দিতে পারেন না···প্রতাপের জন্মক্ষণ থেকেই এই অমঙ্গল ছায়ার মতো নিত্যসঙ্গী, দিনে দিনে দীর্ঘ হয়ে উঠেছে এই ছায়া, ক্রমে সারা যশোহর ছড়িয়ে পড়তে পারে। অতন্দ্রচক্ষু বসন্তরায় যতই সতর্ক থাকুক কিংবা আশ্বাস দিক, সে হয়তো ঠিকমতো অনুধাবন করতে পারছে না প্রতাপের গতিবিধি, বুঝতে পারছে না কীভাবে নেমে আসবে ভয়ংকর বজ্র। অবশ্য তিনিও তা অনুমান করতে পারেন না, কিন্তু স্নেহান্ধ নন বলেই ছোট-বড় নানান ঘটনার মাধ্যমে ভবিষ্যতের চেহারাটি দেখতে পান—তা সে যতই অস্পষ্ট হোক। মনের মধ্যে সেই ছবিগুলি নাড়াচাড়া করতে থাকেন।

প্রতাপের জনপ্রিয়তার দুটো দিক আছে। পিতা হিসাবে একদিকে নিশ্চয় খুশি হওয়া যায় কিন্তু অপর দিকটি ঠিক বিপরীত—এই জনপ্রিয়তার মদগর্বে সে বিদ্রোহী হতে পারে। ইতিহাসে এমন বহু নজীর আছে যে, পুত্র বিদ্রোহী হয়ে পিতার সিংহাসন দখল করেছে। কে বলতে পারে প্রতাপের সে-বাসনা নেই; জনপ্রিয়তার সুযোগ নিয়ে সে যশোরের সিংহাসনে দখল করতে পারে অনায়াসে।···এজন্যেই, এই সব আশংকা বেশি বলে, প্রতাপের প্রতিটি কাজে বাধা হয়ে দাঁড়াতে হয়—যাতে তার স্বভাবের গতি বক্রপথে না-যায়, উদ্ধত না-হয়ে ওঠে। ওর সাধ-আহ্লাদগুলিকেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে পিষ্ট করা দরকার—প্রতাপের বোঝা উচিত তার মাথার ওপর যশোরের মহারাজা বিক্রমাদিত্য আছেন, ঘটনার গতি-প্রকৃতি যিনি নিপুণ-ভাবে বিশ্লেষণ করতে জানেন এবং কূটনীতিতে বিচক্ষণ। রাজা চালনা

করতে হলে সতর্কতা প্রয়োজন। আবেগ ও উচ্ছ্বাস যত কম থাকে ততই ভালো। হৃদয়ের দুর্বলতা ক্ষতিকারক…

'প্রতাপ কেমন আছে?'

ভ্রাতা বসন্তরায়কে আসতে দেখে প্রশ্ন করলেন মহারাজা বিক্রমাদিত্য।

'আগের মতোই। জ্বরে বেহুঁস, মাঝে মাঝে জ্ঞান ফেরে আর কাকে যেন খুঁজে বেড়ায়…'

বিক্রমাদিত্য বললেন, 'জ্বর-বিকারে মানুষের অন্তস্থল উদ্‌ঘাটিত হয়, সেই বিকারের ঘোরে অনেক কথা জানা যায় যা সে সুস্থ অবস্থায় স্বমুখে প্রকাশ করতো কিনা সন্দেহ। তেমনি একটি সংবাদ তুমি শুনেছো হয়তো। প্রতাপ প্রণয়-পীড়িত, সে নিজে থেকেই পাত্রী নির্বাচন করেছে। নাগ-মশায়ের কন্যা শরৎসুন্দরীকে আমি একবার মাত্র দেখেছি, যদিচ সে সুন্দরী ও সুলক্ষণা তবু খেয়ালী যুবরাজের এ-খেয়াল আমি সমর্থন করি না। প্রতাপ নিজে কেন পাত্রী নির্বাচন করবে, আমরা থাকতে? তাছাড়া…

'দাদা; বসন্তরায় শান্তস্বরে বললেন, 'প্রতাপের কোনো কোনো কাজে হয়তো তোমার সমর্থন নেই কিন্তু যেটা তার ব্যক্তিগত জীবনের প্রশ্ন এবং যাকে নিয়ে সারা জীবন কাটাতে হবে সেক্ষেত্রে তার পছন্দ ও রুচিকে প্রাধান্য দেওয়া উচি বলে মনে করি। আমি অন্তত আপত্তির কারণ দেখি না। প্রতাপের নির্বাচন অসংগত হয়েছে তাও আমি মনে করি নে।'

'তোর প্রশ্রয়ের জন্যেই—'

বসন্তরায় ম্লান হাসলেন, 'দাদা, তুমি জানো প্রতাপের আমি ভালো চাই আর যশোরের মঙ্গল। প্রতাপ দেহে-মনে সুস্থ থাকলে যশোহরের মঙ্গল হবেই, তুমি দেখে নিও। কিন্তু ও-সব পরের কথা, আমি যেজন্যে তোমার কাছে এসেছিলাম, প্রতাপের অসুখের পর থেকে ছোটরাণী সর্বদা তার কাছে বসে আছেন, রাজবৈদ্যের নির্দেশমতো ঠিক সময়ে ঠিক অনুপানটি সেবন করিয়ে যাচ্ছেন, সপ্তাহকাল গত হল, ছোটরাণীর আশংকা অনুপান দ্বারা প্রতাপের কোনো উন্নতি হচ্ছে না, আজ তার অবস্থা বিশেষ ভালো

নয়, ঘন ঘন জ্ঞান হারাচ্ছে—এভাবে ফেলে না-রেখে আমরা বলি-কি ভবানী মন্দিরে গিয়ে ওর জন্যে আশীর্বাদী ফুল আনি। তুমি সম্মতি দিলে ছোটরাণী স্বয়ং মন্দিরে যেতে প্রস্তুত…'

বিক্রমাদিত্য বললেন, 'আমার আপত্তি নেই।'

…ভেবেছিলেন তাঁর অনিচ্ছায় প্রতাপের বিবাহ অন্যত্র হবে, অবশ্য বিবাহ দেওয়া দরকার, পিতার কর্তব্য অস্বীকার করা যায় না, বিবাহ দেবেন নিজের পছন্দমতো পাত্রীর সঙ্গে—নিশ্চয় তা দিতেন, কিন্তু চিন্তায় ফেলে গেলেন বসন্তরায়, দ্বিধা জাগছে মনে, জোর পাচ্ছেন না তেমন। প্রতাপের ভাগ্য অত্যন্ত অনুকূল, কিছুই করা যায় না তার বিরুদ্ধে। অথচ ভয় এখানেই, আরও শক্তি ও সমর্থন পেয়ে সে উদ্ধত হবে না তার নিশ্চয়তা কি।…দৈব। তদুপরি যদি দৈব সহায় হয় তাহলে তো নিরুপায়, ঘটনার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে হয়। প্রতাপের বিবাহ তেমনি দৈব সংঘটিত। সংকেত এসেছিল ওই ভবানী মন্দির থেকেই।

তিনি জানতেন ছোটরাণী ভবানী মন্দিরে যাবেন এ সংবাদ প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে নগরবাসীদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হবে এবং অনেকেই তাঁর সহযাত্রী হবেন…পরদিন প্রত্যুষে রাজ-অন্তঃপুরে একযোগে বেজে উঠল সহস্র শঙ্খধ্বনি, ছোটরাণীর মন্দিরোদ্দেশ্যে বহির্গত হবার সংকেত, এটাই রীতি—দেখতে পেলেন ছোটরাণীর সঙ্গে চলেছে অন্তঃপুরচারিকাগণ, তাদের কারো হাতে ডালা কারো হাতে পুষ্পমাল্য, কেউ নিয়েছে মঙ্গলঘট কেউ বা সিঁদুর-রঞ্জিত আম্রপল্লব, কদলীবৃক্ষ, সশীর্ষ নারিকেল বা নৈবেদ্য। তারণ পার হয়ে সার বেঁধে তাঁরা চলেছেন ভবানী মন্দিরের দিকে, পূত, বিত্র ভঙ্গি। পথে মিলিত হলেন পুরঙ্গনাগণ, অনাবৃত মস্তক, আলুলায়িত ধরী, কণ্ঠে মঙ্গল-গীতি। ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল ওদের পথ-পরিক্রমা। গানের কথা বোঝা যাচ্ছিল না, সম্মিলিত কণ্ঠে সুরের যে অস্পষ্ট ধারাটি ভেসে আসছিল তা যেন অমৃত নির্ঝর, গোবিন্দদাসের গানের মতো চিত্তদ্রাবী, হৃদয়ের একূল ওকূল ভেসে যায়। দেবতার নিকট প্রার্থনা

জানাবার সুর এ রকমই হয়, অন্তরের অন্তস্তল থেকে উঠে আসছে, অকপট, নিবিড়। পা পা করে নেমে আসছিলেন তিনি, আকর্ষণ বোধ করছিলেন, মন্ত্রমুগ্ধের মতো টান লাগছিল সুরে, তিনি একা তোরণ পেরিয়ে রাস্তায় নামলেন। এগিয়ে যাচ্ছিলেন হনহনিয়ে।

'দাদা, তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

প্রাতঃভ্রমণ সাঙ্গ করে ফিরে আসছিলেন বসন্তরায়, বিস্মিত।

'আসছি এখনই, তুই যা—'

আচ্ছন্নের মতোই চলে এলেন মন্দিরে। মস্ত মন্দির, পাকা ইমারত, ঘেরা অঙ্গন অনেকখানি। মহারাজাকে দেখে সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিল ওরা, তিনি মন্দির মধ্যে দাঁড়ালেন একপাশে। দেখতে পাচ্ছিলেন মধুমাখা সেই গীত গাইতে গাইতে ছোটরাণী ও তাঁর অনুগামিনীরা প্রদক্ষিণ করছেন দেবী-বিগ্রহ, অনুগামিনীদের মধ্যে রাজঅন্তঃপুরচারিকাগণ যেমন আছে তেমনি বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দের মাতা পত্নী কন্যাও রয়েছেন। অবগুণ্ঠন থাকার ফলে চেনা গেল না সকলকে, গুণ্ঠনমুক্ত থাকলেও চেনা সম্ভব ছিল না, যশোহরের নারী-সমাজের সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় নেই, পোশাকে ও রূপে অভিজাত-বংশীয়া বলে অনুমান করে নিয়েছেন তিনি—কুমারী কন্যাদের মাথায় গুণ্ঠন না-থাকায় প্রথমে নজরে পড়ল অরুন্ধতী, সুপরিচিতা কুমারী, রাজ-অন্তঃপুরে প্রায়ই দেখেছেন ; তদ্‌পশ্চাতে সুরূপা লাবণ্যময়ী কন্যাটি যেন চেনা-চেনা মনে হল, কোথায় কবে দেখেছেন সহসা স্মরণে এল না বটে তবে কমনীয় রূপ ও রমণীয় চলনে বোঝা যায়, উচ্চবংশজাত না-হলে এত ভিড়ে সে দৃষ্টি আকর্ষণ করত না। বাস্তবিকপক্ষে, মেয়েটিকে তাঁর দেবী-প্রতিমা বলে ভ্রম হচ্ছিল। যশোরের মেয়ে নাকি ? কার মেয়ে ?

দ্বাদশবার পরিক্রমা শেষ করে ওঁরা থামলেন। ধূপ ও ধুনার গন্ধে ভরে গেছে মন্দিরের অভ্যন্তর, ফুলের গন্ধ মিশেছে তার সঙ্গে···বাতাসে পবিত্র চেতনা, সমবেত পুরনারীদের আন্তরিক প্রার্থনায় পাষাণ প্রতিমার হৃদয় বিগলিত হবার কথা, কখনও কখনও তা হয়েছে। দেবী জাগ্রতা—তার

আশীর্বাদী ফুল পেয়ে ধন্য হয়েছে কত ভক্ত। এক্ষেত্রে তা ঘটবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না, ছোটরাণীর মতো ভক্তিমতী আর কে আছে, তাঁর প্রার্থনায় দেবী ভবানী সাড়া দেবেন নিশ্চয়, প্রত্যেকেরই সেই প্রত্যাশা, তাঁর নিজের প্রত্যাশাও তাই—কিন্তু স্তব্ধ হতে হল, বেদনায় বিস্ফারিত। দেখতে পেলেন ছোটরাণী বিগ্রহের সামনে জানু ভেঙে বসে ঊর্ধ্বাঞ্জলি হয়ে কি-যেন প্রার্থনা করলেন, নিমীলিত চোখে অশ্রুধারা, বিড়বিড় করে বললেন, 'দেবী, প্রতাপকে রক্ষা করো! তোমার প্রসাদী ফুল দাও—'

করাঞ্জলি বাড়িয়ে দিলেন। অপেক্ষা করলেন। কিন্তু ফুল পড়ল না।

শিহরিত হলেন মহারাজা বিক্রমাদিত্য। দেবী অপ্রসন্না—তবে কী প্রতাপ বাঁচবে না? বুকের মধ্যে বেদনা অনুভব করলেন, ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল দৃষ্টি, অশ্রুজলে আবছা হয়ে উঠছিল সম্মুখের দৃশ্য। একমাত্র পুত্র প্রতাপ, সে যদি না বাঁচে তবে তাঁর নিজের বেঁচে থেকে লাভ কি। প্রতাপের জন্যে যত উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা, এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে, সেগুলোর মূল্য অসীম—প্রতাপ না-থাকলে তার ভাবনা কী থাকবে এমন চিত্ত জুড়ে? না, প্রতাপের বাঁচা দরকার—তাঁর সমগ্র পিতৃসত্তা যেন চিৎকার করতে চাইছিল, 'মা ভবানী, বাঁচিয়ে দে মা, এমন করে কেড়ে নিসনে আমার আদরের ধনকে। তোর চরণে আমি তো কোনো অপরাধ করি নি—'

লুটিয়ে পড়তে চাইছিলেন দেবীর চরণে। কিন্তু ছোটরাণী তৎপূর্বে আহ্বান জানিয়েছেন, 'যশোরের কুললক্ষ্মীরা এগিয়ে এসো। তোমরা মায়ের কাছে প্রসাদী ফুল চেয়ে নাও—মা কখনও এত নিষ্ঠুর হতে পারেন না—'

কুললক্ষ্মীরা এগিয়ে গেল একে একে। প্রদক্ষিণ সেরে নতজানু হয়ে বসল প্রতিমার সামনে। করজোড়ে প্রার্থনা জানাল। কিন্তু পাষাণ প্রতিমা অচল, অনড়। তাঁর হাতের ফুল রয়ে গেল হাতে।

'তোমরাও এসো।' ছোটরাণীর গলার স্বর ভিজে, কান্না অবরুদ্ধ, তবু যেন জেদের মতো দৃঢ়ঃ 'মায়েরা বউয়েরা ব্যর্থ হয়েছেন, কুমারীদের মধ্যে এমন কোনো পুণ্যবতী আছে কিনা দেখতে চাই যার প্রার্থনায় পাষাণীর হৃদয়

টলবে, ফুল পড়বে—তার পরীক্ষা হোক। এসো তোমরা। অরুন্ধতী এসো আগে—'

অরুন্ধতীর বেণী গ্রন্থিযুক্ত, মুখখানি শুকনো, বোঝা যায় সে উপবাসে আছে—প্রতাপের অন্যতম প্রিয় সহচর সূর্যকান্তের প্রণয়ভাগিনী। তার প্রার্থনায় দেবী সাড়া দেবেন, ছোটরাণী ভেবেছিলেন অরুন্ধতী অন্তত ব্যর্থ হবে না, ওর পুণ্যফল আছে। কিন্তু প্রত্যাশা পূর্ণ হল না, যথাপূর্বং তথাপরং, দেবীর হাতের ফুলটি একই ভাবে অনড়। যেন কেউ গেঁথে রেখেছে শক্ত করে।

পরীক্ষা যখন হচ্ছে ভালো করেই হোক।

'তুমি এসো—'

দ্বিতীয় কুমারীটির দিকে সকলের নজর পড়ল একযোগে। এ অঞ্চলে তো ওকে দেখা যায় নি বড়-একটা। কার মেয়ে? ভারি সুন্দর দেখতে!

'এসো শরৎ—'

গ্রন্থি-বাঁধা চুল তারও, এলিয়ে পড়েছিল পিঠে, অরুন্ধতী কুণ্ডলী করে তুলে দিল মাথার ওপর।

'এত কাঁপছিস কেন, পড়ে যাবি যে! শক্ত হয়ে দাঁড়া—'

বাস্তবিক কাঁপছিল শরৎসুন্দরী। এখানে সে এসেছে স্বেচ্ছায়, গতকাল ঘোষণা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মনস্থির করে আজ ভোরে এসে উঠেছিল সখির আবাসে, পুরনারীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে গান গাইতে গাইতে চলে এসেছে মন্দিরে। জ্ঞানতঃ সে এসেছে কিনা স্মরণ হয় না, যুবরাজের দুরারোগ্য ব্যাধি এবং তার আরোগ্যের জন্য ছোটরাণী মন্দিরে যাবেন শুনে সে স্থির থাকতে পারে নি, এতক্ষণ ভিড়ের মধ্যে একজন হয়ে ছিল, এবার স্পষ্ট হতে হবে। অরুন্ধতী হাতে তুলে দিয়েছে প্রজ্বলিত ধুনার মৃৎপাত্র, তাতে অগুরু চন্দন মেশানো, সুগন্ধ উঠছে। ফুল আছে অন্য হাতের ডালায়—শরৎসুন্দরী এগিয়ে গেল।

…চেনা চেনা মনে হচ্ছিল এজন্যেই, ছোট বয়সে একবার গিয়েছিল

প্রাসাদে ওর বাবার সঙ্গে, প্রণাম করে দাঁড়িয়েছিল নতমুখে, তখন এত সুন্দরী ছিল না। অরুন্ধতী নাম ধরে ডাকার ফলে সেই স্মৃতি চমকিত, তৎক্ষণাৎ মনে পড়ল প্রতাপ এই মেয়েটিকে বিবাহ করতে চায়। ওর বাবার সঙ্গে পরিচয় অনেকদিনের, স্বধর্মাবলম্বী, সৎ প্রকৃতির মানুষ; নিতান্ত খারাপ হবে কী উভয় পরিবারে সম্বন্ধ স্থাপিত হলে ? কোথায় যেন আটকাচ্ছে, সহজ সায় পাওয়া যাচ্ছে না। বসন্তরায় যত যুক্তি দেখাক, অন্তর বিরূপ হয়ে উঠেছে আবার। এখন প্রতাপ গুরুতররূপে অসুস্থ, সে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে, এ সময়ে ও-সব চিন্তা না-করাই উচিত··· ভাবছিলেন বিক্রমাদিত্য। দ্বিধা-দ্বন্দ্বগুলো অচেতন মনে এমন পাকে পাকে জড়িয়ে থাকে যে···

'ফুল পড়েছে ! ফুল পড়েছে—'

শতকণ্ঠের উল্লাস। ভবানী বিগ্রহের হাত শূন্য, সকলের চোখের সামনে ফুলটি খসে পড়েছে তদ্গতচিত্ত প্রার্থনারত কুমারীর করপুটে। আবেগে ছোটরাণী বুকে টেনে নিলেন শরৎসুন্দরীকে। মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন ক্রমাগত। চোখে জল, মুখে হাসি।

'তুই চল প্রাসাদে, প্রতাপের মাথায় ঠেকিয়ে দিবি এই প্রসাদী ফুল। আর ভয় নেই। প্রতাপ জীবন ফিরে পেল তোর পুণ্যে, তোকে আমি ছাড়ছি নে, যশোরের লক্ষ্মী তুই—'

আদরে আদরে আচ্ছন্ন করে ফেললেন ছোটরাণী।

খাস বরদার খবর দিয়ে গেছে যশোর-রাজের দেওয়ানখানায় উপস্থিত থাকতে হবে, যদিচ বিনীত ভঙ্গি এবং সম্ভ্রমসূচক আমন্ত্রণ তবু কারণ খুঁজে না-পেয়ে অথৈ চিন্তায় হাবুডুবু খাচ্ছিলেন জীতমিত্র নাগমশায়। হঠাৎ তলব কেন ? স্মরণ করবার চেষ্টা করলেন—এ সময়ে কোনো পার্বণ আছে

কিনা, বিশেষত আজ, শ্রাবণের মাঝামাঝি ; কদিন আগে সমারোহের সঙ্গে পুষ্পযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে, বিপুল আয়োজন করেছিলেন মহারাজা বিক্রমাদিত্য, নাম-গানে গগন মুখরিত করে তুলেছিলেন। সামান্য জিনিসকে অসামান্য রূপ দিতে পারেন যশোররাজ, কত রকমের উৎসব যে প্রচলিত করেছেন রাজ্য মধ্যে, ফলে সামাজিক মেলামেশার পথগুলি গেছে খুলে—আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা বাড়ছে দিনে দিনে। যশোরের মান্যব্যক্তিদের অনেকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, দরবারের সকলেই তো পরিচিত, রাজা বিক্রমাদিত্যের উদার আমন্ত্রণ ও রাজভ্রাতা বসন্তরায়ের কাব্যপ্রীতি আকৃষ্ট করেছে··· ওঁদের সংস্রবে দু'দণ্ড কালাতিপাত করলে চিত্ত পরিতৃপ্ত হয়, হৃদয় ভরে ওঠে আনন্দে। মহৎ ব্যক্তি উভয়েই। কিন্তু অকারণ আহ্বান জানান না কখনও, উপলক্ষহীন আমন্ত্রণ কখনও ঘটেছে বলে মনে পড়ে না। আজ তার কিসের আহ্বান ?

'কোথায় যাচ্ছ বাবা ?'

পোশাক পরিধান করছিলেন তিনি, শেষ করে এনেছিলেন, সাধারণ পরিচ্ছন্ন পোশাক।

'তলব করেছেন রাজা বিক্রমাদিত্য, যাচ্ছি তাঁর দেওয়ানখানায়—'

কন্যা মুখ তুলল।

'কেন বাবা ?'

তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন কন্যার কণ্ঠে বহুমূল্য রত্নহার, বসন্তরায়-পত্নী উপহার দিয়েছেন। শুধু রত্নহার নয় আরও বহুবিধ অলংকার উপহার দিয়েছেন ছোটরাণী, শরৎসুন্দরীর অঙ্গ ভরে গেছে। সেই প্রার্থনা-দিবসের পর থেকে উপহার এসেছে প্রচুর, সবই কন্যার নামে, ওকে যশোর-লক্ষ্মী বলে আশীর্বাদ করেছেন ছোটরাণী ; অন্য অলংকারগুলি খুলে রেখেছে শরৎ, রত্নহারটি ছোটরাণী সেদিন প্রাসাদে নিয়ে গিয়ে আপন হাতে পরিয়ে দিয়েছিলেন বলে ওটি কণ্ঠে ধারণ করে আছে। যশোর-লক্ষ্মী কিনা বলা যায় না তবে পিতা হিসাবে কন্যাটির মধ্যে লক্ষ্মী-ভাব প্রত্যক্ষ করেছেন

বহুবার, তাঁর নিজেরই একবার কঠিন পীড়া হয়, বৈদ্যগণ আশা ত্যাগ করেছিলেন, কন্যার যত্নে ও সেবায় আরোগ্য লাভ করেন। মমতা এই কারণে, বিবাহ দিলে পরের ঘরে চলে যাবে ভাবতে গেলে বুকের ভেতর শূন্যতা জাগে, হাহাকারে ভরে যায়।

'জানি না মা। ডেকেছেন যখন, ঘুরে আসি—'

তিনি বেরতে যাচ্ছিলেন, কন্যা ডাকল, 'বাবা—'

'বল্ ?'

'ন্ না থাক্—'

হাসলেন তিনি, কন্যা বলতে চেয়েছিল কিছু, সংকোচে থেমে গেছে। যশোর রাজদরবারে যাচ্ছেন পিতা, কী জিজ্ঞাস্য থাকতে পারে ? গতকালও সংবাদ পাওয়া গেছে যে যুবরাজ প্রতাপাদিত্য অপেক্ষাকৃত সুস্থ, পথ্য গ্রহণ করেছেন, আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেছে রাজপ্রাসাদে, রাজ্যের অধিবাসীরা খুশি ; সংবাদবাহক-মারফত আরও অবগত হওয়া গেছে যে ছোটরাণীমা বারংবার শরৎসুন্দরীর নামোচ্চারণ করেছেন, স্বয়ং যুবরাজ কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন··· তখন, সংবাদ শ্রবণকালে, তিনি লক্ষ্য করে দেখেছেন কন্যার মুখশ্রী কি-এক আলোয় এমন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে যেন সে নিজেই কৃতার্থ, ছুটে গিয়ে রাধাগোবিন্দজীর চরণে প্রণাম জানিয়েছে। চাপা অনুরাগ ধরা পড়েছে তাঁর অনভ্যস্ত চোখেও, পরক্ষণে ভেবেছেন যশোর-যুবরাজের প্রতি কারই বা অনুরাগ নেই, নরনারীনির্বিশেষে সকলে তাঁর মঙ্গল চায়, অতএব কন্যার উচ্ছ্বাস অসংগত নয়। কিন্তু এখন লজ্জা কেন ? কন্যা কি বলতে চেয়েছে তার মুখের রক্তিমাভা দেখে অনুমান করা যায়, হয়তো বলতে চেয়েছিল 'যুবরাজের সংবাদ এনো,' কিন্তু লজ্জায় পারল না বলতে। এই লজ্জাটুকু না-থাকলেই বোধহয় ভালো হত। যুবরাজের খবর যে-কেউ জিজ্ঞেস করতে পারে, যখন তিনি যাচ্ছেন ওখানে।···কন্যার মধ্যে পরিবর্তন আসছে, রহস্যময়ী হয়ে উঠছে, বদলে যাচ্ছে চাল-চলন। আর বিলম্ব উচিত হবে না, এবার ওর বিবাহ দেওয়া প্রয়োজন।

তাঞ্জাম এসে থামল দুর্গতোরণদ্বারে, তাঞ্জাম পাঠিয়ে দিয়েছিলেন স্বয়ং বিক্রমাদিত্য, সচরাচর এত সম্মান প্রদর্শন করেন না তিনি, সম্ভবত জরুরি প্রয়োজন বলে এই আয়োজন; অথচ ভেবে পাওয়া যাচ্ছে না কিসের প্রয়োজন এবং কেন ? তোরণরক্ষী অভিবাদন জানিয়ে সম্ভ্রম সহকারে সরে দাঁড়াল। ঠিক এ-ধরনের সম্ভ্রম ওরা আগে দেখায় নি, গর্বিত না-হয়ে কেমন যেন শংকিত হলেন। হাওয়া অন্য রকম। কোথায় কী ঘটল ?

দেওয়ানখানায় আসেন নি ইতিপূর্বে, ওটা মন্ত্রণাগার, প্রয়োজন হয় নি কখনও—সংসারে মন্ত্রণা দেবার লোকের অভাব নেই একমাত্র তিনি ছাড়া, মন্ত্রণা দেওয়া মানে তো নিজের ইচ্ছা অপরের ওপর আরোপ করা, তা তিনি কোনোদিন করেন নি এবং পারবেনও না···মর্মরনির্মিত মেঝে, সাদা, তার ওপর লাল কালো নীল হলুদ নানা রঙের ফুল ও পাতা খোদাই করা, পা ফেলতে সংকোচ হয়, মনোরম মন্ত্রণাগার বটে। সুসজ্জিত চৌপায়া রোশন কেদারা তক্ত প্রভৃতি আসনগুলি বহুমূল্য আস্তরণ দ্বারা আবৃত! কাব্যা-লংকারের মতো সজ্জিত কক্ষ, ছন্দের মতো সুশোভিত। এই কক্ষ-সজ্জার ব্যাপারে কাব্যানুরাগী বসন্তরায় মশায়ের হাত আছে নিশ্চয়, সেই রকম পরিশীলিত রুচির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছিল।

'এই যে নাগমশায়, আসুন আসুন—'

কণ্ঠস্বরে চকিত হলেন। বসন্তরায়ের অভ্যর্থনা, উদার এবং আন্তরিক, যেন তিনি বিশিষ্ট কেউ। অভ্যর্থনা বরাবরই করে থাকেন ওঁরা, পদকবি গোবিন্দ-দাস কিংবা অন্য কারো গান শোনার আমন্ত্রণে এখানে এলে এমন সরব অভ্যর্থনা পান বটে তবে তার সঙ্গে আজকের সুরে ও ছন্দে কোথায় যেন তফাৎ। এত সম্মানযোগ্য ব্যক্তি তিনি নন। খটকা লাগছে কানে, কোথাও কিছু ঘটেছে, অভ্যর্থনার এত ঘটা কেন ?

'আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন তাই—'

গলা শুকিয়ে গেছে, ঢোঁক গিললেন একটা।

'কথা আছে আপনার সঙ্গে, দয়া করে আসন গ্রহণ করুন, দাদা এসে

যাবেন এখনই—'

দেখতে পাচ্ছিলেন কক্ষমধ্যে মণিমাণিক্যমণ্ডিত এবং হস্তিদন্তনির্মিত বিরাট সিংহাসন, শূন্য, মহারাজা বিক্রমাদিত্য অনুপস্থিত। সিংহাসনের উপরে হেমদণ্ডে মুক্তার ঝালর শোভা পাচ্ছে, পুষ্পাধারে রক্ষিত তাজা ফুলের গুচ্ছ থেকে উঠছে সুগন্ধ, আমোদিত হয়ে আছে কক্ষ। স্তম্ভগাত্রগুলি রজত নির্মিত এবং বহুমূল্য প্রস্তরখচিত বলে ঔজ্জ্বল্যে দৃষ্টি ঝলসে যায়, তদবেষ্টনে পুষ্পমাল্য ও অশোকগুচ্ছের শোভা। সিংহাসনের সম্মুখে দক্ষিণে ত্রিপদ বিশিষ্ট আসনের উপর বিচিত্র রত্নালংকার বিজড়িত রাজদণ্ড, বামে স্বর্ণ-বিমণ্ডিত আসনে যশোরের রাজশ্রী সম্ভারঃ মুকুট কুণ্ডল কবচ ইত্যাদি। ভিত্তিগাত্রে শ্বেত নীল লাল ও সবুজ ফানুসে স্ফটিক দেওয়ালগীর, তার ফাঁকে ফাঁকে ইতিহাস খ্যাত রাজনীতিবিদ রাজা সেনাপতি বাদশাহ প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তির বৃহদায়তন চিত্র সুন্দরভাবে সজ্জিত।

'কী দেখছেন নাগমশায়?'

সিংহাসনের দক্ষিণপার্শ্বে হস্তিদন্তনির্মিত ঠেশ, বিচিত্র, অতিশুভ্র—বসন্তরায় তদুপরি উপবিষ্ট। কি-এক নকশায় মনোযোগী ছিলেন এখন সেটি সরিয়ে রেখে অতিথির প্রতি আকৃষ্ট।

'এ কক্ষের শোভা ভারি সুন্দর—'

বসন্তরায় বললেন, 'আপনার কন্যা কুশলে আছেন তো?'

'হ্যাঁ। আপনারা সকলে কুশল আশা করি—'

বসন্তরায় বললেন, 'যুবরাজ গতকল্য পথ্য গ্রহণ করেছেন। ওই দাদা আসছেন—'

জীতমিত্র উঠে দাঁড়িয়ে সম্ভ্রমভরে নমস্কার জানালেন।

'বসুন।' মহারাজা সিংহাসনে উপবেশন করে বললেন, 'আপনার সঙ্গে আমি একটি সম্পর্ক স্থাপন করতে চাই, সে জন্যে আপনাকে এই নিভৃত কক্ষে ডেকে আনা। বলুন, সম্পর্ক স্থাপনে রাজি কিনা?'

হাসছেন মৃদু মৃদু। সুরসিক ব্যক্তি, কিন্তু বক্তব্য কোন্ পথ ধরে কোথা যাবে

বুঝতে না-পেরে শংকিত হলেন জীতমিত্র।

'আমি সামান্য ব্যক্তি, আমার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে চাইছেন জেনে আনন্দিত,—যদিচ সম্পর্ক একটা আছেই—রাজা ও প্রজার সম্পর্ক—'

'না। সে-রকম সম্পর্কের কথা বলি নি।'

জীতমিত্র বললেন, 'গোবিন্দের চরণে হৃদয় সমর্পণ করেছি বহুকাল, দেহ রাজসেবায়, সংসারিক জ্ঞান বরাবর কম। আমার নির্বুদ্ধিতা ক্ষমা করবেন, ঠিক বুঝতে পারছি না আপনি কী বলতে চাইছেন—'

'আপনার কন্যাটির বয়স কত ?'

'তেরো চৌদ্দ হবে—'

'কবে বিবাহ দেবেন ?'

'চেষ্টা করছি—'

'আমার পুত্রটিকে কেমন মনে হয় ?'

'তুলনাহীন—'

'ছোটরাণী আপনার কন্যাকে যশোর-লক্ষ্মী বলে সমাদর করেছেন, মা বলে ডেকেছেন। আমরা চাই সে যথার্থ যশোর-লক্ষ্মী হোক। প্রতাপের সঙ্গে তার বিবাহ দিলে কেমন হয় ?'

'আমার পরম সৌভাগ্য- -'

'যান, অয়োজন করুন গে। আগামী মাসে বিবাহ।'

'আমার কন্যাকে কী দেখেছেন আপনি ? তাকে দেখুন—'

'দরকার নেই। আর-কিছু বলবেন ?'

'না, মানে, আমি ঠিক প্রকাশ করতে পারছি নে—'

হাসছিলেন মহারাজা বিক্রমাদিত্য। বুঝতে পারছিলেন, অপ্রত্যাশিত বিবাহ প্রস্তাবে নাগমশায় বিশেষ বিচলিত, যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না। বললেন, 'চলুন, দুদিন পরে কুটুম্ব হতে যাচ্ছেন, একটু জলযোগ করে যাবেন। ওরে কে আছিস—'

তিনি উঠে পড়লেন সিংহাসন ছেড়ে।

রাজপ্রাসাদ থেকে বেরনো নিষেধ ছিল, এখনও কিছুদিন শয্যা-বিশ্রাম প্রয়োজন, রাজবৈদ্য মশায়ের নির্দেশ ; গত তিনদিন যাবৎ পথ্য জুটছে, শরীরে শক্তি ফিরে আসছে, চুপচাপ কক্ষবন্দী থাকা শাস্তির মতো মনে হয়। সকলেই কিছুক্ষণ সাক্ষাৎ করে যান অবশ্য, এমন-কি পিতৃদেব পর্যন্ত, কিন্তু তথাপি মাঝে মাঝে এমন একটা নিঃসঙ্গতা আসে যে হাঁপিয়ে ওঠে মন। ছোটমা তো সব সময় আছেন কাছে কাছে, অসুখের সময় বিনিদ্র কাটিয়েছেন দিবস-রজনী, প্রকৃত মায়ের মতোই তিনি।·· একা হয়ে গেলে, শয্যার উপরে বালিশে ঠেস দিয়ে বসে বহিঃপ্রকৃতির অনিন্দ্য শোভা নিরীক্ষণ করতে করতে, কখনও কখনও অন্যমনস্ক হয়ে যান প্রতাপ। মা, মাকে সে হারিয়েছে অতি শৈশবে, বলা যায় জন্মক্ষণ থেকেই ; কণামাত্র স্মৃতি সম্বল নেই জন্মদাত্রী সম্বন্ধে—ছোটমার দিকে তাকালে, তাঁর স্নেহ-ভালোবাসায় অভিষিক্ত হলে চোখের কোল দুটি জলে ছলছল করে ওঠে, মনে হয় মা বুঝি এ রকমই ছিলেন। অকারণে কাঙাল হয়ে ওঠে মন। ভাবালুতা আসে, উচ্ছ্বাস জাগে চিত্তে। ছোট নদী যমুনা. দৃষ্টি চলে যায় তার সীমানা ছাড়িয়ে ঢলে-পড়া অনন্ত নীল আকাশে, সন্ধ্যাবেলা একটি-দুটি তারা দেখা দিলে মনে পড়ে, মাকে মনে পড়ে। ওখানে কোথাও মায়ের চোখ অতন্দ্র হয়ে আছে, দেখতে পাচ্ছেন সন্তানের আকুলতা। সব ভুলে যেতে হয়. ছেলেমানুষের মতো আকুলতা জাগে···

নিঃশব্দে কেউ কক্ষে ঢুকল এবং নিঃশব্দেই চলে গেল। সম্ভবত তাকে অন্যমনস্ক দেখে বিরক্ত করে নি, অনেকেই আসে খবরাখবর নিতে, শারীরিক সংবাদ জানাতে হয় সবাইকে। ওঁরা শুভাকাঙ্ক্ষী, ওদের আগমনে খুশি হওয়া উচিত, কিন্তু ক্রমাগত কুশল-বার্তা জানাতে জানাতে ক্লান্তি আসে। রাজবৈদ্যের নিয়মমাফিক নাড়ি পরীক্ষার মতো এ যেন নিয়মাধীন কুশল-জিজ্ঞাসা। বেশিক্ষণ কথা বলা যায় না ওদের সঙ্গে। আরও অসহ্য সংকীর্তন

গান, প্রথম পথ্য গ্রহণের দিন নাম-সংকীর্তন হয়েছে অষ্টম প্রহর, কার নির্দেশে হয়েছে কে জানে, কিন্তু ওই ভাবালুতা ও ভক্তিবাদে চিত্ত পরিতৃপ্ত হয় না আর। তার চেয়ে বেশি আকর্ষণ শক্তিবাদে, তান্ত্রিকতায়। কিছু কিছু কালী-উপাসক তান্ত্রিক বসবাস করেন শ্মশান-সন্নিকটে, উপর্যুপরি কয়েক রাত্রি সেখানে গিয়ে দেখেছেন সাধনার কী রূপ, শক্তিকে জাগাতে হয় কী ভাবে। এখন শরীর দুর্বল, সেরে উঠলে ফের যাবার ইচ্ছা আছে। বৈষ্ণব ধর্ম অপেক্ষা শাক্তধর্মে আকর্ষণ জেগেছে, শক্তি চাই। নিজের মধ্যে এবং রাজ্যের মধ্যে শক্তির উদ্বোধন ঘটাতে না-পারলে সোজা হয়ে দাঁড়ানো যাবে না।

কিন্তু কক্ষে ঢুকেছিল কে? চলে গেল কেন?

সহচর সূর্যকান্ত এসেছিল নাকি? ওকেই দরকার এখন। যথেষ্ট অভয় দেওয়া সত্ত্বেও সম্মানসূচক দূরত্ব রয়ে গেছে আজও, সূর্যকান্ত কোনো সময়ে ভুলতে পারে না যে সে যুবরাজের অনুগত অনুচর মাত্র, স্থূলভাবে কথাটা হয়তো তাই, কিন্তু তিনি কদাচ সে-রকম ব্যবহার করে থাকেন। তুলনায় শংকর বেশি বলিষ্ঠ, তার মধ্যে একটা প্রখর স্বাতন্ত্র বোধ আছে। গত তিনদিনে ওরা দুজনে বহুবার এসেছে, আজ সারাদিন দেখা নেই। কী করছে ওরা? ওদের মধ্যে কেউ এসেছিল কী?

'যুবরাজ—'

বিনীত কণ্ঠস্বর, মৃদু ও সুমিষ্ট।...ওদের কাছ থেকেই জানা গিয়েছিল, পিতা তাঁর বিবাহের আয়োজন করছেন, পাত্রী নাগ কন্যা শরৎসুন্দরী। এও জানা গেছে যে শরৎসুন্দরীর জন্যে তিনি প্রাণ ফিরে পেয়েছেন, পুণ্যবতী বালিকা, তার প্রসারিত করপুটে পড়েছিল ভবানীর আশীর্বাদী ফুল। মানস-কন্যা নাকি এসেছিল এ কক্ষে, মাথায় ঠেকিয়ে গেছে সেই ফুল, তখন তিনি জ্বরে বেহুঁস। রাজ্যব্যাপী তার নামে ধন্যধ্বনি। ছোটমা নাকি আশীর্বাদ করেছেন যশোর-লক্ষ্মীরূপে। ওর সঙ্গেই নাকি বিবাহ আগামী মাসে। আনন্দে ভরে গিয়েছিল বুক।

'যুবরাজ—'

তন্ময়তা যখন আসে তখন এমনি বধির হয়ে যান প্রতাপাদিত্য। আবেগের প্রচণ্ডতায় বিলুপ্ত হয়ে যায় বাস্তব-বোধ।···সংকোচ ছিল না অতঃপর, সূর্য-কান্তকে অনুরোধ করেছিলেন ছবিটি আনতে, এ কক্ষের দেওয়ালে টাঙানো রয়েছে অরুন্ধতীর আঁকা শরৎসুন্দরীর সেই ছবিটি, মুখোমুখি। এখন অপলকে তাকানো যায় তার দিকে, তাকিয়েছিলেন, টানা টানা ডাগর দুটি চোখে মায়েব মতো স্নেহ···যে-রকম দুটি চোখ তিনি খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন সন্ধ্যাকাশে। মনে পড়ছিল বিকার-অচৈতন্য অবস্থায় কে যেন পাশে এসে বসেছিল, মায়ের মতো দেবীর মতো, অঙ্গে বুলিয়ে দিয়েছিল হাত। চেতনা ছিল না আদৌ, মা বলে ডেকেছে বার বার, ওই দুটি চোখ তখন যেন দেখে-ছিল মনে পড়ে। ছবির মধ্যকাব চোখ আর সেই চোখ যেন এক···

'যুবরাজ—'

সুমিষ্ট গলা, সুরেলা। বহুবার শুনেছেন তবু বুঝি চমকে গেলেন। ছবিব রাজ্য থেকে মর্ত-জগতে।

'নিপুণিকা, কিছু বলবে ?'

ছোটমার প্রধানা সহচরী। সুযৌবনা, স্বাস্থ্যবতী। সমবযসী বলা চলে, সংগীতনিপুণা। পূর্বজীবনের নাম লোকে বিস্মৃত, ছোটমা নতুন নাম রেখেছেন, নিপুণিকা। সকলে ওই নামই জানে। চটপটে, ধীর, নম্র। অধিকন্তু সংগীতানুরাগিণী। প্রায়ই ওর গান শোনা যায়, কীর্তন জাতীয় সংগীত নয়, ছোটবেলায় গৌড়-দরবারের সংগীতজ্ঞের কাছে যে ধরনের গান শিখেছল সেই রকম গান—রাগাশ্রয়ী, সুর-সমন্বিত। অন্তত কীর্তনের চেয়ে ভালো, যদিচ মাঝে মাঝে কীর্তনকেও উচ্চাংগ সংগীতের পর্যায়ে ফেলতে মন চায় তার সুর-বৈচিত্র্যের জন্যে। নিপুণিকা বিশুদ্ধ রাগ-সংগীতের চর্চা করে এবং তা শুনতে খাবাপ লাগে না।

'গরম দুধ রেখে গিয়েছিলাম, ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, বৈদ্য মহাশয়ের নির্দেশ ছিল এই সময়ে আপনি গরম দুধ ও মিষ্টান্ন গ্রহণ করবেন। মিষ্টান্ন কী আনব ?'

'না। এখন আমার খেতে ইচ্ছা নেই। তুমি দুধ নিয়ে যাও—'
'দয়া করে এইটুকু পান করুন।'
'নিপুণিকা, তুমি এ-ভাষায় কথা বলছো কেন?'
'অন্যায় হয়ে থাকলে ক্ষমা করবেন—'
'নিপু, তুমি-আমি একসঙ্গে বড় হয়েছি।' যুবরাজের স্বরে কৃত্রিম গাম্ভীর্য: 'অন্তত দুজনে যখন একসঙ্গে থাকবে তখন এভাবে কথা বোলো না। তুমি আমার বাল্য-সহচরী—'
'যুবরাজ, আমি কোনোক্রমেই ভুলতে পারি না আমার দুর্ভাগ্যের কারণ ওই মোগল। রাহুর মতো এসে ওরা আমার সব ছিনিয়ে নিয়ে গেল, আমি হলাম সর্বহারা—'
'জানি। তোমার সব কথা শুনেছি। খুড়োমশায় বলেছেন। বাবা-খুড়োর মতিগতি অন্য রকম, আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, সুযোগ ও সুবিধা যদি কোনোদিন পাই তাহলে মোগলের সঙ্গে মোকাবিলা করব।'
'ঈশ্বর ততদিন যেন আমাকে জীবিত রাখেন আর আপনার মঙ্গল করেন। যুবরাজ, আমি বড় দুর্ভাগিনী, আপনি আমার ওপর রাগ করবেন না—'
'করব, যদি ফের আপনি-সম্বোধন করো।'
'কিন্তু—'
'ভুলে যাও কেন, তোমারও একটা পরিচয় আছে। তুমি পাঠানরাজ দাউদ খাঁর রাজস্ব বিভাগের মন্ত্রী রাজা গোবিন্দপ্রসাদের ভ্রাতুষ্পুত্রী। গৌড়ের প্রথম রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় গোবিন্দপ্রসাদ নিহত হন, তখন তুমি ও আমি দুজনেই ছোট, খুড়োমশায় তোমাকে যশোরে আনেন এবং অন্তঃপুরে প্রতিপালিত করেন। নিঃসন্তান ছোটমার একটি কোল বেছে নিয়েছি আমি আর-একটি তুমি, দুজনে হেসেছি-খেলেছি একসঙ্গে, বড় হয়েছি। তখন অবোধ ছিলে বলে সহজেই 'তুমি' বলতে পারতে আর এখন জ্ঞান হওয়ার পর—'
'ছোটরাণী অনুগ্রহ করে আমাকে তাঁর প্রধানা সহচরী করেছেন। এ আমার

সৌভাগ্য। দুর্দিনে যে সহানুভূতি আপনাদের সকলের কাছ থেকে পেয়েছি তাতে দাসী হয়ে থাকতে পারলে জীবন ধন্য হয়ে যাবে। অতীতের প্রসঙ্গ তুলে লজ্জা দেবেন না। তখন অবোধ ছিলাম—'

'কৃতজ্ঞতা যখন এত প্রবল এবং দাসী হয়ে থাকার বাসনা অকপট, যদিচ, আমি ও-দুটোর মূল্য দিই না, কারণ কৃতজ্ঞতা মানুষকে ছোট করে আর দাসী মনোভাবের মধ্যে আর যাই থাক্ হীনতা সুস্পষ্ট ; তখন আমি তোমাকে আদেশ করতে পারি। পারি কিনা ?'

'জিজ্ঞাসা বাহুল্য মাত্র। আমি আপনার আদেশের জন্যে অপেক্ষা করছি—'

'তাহলে বাল্য-সহচরীর মুখে অতঃপর যেন 'আপনি'-সম্বোধন না শুনি। দ্বিতীয়ত দুধের পাত্র নিয়ে যাও, দুগ্ধ পানে রুচি নেই। এবং তৃতীয়ত তোমাকে একটি গান শোনাতে হবে, বিশুদ্ধ রাগ-সংগীত—'

'আপনার প্রথম ও তৃতীয় আদেশ রক্ষা করতে পারি, যদি দুধটুকু পান করেন।'

'নিপুণিকা, দুর্বিনয় প্রকাশ পাচ্ছে নাকি ?'

'আবার ক্ষমা চাইছি। আমি যাঁর প্রধানা সহচরী তাঁর নির্দেশ আছে এই কাজটুকু যেন অবশ্য পালন করে যাই—'

'শুধু ছোটমার নির্দেশ ? তোমার কোনো ইচ্ছা নেই ?'

নিপুণিকা চুপ করে রইল।

'সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। দিগন্ত ঢেকে গেছে অন্ধকারে। এখন কোন্ রাগ উপযুক্ত ?'

যুবরাজ দুগ্ধপাত্র তুলে নিয়েছেন ওষ্ঠে, চুমুক দিচ্ছিলেন।

'আমি তম্বুরা আনি—'

বাতিদানে অগ্নিসংযোগ করে গেছে পরিচারক। স্নিগ্ধ আলো ছড়িয়ে পড়েছে কক্ষে। দেওয়াল গাত্রে রঙ-তুলিতে আঁকা ছবিটি আরও মনোরম হয়ে উঠেছে। অন্য একটি অশরীরী সত্তা কক্ষে ছিল বলেই কী তিনি এত আন্তরিক হয়ে উঠেছিলেন ? বড় সরস ও মধুর আলাপ। সাধারণত এত

বেশি কথা তিনি বলেন না, কানে এখনও কণ্ঠস্বর বাজছে। তানপুরা ছাড়ছিল ধীরে ধীরে, সুরে গমগম করে উঠছিল কক্ষ ; নিপুণিকা দেখতে পাচ্ছিল দেওয়াল-গাত্রের ছবিখানির পানে তাকিয়ে যুবরাজ তন্ময়। রাগ সংগীত শুনছেন, কিন্তু মনে হচ্ছিল অনুরাগের আনন্দ-আভা ফুটে রয়েছে যুবরাজের মুখমণ্ডলে—হয়তো অচেতনভাবে তারই বিচ্ছুরণ ঘটেছে তাঁর আচরণে। বাল্য-সহচরীর দুর্লভ সম্মান দিয়ে কাছে ডাকা কই আগে তো কখনও ঘটে নি! তার সুরে প্রাণের স্পর্শ পাওয়া যাচ্ছিল। সুরের নকশাগুলি যেন নিবেদনের মতো কারও পায়ে লুটিয়ে পড়তে চায়। ভক্তিমতীর মতো তন্ময় চিত্ত।

সংগীত পরিবেশন করছিল নিপুণিকা, দেওয়ালের বড় আয়নায় তার ললিত ভঙ্গি প্রতিবিম্বিত, মাঝে মাঝে চোখ পড়ছিল। আবেশ নামছিল চোখে, দৃষ্টি কখনও আয়নায় কখনও দেওয়ালে, দুটো ছবি যেন একাকার হয়ে যাচ্ছিল। তন্দ্রার মতো ঘোর নেমে এসেছে, যেন জেগে জেগে স্বপ্ন দেখ-ছিলেন প্রতাপাদিত্য।

'নিপুণিকা—'

গান থেমে যাবার পর ডাকলেন তিনি, স্বরে কোমলতা, যেন আবেশ-জড়ানো।

'আদেশ করুন—'

কেঁপে উঠল তার কণ্ঠস্বর, যুবরাজের বিভ্রম ঘটেছে নাকি, কী বলতে চান এই সন্ধ্যায়।

'ফের !'

কপট বিরক্তির রেখা কপালে, যেন ধমক দিতে চাইলেন।

'বলো—'

মুখ নামাল নিপুণিকা, সংকোচে আড়ষ্ট, যদিচ ছোটবেলায় এই নৈকট্যের ভাষায় সাড়া দিত।

'তোমার কাছে একটি ভিক্ষা আছে—'

উজ্জ্বল চোখ-মুখ, কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন, লক্ষ্য করছেন বাল্য-সহচরীর প্রতিক্রিয়া।

'ভিক্ষা? আমার কাছে! যুবরাজ, এ কী বলছো? আমি কী দিতে পারি তোমাকে—'

দারুণ বিচলিত, বুঝি বা শিহরিত। সুরেলা কণ্ঠে কাঁপন।

'আমি জানি, দেবার মতো অনেক সম্পদ তোমার আছে। আমি তা থেকে একটি জিনিস চাইছি। দিতে হবে গোপনে—'

মৃদু মৃদু হাসছিলেন। বুঝতে পারছিলেন, তাঁর রসিকতা ধরতে পারে নি। মেয়েদের চিন্তা বড় বেশি একমুখী।

'দয়া করে আমাকে বিভ্রান্ত কোরো না প্রতাপ। বলো, আমি তোমার কোন্ কাজে লাগতে পারি?'

উত্তেজনায় হাঁপিয়ে গেছে। নিশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

'রাজা গোবিন্দপ্রসাদের কিছু অর্থ আছে তোমার নামে। গচ্ছিত আছে আমার খুড়োমশায়ের কাছে। তা থেকে কিছু অংশ তুলে দিতে হবে—'

'তোমার প্রয়োজন?'

'হ্যাঁ—'

'কিন্তু তুমি চাইলেই তো পেতে! মহারাজা কৃপণ নন। এভাবে অর্থ চাও কেন?'

'আমার ইচ্ছা ওই অর্থ তুমি নাগালয়ে নিজে নিয়ে যাবে। বলে আসবে বিবাহের দিন যেন দরিদ্র-নারায়ণের সেবা করানো হয়।···এজন্যে কী বাবা কিংবা খুড়া মশায়ের কাছে টাকা চাইতে পারি?'

'এই ব্যাপার। আচ্ছা—'

বুকের ধকধকানি তখনও কাটে নি, নিপুণিকা হেসে চলে গেল কক্ষের বাইরে।

চরকির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিল সুন্দর। অবাক হয়ে চারিদিকে তাকাচ্ছিল আর বলছিল, 'দেখেছিস ব্যাপারখানা···হ্যাঁ যুবরাজের বিবাহের যোগ্য আয়োজন বটে···'

মনের ক্ষোভ দূর হয়ে গেছে তার—সেই ক্রীড়ানুষ্ঠানের পর থেকে সে যুবরাজের অনুচর-দলের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং অধিকাংশ সময় দুর্গমধ্যে থাকে বলে বহির্জগতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পারে না তেমন। মনের আনন্দে দুর্গে ঘুরে বেড়ায়, চঞ্চল প্রকৃতি, এক জায়গায় স্থির নয়—সর্বত্র যাতায়াত এবং সকলের সঙ্গে মেলামেশা থাকায অল্পদিনে প্রিয় হয়ে উঠেছে। যদিচ যুবরাজের কাছাকাছি থাকার সৌভাগ্য হয় নি তথাপি দুর্গের ভিতরে তার বাসস্থান নির্দিষ্ট ছিল—সুন্দর সেটা গ্রহণ করে নি। বিনীতভাবে বলেছে, 'আমি যেখানে আছি সেখানেই থাকব···ওখানে শংকরদা আছেন।' প্রকৃতপক্ষে শংকরকে সে গুরুজনের মতো শ্রদ্ধা করে এবং প্রভাবতীর স্নেহ-মমতার বন্ধনে আবদ্ধ, তাঁদের সংস্পর্শ ছেড়ে আসার কথা ভাবলেই মনের মধ্যে কষ্ট হয়। অতিরিক্ত আরও একটি আকর্ষণ সে অস্বীকার করতে পারে না, আপন জনের মতো খাবারের থালা বহন করে আনে, পাশে বসে থাকে যতক্ষণ-না আহার শেষ হয়, বড় বড় ডাগর দুটি চোখে কী মায়া! বন্য-জীবনে আকর্ষণ ছিল অন্যবিধ, তার রূপ রস রঙের স্বাদ আলাদা, এখনও ঠাস-অরণ্যানি ও সবুজের বিস্তার লেগে আছে চোখে; কিন্তু এখানে, এই নগর-জীবনে প্রাণের প্রকাশ যেমন বিচিত্র পরিচয় তেমনি বিপুল—সজীব মানুষের সান্নিধ্যে অনুভূতি রমণীয়! এই মানুষগুলিকে কী আদৌ চেনা যেত যারা আজ ঘিরে আছে চতুর্দিকে, শংকরদার সন্ধান কেউ কী তাকে দিত? পাওয়া যেত কী প্রভা-বৌদিকে? রাধা, এখন যে মেয়েটি তার সঙ্গে নগর-পরিভ্রমণে বেরিয়েছে—হাসছে, কথা বলছে, নাচের ভঙ্গিতে দুলে দুলে চলেছে পাশে—দেখা পাওয়া যেত কী কখনও? ভাগ্যবান মনে

হয় নিজেকে।

'দেখেছো নগরের শোভা? সারা যশোর মেতেছে উৎসবে···'

পথের দু'পাশের বাড়িগুলি নতুন রূপ ধারণ করেছে, সাধ্যমতো চিত্রিত ও সুশোভিত। সম্ভ্রান্ত গৃহের সন্নিধানে কাষ্ঠ তোরণ এবং দরিদ্রের গৃহগুলি সু-মার্জিত ও পরিচ্ছন্ন। বাজারে দোকানগুলির সজ্জা অতি মনোরম। অতিথি-সংখ্যা বেড়ে গেছে অনেক, প্রতি গৃহেই অতিথি-সমাগম, ফলে বাজারের সামগ্রীর চাহিদা বেড়েছে—বিক্রি তেমনি। রাধার হাত ধরে বাজার পর্যন্ত ঘুরে সুন্দর ফিরে চলল আবার।

'তোর খিদে পেয়েছে নাকি?'

রাধা বললে, 'না—'

'আমাদের সকলের নেমন্তন্ন, তুইও যাস। পেট ভরে যুবরাজের বিবাহের ভোজ খাওয়া যাবে।'

···রাজ-দরবারের শোভা সর্বাধিক, বিবাহ আগামীকাল, দূর দূরান্ত থেকে আত্মীয় কুটস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কর্মচারী সামাজিক নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত, সংখ্যায় অগণ্য, রাজবাড়ি থই থই। কোলাহলে কান পাতা যায় না, কোথাও আনন্দধ্বনি কোনোখানে অভ্যর্থনাসূচক মঙ্গলবাদ্য, গান, অভ্যাগত ও আহুতদের বাসস্থান নির্দেশ, খাদ্যসম্ভারপূর্ণ পাত্র নিয়ে বাহকদের গমনাগমন, চাঞ্চল্য যেমন চিৎকার তেমনি। ওই ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢুকেছিল সুন্দর, দেখছিল ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে। দেওয়ানখানায় কোনোদিন ঢোকে নি, দরবার-গৃহ পৃথক, দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে আন্দাজ একশো গজ হবে। কিন্তু পা ফেলতে সংকোচ হয়, মর্মরের মেঝেতে নানাবর্ণের পাথরের ফুলফল ও লতাপাতা আঁকা, পরিষ্কার ঝকঝকে। মনোরম খোদাই-কার্য স্তম্ভের গাত্রগুলিতে, সমস্ত চত্বর জুড়ে শ্রেণীবদ্ধ অনেকগুলি স্তম্ভ, ছোট-বড় নানারঙের প্রস্তর খচিত—দরবার বসার সময় নাকি মর্যাদা অনুযায়ী ব্যক্তিরা এক-একটি স্তম্ভ-এলাকা দখল করে থাকেন। বাসন্তী রঙের প্রাচীর গাত্রে সে দেখতে পাচ্ছিল বিচিত্র শোভা, সুচিত্রিত দেওয়াল-

গীর যেমন রয়েছে তেমনি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রাজা-মহারাজা, বাদশাহ ও দেশ-বিদেশের গুণীজনের তৈলচিত্রের নীরব উপস্থিতি। কোনোস্থানে সুবা-বাঙলার নকশা। যশোহরের নকশা ঠিক পাশে। দেখতে দেখতে এগিয়ে যাচ্ছিল সে, থেমে দাঁড়াল। পাশাপাশি বারোখানি তৈলচিত্র, প্রিয়জনের মতো কাছাকাছি রাখা। কারা এঁরা ?

'কী দেখছো ?'

রাধা নয়, বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠ। ওদিকে শ্রেণীবদ্ধভাবে স্বর্ণ-রৌপ্য বিজড়িত কারুমণ্ডিত অসংখ্য ঠেশ রৌশন চৌকি কেদারা ও তক্ত···তার ফাঁকে ফাঁকে মূল্যবান ধাতুনির্মিত ত্রিপদের ওপর মোরাদাবাদ, বারাণসী, কটকের কারু-মণ্ডিত নানা আকারের পুষ্পাধারে নানা বর্ণের ফুলের স্তবক, গ্রন্থি, মালা ও গুচ্ছ। মাঝের পথটি দীর্ঘ, অনতিপ্রসর, পথের ওপর পারস্য দেশের মখমলের আস্তরণ···পথের শেষে দ্বাদশ সংখ্যক রজত সোপান, তদগাত্রে বহুমূল্য প্রস্তরাদি খোদিত, গোলাকৃতি ; সেই দ্বাদশ সোপানের উপরি-ভাগে মধ্যস্থলে বিরাট হস্তিদন্তনির্মিত সিংহাসন, হেম-জড়িত, মণিমাণিক্য খচিত, বিচিত্র। তার পাশে দক্ষিণে ও বামে দ্বাদশটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায় একই রকম সিংহাসন।···দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল ওদিকে।

'হাঁ করে কী দেখছো ?'

সুন্দর ফিরে তাকাল, রাজ-সহচরী নিপুণিকা। এই পরিবেশের সঙ্গে যেন মিশে গেছে, চমৎকার অঙ্গসজ্জা, হাতে ফুলের গুচ্ছ।

'এলাহি কাণ্ড'—

আলাপ রাজ-অন্তঃপুরে, শ্রেষ্ঠ তীরন্দাজরূপে স্বীকৃতি পাওয়ার দিনে, যুব-রাজের আমন্ত্রণে সেই প্রথম প্রবেশ। আহারাদির ব্যবস্থা ছিল। পরি-বেশনের ভার পড়েছিল ওই সুন্দরী সহচরীর ওপর।

'তুমি যা দেখ তাতেই আশ্চর্য হয়ে যাও।' নিপুণিকা হাসছিল, 'এ ছাড়াও সংসারে কত আশ্চর্য জিনিস আছে তা যদি জানতে! দেখে দেখে আমি হদ্দ হয়ে গেলাম—'

সুন্দর বললে, 'আমি সবে দেখতে সুরু করেছি। আমার সঙ্গে কী আপনার তুলনা হয় ? সেইজন্যে যা দেখি, একেবারে গেঁথে রাখি মর্মে, যেন ভুলে না যাই—'

'আমাকে মনে রাখবে ?'

'নিশ্চয়—'

'কেন ?'

'আপনি খুব সুন্দর—'

'আমার মতো কাউকে দেখ নি আগে ?'

'দেখেছি। কিন্তু আপনার সঙ্গে আলাপ হল প্রথম—'

'ওই মেয়েটি কে ?'

'কার কথা বলছেন ?'

'যার সঙ্গে সারা সকাল ঘুরে বেড়ালে পথে-ঘাটে—'

'আপনি দেখেছেন ? ও তো রাধা !'

'ওর সঙ্গে ঘুরে বেড়াও কেন ?'

'বা, তাহলে কার সাথে বেড়াব ? আমাদের দুজনের মধ্যে খুব ভাব—'

'হুঁ। শোনো, তোমার চেয়ে আমি দু-এক বছরের বড় হব, কিংবা সমবয়সী, তুমি এবার থেকে 'আপনি-আজ্ঞে'গুলো বাদ দেবে। কথা না-শুনলে যুবরাজকে বলে বকুনি খাওয়াব। জানো তো আমি যুবরাজের বাল্য-সহচরী—'

'কিন্তু—'

'যা বললুম তাই করবে। আর যখন ডাকব তখনই আসবে। তুমি এত বাইরে বাইরে থাকো কেন, খাওয়ার সময় আসতে পারো না ?'

'প্রভা-বৌদি নিজের হাতে খাবার করে পাঠান বলে আমি বাড়িতে খাই—'

'যুবরাজ বলেছেন তুমি এখানে খাবে।'

'কই আমি তো শুনি নি ! কাকে বলেছেন ?'

'তুমি বড় তর্ক করো। বেশ, দুবেলা ইচ্ছা না-হয় একবেলা খাবে। যে-কাউকে

বলে দিও, আমি খাবার পাঠিয়ে দেব। একদিন খেয়ে দেখো তোমার প্রভা-বৌদির চেয়ে সেটা খারাপ লাগবে না—'

'আচ্ছা। তোমাকে এখানে দেখব আশা করি নি—'

'সহচরীরা বললে, দরবার-গৃহে ফুল সাজানো শেষ হয়েছে, তাই দেখতে এসেছিলাম। কিন্তু তুমি অমন হাঁ করে কী দেখছিলে?'

'ওই ছবিগুলো—?'

'ওঁদের চিনতে পারো নি তো। ওঁরা হলেন দ্বাদশ ভৌমিক, ক্রমে জানতে পারবে—'

বিকেলে দুর্গের অভ্যন্তরে প্রকাণ্ড ঘণ্টায় পর পর আঘাত পড়ল, ঢং ঢং ঢং ঢং···

দরবার বসার সংকেত। পুত্রের বিবাহের উদ্যোগ করেছিলেন অতি সমারোহের সঙ্গে, কোথাও কোনো ত্রুটি আছে কিনা দেখতে চাইছিলেন দরবার ডেকে, ঘণ্টাধ্বনি হয়েছে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নির্দেশক্রমেই। যদিও ত্রুটি নেই তবু দেখতে দোষ কি।

···ভাই ধরতে পারে নি হঠাৎ কেন মতি পরিবর্তন করে তিনি মেতে উঠেছেন এমন ব্যাপক আয়োজনে, হয়তো ভেবেছে একমাত্র পুত্রের বিবাহ বলেই এত আনন্দের প্রকাশ কিংবা যশোর প্রতিষ্ঠিত হবার পর এই প্রথম শুভকাজ হিসাবে তিনি সাড়া দিয়েছেন সর্বতোভাবে। হাসলেন বিক্রমাদিত্য আপন মনে, ঘণ্টাধ্বনি শুনেছেন, দরবার-অভিমুখে এই চিন্তা-প্রযুক্ত হয়ে যে বসন্তরায় যত বুদ্ধিমান হোক, তাঁর অনন্দের কারণ ধরতে পারে নি—পারা সম্ভব নয়। তিনি নিজেও নিরুৎসাহ ছিলেন কিছুদিন আগে পর্যন্ত, পুত্রের ইচ্ছা ও পছন্দের কাছে নতি-স্বীকার করতে হচ্ছে বলে ক্ষুব্ধ ছিলেন মনে মনে, ভেবে দেখেন নি অন্য দিকটি। বশে আনা যাচ্ছে না পুত্রকে, কেবল বাইরের দিকে ঝোঁক; শুধু শিকারগত ব্যাপার হলে চিন্তার কারণ ছিল না,

শিকারে যত-খুশি যাক আপত্তি নেই, প্রতিবার সফলতার সঙ্গে ফিরে আসবে এমন নাও হতে পারে—মৃত্যু না-হোক পঙ্গু, বরাবরকার মতো পঙ্গু হবার সম্ভাবনা আছে তাতে, তাই প্রতাপের শিকারে বেরবার কালে কোনো-বার বাধা দেন নি তিনি। কিন্তু আশ্চর্য ভাগ্য, দৈব সহায় ছাড়া আর-কি বলা যায়, প্রতিবার অক্ষত ফিরে এসেছে প্রতাপ। সুন্দরবনের জন্তুগুলো নিতান্তই চতুষ্পদ জন্তু বিশেষ !

ওদিক দিয়ে কিছু হয় নি, রঙ্গক্রীড়ার গোপন আয়োজন পর্যন্ত ব্যর্থ, কোনো-প্রকারে দমিত করা যায় নি তাকে। ইদানীং সংবাদ পাওয়া গেছে, বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি পুত্রের আস্থা ও আকর্ষণ কম—শ্মশানক্ষেত্রে যাতায়াত করে বীরাচারী তান্ত্রিকদের সঙ্গে মেলামেশা ধরেছে এবং সেই ধর্মে আনুগত্য প্রকাশ করেছে। দুর্মতি আর কাকে বলে ! এ-সব লক্ষণ শুভ নয়। কিন্তু প্রতিরোধ করার পথই বা কই ? মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করে দেখেছেন শোভন পথ ওই একটাই, শুধু প্রতাপ কেন যে-কোনো ছেলের স্কন্ধে বিবাহের জোয়াল চাপাতে পারলে তার গতি শ্লথ হতে বাধ্য—হঠাৎ এই চিন্তা এসেছে, খুশি হয়ে উঠেছেন। তদুপরি যদি নিজের পছন্দ-করা পাত্রী হয় তবে তার দামালপনা কমে যাবে আপনা থেকে।···অতএব দেশ-শুদ্ধ লোককে নিমন্ত্রণ করা যায়। এবং তাই করেছেন তিনি। পুত্রের অস্ত্রেই পুত্র ঘায়েল হবে।

এই বিবাহ উপলক্ষে বিদ্বান ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য গুণী ব্যক্তিদের যেমন নিমন্ত্রণ তেমনি তাঁদের আগমনের সুবিধার জন্যে নানাস্থানে নৌকা ও কর্মচারীবৃন্দকে প্রেরণ করেছিলেন ; যাঁরা দূর-দূরান্তে ফিরে যাবেন তাঁদের যাতে কোনো প্রকার ক্লেশ বা অসুবিধা না-হয় সেজন্যে কর্মচারীদের উপর নির্দেশ ছিল যে তারা যেন যত্নের সঙ্গে সুবিধা-অসুবিধাগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখে। নানাদেশ থেকে সমাগত জনগণের সম্মেলনে যশোর আনন্দময় হয়ে উঠেছে তা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন এবং সেই কারণে সমাগত ব্যক্তিগণের প্রীতির জন্যে এক-দিকে যেমন ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের ব্যবস্থা, ছোট-বড় সকলেই আকৃষ্ট

তাতে, অন্য দিকে মধুকণ্ঠ গায়কগণ কর্তৃক জয়দেব প্রভৃতি কবিগণের স্থললিত সংগীত পরিবেশন, বর্ষিয়সী মহিলাদের ভিড় বেশি। যশোর নগর থই থই করছে লোকে, তিনি জানতেন অজস্র লোক আসবে এবং আনন্দ প্রকাশ করবে।

আগামীকাল সন্ধ্যালগ্নে প্রতাপের বিবাহ—উৎসব চলবে পরবর্তী আরও সাত দিন। অসংখ্য পাঁচরঙা নিশান তুলে দেওয়া হয়েছে দুর্গশীর্ষে, দেবদারু পত্র জবামাল্য আর অশোকগুচ্ছে নগরের অগণ্য তোরণ-সকল সজ্জিত। নাগরিকবৃন্দের বাসভবনের সম্মুখে সশীর্ষ নারিকেল শোভিত সিঁদুর অংকিত পূর্ণকুম্ভ ও কদলীবৃক্ষ—দ্বারে গবাক্ষে বাতায়নে নানা বর্ণের পতাকা পুষ্পমাল্য আম্রশাখা শোভা পাচ্ছিল। দুর্গের ভিতরে ও বাইরে অসংখ্য নহবৎ, বিরামহীন সুর-লহরীতে মাড়িয়ে রেখেছে নগর। তিনি জানতেন এ-সব ব্যতীত ঐন্দ্রজালিক, গায়ক, বাদক, কীর্তনকারী, শ্যামাসংগীত গায়ক প্রভৃতির উপস্থিতিতে নগরমধ্যে বড় ধূমধাম—যমুনার উভয় তটে সুসজ্জা, ভবানী মন্দিরে অনুক্ষণ নাম-গান।···এই আনন্দ তাঁর চিত্ত স্পর্শ করেছে, অন্তত এখন মনে কোনো মালিন্য নেই, সর্বান্তঃকরণে পুত্রকে আশীর্বাদ করতে পারেন।

তিনি দরবার-গৃহে প্রবেশ করলেন।

ঘণ্টাধ্বনি শুনে সচকিত হয়েছিল সকলে। সাড়া পড়ে গিয়েছিল সর্বত্র।

‘কিরে তুই যাবি না?’

সুন্দর বললে, ‘আপনি যান, আমি যাচ্ছি একটু পরে—’

‘তাড়াতাড়ি আয়, নইলে জায়গা পাবি না, একেবারে পেছনে দাঁড়াতে হবে।’

কারণ, শংকর দেখতে পাচ্ছিলেন রাস্তা দিয়ে সারি সারি চলেছে রক্ষী প্রহরী চোপদার পদাতিক অশ্বারোহী গজারোহী সুসজ্জিত বাহিনী···বাদ

যাবে না কেউ। নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত সকলেই আসবে। আজ সবচেয়ে বেশি জনসমাগম হবে দরবারে। শংকর ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন দ্রুতবেগে।

সুন্দর যেজন্যে অপেক্ষা করছিল তা বুঝি আর হল না, একসঙ্গে যাবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু রাধার পাত্তা নেই। আগে থেকে বলা ছিল না অবশ্য তবু ঘণ্টাধ্বনি সে শুনেছে নিশ্চয় আর এ-কথা সে জানে যে ঘরে স্থির থাকতে পারবে না সুন্দর। এই বিবাহ উপলক্ষে নগরে এত জমজমা যে কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা দেখবে ঠিক থাকে না সব সময়, যা দেখে তাতেই আশ্চর্য হয়ে যায়, সঙ্গে একজন-কেউ থাকলে আনন্দ ও দর্শন নিবিড় হয়, ওই মেয়েটা যদি তা বোঝে !

'প্রভা-বৌদি, রাধাকে দেখছি না যে, সে কোথায় ?'

অধৈর্য হয়ে চলে এসেছিল এ-বাড়ি, শংকরদা বেরিয়ে গেছেন, প্রভা-বৌদিকে জিজ্ঞাসা করা যায়।

'বাজারে পাঠিয়েছি। কেন বলো তো ?'

প্রভা-বৌদি হাসছিলেন বুঝে চোখ তুলে তাকানো যাচ্ছিল না, অথচ রাধার খোঁজ নিতে এসেছে বলে হাসার কী আছে সে ভেবে পেল না। শহরের মানুষগুলো বড় অদ্ভুত ?

'এমনি—'

সুন্দর আর কোনো কথা না-বলে দরবার-অভিমুখে রওনা দিল।

'কিরে পিছিয়ে গেছিস তো ! পা চালিয়ে আয়—'

মদনদা চলে গেলেন ঘোড়া ছুটিয়ে। বিরাট চেহারা, যুবরাজের অনুচরদের সর্দার, তার নিজেরও কর্তা। মদনদার কাছে তার হাজিরা এবং তার নির্দেশেই চলতে হয়। খুব আমুদে লোক, ভোজনবিলাসী। ওর একার আহারে গোটা একটি দলের ক্ষুন্নিবৃত্তি মিটতে পারে, আহারে প্রচুর আসক্তি, এক-একদিন ও নিয়ে নানা ঠাট্টা-তামাসা হয়। কিন্তু মাটির মানুষ, রাগ করেন না সহজে। শ্রেষ্ঠ তীরন্দাজরূপে গণ্য হবার পর তাকে স্নেহের চক্ষে দেখেন এবং সব আবদার মেনে নেন। সুন্দর ভাবছিল যুবরাজের দলে সকলেই গুণী

এবং চমৎকার লোক, যত মিশছে আর দেখছে ততই ভালো লাগছে। তুলনা হয় না।…কিন্তু মেয়েরা যেন কেমন কেমন, ওই নিপুণিকা রাধা প্রভা-বৌদি কেউ স্পষ্ট নয়, কেন হাসে কেন ডাকে কেন কাছে আসে বোঝা মুশকিল। প্রভা-বৌদির হাসিটা মনে পড়ছিল এখন, অন্য কোনো অর্থ ছিল ওই হাসির মধ্যে যা সে ধরতে পারছে না, কিন্তু কোন্ অর্থ থাকতে পারে? কেন হেসেছিলেন প্রভা-বৌদি? রাধাকে ডাকতে গিয়েছিল বলে হাসতে হবে নাকি? কই, মদনদাকে ডাকতে গেলে তো তিনি এ-রকম হাসেন না! মাথায় ঢুকছিল না কিছুতেই। তেমনি দুর্বোধ্য নিপুণিকার আচরণ। তাকে খেতে বলার কী দরকার? সে কী খেতে পাচ্ছে না? মাঝে মাঝে তার নিমন্ত্রণ রক্ষা না-করলে অনর্থ বাধতে পারে, যুবরাজের মন বিষিয়ে দিতে পারে অনায়াসেই, সে ক্ষমতা তার আছে, সে যুবরাজের বাল্য-সহচরী। অধিকন্তু দেখেছে সারা সকাল রাধার সঙ্গে টো টো করে ঘুরে বেড়ানো, দেখেছে কিংবা শুনেছে যাই হোক, এতে রাগ করার কী আছে? সে কী কারো সঙ্গে স্বাধীনভাবে বেড়াতে পারবে না? কোথায় এবং কিসের যেন জট পাকিয়ে গেছে এই রাধাকে নিয়েই। রাধার সঙ্গে আলোচনা করবার জন্যে সে এতক্ষণ অপেক্ষা করেছে, অথচ রাধা এল না।

তোপধ্বনি হয়ে গেছে একবার, পথে দ্বিতীয়বার শুনেছিল ঘণ্টাধ্বনি, তোরণ পার হতে হতে শুনল তৃতীয় সংকেত—মিষ্টি-মধুর বাদ্যধ্বনি। অসংখ্য লোক তখনও প্রবেশ করছে, ভিড়ে চাপাচাপি অবস্থা, ঠেলে কোনোমতে দরবার-গৃহে পৌঁছে দেখল মদনদার অনুমান মিথ্যা নয়। দাঁড়াতে হল প্রায় শেষদিকে, অনুচরদের জন্যে আলাদা সারিতে। যুবরাজের অনুচরের সংখ্যাও প্রচুর। মদনদাকে দেখা যাচ্ছিল সারির সামনের দিকে, আরও অনেকে আছেন বটে কিন্তু পেছন থেকে ঠাহর করে বোঝা যাচ্ছিল না কে কোন্ জন। শংকরদা ও সূর্যদা সিংহাসনের নিচে অভ্যর্থনায় ব্যস্ত, বিশিষ্ট ও গুণী-জ্ঞানী ব্যক্তিরা আসন গ্রহণ করেছেন সিংহাসনের নিচে প্রথম সারিতে। তাঁদের পোশাক ও ভঙ্গি সম্ভ্রমসূচক। সিংহাসনে উপবিষ্ট মহারাজ বিক্রমাদিত্য

এবং তাঁর একপার্শ্বে ছোটরাজা বসন্তরায়, অন্যপার্শ্বের আসনটি শূন্য···ওই আসন যুবরাজের জন্যে নির্দিষ্ট, আপাতত শূন্য। মন্ত্রী ও অমাত্যবর্গ স্ব স্ব আসনে আসীন। তথাপি অনেকগুলি আসন শূন্য ছিল।

দরবার-গৃহ একেবারে ভরপুর।

নকীব এক-একটি বিশিষ্ট নাম হেঁকে যাচ্ছিল আর তাঁরা উঠে দাঁড়িয়ে কেউ নমস্কার কেউ প্রণাম জানাচ্ছিলেন। বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় বয়ঃকনিষ্ঠদের প্রণাম ও জ্যেষ্ঠদের নমস্কার গ্রহণ করছিলেন প্রসন্নচিত্তে। তাঁদের সিংহাসনের পাশে যে আসনগুলি শূন্য ছিল, উভয়ে সাদরে তাঁদের আহ্বান করে সেই-সব আসনে উপবেশনে অনুরোধ করছিলেন। কেউ দক্ষিণে কেউ বামে আসন নিচ্ছিলেন, যে-কোনো ব্যক্তির পক্ষে এটা সর্বাধিক সম্মান। সুন্দরের জানতে ইচ্ছা করছিল ওঁরা কারা, এত সম্মান পাচ্ছেন কেন?

নকীব পর-পর হেঁকে যাচ্ছিল তাঁদের পরিচয়ঃ

'বঙ্গজ কায়স্থ কুলতিলক চন্দ্রদ্বীপ-অধিপতি—'

'বঙ্গজ কায়স্থ কুলপ্রদীপ শ্রীপুরাধিপ অশ্বিনীকুমারদ্বয়—'

'উত্তররাঢ়ীয় কুলতিলক ভূষণাধীশ্বর—'

'ব্রাহ্মণকুলসবিতা ভুলুয়া-অধিপতি—'

'প্রবলপ্রতাপ হিজলিপতি ঈশা খাঁ মসনদ আলি—'

ইনি মুসলমান। সুন্দর দেখল, বসন্তরায় উষ্ণীষ খুলে হাতে নিয়ে অবনত হয়ে তসলিম জানালেন। ঈশা খাঁ উঠে এসে সেই উষ্ণীষ গ্রহণ এবং নিজশিরে স্থাপন করে সিংহাসনের দক্ষিণ পার্শ্বে আসন নিলেন।

'এটা কী হল?'

ফিসফিস করল সুন্দর।

পাশের লোকটি বললে, 'উনি ছোটরাজার 'পাগড়ি-বদলি' ভাই—'

'ও।'

নকীব হাঁকছিলঃ 'দৈবশক্তিসম্পন্ন ভাওয়াল সাহা ফজল গাজী—'

ইনিও প্রত্যাভিবাদন গ্রহণ করে দক্ষিণপার্শ্বে আসন নিলেন।

'মল্লকুলসূর্য বিষ্ণুপুর-অধিপতি—'

'দ্বিজেন্দ্র তাহিরপুর-অধিপতি—'

'বঙ্গের অর্গল রাজেন্দ্রকুলচন্দ্রমা দিনাজপুর—'

'দ্বিজেন্দ্র পাবনাধিপতি—'

'রমণীকুলধন্যা পুটিয়ায় অধিশ্বরী—,

তিনি বিশেষ সম্মানের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী প্রকোষ্ঠে অবস্থান করছিলেন, নকীবের ঘোষণার পরে সভামধ্যে দেখা দিলেন। নমস্কার জানিয়ে প্রকোষ্ঠে চলে গেলেন আবার।

সভা হল নিস্তব্ধ।

'এরা কারা ভাই?'

'জানো না?'

'আমি নতুন এসেছি কিনা—'

'দেওয়ালে ওই ছবিগুলো দেখেছো?'

'হ্যাঁ—'

'এঁরা ওই ছবিগুলোর জীবন্ত মূর্তি। বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ ভৌমিকগণ, এঁরাই বঙ্গদেশ শাসনে রেখেছেন।'

সুন্দর দূর থেকে বুঝতে পারে নি, এখন মনে হল তাই বটে। ছবিগুলির সঙ্গে ওঁদের হুবহু মিল।

এগারো জনের নাম পাওয়া গেছে। দ্বাদশ চিত্রটির পরিচয়ের দরকার নেই, তিনি মহারাজা বিক্রমাদিত্য। নিজস্ব দরবার, তাঁর ছবি রয়ে গেছে একটি।

সকলে প্রতীক্ষা করছিল যুবরাজের উপস্থিতি।

নকীব হাঁকল: 'যুবরাজ প্রতাপ-আদিত্য—'

প্রবেশ করলেন যুবরাজ।

সেই অনিন্দ্যসুন্দর বীরাকৃতি চেহারা, সুন্দর দেখছিল, হীরক-খচিত রক্তবর্ণ পরিচ্ছদ। মণিময় কটিবন্ধ—দরবারে এসেছেন বলে কৃপাণশূন্য। বক্ষে রত্ন-বিজড়িত মোতিগুচ্ছ, বাহুতে কবচ ও রত্নালংকার, কর্ণে স্বর্ণাবিমণ্ডিত

প্রবাল। মস্তকে রক্তবর্ণ পক্ষীপুচ্ছ তরঙ্গায়িত, মণিমাণিক্যখচিত উষ্ণীষ, তার মধ্যস্থলে ললাটের ঠিক উপরে প্রকাণ্ড একটি হীরকখণ্ড। অপূর্ব দেখাচ্ছিল। গাত্রোত্থান করে সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন সকলে, বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত-রায় ব্যতীত।

'দ্বিজেন্দ্র সমাজ! আমার প্রণাম গ্রহণ করুন—'

সকলের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে প্রতাপাদিত্য নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করলেন।

'আগমীকল্য বিবাহ। আপনারা ওকে আশীর্বাদ করুন—'

বসন্তরায়ের আবেদনক্রমে সমস্ত দরবার হর্ষধ্বনি করে উঠল।

'যাঁরা বরযাত্রী যাবেন অনুগ্রহ করে তাঁরা অপরাহ্ণে উপস্থিত হবেন—'

অনুরোধ জানালেন বিক্রমাদিত্য।

'কখন যাত্রা সুরু হবে?'

'সন্ধ্যাপূর্বে—'

উত্তর দিলেন বিক্রমাদিত্য।

···পরদিন বরযাত্রীর সঙ্গে চলল সুন্দর। দীপমালায় সজ্জিত হয়েছে নগরী—যমুনা তটের শোভা আরও হৃদয়গ্রাহী। দীপরশ্মি প্রতিভাত হয়ে যমুনা-বক্ষ অপরূপ শোভা ধারণ করেছে, যা সচরাচর দেখা যায় না। দুর্গ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে পূর্বদিকে যে রাজপথ চলে গেছে, তার দুপাশে নগরপালের অধীনে শ্রেণীবদ্ধভাবে সুসজ্জিত অসংখ্য রক্ষী বরযাত্রীদের সম্মান-রক্ষায় দণ্ডায়মান। বিশেষ তোরণ অতিক্রম করে বেরিয়ে এসেছে বরযাত্রী দল, অপর তোরণে শৃংখলাবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে দর্শকবৃন্দ অভিনন্দন জানাচ্ছিল। নহবৎ বাজছিল মিষ্টিসুরে, ওরা বেরিয়ে আসার পর দামামা জয়ঢাক কাড়া বাঁশি মৃদঙ্গ দগড় যে যা-পেয়েছে বাজাতে সুরু করেছে আনন্দের অভিব্যক্তি স্বরূপ—কোলাহলের মতো লাগছিল। তৎসহ মিশেছে পুরাঙ্গনাদের উলু ও শঙ্খধ্বনি। পথের ধারে পাঁচরঙা পতাকা উড়ছিল, গন্ধ ধূমে বাতাস আমোদিত।

সুন্দর দেখেছে দুর্গ-মুরচা থেকে ঘন ঘন তোপধ্বনির মধ্যে প্রথমে বেরিয়ে এলেন মহারাজা বিক্রমাদিত্য, তৎপরে ব্রাহ্মণমণ্ডলী ও ভৌমিকবৃন্দ, বসন্তরায় তাঁর পিছনে। যুবরাজ এলেন হেমদণ্ড উপরে অষ্টকোণবিশিষ্ট ছত্র শোভিত হয়ে—তাঁর দক্ষিণে সূর্যকান্ত ও বামে শংকর, উভয়ে কুমকুম বর্ণ পরিচ্ছদে সজ্জিত থাকায় একটা শ্রী ফুটে উঠেছিল। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নির্দেশে ভবানী-মন্দিরে প্রার্থনা জানিয়ে ওঁরা যমুনা পার হয়ে চললেন নাগালয়-অভিমুখে।

নাগালয সাধ্যমতো সুশোভিত করেছেন জীতমিত্র নাগ। প্রাসাদের উভয় পার্শ্বে সারিবদ্ধভাবে ছোট ছোট বিবিধ বর্ণের কানাত—তা থেকে নানারঙের রশ্মি বেরিযে সমগ্র নাগালয় যেন সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে। অপূর্ব রক্ত প্রস্তর-নির্মিত প্রবেশ স্তম্ভ—তার গায়ে সুগন্ধি তৈলপূর্ণ অসংখ্য দীপ, প্রজ্বলিত শিখার চারিদিকে পতঙ্গেরা ক্রীড়াবিমুগ্ধ। সেই রকম একটি স্তম্ভের পাশে দাঁড়িয়ে বরযাত্রীদের অভ্যর্থনা করছিলেন জীতমিত্র। দ্বারে দ্বারে মঙ্গলঘট সিঁদুর-পুত্তলিকা পুষ্পমাল্য প্রভৃতি সযত্নে রক্ষিত। দীপ-রশ্মি-সহযোগে বিরাট একটি ভবানীমূর্তি অংকিত—বায়ুভরে কাঁপছিল। সুন্দর তার নিচে দাঁড়িয়ে হাঁ করে চতুর্দিক নিরীক্ষণ করছিল।

'মাথা ঘুরে গেছে নিশ্চয় : সাধে কী বলি বনমানুষ—'

সকৌতুক রহস্যালাপ। ঘুরে দাঁড়াল সুন্দর। অবাক হয়ে গেছে।

'রাধা, তুই !'

'কেন, আসতে নেই নাকি ? এখানে যুবরাজের আদেশ অচল, সাধ্যি থাকে তো বার করে দাও—'

'আরে না, না। আমি তা বলি নি। মানে—'

'অরুদির সঙ্গে এসেছি। অরুদিকে চেনো তো ?'

'মেয়েদের মধ্যে আমি শুধু একজনকেই চিনি, তার নাম রাধা—'

'বা, এই তো কথা শিখেছো। নগরের হাওয়া লেগেছে গায়ে। বেশ। রাধা ছাড়া আর কাউকে চেনো না বুঝি ? মিথ্যা কথা বোলো না—'

'মিথ্যে বলব কেন ? আর কাকে চিনি ?'

'কেন, যে তোমাকে খাবার নেমন্তন্ন করেছে আর না-গেলে চাকরি খতম করে দেবে বলে শাসিয়েছে—'

'বাবা তুমি তো খুব মেয়ে ! শুনলে কী করে ?'

'জানি। জানতে হয়। আমার দুটো লম্বা লম্বা কান আছে—'

'তুমি তাহলে লম্বকর্ণ !'

'শুধু আমি কেন, সব মেয়েই তাই। মেয়েদের কান দেখতে ছোট কিন্তু সব শুনতে পায়—'

সুন্দর দেখতে পাচ্ছিল ব্রাহ্মণ ও অধ্যাপকমণ্ডলী নির্দিষ্ট স্থানে আসন গ্রহণ করেছেন, নাগমশায় তাঁদের আপ্যায়নে ব্যস্ত। ফাঁকা চত্বরে কিছুদূরে চমৎকার শিবির একটি, পাশে আরও কতকগুলি, ছোটরাজা ও ভৌমিকগণ প্রথমে প্রবেশ করলেন এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ বাকি তাঁবুগুলিতে। প্রকোষ্ঠ ও প্রাঙ্গনের অস্থায়ী বাসস্থানগুলি পূর্ণ হয়ে গেছে সাধারণ নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ দ্বারা। কোলাহল শোনা যাচ্ছিল, চেঁচামেচি, হইচই। ওদের কথা বলতে অসুবিধা হচ্ছিল।

রাধা বলল, 'আমি যাই। নিপুদির কানে কথা উঠতে পারে আবার—'

হেসে চলে গেল। বোকার মতো দাঁড়িয়েছিল সুন্দর। মেয়েদের রহস্য বোঝা ভার। সুন্দরবনের অরণ্যের চেয়েও জটিল ওদের মনের গহিন প্রদেশ, আলোর চেয়ে ছায়া বেশি, গোলকধাঁধা-বিশেষ। গোলকধাঁধা যে ঠিক কী সুন্দর জানত না, রাধা শিখিয়েছে খেলাটি, মেয়েরা ও-খেলায় নাকি পটু। অন্তত রাধার কাছে কোনোবার জিততে পারে নি সুন্দর— বার বার নেমে গেছে নরকে আর রাধা হেসেছে। বলেছে, 'তুমি নরকে পচে মরবে, আর আমি ড্যাং ড্যাং করে গোলকধামে চলে যাব।' তখনই বুঝেছিল গোলকধাঁধা বলে বটে প্রকৃতপক্ষে ওটা গোলকধাম, নানা জটিল আবর্ত আছে, সহজে ওঠা যায় না ওখানে। মেয়েরা সবাই বোধহয় গোলকধামে যায়, উদাস হয়ে গিয়েছিল সুন্দর, তার কপালে আছে নরক।

সে যে খেলতে জানে না! খেলা-টেলা আসে না আদৌ।

অন্দরের দ্বারের কাছে বেজায় ভিড়···যুবরাজ এসে গেছেন, তাঁর সামনে ধরা হয়েছে দৃষ্টিপ্রদীপ, তিনি চোখ ফিরিয়ে নিলেন। উজ্জ্বল দৃষ্টিপ্রদীপে তাঁর চক্ষু ধাঁধিয়ে যাচ্ছিল। উলুধ্বনিতে কান পাতা যায় না, রাশি রাশি পুষ্পমাল্য লাজ ধানদূর্বা বর্ষিত হচ্ছিল, শঙ্খরবে অন্তঃপুর মুখরিত সুবেশা সুন্দরী মহিলাদের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে যুবরাজ এগিয়ে চললেন নির্দিষ্ট কক্ষের দিকে। সুন্দর ইতস্তত করছিল। সে একা পড়ে গেছে। কী করবে কোন্ দিকে যাবে ভেবে পাচ্ছিল না।

'তুমি এখনও দাঁড়িয়ে! চলো চলো, খেতে বসার জন্যে ডাকাডাকি করছে—'

মদনদা যেতে যেতে হেঁকে গেলেন।

···আহারের আয়োজন বিরাট। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় বিশেষে পরিপাটি ব্যবস্থা। সুন্দর বসেছিল মদনের পাশেই। মদনদার পাত খালি হচ্ছিল ঘন ঘন আর বলছিলেন, 'কিরে চোঁড়া, হাত গুটিয়ে বসে আছিস কেন? পাখি মারতে পারিস বলে পাখির মতো আহার শিখেছিস নাকি? খেয়ে নে খেয়ে নে—'

পেটে আর জায়গা ছিল না সুন্দরের। পাতের ওপর হাত দুটি জড়ো করে সে ক্রমাগত 'না না' করছিল আর বলছিল, 'ওকে দিন ওকে দিন—'

পরিবেশনকারীরা বুঝে ফেলেছিলেন এ-দলের মধ্যে খাদ্যরসিক যদি কেউ থাকেন তবে ওই ব্যক্তি—মদন যাঁর নাম। তারা বিশেষ মনোযোগী হল। ভারে ভারে সুখাদ্য আসে আর ঢেলে দেয় মদনের পাতে—নির্বিকার মদন অত্যন্ত সন্তুষ্ট চিত্তে তা গলাধঃকরণ করেন। সকলের আহার শেষ হয়ে গিয়েছিল, তারা কৌতুক-সহকারে এই দৃশ্য অবলোকন করছিল।

সুন্দর মৃদুস্বরে বললে, 'মদনদা, আমরা অনেকক্ষণ বসে আছি—'

'বাগড়া দিসনে। আর-একটুখানি বস্। পেটের কোণাটা সবে ভরে উঠছে।'

যথেষ্ট সময় লাগল তাঁর আহার-পর্ব শেষ হতে।

'তোদের জন্যে তাড়াতাড়ি উঠতে হচ্ছে। নইলে—'

পানীয় জলের জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

'জল। জল কই রে—'

জলভর্তি পাত্র নিয়ে এল একজন।

'ও কি! বড় কলসী নিয়ে এস একটা—'

আহারের মতই প্রচুর পরিমাণে জলপান করে উঠে দাঁড়ালেন মদনদা, সুন্দর এগিয়ে যেতে দিল তাকে। ওই বিরাট চেহারার পেছনে থাকলে সহজে ভিড় ঠেলে বেরনো যাবে। সুন্দর নেমে এল সেইভাবে।

'নাগিনী—'

কালরাত্রি পার হয়েছে, আজ ফুলশয্যা। সারাদিন এবং মধ্যযাম অবধি রাজপ্রাসাদে বিপুল কর্মতৎপরতা। সমস্ত নগরবাসী নিমন্ত্রিত ছিল, ফলে বিরাট কর্মকাণ্ডের পরে এখন ক্লান্তি নেমেছে, বিশ্রাম ও নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ছে একে একে। নিঝুম হয়ে আসছে রাজপ্রাসাদ। অন্তত এ-কক্ষ থেকে চলে গেছে সবাই, নিপুণিকা ছিল শেষ পর্যন্ত, সরস রসিকতায় কিছু মধুর বাক্যবর্ষণ করে সে উঠে গেছে এইমাত্র—কেউ নেই কক্ষে। যমুনা-বক্ষ থেকে ভেসে আসছে ঝিরঝিরে বাতাস, নহবতে কি-এক আকুল-করা সুর, মোমের আলোয় ফুলের শয্যাটি মনে হচ্ছিল স্বর্গের উদ্যান বুঝি। তার মধ্যস্থলে সালাংকারা মূর্তিটি ঈষৎ জুবুথুবু, কিন্তু উপবেশনের ভঙ্গিতে চমৎকার একটি শিল্প-সুষমা। ফুলে-ঢাকা স্বর্ণ-পালংকে ঠেস দিয়ে, হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে বসে আছে যেন অরুন্ধতীর হাতে-আঁকা ছবিটি। ঘোমটা ঈষৎ খসেছে, মুখখানি পদ্মের মতো। যখন বেণী-সংবদ্ধ মাথা তোলে, এমন অনেকবারই হয়েছে, ঠিক যেন পদ্ম-গোখুরার ফণা একটি। বারে বারে তাকিয়েছে আর ওই সাপের উপমা মনে এসেছে। কেন মনে আসছে সাপের উপমা, ভাবতে গিয়ে যশোর ও সুন্দরবন অঞ্চলে বিষধর সাপগুলির কথা এসেছে স্মরণে।

যশোর পত্তনের সময় খুড়ো মশায় এ-রকম বহু বিষধরের মুখোমুখি হয়েছেন আর মদন তো এখনও সাপেদের ঠিকুজি-কোষ্ঠী বলে যায় হাসতে হাসতে, যেন কোনো মজার কাহিনী বলছে। পরে কৌতূহলী হয়ে অনেক কথা জেনেছিলেন প্রতাপাদিত্য।

'নাগিনী—'

হেসে, আর-একবার ডাকলেন তিনি। চোখ তুলেই নামিয়ে নিলেন শরৎ-সুন্দরী। ফের হাঁটুতে থুতনি রাখলেন। ঘোমটা পুরো খসে গেছে মাথা থেকে, অবিকল সাপের ফণা। '···মদন তিনভাগে ভাগ করেছে বিষধরদের, মনে পড়ছিল। চৌসাপা, বোড়া আর বীজজড়ী। চৌসাপার ভাগে ধরেছি কেউটে গোখরো আইরাজ ও কানড়। এই চারটে সাপের মধ্যে আবার নানাপ্রকার ভেদ আছে—'

'তুমি বড় জটিল করে ফেলেছো মদন, পরিষ্কার করে বলো।'

মদন বললে, 'আপনারা জানেন কেউটে হল আট প্রকার—'

'তুমি গুনে দেখেছো নাকি?'

মদন বললে, 'যারা গুনীন তারাও বলে। যতদূর জানা গেছে এ-পর্যন্ত আট প্রকারের কেউটের দর্শন পেয়েছে লোকে—'

'শুনি তাদের নাম?'

মদন একটু ভেবে নিল। বললে, 'কয়েকটা কেউটের নাম তো সকলেই জানে। যেমন, কাল কেউটে—এই সাপগুলো আকারে ছোট, চোখ লালবর্ণ আর গায়ের রঙ কালো। আ'ল কেউটে—এদের গাত্রবর্ণ নীল। তেঁতুলে কেউটে দেখতে অনেকটা জলবোড়া সাপের মতো, তফাৎ শুধু গাত্রবর্ণ, লাল। ঘিতে ভাঙা বা শামুক ভাঙা অনেকে হয়তো দেখেছেন কিন্তু সবচেয়ে সুন্দর দেখতে পদ্ম কেউটে বা তারা ফুটকি, ওদের মাথায় পদ্মের চিহ্ন সুস্পষ্ট দেখা যায়। বাঁশবুনে কেউটের গায়ে শাদা শাদা ডোরা দাগ আর দুধে খরিষ হল সেইগুলো ওদের শাদা গায়ে ফুটে আছে শাদা পদ্ম। আর খ'য়ে কেউটে তো এখানে আকচারই দেখা যায়—'

'গোখরো ?'

মদন বললে, 'আমার হিসাবে পাঁচ রকম। কালি গোখরো ঃ নামের সঙ্গে ওদের গায়ের রঙের সম্পর্ক আছে, কালি বর্ণ। সোনার মতো গায়ের রঙ যাদের, তারা হল পদ্ম গোখরো আর নাগরাজ গোখরো কালোর ওপর ডোরা-কাটা। তাছাড়া আছে খ'য়ে গোখরো আর হলদে গোখরো—'

সূর্যকান্ত চুপ করে থাকতে পারে নি, বলেছিল, 'আমি জানি, আইরাজ আট-ন' রকম। ফণা আছে অথচ মাথায় কোনো চিহ্ন নেই সে হল পাতরাজ, দুধরাজের রঙ শাদা। কালো রঙ আছে তিনটির, মণিরাজ ধনীরাজ আর ভীমরাজ। তাছাড়া মণিচূর নাগরচাঁদ ও শঙ্কাবতী নামেও আছে তিন প্রকার আইরাজ। হলুদরঙের আইরাজের নাম সকলেই শুনেছে, সবচেয়ে সাংঘাতিক, শঙ্খচূড়…'

শংকর বলেছিলেন, 'আমি মাত্র চার রকম কানড়ের নাম জানি। পাথুরে কানড়—যাদের অনেকটা আ'ল কেউটের মতো দেখতে, শাঁখামুটি—বাঁশ-বুনে কেউটের সঙ্গে যাদের নিকট-সাদৃশ্য, রক্ত কানড়—এদের পেটে দু পাশে মাথা পর্যন্ত দুটি লাল দাগ আছে, এবং কালাজ—রঙকালো আর ঘাড়ের কাছে একটি চৌকো দাগ আছে—'

'বোড়া শ্রেণীর সাপ', মদন বললে, 'অনেক প্রকার। আমি অন্তত চৌষট্টি প্রকারের নাম জানি। যেমন চক্রবোড়া চন্দ্রবোড়া বিঘতেবোড়া হরিণবোড়া প্রভৃতি। এদের মধ্যে চক্রবোড়া ও চন্দ্রবোড়ার পেটে ছানা হয় এবং এরা অত্যন্ত সর্পভুক। বেশি লম্বা নয় কিন্তু মাথা সরু আর দেহ বেশ মোটা, এদের কামড় অতি মারাত্মক, কামড়ালে চোখ মুখ নাক দিয়ে রক্ত পড়তে থাকে। বিঘতে বোড়ার চলন দেখলে ভয় লাগে, ওরা লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। আর হরিণবোড়া খুব দীর্ঘ ও মোটা, এরা হরিণ বা ওই রকম কোনো জন্তুকে সশরীরে উদরস্থ করতে পারে—'

তিনি নিজেই বলেছিলেন, 'বীজজড়ী সাপও অনেক প্রকার ঃ এই শ্রেণীতে পড়ে কালনাগিনী উদয়কাল রুদ্রকাল মহাকাল নিকেনী নাগ বঙ্করাজ

বাঁকাল সীতাহার চন্দ্রভাগ সূর্যভাগ ও সূতাসঞ্চার প্রভৃতি। বঙ্করাজ আমি দেখি নি, খুড়ো মশায় বলেন এরা খুব বড় হয়, দৈর্ঘে পাঁচ-ছ' হাত, ফণাধর সাপের মতো যখন ছোবল দেবার জন্যে উঁচু হয়ে ওঠে তখন এদের গায়ে ভাঁজ পড়ে চার-পাঁচটি—দেখায় নাকি ভারি সুন্দর। বাঁকাল দেখেছি, তার তিনটে শিরা, আমার বেশ সুন্দর লেগেছে দেখতে। কালনাগিনীকে চেনা যায় সহজে, তার কালো গায়ে লাল ফুল দেওয়া থাকে। উদয়কালকে চেনা শক্ত, কেন না সে বহুরূপী, ক্রমাগত রঙ বদলায়…

মদন বললে, 'এই চার প্রকার সাপের কামড়ের মধ্যেও তফাৎ আছে। কেউটের কামড়ে কনকনে যন্ত্রণা—আহত ব্যক্তি হাত-পা ছুঁড়তে থাকে আর মুখে গাঁজলা বা ফেনা ওঠে। এরা সাধারণত বিলে বা জলা জায়গায় কামড়ায় এবং এদের বিষে শরীর নীলবর্ণ হয়ে যায়।'

সূর্যকান্তের সংযোগ: 'গোখরোর আঘাতে জ্বালা-যন্ত্রণা অত্যধিক এবং অসহ্য। এরা কখনও জলে কামড়ায় না। কেউটের মতো এদের বিষেও শরীর নীলবর্ণ হয়ে যায় এবং তেমনভাবে কামড়ালে আহত ব্যক্তির তৎক্ষণাৎ মৃত্যু…'

'আইরাজের দাঁত বড়', শংকর পরিবেশিত তথ্য: 'সেজন্যে ক্ষতি হয় বেশি। বিষ কেউটের মতো, তবে বিষের গতি একটু মন্থর—'

'খুড়ো মশায়ের মুখে শুনেছি', তিনি শেষ করেছিলেন প্রসঙ্গ: 'কানড়ের কামড় বুঝতেই পারা যায় না, জ্বালা করে না, কিন্তু কেউটের আঘাতের মতো দেহ নীলবর্ণ হয়, বিষের গতি খুব ধীর। এরা বিছানায়ও কামড়ায়…'

সর্পালোচনা কিছুদিন আগেও হয়েছে বলে, এখন, মধ্যরাত্রির নিস্তব্ধতায় মনে পড়ছিল। সারাদিন ধকল গেছে, নানা উৎপাত, তিনি ভেবে পাচ্ছিলেন না এত বিষয় থাকতে সাপের চিন্তাই বেশি করে জেঁকে বসেছে কেন মনের মধ্যে? সম্ভ্রান্ত ঘরের যে কন্যাটি মুখ নিচু করে পালংকে বসে রয়েছে নির্বাক, একদা তার রূপে বিমোহিত হয়েছিলেন—অংকিত চিত্র দেখে বিচলিত; তার সুচিক্কন বেণী কি শুধুই সাপের উপমা? মেঘের সঙ্গে

কেশের তুলনা তো অনেকেই করে থাকেন ঃ কুঁচবরণ কন্যা তার মেঘবরণ কেশ ; নিতান্ত পুরানো মনে হয় যদি, অরণ্য হাতের কাছে ছিল কিংবা রাত্রির সঙ্গে তুলনা করা চলত। কিন্তু সাপ, হুঁ, সাপের চিন্তা করলে মনের ভেতরে কি-যেন নড়েচড়ে ওঠে—অনুভূতি প্রখর হয়, চেতনায় যেন কিসের সাড়া পড়ে যায়। জড়ানো ছবি একটা, পিষ্ট হবার বাসনা। সাপ বোধ হয় বাসনার প্রতীক, রসচিত্তে তার আবেদন তীব্র।

'আমার নাগিনী—'

নাগ-কন্যা বলে এ-সম্বোধন মনে এসেছে কি। কিন্তু ভারি মিষ্টি লাগছে ডাকতে। গলার স্বর গাঢ় এবং দৃষ্টিতে আচ্ছন্নতা। ওই প্রিয়দর্শিনী কিশোরী সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব, যুবরাজ্ঞী, ভাবতে গেলে কেমন শিহরণ জাগে শরীরে।

'আমার নাম শরৎসুন্দরী—'

সাড়া পাওয়া গেছে এতক্ষণে ঃ রূপের মতোই কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট। যেন ঈষৎ ক্ষুণ্ণ, কানে ধরা পড়ে ক্ষীণ কর্কশতা।

'তুমি সুন্দরী একথা ঠিক, হয়তো শরৎকালের মতোই অনবদ্য, কিন্তু আমার কাছে তুমি নাগিনী। কেন, ভালো লাগছে না এই নতুন নামটা ?'

'বিচ্ছিরি—'

'আমি কিন্তু ওই নামে ডাকব। আমার খুব ভালো লাগছে। বেশ তুমিও আমার একটা নাম রাখো।'

'আমি ও-সব পারি না—'

'বলো-না কী মনে হচ্ছে আমাকে দেখে ?'

'তোমার নামের মতোই—প্রখর, দীপ্ত, তেজিয়ান। কাছে আছো তবু যেন কাছে নেই, সুদূর, ঈশ্বরের মতো। কি-যেন ঘিরে আছে তোমাকে—'

'আমার আবেগ ও শক্তি। জানো শরৎ, আমি শাক্তধর্মে দীক্ষা নেব শিগগির। সমস্ত অবরোধ ভেঙে সোজা হয়ে দাঁড়াব। বঙ্গদেশে এমন এক শক্তির জাগরণ ঘটাব যে…'

ক্ষণপূর্বের তরলতা অন্তর্হিত। হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে গেছে, ওষ্ঠের ওপর চেপে-বসা দাঁত। ভিন্নমূর্তি। বদলে গেছেন আগাগোড়া।

'আমার ভয় করে—'

ওষ্ঠ-চাপ শিথিল হয়ে গেল। হাসি ফুটে বেরুল। পালংকে গিয়ে বসলেন। শরৎসুন্দরীর মুখখানি তুলে ধরে বললেন, 'ভয় কি। আমি যতদিন আছি, তোমার কোনো ভয় নেই। নাগিনী, বললে না তো আমাকে তোমার কেমন-লাগে ?'

'তুমি আমার মাথার মণি। ওই আলোতে পথ চলব এবার থেকে। আশীর্বাদ করো, যেন বিভ্রান্ত না-হই কোনো কাজে—'

শরৎসুন্দরী নিচে নেমে প্রণাম করলেন। প্রতাপাদিত্য আলিংগনে আবদ্ধ করে বুকে টেনে নিলেন। বাতিদানে মোম গলে গলে পড়ছিল। রাত শেষ হয়ে আসছে। শয্যা নিলেন দুজনে।

৭

হিসাবে ভুল হয়ে যাচ্ছে বার বার, কোনো কৌশলেই ধরে রাখা যাচ্ছে না পুত্র প্রতাপাদিত্যকে। এমন-কি, বিবাহের ফলে যে সংযত ভাব দেখা দেবে বলে আশা করা গিয়েছিল তার কণামাত্র প্রকাশ তো পাওয়া গেলই না উদ্ধত ভাব যেন আরও প্রকট। লক্ষ্য রেখেছিলেন আগাগোড়া, বংশ-বিশুদ্ধি দ্বারা সামাজিক উন্নতি বিষয়ে প্রথমদিকে যেমন লক্ষ্য রেখেছিলেন ভ্রাতা বসন্তরায় তেমনি বিবাহ দ্বারা চরিত্র-বিশুদ্ধি ঘটাতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তা ঘটল না। প্রতাপের চরিত্রের রঙ বুঝি বদল হবার নয়। ...আমন্ত্রিত মান্য ব্যক্তিগণ বিদায় নিয়েছেন যথারীতি, উপঢৌকনে ভরে গেছে প্রাসাদের একটি বৃহৎ কক্ষ, বহিরাগত ব্যক্তিরাও বিদায় নিয়েছেন একে একে—সাতটি দিন কেটেছে প্রচুর আমোদে-আহ্লাদে। তিনি নিজে প্রতাপকে উপহার দিতে চেয়েছিলেন এমন জিনিস যা স্মরণীয় হয়ে থাকবে, দারুণ খুশি ছিল তাঁর মন। জিজ্ঞাসা করেছিলেন কোন্ জিনিস পেলে প্রতাপ খুশি হবে। যে কোনো পরিমাণ অর্থ বা রত্ন দিতে প্রস্তুত ছিলেন তিনি। কিন্তু প্রার্থনা করল, এক বছরের জন্যে প্রজাদের খাজনা মকুব হোক।...লোভ সংবরণ করতে জানে প্রতাপ, অন্তত এক্ষেত্রে তার প্রার্থনা শুনে তিনি তারিফ না-করে পারেন নি। উপযুক্ত জিনিস প্রার্থনা করেছিল এবং তিনি তা মঞ্জুর করতে দ্বিধা করেন নি। এই প্রতাপ, এত উদার ও প্রজা-বৎসল যে পুত্র, চরিত্রের দৃঢ়তার জন্যে বারে বারেই পরাজিত হতে হচ্ছে তার কাছে।

আপাতত শেষ পরাজয় এই বিবাহ। নিজে নিজেই পুত্র-চরিত্র বিশ্লেষণ করছিলেন মহারাজা বিক্রমাদিত্য, বিলাসের সমস্ত উপকরণ মজুত থাকা সত্ত্বেও, ভোগের পাত্র কানায় কানায় পূর্ণ...তথাপি উদ্ধত ভাব ফুটে ওঠে কী করে? ইচ্ছা জাগে কী কারো ফুলশয্যার পরদিনই মৃগয়া-অভিযানে সুন্দরবন-অভিমুখে রওনা হতে? পথে-প্রান্তরে কৃত্রিম সমরাভিনয়ের মহড়া

নিতে ? প্রতাপ তাই করেছে। ওর স্বভাব-অনুযায়ী এ-সব মানায় এবং সহ্য করা যায় হয়তো, ছেলে বয়স থেকেই তাকে এভাবে দেখে আসছেন তিনি ; কিন্তু এর চেয়েও ভীষণ কাণ্ড করেছে প্রতাপ যা বরদাস্ত করা যায় না কোনোমতে। দুশ্চিন্তা সেই কারণে। সীমা ছাড়িয়ে গেছে প্রতাপ, ওর জেদ ও ঔদ্ধত্য অন্যদিকে বাঁক নিয়েছে, বৈষ্ণবধর্মে স্থির থাকতে না-পেরে সম্প্রতি গ্রহণ করেছে শাক্তধর্ম। আপাত-দৃষ্টিতে গুরুতর মনে না-হলেও, পরিণাম অশুভ সুনিশ্চিত। এ রকম টুকরো টুকরো ঘটনা থেকে বোঝা যায় প্রতাপ কত খেয়ালী, ওর মতির স্থিরতা নেই, একটা ব্যবস্থা করা দরকার। বসন্তরায় অন্ধস্নেহে তাকে যতই আড়াল করে থাকুক এবং দোষ-স্খালনের চেষ্টা করুক—অন্তত তিনি হালকাভাবে নিতে পারেন না। খুঁজে বার করতে হবে পন্থা।

রীতিমত চিন্তা করছিলেন বিক্রমাদিত্য। সম্ভবত যশোরের মাটি ও এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী ওকে চঞ্চল করে তোলে, রক্তের মধ্যে বন্য সাড়া জাগায়, যে-কারণে আদৌ সুস্থির নয় ; যশোরের আবহাওয়া থেকে ওকে কিছুদিন দূরে কোথাও সরিয়ে রাখতে পারলে হয়তো স্বভাবে পরিবর্তন আসতে পারে। কিন্তু কোথায় পাঠানো যায় ? কোথায় ? এমন একটি জায়গা হওয়া চাই যেখানে পাঠানোর পিছনে যুক্তি থাকবে অথচ ফিরে আসবে শিক্ষা গ্রহণ করে, অর্থাৎ কাজের অছিলা ও স্থান-গুরুত্ব চাই।—কাজ ! স্থানের গুরুত্ব ! এ-রকম জায়গা তো একটি আছে, আগ্রা, বাদশাহ-সকাশে পাঠাতে পারলে স্থান পরিবর্তন করানো যায় ও শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পায়—উভয় উদ্দেশ্য সাধিত হয় অনায়াসে। পাঠানো যায় কি ভাবে ?

'দাউদ খাঁর পরাজয়ের পর আকমহলে আমরা একাধিকবার বাদশাহের রাজস্ব-মন্ত্রী টোডরমলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম, তাই না জানকী ?'

বসন্তরায় বসেছিলেন পাশে, প্রশ্ন শুনে সচকিত।

হ্যাঁ,। সে তো অনেকদিন আগেকার ঘটনা। বঙ্গদেশে জমি-ব্যবস্থা ঢেলে

সাজিয়েছিলেন তিনি, তাতে আমরা দুজনে সাহায্য করেছিলাম কিছু। আমাদের ব্যবহারে খুশি হয়েছিলেন রাজা টোডরমল এবং আগ্রায় ফিরে বাদশাহকে বলেছিলেন সে-কথা। ফলে আমাদের পক্ষে সুবিধা হয়েছিল যশোরে রাজ্যবিস্তার করা। আমরা তো বাদশাহের অধীনে সামন্ত রাজা মাত্র—'

বিক্রমাদিত্য বললেন, 'তাহলে বাদশাহের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকা উচিত। আমরা কেউ কখনও বাদশাহের দরবারে যাই নি বা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি নি। করেছি কী?'

'না। যশোরের বাইরে কই আর গেলাম—'

বিক্রমাদিত্য সামান্যক্ষণ চিন্তা করে বললেন, 'বোধহয় এদিক থেকে আমাদের কিছু ত্রুটি হয়েছে। সংশোধন করা যায় কিনা ভাবছি—'

'তোমার বা আমার যা বয়স তাতে এই দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে আগ্রা কিংবা দিল্লী যাওয়া কী সম্ভব?'

'অথচ কর্মচারীর মাধ্যমে এ-সব কর্তব্য সুসম্পন্ন হয় না। আমাদের পক্ষ থেকে এমন কাউকে পাঠানো উচিত যাকে দেখে বাদশাহ আকবর খুশি হবেন এবং যশোহরের উপর প্রসন্ন থাকবেন। আমি ভাবছিলাম প্রতাপকে পাঠালে কেমন হয়? দুদিন পরে সে-ই তো বসবে যশোরের সিংহাসনে, ভবিষ্যতে হয়তো সুবিধা হবে তাতে—'

এতক্ষণে বোঝা গেল দাদার মনোবাসনা। কিন্তু প্রতাপের বিবাহ হয়েছে সদ্য, এখন বধূমাতার সংশ্রব থেকে বিচ্ছিন্ন করে দূর দুর্গম দেশে পাঠানো নিষ্ঠুরতার সামিল। উত্তর না-দিয়ে দ্রুত চিন্তা করছিলেন তিনি, একদিকে যেমন হৃদয়হীনতা প্রকাশ পায় অপরদিকে তেমনি দাদার যুক্তি ও সদিচ্ছা অস্বীকার করা যায় না। বাস্তবিক, এতাবৎকাল কর্মচারী-মারফতই বাদশাহের দরবারে যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে, তাঁদের দুজনেই কেউ কখনও বাদশাহ-সকাশে উপস্থিত হন নি। কর্মচারীর বদলে রাজস্ব নিয়ে যদি প্রতাপ সেখানে যায় তাহলে শোভন ও সংগত হয় একথা ঠিক কিন্তু প্রতাপ কি

এটা প্রসন্নমনে গ্রহণ করবে? ক্রমশ সন্দিগ্ধচিত্ত হয়ে উঠছে প্রতাপ, ওর ধর্মান্তরে দীক্ষা নেওয়ার পেছনে এই সন্দেহপ্রবণতা কাজ করেছে কিনা কে জানে, কোনো কাজেই অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে না সে। নিজের বুদ্ধি ও বিবেচনাকে এত বেশি অগ্রাধিকার দেয় যে সময়ে-সময়ে দুর্ভাবনা হয়। ওর চিন্তা-জগতে কোথাও একটা ফাটল আছে সেজন্যে পারম্পর্য ঠিক রাখতে পারে না, হঠাৎ আবেগ আসে এবং হঠাৎই তা চলে যায়। বিবাহের ব্যাপারে তার যে উদ্যম ও আগ্রহ দেখা গিয়েছিল এখন তা অপসৃত, কে বলবে এই ছেলে ওই মেয়ের জন্যে পাগল হয়ে উঠেছিল—বাবা-খুড়োকে ডিঙিয়ে নিজে দূত পাঠিয়েছিল আবেগের বশবর্তী হয়ে। তাঁর নিযুক্ত চর ঠিক সংবাদ দিয়েছিল যে প্রতাপের সঙ্গী শংকর নাগালয়ে গেছে বিশেষ উদ্দেশ্যে। বাকিটুকু বুঝতে অসুবিধা হয় নি। এখন সেই ছেলে অন্তঃপুরের সঙ্গে সংযোগ ছিন্ন করে শিকার ও সমরাভিনয়ে মত্ত—নানা পরিকল্পনায় ব্যস্ত রাখছে নিজেকে। চঞ্চল,—এই বন্যবেগ সংহত হওয়া প্রয়োজন। দাদা চিন্তা করেছেন সেদিক দিয়ে। হয়তো পরামর্শের প্রয়োজন হত না, দাদা ইচ্ছা করলে নিজেই পাঠাতে পারতেন প্রতাপকে আগ্রা কিংবা অন্য কোথাও, পরামর্শের জন্যে সুবিধা হল এই যে পুত্র ও পিতার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে উঠল তাঁর কাছে। দাদা এখনও কোষ্ঠীর ফলাফল বিস্মৃত হন নি আর প্রতাপ কোনোমতেই স্বভাব-নম্রতা পায় নি···তবু যত বিভ্রান্তিকর আচরণ ও বিরক্তিকর কর্ম করুক প্রতাপ, এ-কথা ভুললে চলবে না যে সে আজও ছেলেমানুষ, সহানুভূতির সঙ্গে তার বিষয়গুলি বিবেচনা না-করলে অবিচার করা হবে এবং সেই ক্ষোভ ও দুঃখ এজন্মে তার জীবনের ধারা বদলে দিতে পারে। একটু একটু করে বদলাচ্ছে প্রতাপ, এখন রাশ টেনে ধরা নয় আলগা করে দেওয়াই সুবুদ্ধির পরিচয়।

'দাদা, এ-সময়ে ওকে পাঠাবেন অতদূরের মানে সবে বিবাহ গেল—'

বিক্রমাদিত্য বললেন, 'পরে পাঠানো যেত। কিন্তু রাজস্ব পাঠাবার সময় এটাই। এখন যাওয়াই বরং যুক্তিযুক্ত। তোমার কী মনে হয় প্রতাপ আমার

কথা রাখবে না ?'

'সে তেমন ছেলে নয়। পিতার প্রতি তার যথেষ্ট শ্রদ্ধা। আমি বলতে চাইছিলাম দেরি যখন হয়েই গেছে আরও একটা বছর যাক-না—'

বিক্রমাদিত্য বললেন, 'শুভযাত্রা তাড়াতাড়ি করাই ভালো। প্রতাপ যাতে আগামী সপ্তাহে আগ্রা যাত্রা করতে পারে তুমি তার ব্যবস্থা করে দিও।'

বসন্তরায় বুঝলেন এর পর আর কোনো কথা চলবে না। হাজার হোক দাদা মহারাজা, এ হল আদেশ। সাধ্যমতো প্রতিবাদ করেছিলেন তবু দাদা যদি পুত্রের নির্বাসন চান, তিনি কী করতে পারেন। মাঝে মাঝে দাদার জেদ অনমনীয় হয়ে ওঠে, বিশেষত পুত্রের ক্ষেত্রে, এখন সেই জেদের মুখে পড়েছে প্রতাপাদিত্য, আগ্রা না-গিয়ে ওর উপায় নেই।

'শুনলুম, তুমি নাকি মাথার মণি ফেলে আগ্রা যাচ্ছ ?'

দিবাভাগে আলাপের সুযোগ হয় না তেমন, নানা লোকে ঘিরে থাকে সব সময়, আহারকালে যদি বা কাছে পাওয়া যায় আশেপাশে পরিচারিকা বা অন্য অনেকে থাকে—ছোটমা বসে থাকেন থালার কাছে ছোট একটি পাখা নিয়ে, যদিচ চামর ব্যজন করে নিপুণিকা ; আহারের বিষয় ব্যতীত কোনো কথা হয় না। বিশ্রামের জন্যে শয়নকক্ষে প্রবেশ করেন বটে কিন্তু শয্যার সঙ্গে সম্পর্ক অল্পক্ষণ, ছোটমার সঙ্গে আহার সমাধা করে কক্ষে আসতে যেটুকু দেরি তার মধ্যে দেখা যায় শয্যা শূন্য—বেরিয়ে গেছেন কখন্। সারাদিন আর দেখা হয় না, সানুচর মেতে থাকেন নানা খেলায়, যুদ্ধাভিনয়ে কিংবা শিকারে ; কোনো কোনোদিন রাজকার্যে সহায়তা করেন পিতাকে, প্রজাদের সুখ-দুঃখের কথা শোনেন দরবারে···মনেই থাকে না কেউ কোথাও উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষায় আছে, অতএব রাত্রিকাল ব্যতীত আলাপের সুযোগ কই ! অবশ্য পুরুষ মানুষের স্বভাব এ-রকম হওয়াই উচিত, যুবরাজ বলে বিলাস-ব্যসনে মেতে থাকবেন এটা ভালো দেখায় না, সেজন্যে স্বামী-সাক্ষাৎ

কম ঘটে বলে ক্ষীণ আক্ষেপ থাকলেও দুঃখ নেই মনে। উনি যেভাবে কালাতিপাত করলে খুশি থাকেন তাতেই আনন্দিত শরৎসুন্দরী। বহু ভাগ্যগুণে যুবরাজ্ঞী হয়েছেন তিনি, আর কত দেবেন ঈশ্বর? হৃদয় আপ্লুত হয় মাঝে মাঝে, ঈশ্বরের অশেষ করুণা বলে মনে হয়। দেহমন ভরে গেছে তাঁর করুণাধারায়।···তবু অবিমিশ্র করুণা বুঝি মেলে না, কখনও কখনও কঠোর হয়ে যান তিনি, বজ্রের মতো দুঃখ নেমে আসে। এখন সেই দুঃখের বজ্রের সঙ্গেই মোকাবিলা করতে হচ্ছে। এখন যথেষ্ট রাত্রি, প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে নিদ্রার নিঃশব্দ পদসঞ্চার, হয়তো মৃদুস্বরে আলোচনা যুবরাজের আগ্রাযাত্রা বিষয়ে ; বিষণ্ন হয়েছেন অনেকেই, চাপা-খুশি ফুটেছে কোথাও কোথাও। বিশেষত ছোটরাজার পুত্রদের মধ্যে চাঞ্চল্য ও উদ্দীপনা সহজে চোখে পড়ে। অন্তঃপুরে থাকতে হয় বলে শরৎসুন্দরী অধিকন্তু লক্ষ্য করেছেন ছোটরাজার পুত্র গোবিন্দরায় বেশি উচ্ছ্বসিত, অনবরত ফিসফাস, কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাঘব ও আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে আলোচনা ও পরামর্শ, দু-একটা কথার টুকরো কানে এসেছে এবং মনে হয়েছে যুবরাজের আগ্রা-যাত্রার সংবাদে যদি কেউ সুখী হয়ে থাকেন তাহলে ওই গোবিন্দরায় ও তৎসম্প্রদায়···

'হুঁ—'

প্রতাপাদিত্য শয্যা গ্রহণ করেন নি, বাতায়ন সম্মুখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। পিছনে হাত দুটি মোড়া, দৃষ্টি বহির্ভাগে অন্ধকার প্রকৃতির রাজ্যে নিবদ্ধ। দু-একটি আলোর সংকেত ব্যতীত বহিঃপ্রকৃতি নিঃসীম অন্ধকার—গাঢ় কালিমালিপ্ত আকাশ বুঝি সর্বব্যাপ্ত, হয়তো বা মানুষের মনোরাজ্যেও এই অন্ধকারের কুটিল আধিপত্য···সাপের মতো এমন ক্রুর হয় মানুষের মন, আগে জানা ছিল না। আজন্মের শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের পরিমণ্ডল এই একটি ঘটনার অভিঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ, কণামাত্র সন্দেহ নেই যে একক পিতার প্রচেষ্টায় এ নির্বাসন সম্ভব হয় নি, মহারাজা এতখানি কুটিল হৃদয়ের অধিকারী নন, তাঁকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এবং পাকে-প্রকারে রাজি করানো

হয়েছে। কূটবুদ্ধিতে যিনি বরাবর প্রশংসা পেয়েছেন এ হল সেই খুড়ো-মশায়ের কারসাজি—তাঁর পুত্র গোবিন্দরায় বড় হয়েছে, তাঁকে যশোরের সিংহাসনে বসাবার হীন অভিসন্ধি ছাড়া আর কী। নির্লোভ! পুত্রাধিক স্নেহ! এখন বাইরে অন্ধকার প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে খুড়ো-মশায়ের অন্তরের গূঢ় অভিলাষ এটাই, লোভ তাঁর যথেষ্ট আছে, বিশেষত স্বপ্রতিষ্ঠিত যশোরের সিংহাসন···বাবা বয়সে বড় ছিলেন বলে চক্ষুলজ্জায় বেধেছে, এখন দুজনেই অস্তমুখে, অতএব পুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে সেই সাধ পূর্ণ করতে চান চতুর খুড়োমশায়। কিন্তু তা হবে না, যেভাবে হোক চূর্ণ করতে হবে তাঁর চক্রান্ত। যশোরের সিংহাসনে তাঁর ন্যায্য অধিকার। আগ্রা থেকে ফিরে সেই অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।···পুত্রাধিক স্নেহের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ধরে ফেলেছেন তিনি! বিশ্বাস নেই খুড়োমশায়কে, সবই সম্ভব তাঁর দ্বারা।

'এমন অসময়ে দূর দেশে যাবার খুব কী প্রয়োজন ছিল?'

যে সরস রসিকতায় আলাপ সুরু করেছিলেন তা অন্তর্হিত, পরিবর্তে কণ্ঠ-স্বরে গাঢ়তা, ঈষৎ ভারি ও বেদনাতুর, বড় বড় চোখ দুটি জলে ভরা। ···বুঝতে পারছিলেন বিদায় অনিবার্য, ক্ষীণ একটা আশা ছিল যুবরাজ স্বয়ং হয়তো বুদ্ধিবলে বন্ধ করেছেন যাত্রা, কিন্তু শয্যাগ্রহণ না-করে এখন তিনি যেরূপ চিন্তাপ্রযুক্ত তাতে স্পষ্টত আশাভঙ্গ। যুবরাজকে এত দুশ্চিন্তিত হতে দেখা যায় নি আগে কখনও।

'ছোটরাজার ইচ্ছা হয়েছে, আমাকে যেতেই হবে, প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের কথা বড় নয়।'

কানে খট করে বাজল, খুড়োমশায় নয় ছোটরাজা!—তবে কী ছোটরাজার নির্দেশেই ওঁকে যেতে হচ্ছে আগ্রা? এমন তো ছিলেন না ছোটরাজা! কোথাও কিছু ঘটেছে নিশ্চয় এবং সে-কারণেই যুবরাজ এত গম্ভীর।

'আচ্ছা পিতারও কী তাই মত?'

সামনের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন প্রতাপাদিত্য। কণ্ঠস্বর ঈষৎ রুক্ষ, বললেন,

'পিতা তো ছোটরাজার হাতে খেলার পুতুল। তাঁর নিজস্ব মত বলে কিছু আছে নাকি? কেন যেতে হচ্ছে তা আমি জানি, কিন্তু তুমি দেখে নিও শরৎ, তাঁর ষড়যন্ত্র ভেঙে খান খান করে দেব। প্রতারণা আমি কোনোমতেই বরদাস্ত করব না। সন্দেহ ছিল আগে থেকে, এখন সেটা পাকা হল, যশোরের সিংহাসন থেকে যদি বঞ্চিত হই তাহলে এর শোধ আমি তুলবই—'

আভাস পাওয়া গিয়েছিল অন্তঃপুরমধ্যে। ফিসফাস, কানাকানি। কালো ছায়া যেন দুলছে অন্ধকারের মতো, ভবিষ্যৎ ঢাকা পড়ে যেতে পারে তাতে। দুর্যোগের সংকেত নিহিত বুঝি এই চিন্তারাশির মধ্যে। শিহরিত হল অন্তর। শংকা জাগল মনে। পরিণামে কী দাঁড়ায় কে জানে। কান্না এসে যাচ্ছিল, কথা বলতে বাকরুদ্ধ হল। প্রতাপাদিত্যের কণ্ঠস্বর আবেগশূন্য। বললেন, 'কেঁদো না। আমার বিশ্রী লাগে। কান্না আমি সহ্য করতে পারি না একেবারে। তাছাড়া কাঁদবে কেন? আমি কী চির-নির্বাসনে যাচ্ছি যে তোমাকে কাঁদতে হবে? ও-সব থামাও! শোনো, যা বলি। আগ্রা আমাকে যেতেই হবে এবং কালই। শুনলাম, জ্ঞানলাভের জন্যে আমাকে সেখানে পাঠানো হচ্ছে—হয়তো তাই—কপট-ভালোবাসায় গা ঢেলে এতকাল নিজের যথার্থ অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি নি, বুঝতে পারি নি যে রাজ-ঐশ্বর্যের মধ্যে বাস করেও আমার নিরাপত্তা বিপন্ন হয়েছে ধীরে ধীরে। এখন মুখোস খুলে গেছে, আমাদের সতর্ক থাকা প্রয়োজন। আমার অনুপস্থিতিতে এখানে যদি তেমন-কিছু বোঝো তাহলে বাপের বাড়ি চলে যেও, বাবা নিশ্চয় এটুকু ব্যবস্থা করে দেবেন—'

'আমি সকলের প্রিয়পাত্রী, হয়তো তার দরকার হবে না। বরং যদি অনুমতি দাও তাহলে খুড়োমশায়ের পায়ে ধরে তোমাকে যশোরে রাখার প্রার্থনা জানাই—'

'পায়ে ধরে ভিক্ষা! ছি—'প্রতাপাদিত্যের স্বরে তীব্রতা: 'তোমার মাথার মণিকে এত নিচে নামাবে? সে যে আমার লজ্জা, নাগিনী! চাইবার হলে

আমি কী ভিক্ষা চাইতে পারতাম না?'

'তবে?'

প্রতাপাদিত্য বললেন, 'আমার সঙ্গে সকলেই যাচ্ছে, শংকর সূর্যকান্ত সুন্দর মদন এবং বহু লোক-লস্কর। দেখতে দেখতে কেটে যাবে ক'টা দিন। তুমি শুধু সাবধানে থেকো…'

সূর্যকান্ত বিদায় নিয়ে এসেছিলেন ওই ভাবেই। শুভযাত্রাব পূর্বে মা আশীর্বাদ করেছিলেন কিন্তু অরুন্ধতী মুখ নিচু করে। বিষাদ-প্রতিমা যেন একটি। কাছে টানা যায় নি, কোনো কথা হয় নি ওর সঙ্গে। অনুমানে বুঝেছিলেন ওর কোমল মনে ব্যথা জমেছে, এখন সামান্য নাড়া পেলেই ঝব ঝর করে ঝবে পড়বে!…মাকে প্রণাম করে চলে এসেছিলেন সোজা রাজ-প্রাসাদে। সেখানে মঙ্গল-অনুষ্ঠানেব মধ্য দিযে যুবরাজের যাত্রার প্রস্তুতি চলছিল। এই পথটুকু আসতে আসতে তিনি লক্ষ্য করছিলেন নগরে কোথাও আনন্দের প্রকাশ নেই, সর্বত্র বিষণ্ণতা। যুবরাজের বিবাহের সময় প্রতি ঘরে ঘরে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের সাড়া জেগেছিল, আজ একেবারে তার বিপরীত। প্রাণহীন থমথমে।…যেতে যেতে কেবলই মনে হচ্ছিল যুবরাজের বয়স অল্প কিন্তু অতিশয় জনপ্রিয়। মেয়েরা দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে, পুরুষেরা রাস্তাপ্রান্তে, সকলে নীরব। এই পথ দিয়ে যুবরাজ যাবেন নদী-অভিমুখে, সেখানে তাঁর সুরম্য নৌযান প্রস্তুত, প্রকাণ্ড একটি কোশা।

দ্বারপ্রান্তে প্রতীক্ষারতা মেয়েদের পানে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আবার কখন্ ভেসে উঠেছে অরুন্ধতীর মুখ। অন্তর সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত করে নি অরুন্ধতী কোনোদিন, বড় চাপা স্বভাব, শালীনতা মণ্ডিত; ওর অসমাপ্ত ছবিটি দেখতে না পেলে বোঝাই যেত না তার অন্তরের কতখানি জায়গা জুড়ে আছেন তিনি। সেই ছবি সমাপ্ত করেছে অরুন্ধতী, রঙে-রেখায় অপ-রূপ, দেব-চিত্রের মতো মহিমা দান করেছে। প্রকৃতপক্ষে এ তার অন্তরের

রঙ, যে রঙে সে তাঁকে দেখেছে। নিছক কর্তব্য বা ভালো-লাগার খাতিরে এমন ছবি আঁকতে পারে না কেউ, ভালোবাসার রঙ যে কি-রকম, তাই যেন ধরা পড়েছে ওতে। আজ বিদায়মুহূর্তেও তার প্রকাশ দেখা গেছে। পুঞ্জীভূত নীরবতার মধ্যে সোচ্চার আকুলতা!···অরুন্ধতী অভিজাতকুল-কন্যা এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, ওর রক্তের মধ্যে আছে পরিশীলিত রুচি ও আত্মসম্ভ্রমবোধ যা দুর্লভ, সচরাচর দেখা যায় না। অথচ ওর জন্মপরিচয়টুকু না-জানার ফলে অলক্ষ্যে গড়ে উঠেছে দুস্তর ব্যবধান, ঘনিষ্ঠতায় জেগেছে বাধা, কেউ যেন পিছু টেনে রেখেছে। কোনো অলৌকিক উপায়ে যদি ওর জন্মপরিচয় উদ্ঘাটিত হতো···

মঙ্গলাচরণ সমাপ্ত হয়েছে, ওঁরা যাত্রা করেছেন নদীর পথে।

বসন্তরায় এসেছিলেন নদীঘাট পর্যন্ত, বিদায় দিলেন সাবধানে থাকতে বলে। ···সামনে পিছনে একখানি করে শক্তিশালী ঘুরাব, তাদের পাশে কিছু সংখ্যক বলিয়া ও ছিপ—মধ্যস্থলে সুদৃশ্য বড় কোশা একটি। নৌযানগুলির সংস্থান করে দিয়ে গেছেন বসন্তরায় স্বয়ং, চতুর্দিকবেষ্টিত কোশার মধ্যে যুবরাজ প্রতাপাদিত্য ও তাঁর অনুচরবৃন্দ—হিন্দুরা পূজার সময় যে কোশা ব্যবহার করেন কতকটা তার মতো আকার বলে এই নৌকাগুলির নাম 'কোশা' নৌকা, সূর্যকান্ত আবিষ্কার করেছে নামের উৎপত্তিগত কারণ। এক নদী থেকে আর-এক নদী—বহর চলেছে কখনও অনুকূল স্রোতের টানে জোরে কখনও স্রোতের প্রতিকূলতায় মন্থরগতি, দুপাশের নদীতীরে দৃষ্টি রাখতে রাখতে তাঁরা চলে এসেছেন অনেকদূর, সামনে বিধ্বস্ত গৌড় দেখা যায়।···বাস্তবিক বিধ্বস্ত। সেই শোভা ও গরিমা অন্তর্হিত। যে মহা-নগরীর অর্ধচন্দ্রাকৃতি বন্দরমধ্যে দিবানিশি অজস্র বাণিজ্য ও রণপোত অনলস পরিশ্রমে নদীবক্ষে কর্তব্যপালনে তৎপর থাকত, কোলাহলে ও কর্মচাঞ্চল্য সর্বদা মুখর, আজ তার সেই গৌরব কালগর্ভে বিলীন। দেখে প্রাণে দুঃখ জাগছিল। যুবরাজের নির্দেশে নৌ-বহর থেমেছে গৌড়ের শ্মশান বন্দরে, কোশা থেকে নেমেছেন যুবরাজ, তাঁর চোখেও আচ্ছন্ন দৃষ্টি, পা পা করে

এগিয়ে চলেছেন নগরের ভিতরের দিকে।

সূর্যকান্ত অনুসরণ করছিলেন তাঁকে, যদিচ গৌড়ের বর্তমান ভগ্নদশা দেখে তিনিও দুঃখিত। বললেন, 'যুবরাজ, এখন মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত, আমাদের বেশিদূর না-যাওয়াই উচিত—'

'নেমেছি যখন,' যুবরাজ উত্তর দিলেন, 'চলো, ঘুরে দেখে আসি ভেতরটা। আবার কবে আসব ঠিক নেই।'

'তাহলে আরও কিছু অনুচর নিন সঙ্গে—'

'দরকার কি। তুমি-আমি যথেষ্ট। এসো।'

'চলুন—'

দুজনে এগিয়ে যাচ্ছিলেন আর শ্মশানভূমির নীরবতার মতো ধাক্কা খাচ্ছি-লেন মনে। কোনো গৌরব অবশিষ্ট নেই, গৌড়ের সমস্ত কীর্তি মিশে গেছে ধুলায়। বড় বড় সৌধ মন্দির ও বিপণি ধ্বংস। 'ওইখানে ছিল গৌড়ের দুর্গ—' ছোটবেলার কথা মনে পড়ছিল প্রতাপাদিত্যের, অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখালেন জায়গাটি, সূর্যকান্ত দেখলেন শুধু ভগ্নস্তূপের রাশি।

'আমি এই গৌড়ে জন্মেছি,' প্রতাপাদিত্য বলছিলেন, 'এটা আমার জন্ম-ভূমি। চারিদিকে ফলবান বৃক্ষ, সরোবর, সৌধ—রাস্তাঘাট পরিষ্কার, লোকের মুখে হাসি—স্বপ্নের মতো অস্পষ্ট মনে পড়ে। আজ তার কত পরিবর্তন। ক্রমাগত যুদ্ধ ও রাষ্ট্রবিপ্লবে সোনার গৌড় একেবারে ছারখার হয়ে গেল আর দুর্ধর্ষ শক্তির অধিকারী ওই-যে পাঠান জাত তারা বোধহয় কোনোদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না, দাউদ খাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও মৃত্যু ঘটে গেল—'

পিছন পিছন আসছিলেন এক অশ্বারোহী, ক্রমশ কাছে এসে গেলেন।

'কে ?'

অশ্বখুরে সচকিত হয়ে ফিরে তাকালেন প্রতাপাদিত্য। সূর্যকান্ত কোষবদ্ধ তরবারিতে হাত রাখলেন।

'বন্দর-কোতোয়ালের মুখে সংবাদ শুনে ছুটে গিয়েছিলাম নদীর ঘাটে,'

অশ্বাবতরণ করে যথাযোগ্য সম্মান জানালেন আগন্তুক ঃ 'সেখানে শুনলাম যে আপনি নগর-পরিভ্রমণে বেরিয়েছেন। আমার অসীম সৌভাগ্য যে গৌড়ে যশোর-যুবরাজের সাক্ষাৎ পেলাম—'

হায়দার মানকুলি। বিখ্যাত মল্লযোদ্ধা। যশোরে মল্লক্রীড়ানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেছিল এবং আলাপে জানা গিয়েছিল, মোগল-বিদ্বেষ ওর মর্মে মর্মে। ওর পিতা বাবুই মানকুলি গৌড়-সুলতানের অধীনে সেনাপতি ছিলেন—মোগল-পাঠান যুদ্ধে প্রাণ দিতে হয়েছে তাকে। সুউন্নত বলিষ্ঠ গড়ন, তেজোদৃপ্ত। এখন সম্ভ্রমে বিনত। যথার্থ শ্রদ্ধার প্রকাশ।

'রাজাজ্ঞায় বাদশাহের দরবারে যশোরের প্রতিনিধিত্ব করতে যাচ্ছি। অতীতের গৌরব গৌড়ের বর্তমান রূপ দেখতে নেমেছিলাম। তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে ভাবি নি। এ আমার উপরি পাওনা—'

হায়দার বললে, 'দয়া করে যখন নেমেছেন তখন দরিদ্র মানকুলি গৃহে পদ-ধূলি দিলে ধন্য হব। সুলতান দাউদ খাঁর পতন এবং আমার পিতার অকাল-মৃত্যুর পর রায়-বংশের সঙ্গে আমার সংযোগ বিচ্ছিন্ন। মল্লক্রীড়া উপলক্ষে যশোরে যে আতিথ্য লাভ করেছি তা বিস্মৃত হবার নয়, এখন এত কাছে পেয়ে আপনাকে ছেড়ে দিতে ইচ্ছা হয় না ; আমার কুটীরে কিছুক্ষণ আতিথ্য গ্রহণ করলে কৃতার্থ হব—'

মধ্যাহ্নের সূর্য প্রখর হয়ে উঠেছে। হাঁটতে হাঁটতে ওঁরা এসে পড়েছেন বেশ কিছুদূর। ফিরে যেতে সময় লাগবে।

'সূর্যকান্ত, তুমি কী বলো ?'

যুবরাজের মনোভাব বুঝতে পেরে সূর্যকান্ত বললেন, 'উনি যখন এত করে অনুরোধ করছেন—'

'ওঁরা দুশ্চিন্তিত হবে।'

সূর্যকান্ত সেই কথা ভাবছিলেন, বললেন, 'তা হবেন—'

'যদি অনুমতি করেন,' মানকুলি বললে, 'আমি এখনই বলে আসতে পারি যে যুবরাজ এক গরীবের প্রতি প্রসন্ন হয়ে তার কুঁড়েঘরে আতিথ্য গ্রহণ

করেছেন, সেখানে মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপ্ত করে ফিরবেন, আপনারা তাঁর প্রত্যাগমনের অপেক্ষায় অনাহারে থাকবেন না।'

'বেশ তাই বলে এসো—'

মানকৃলি দ্রুত অশ্বচালনা করে বন্দর-অভিমুখে চলে গেল এবং ফিরে এল খানিক পরে।

'চলুন যুবরাজ—'

প্রতাপাদিত্য বললেন, 'যতদূর মনে হয় গৌড়ের প্রতি তোমার আর মায়া নেই। যদি তাই হয় তাহলে তুমি অন্য কোথাও যেতে রাজি আছো কী?'

'সংসারে আছেন শুধু আমার জননী। প্রতিনিয়ত পিতৃস্মৃতি তাঁকে কাঁটার মতো বেঁধে। ইচ্ছা হয় তাঁকে অন্য কোনোখানে নিয়ে যাই। কিন্তু কর্মোপলক্ষে এখানে আমি বাঁধা। যদি কর্ম-সংস্থানের কোনো ব্যবস্থা করে দিতে পারেন তাহলে যেখানে বলবেন সেখানে যেতে রাজি—'

প্রতাপাদিত্য বললেন, 'যশোরে তো গিয়েছিলে, জায়গাটি কেমন লেগেছে?'

'চমৎকার—'

প্রতাপাদিত্য বললেন, 'আমি আগ্রা থেকে ফিরে তোমাকে সংবাদ পাঠাব, যশোরে চলে যেও। আমার অধীনে তোমার চাকরি বাঁধা থাকবে।'

'বহুত খুব। আসুন, এই আমার গরীবখানা—'

মানকৃলি বংশের অধঃপতন সত্ত্বেও, গৃহশ্রী অনবদ্য। অন্তত বংশের শেষ গরিমাটুকু ধরে রাখার চেষ্টা করেছে হায়দার মানকৃলি। অবিবাহিত যুবক, আপাতত তাকে শেষ বংশধর বলা যায়। অর্থের প্রয়োজনে মোগলের গোলামি করছে, প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনচিত্ততা অম্লান। সুমিষ্ট ব্যবহার, অভ্যর্থনা আন্তরিক। নিজের ফৌজী দলে এই শ্রেণীর যুবক যত বেশি সংগৃহীত হয় ততই শক্তি বৃদ্ধি। ভাবছিলেন প্রতাপাদিত্য আর দেখছিলেন, বিনয়বশত গরীবখানা বা কুঁড়েঘর যা-ই বলে থাকুক হায়দার, বিধ্বস্ত গৌড়ে তার গৃহখানি চোখে পড়ার মতো। বেশ বড় বাড়ি, নির্মাণ-কৌশলে শ্রী ও সৌন্দর্য আছে। বড় বড় খিলান, সুন্দর একটি সৌধের ক্ষুদ্র সংস্করণ।

হায়দার মানকুলি বর্তমান গৌড়েশ্বরের অধীনে উচ্চপদস্থ কর্মচারী।
উভয়ে বসেছিলেন সুশোভিত একটি কক্ষে। টানা পাখায় বাতাস করছিল এক পাঠান পরিচারক। বৃদ্ধা হায়দার-জননী এসে অশেষ সম্মান প্রদর্শন করে গেছেন, পরিচারিকা-মারফত পাঠিয়ে দিয়েছেন মিষ্টান্ন ও সরবত। এখন কিছু-সময় অতিবাহিত হলে তবে আহারের আহ্বান। যুবরাজ উদাস-চোখে বাইরের পানে তাকিয়ে আছেন, সূর্যকান্তের তন্দ্রা আসছিল। তন্দ্রার ঘোরে সূর্যকান্ত শুনতে পাচ্ছিলেন, হায়দার ব্যস্তস্বরে বলছে: 'যাও, তাড়া দাও, রন্ধনে এত দেরি করছে কেন ব্রাহ্মণ? এঁরা ফিরে যাবেন তাড়াতাড়ি—' চোখ মেলে দেখতে পেলেন, পরিচারক রাস্তাগারের এক ভগ্ন কুটীর-দ্বারে করাঘাত করে কি-যেন বলছে। সম্ভবত আহার্য-বস্তু প্রস্তুতির তাড়া। তার মানে, বিশেষ রন্ধনের ব্যবস্থা। ওই ব্রাহ্মণ নিশ্চয় রন্ধনশিল্পে পটু। কিন্তু দেরি হয়ে যাচ্ছে। এইভাবে একটি করে বেলা নষ্ট হলে কবে তারা পৌঁছবে আগ্রা? জলপথে আগ্রা তো কম দূর নয়! অবশ্য সমস্ত পথ জলে যাওয়া যাবে না, কখনও কখনও স্থলের সাহায্য নিতে হবে। সেক্ষেত্রে উট হাতি কিংবা ঘোড়াই হবে বাহন··

'আসুন, আহার প্রস্তুত— '

সূর্যকান্তের তন্দ্রার ঘোর কেটে গেল, যুবরাজের উদাস দৃষ্টির মধ্যে স্পৃহভাব জেগে উঠল।

'তোমার মায়ের হাতে রান্না খেতে কিন্তু আমার আপত্তি ছিল না—'
যুবরাজ উদারতার প্রকাশ ঘটাতে চাইলেন।

সূর্যকান্তের হঠাৎ মনে পড়ল, অরুন্ধতী এতক্ষণে আহার সমাধা করেছে নিশ্চয়, আজ শিকারের দিন নয়—দূরদেশ যাত্রা, অতএব তার কোনো ব্রত নেই···এখন কী করছে অরুন্ধতী? মায়ের পাশে বিশ্রাম-শায়িতা নাকি ছবি আঁকছে। এবার সে কী ধরণের ছবি আঁকতে পারে? প্রণয়-রঙে উজ্জ্বল ছবি সে দেখেছে আজ কী তবে আঁকছে কোনো বিরহ-মলিন ছবি? ওর হৃদয়ের রঙই তো ফুটে ওঠে চিত্রপটে? অদ্ভুত দরদী হাত পেয়েছে অরুন্ধতী,

তেমনি হৃদয়খানি।···কাছে থাকলে ওর কথা বেশি মনে পড়ে না, যত দূরে যাওয়া যায় তত ভর করে যেন—নিখুঁতভাবে ফুটে ওঠে ওর সর্ব-অবয়ব। হাতের কাছে রঙ-তুলি থাকলে এখনই এঁকে ফেলা যায় এবং সে-ছবি এমন জীবন্ত হয় যে শত চেষ্টাতেও অন্য-কেউ তেমনটি আঁকতে পারত না। পরিবর্তে হাতের কাছে মজুত খাদ্যসামগ্রী এবং তা তুলতে হচ্ছে মুখে···

'বড় পরিতৃপ্ত হলাম। চমৎকার রান্না—'

যুবরাজের আহার শেষ হয়ে গেছে, উঠে পড়েছেন তিনি। সূর্যকান্তের ক্ষুধা ছিল না তেমন, উঠে পড়লেন যুবরাজের সঙ্গে সঙ্গে।

'আপনি তো খেলেন না কিছুই, ভালো লাগে নি নিশ্চয়—'

সূর্যকান্ত তাড়াতাড়ি বললেন, 'না না, সুন্দর রান্না, আমার ক্ষুধা নেই বলে খেতে পারলাম না।'

'এই ব্রাহ্মণ, যিনি রন্ধন করেছেন, পূর্বে মঙ্গলগড়ে জায়গীরদার রাজা বিজয়েন্দু রায়ের খাস-পাচক ছিলেন। হিন্দুরান্নায় সবিশেষ পটু বলে ওকে দিয়ে আপনাদের সেবার বন্দোবস্ত করেছিলাম—'

হায়দার মানকুলির ইসারায় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সামনে এসে দাঁড়াল। প্রণাম করে সরে গেল। কথা নেই, চুপচাপ।

'ব্রাহ্মণ কী অসুস্থ?'

'না তো—'

'কেমন যেন লাগল।'

'তার কারণ আছে।' হায়দার মানকুলি বললেন, 'রাজা বিজয়েন্দু রায়কে এই বৃদ্ধ ভীষণ ভালবাসতেন। ততোধিক স্নেহ ছিল রাজা-সায়েবের কন্যাটির ওপর, অতি সুশ্রী চমৎকার কন্যা, প্রায় সব সময় সে থাকত ব্রাহ্মণটির কাছে। গৌড়ের রাষ্ট্রবিপ্লবে সুলতানের পক্ষে রাজা বিজয়েন্দু রায় যুদ্ধ করেছিলেন মোগলের বিরুদ্ধে, তাতে ফল ভালো হয় নি। রাজা বিজয়েন্দু নিহত হন এবং তাঁর প্রাসাদ লক্ষ্য করে মোগল-বাহিনী ছুটে আসছে দেখে

তাঁর স্ত্রী ও অন্যান্য মহিলারা বিষপান করে আত্মহত্যা করেন, পুরুষেরা প্রতিরোধ করতে করতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তখন এই ব্রাহ্মণ কন্যাটিকে নিয়ে জঙ্গলে আত্মগোপন করেন। পরে গৌড়ে চলে আসেন যদি কোনো মতে কন্যাটিকে ক্ষুধা-তৃষ্ণার হাত থেকে রক্ষণ করতে পারেন এই মনে করে। কিন্তু তিনি নিজেই ছিলেন ক্ষুধার্ত ও ক্লান্ত, শক্তি ছিল না শরীরে। পথের ধারে এক ছায়া-সুশীতল বৃক্ষের নিম্নে বসে পড়েছিলেন, কন্যাটিকে পাশে রেখে। ঠাণ্ডা বাতাসে ঘুমিয়ে পড়েন একসময়, কন্যাটিকে আর দেখতে পান না ঘুম থেকে জেগে। সম্ভবত তাঁর ঘুমের অবকাশে চঞ্চল কন্যা একা চলে গিয়েছিল কোনোদিকে, পথ হারিয়ে কান্নাকাটি করেছে, তাই দেখে কোনো ব্যক্তি তুলে নিয়ে গেছে। তখন থেকেই ব্রাহ্মণের মস্তিষ্ক বিকৃতি, কারো সঙ্গে কথা বলেন না, চুপচাপ ওই কুটীরে পড়ে থাকেন—'

হুঁ গৌড়ের রাষ্ট্রবিপ্লবে এ-রকম কত ঘটনা ঘটেছে কে জানে। আমার খুড়োমশায় তো এইভাবে বহু অনাথিনীকে আশ্রয় দিয়েছেন যশোরে। কন্যাটির কী নাম ?'

বৃদ্ধটিকে কখনও কখনও বিড় বিড় করতে শুনেছি অরু অরু বলে, পুরো নাম আমি জানি না।' হায়দার মানকুলি বৃদ্ধকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, দীননাথ, রাজা বিজয়েন্দু রায়ের কন্যাটির নাম কী ছিল ?'

খানিকক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল দীননাথ। হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল তারপর।

আরে কাঁদো কেন ? ইনি যশোরের যুবরাজ, নাম জানতে পারলে যশোরে খোঁজ করতে পারেন —'

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ চোখের জল মুছতে মুছতে বললেন, 'মা কী আমার বেঁচে আছে ? আ-হা কী রূপ মায়ের, কত গুণ। এতদিন পরে তার খোঁজ কী কেউ পাবে ? মায়ের আমার নামটি ভারি সুন্দর—অরু—অরুন্ধতী—'

কী নাম বললেন'

প্রতাপাদিত্য চমকে গেলেন। সূর্যকান্ত পাথরের মতো স্তব্ধ। ভুল শুনলেন

না তো ?

'ওর বাবা অরু বলে ডাকতেন, প্রকৃত নাম অরুন্ধতী—'

প্রতাপাদিত্য জিজ্ঞেস করলেন, 'বাম গালে ছোট একটা তিল আছে ?'

'ছিল বটে—'

প্রতাপাদিত্যের পুনঃ জিজ্ঞাসা 'ঠোঁটের নিচে অল্প কাটা-চিহ্ন ?'

'হাঁ। ছোটবেলায় পড়ে গিয়েছিল একবার—'

প্রতাপাদিত্য বললেন, 'ব্রাহ্মণ, হায়দারের সঙ্গে তুমি যশোরে যাবে আমি ফিরে আসার পর। হায়দার, তুমি ওকে নিয়ে যেও। ওই নাম ও বর্ণনায় এক কন্যা আছেন যশোরে, আমি ও সূর্যকান্ত তাকে চিনি, তুমি চিনতে পারো কিনা দেখবে। চলো সূর্যকান্ত—'

সূর্যকান্ত আচ্ছন্নস্বরে বললেন, 'চলুন।'

নৌযানগুলি ভেসে চলল নির্দিষ্ট লক্ষ্যে। পালে বাতাস লেগেছে, বয়ে যাচ্ছিল তরতরিয়ে। ভাঙা ঢেউগুলি সূর্যরশ্মিপাতে ছলছল করছিল, সকালের দিকে মনে হয় আলোর রেখা যেন দণ্ডী খাটছে নদীর বুকে। সূর্যকিরণ প্রখর হলে দণ্ডী-খাটা বন্ধ হয়ে যায়, মধ্যাহ্নে সোনার পাতের মতো টলমল করে গঙ্গা। ছোট ছোট নদী পার হয়ে অবশেষে গঙ্গার অববাহিকা ধরে অনেকদূর চলে এসেছেন তাঁরা। তবু ওই ছলছলে-টলটলে গঙ্গার জলের পানে তাকালে কার যেন মুখচ্ছবি ভেসে ওঠে। অন্তত সূর্যকান্তের সেই বিভ্রম ঘটেছিল। কোনো-কিছুতে মনোযোগ নেই. ওই জলের দর্পণে তার স্থির দৃষ্টি। অরুন্ধতী, যার কোনো পরিচয় জানা ছিল না, ঘটনার আকস্মিকতায় জানা গেছে যে-সে যথা অভিজাতকুলকন্যা, গৌড়ের সংলগ্ন জায়গীরদার স্বর্গত রাজা বিজয়েন্দু রায় তার পিতা। যুবরাজের দুটি জিজ্ঞাসা পরিতুষ্ট হয়েছে, উত্তরে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ জানিয়েছে যে নিরুদিষ্টা কন্যার বাম গালে ছোট্ট তিল এবং ঠোঁটের নিচে ক্ষত-চিহ্ন আছে। নাম ও এই শরীর-লক্ষণ এমনভাবে মিলেছে যে

অতঃপর আর তিলমাত্র সংশয় থাকে না যে···। দীর্ঘশ্বাস পড়ল একটা। হৃদয় বারে বারে হাহাকার করে উঠছিল, 'অরু, অরুন্ধতী···'

'কী ভায়া একেবারে তন্ময় যে! কার ধ্যানে?'

শংকরদা। পাশ দিয়ে যেতে যেতে থেমে পড়েছেন। স্পষ্ট, নির্ভীক ও উদার-চরিত্রের মানুষ।

'না। মানে জলের দিকে তাকিয়ে থাকতে ভালো লাগছিল—'

শংকর মৃদু হাসলেন।

'আমারও একসময় ভালো লাগত হে। নদীর জলের দিকে তাকিয়ে থাকলে কার যেন শিঞ্জিনী শুনতুম, শ্রাবণ-আকাশের পানে তাকালে মনে হত কার যেন ভাসা-ভাসা চোখ, পূর্ণিমা রাত যখন জ্যোৎস্নায় ভেসে যেত তখন···'

হেসে ফেললেন সূর্যকান্ত।

'থাক্ শংকরদা। কাব্যি বড় ভীষণ রোগ, কল্মির মতো সহজে ছাড়তে চায় না. এ-বয়সে আবার যদি তার কবলে পড়ো, বেচারী প্রভা-বৌদির কী-দশা হবে ভাবো একবার।'

শংকর বললেন, 'ভাই রে, আমি হলুম কুলীন ব্রাহ্মণ, তেমন বুঝলে আরও গোটা-কতক বামনি জুটিয়ে নিলে কার সাধ্যি আটকায়। পোড়া-কপাল এই যে পুরনো রোগটা সেভাবে চাগিয়ে উঠছে না, আর তোমার প্রভা-বৌদি খোঁটা দিয়েও অন্য খোঁয়াড়ে ঢোকাতে পারছে না। ও-ব্যাপাবে আমি নিতান্ত অকর্মা এই তার নিত্য খোঁটা, আমি চুপ করে থাকি আর ভাবি আজকালকার অবিবাহিত ছোঁড়াগুলো দিনে দিনে ধিঙ্গি হচ্ছে অথচ গণ্ডা গণ্ডা কেন, একখানা বিয়ে করার সংবাদ নেই। কবে ওদের জলের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলা ফুরোবে আর আমার মতো অন্তত একটা বিয়ে করার সাহস সঞ্চয় করবে তাই ভাবছি। কি হে সুন্দরী পাত্রীর সন্ধান করব নাকি?'

'তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না শংকরদা।' সূর্যকান্ত জবাবে পাল্টা দিল, 'বলা

যায় না, ফিরে এসে আমি হয়তো সাহসী পুরুষ হয়ে যেতে পারি, ছুম করে বিয়ে করে ফেলতেও পারি একটা। তুমি পেটুক বামুন, তোমাকে নিমন্ত্রণ করে রাখলুম আগেভাগে—'

শংকর বললেন, 'বুঝতে পেরেছি ডুবে-ডুবে অনেক জল খাওয়া হয়েছে। তা হঠাৎ এ-ইচ্ছা কেন ? একেবারে হেদিয়ে উঠেছো মনে হচ্ছে।'

'দাদা, বয়সকালে সব ছোকরার দশাই এমন হয়। বয়সের দোষ তুমি তো জানোই—'

শংকর বললেন, 'সন্ধ হচ্ছে কোথাও কিছু ঘটেছে। গৌড়ের প্রেতাত্মা ভর করেছে নাকি ? যদি তাই হয়, প্রাচিত্তির করে নাও, আমি অং বং ঠুকে পেতনি নামিয়ে দিই।'

'না রে দাদা, এ পেতনি নামবার নয়। ঘাড় মটকাবে তবে ছাড়বে। জবরদস্ত কব্জা—'

শংকর বললেন, 'বুঝতে পেরেছি। দুরারোগ্য ব্যাধি। খাসমহলে গোল-মাল।'

হেসে আলাপ করছিলেন বটে, দীর্ঘ জলপথযাত্রা, হাসিঠাট্টা করে সময় না-কাটালে বিরক্তি জাগে—মন ভারি হয়ে ওঠে। সূর্যকান্ত না-ভাঙলেও, শংকর গৌড়-কাহিনী অবগত আছেন যুবরাজ প্রাসাদাৎ। সেয়ানে-সেয়ানে কোলাকুলি হয় সেজন্যে। সূযকান্ত রহস্য ভাঙতে চান না লজ্জাবশত আর শংকর বলতে চান না যে তিনি ব্যাপারটা সবই জানেন। চলুক এভাবে হাসি-ঠাট্টা, হাল্কা হোক জল-জীবনের একঘেয়ে বিষণ্ণতা।

তবু, এই-সব রসিকতার ফাঁকে ফাঁকে সেদিনের ছবিটি ভুলতে পারেন না শংকর। ছবি নয়, কথার টুকরো। যুবরাজকে খুঁজতে খুঁজতেই তিনি হঠাৎ মহারাজের কক্ষের কাছে চলে গিয়েছিলেন, হয়তো অতিক্রম করে যেতেন কক্ষ, কিন্তু থমকে দাঁড়াতে হয়েছিল ওই কথার টুকরোগুলো ভেসে এসেছিল

বলে—যদিচ আড়ি-পাতা তাঁর স্বভাব নয়। বড়রাজা ও ছোটরাজার মধ্যে কথা হচ্ছিল যুবরাজের আগ্রা যাওয়ার বিষয়ে, ছোটরাজা প্রতিবাদ করছেন আর বড়রাজা তাঁর দৃঢ় অভিমত জানাচ্ছেন। তখনই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল দুই রাজার মন, অথচ যুবরাজের ধারণা সম্পূর্ণ বিপরীত। যুবরাজকে একথা কিছুতেই বোঝানো যাচ্ছে না তাঁর আগ্রা যাত্রার পিছনে আর যাঁর অভিসন্ধি কাজ করুক, ছোটরাজা সেজন্যে আদৌ দায়ী নন। একবার সে-প্রসঙ্গ তুলেছিলেন, আজ আবার তুললেন। কোশার মধ্যে ছোট সুদৃশ্য একটি কক্ষে যুবরাজ একা বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, বহিঃদ্বারে মদন বসে সড়কি ও ঢাল নিয়ে, সর্বদা পাহারায় থাকে সে। তাকে ডিঙিয়ে কক্ষে প্রবেশ করে তিনি আগ্রা-যাত্রা প্রসঙ্গ তুলতে না-তুলতেই উত্তপ্ত হয়ে উঠলেন যুবরাজ, সোজাসুজি আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'শংকর, তুমি কী মনে করো ছোটরাজার মুখেও যা, মনেও তাই? কণামাত্র কপটতা নেই অন্তরে বাইরে? তিনি একেবারে ধোয়া তুলসীপাতা?'

উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন খুব, দমন করা যাবে না হয়তো, তবু চুপ করে থাকলে অন্যায় হয়। শংকর বললেন, 'ধোয়া তুলসীপাতা কিনা জানিনে, সংসারে তেমন লোক ক'জনাই বা আছেন, আদৌ আছেন কিনা সন্দেহ; তবে ছোটরাজা দেব-চরিত্র ব্যক্তি একথা জোরের সঙ্গে বলব এবং সর্ব-অবস্থায় বলব—'

'তুমি বিশ্বাস করো?'

শংকর নির্দ্বিধায় বললেন, 'হ্যাঁ—'

'তোমার প্রকৃতি সরল, তাই কায়স্থ-বুদ্ধি কাকে বলে তার মধ্যে প্রবেশ করা সম্ভব হয় নি। শংকর, সংসার অতি বিচিত্র জায়গা, পলকমাত্র দেখে কোনো-কিছু বিচার করা নির্বুদ্ধিতা। তুমি অল্পদিন দেখছো ছোটরাজাকে, আমি জন্মাবধি এবং আমার বুদ্ধি ও বিবেচনাশক্তি তোমার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়—তোমার মতো অগাধ শ্রদ্ধা তাঁর প্রতি আমারও ছিল। কিন্তু একথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারলাম না, ষড়যন্ত্র করে আমাকে আগ্রা

পাঠাবার কী দরকার ছিল ? আমার কোন্ মোক্ষ লাভ হবে আগ্রা গিয়ে ? এটা কী কৌশলে নির্বাসন দেওয়া নয় ? বলতে পারো আমি কী দোষ করেছি ?'

অল্পক্ষণ চুপ করে থাকতে হল। অনেকগুলি প্রশ্ন একসঙ্গে, কোন্‌টির জবাব দেওয়া যায় ?

শংকর বললেন, 'এটা ষড়যন্ত্র কিনা বলতে পারিনে, নির্বাসন নিশ্চয় নয়, কারণ আমার মনে হয়, আগ্রার ঐশ্বর্য দেখলে এবং নানাদেশের নানা গুণী-জনের সঙ্গে মিশলে, কিছু জ্ঞানলাভ আপনার হবে বইকি—ভবিষ্যতে হয়তো সেগুলো কাজে লাগবে।'

'পথে আসতে আসতে যা দেখলুম,' প্রতাপাদিত্য বললেন, 'তাতেও যদি জ্ঞানলাভ না-হয় তো আগ্রায় গিয়ে আর কতটুকু হবে ! ও-সব বাজে কথা—'

'একেবারে বাজে নয় যুবরাজ।' প্রতিবাদের ঝোঁকে পেয়েছে যেন, শংকর সম্ভ্রম বজায় রেখে প্রতিবাদ করলেন, 'গৌড়ের ভগ্ন-দশা আপনি কী দেখতে পেতেন যদি-না আগ্রার উদ্দেশ্যে বেরোতেন ? প্রকৃতপক্ষে আমার বিশ্বাস, ছোটরাজা সদুদ্দেশ্যে আপনাকে আগ্রা পাঠাচ্ছেন, যদি তিনি পাঠিয়ে থাকেন।'

'এর মধ্যে যদি নেই, একমাত্র তাঁর ইচ্ছাতেই আমাকে আগ্রা যেতে হচ্ছে—'

শংকর জিজ্ঞাসা না-করে পারলেন না : 'এতে তাঁর স্বার্থ ?'

'স্বার্থ অনেক।' প্রতাপাদিত্য ক-মুহূর্ত চুপ, ভেবে নিলেন মুখ খুলবেন কিনা, বললেন, 'তুমি আমার ঘনিষ্ঠ অনুচর, তোমার কাছে বলতে বাধা নেই। তুমি যাই বলো, আমার ধারণা কিন্তু অন্যরূপ। একথা তুমিও জানো আমিও জানি যে বড়রাজা ছোটরাজাকে অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখেন, ছোটরাজা সেই স্নেহের সুবিধা গ্রহণ করেছেন। আর স্বার্থ ? সে তো খুব স্পষ্ট। আমাকে যশোর থেকে নির্বাসন মানে তাঁর নিজের শক্তি সঞ্চয়ের

চেষ্টা। কোন্ পিতা এমন নির্বোধ যে নিজের পুত্রদের ভবিষ্যৎ দেখবে না? আমার ধারণা, পুত্রদের সুপ্রতিষ্ঠিত করাই তাঁর অভিপ্রায়। এক্ষেত্রে আমি তাঁর বাধাস্বরূপ—'

'আমি জানি না এ ধারণা আপনার কী করে হল? শুধু অনুরোধ, যথেষ্ট কারণ না-পেয়ে সন্দেহের বশবর্তী হয়ে আগে থেকে এ-রকম ধারণা না-করাই ভালো।'

প্রতাপাদিত্য বললেন, 'শংকর, আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে ঃ কেউ ঠেকে শেখে কেউ দেখে শেখে। আমার দুটো অভিজ্ঞতাই হয়েছে। তুমি ছোটরাজার যতই গুণগান গাও, এ-সিদ্ধান্ত থেকে আমাকে টলাতে পারবে না। যাকে বলে জ্ঞানচক্ষু, তা আমার খুলে গেছে—'

সর্বনাশ, শুনতে শুনতে শংকর ভাবছিলেন, যথার্থ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ছোটরাজার চরিত্র সম্বন্ধে যুবরাজের যদি এই ধারণা হয়ে থাকে তাহলে সমূহ বিপদ। অলক্ষ্যে শনির প্রবেশ। যুবরাজকে হারাতে হবে তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় বন্ধু, পরামর্শদাতা ও গুরুজনকে। কে না জানে, আজন্ম দু-বাহু দিয়ে আগলে রেখেছেন তিনি যুবরাজকে, পুত্রস্নেহ পর্যন্ত তাঁকে বিচলিত করতে পারে নি। মিথ্যা ধারণার বশবর্তী হয়ে নিদারুণ ক্ষতি সাধন করবেন যুবরাজ নিজেরই। ছোটরাজার মতো এত বড় পরামর্শদাতা তাঁর আর কে আছে? এবং গুরুজন তো বটেই, গুরুও। সকল বিষয়ে গুরু। নিজের হাতে অস্ত্রশিক্ষা, অশ্বচালনা, বিদ্যাশিক্ষা—কি না করেছেন তিনি! স্নেহ মায়া ক্ষমা দিয়ে ঘিরে রেখেছেন সর্বদা। প্রকৃতপক্ষে তিনিই তো পিতার কাজ করে এসেছেন এ যাবৎ, পিতৃতুল্য সেই ছোটরাজা সম্বন্ধে যুবরাজের মন যদি এমন বিষাক্ত হয়ে থাকে তাহলে কী তিনি সর্বহারা হবেন না?… মুছিয়ে দিতে হবে, আজ এবং এখনই হয়তো পারা যাবে না, তবু ধীরে ধীরে তাঁর মন থেকে এই মিথ্যা ধারণা মুছিয়ে দিতে হবে। অন্তত শান্ত করে রাখতে হবে এই ক্ষতিকর মনোভাব, হঠাৎ যেন আত্মপ্রকাশে বীভৎস আকার না-নেয়। এটুকু করতে পারলেই যথার্থ বন্ধুর কাজ করা হয়,

ভাবছিলেন শংকর। যুক্তি দিয়ে টলাতে পারা যায় নি, এখন অন্যপথ। কণ্ঠস্বর আরও কোমল ও নম্র, শংকর ডাকলেন, 'যুবরাজ—'

সন্দেহপ্রবণ মন জেগে উঠেছিল। এবং সন্দেহের শক্তির প্রভাবে নানা কথা ভাবছিলেন প্রতাপাদিত্য। এমন-কি এ চিন্তাও তাঁর মনে এসেছে অনুপম সহচর শংকর হঠাৎ কেন ছোটরাজার পক্ষে এত গুণগান গাইছে? রাজনীতি অতি বিষম জিনিস, রাজনীতির ক্ষেত্রে বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না কারো ওপর, সে যত আপনজনই হোক খুড়োমশায় যদি কূট-কৌশলে তাঁকে যশোর থেকে নির্বাসন দিয়ে পুত্রদের স্বার্থের কথা চিন্তা করতে পারেন, তো শংকর ভাববে না কেন নিজের স্বার্থ? বিচার করে দেখতে হবে শংকর কেন ছোটরাজার প্রশংসায় পঞ্চমুখ? তার কি কোনো স্বার্থ আছে?...ছোটরাজা গোপনে তাকেও বশীভূত করেছেন কিনা কে জানে!

'কি? বলো—'

কিন্তু না, পরক্ষণে পালটা চিন্তা এল, দেখতে পেলেন শংকরের অপাপবিদ্ধ মুখে দুরভিসন্ধির চিহ্নমাত্র নেই—স্নিগ্ধ, উজ্জ্বল, অকপট মুখ...ওই মুখে ছোটরাজার আদল ধরে না, নিষ্পাপ, পবিত্র। স্বরে রুক্ষতা এসেছিল, দৃষ্টিতে রুস্ততা আনলেন। এখনই আর-একটা ভুল করতে যাচ্ছিলেন, থেমে শুধরে নিলেন।

'থামলে কেন? বলো—'

শংকর বললেন, 'আমার একটা অনুরোধ আছে, রাখবেন কী?'

'তোমার অনুরোধ!' ফের একটা বাঁকা অনুভূতির ঢেউ উঠছিল, চেপে গেলেন: 'যোগ্য হলে নিশ্চয় রাখব—'

শংকর সম্ভবত অনুধাবন করতে পারছিলেন যুবরাজের চঞ্চল মতিগতি। বললেন, 'অযোগ্য অনুরোধ আমি করি না। এ ক্ষেত্রে সেটা বুঝতে পারছি না যোগ্য কি অযোগ্য। আমার বলার কথাটি এই, নিতান্ত অসম্ভব না-হলে আমার সামান্য অনুরোধটুকু আপনাকে রাখতে হবে—কথা দিন—'

'যদিচ জানি না তুমি কী অনুরোধ করবে,' প্রতাপাদিত্য সহজ হবার চেষ্টা

করেও গম্ভীর হয়ে গেছেন : 'তবু কথা দিলাম। কেননা আমি জানি তুমি আমার হিতাকাঙ্ক্ষী—'

'সেকারণেই অনুরোধ করছি,' শংকর বললেন, 'যতদিন ছোটরাজার পক্ষ থেকে প্রত্যক্ষত আপনার জীবনের কোনো আশংকা দেখা না-দেয় ততদিন পর্যন্ত আপনার সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যেক কর্ম আপনার মঙ্গলের জন্যেই বোধ করতে হবে। ছোটরাজা যেন কোনক্রমে আপনার ভিতরে ভক্তিহীনতার লক্ষণ দেখতে না-পান—'

'এই কথা!'—হেসে উঠলেন প্রতাপাদিত্য। বুঝতে পারলেন সহচরটি সত্যি সরল প্রকৃতি, রাজনীতির দুরূহ তথ্য আদৌ বোঝে না। হেসে বললেন, 'না শংকর। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। তেমন কাজ আমি করব না। কিছুতেই না। যদি তা করতাম তাহলে তাঁর আদেশ অবনত-মস্তকে মেনে নিতাম না। যশোর ছাড়তুম না।'

'কথা দিলেন তো?'

প্রতাপাদিত্য সহচরের পিঠ চাপড়ে দিলেন : 'তা কি আগে দিই নি। প্রতাপাদিত্য কথার খেলাপ করে না - '

'নিশ্চিন্ত হলাম।'

অবশেষে আগ্রা।...দীর্ঘ পথ-পরিক্রমার সমাপ্তি। ক্লান্তিকর একঘেয়ে ভ্রমণের অবসান। স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন সকলে। উন্মুখ হয়ে তাকালেন চারিদিকে। জানা ছিল বাদশাহ আকবর এ-সময়ে আগ্রাতেই থাকেন, এখন গরমকালে, শীতে কখনও ক[illegible]ও দিল্লি চলে যান। বাদশাহের নড়াচড়া উপলক্ষে দিল্লি বা আগ্রা অপরূপ সাজে সেজে ওঠে। নদীতীর থেকেই দেখা যাচ্ছিল অমরাবতীর মতো সাজানো সৌধমালা, তুঙ্গচূড়ায় শোভা পাচ্ছে ধাতুনির্মিত কলস—স্বর্ণ রজত ও পিতলের কলস দেখে অনুমান করা কঠিন নয় যে ওগুলি শ্রেণী বা পদমর্যদার প্রতীক। বিত্তের তারতম্য

তদনুযায়ী ধাতুর তারতম্য এবং তদ্‌দ্বারাই সুস্পষ্ট। প্রতাপাদিত্য বললেন, 'বড্ড চোখে লাগছে। শংকর, বিত্তের বিচারেই কী মানুষ বড় বা ছোট হয়? অন্তত যশোরে এতখানি বিভেদ আছে বলে মনে হয় না—'

শংকর বললেন, 'আগ্রা হিন্দুস্থানের রাজধানী। এখানকার চাল আলাদা, হয়তো মানুষগুলিকে শ্রেণীভিত্তিক ভাগ করা এখানকাব নিয়ম।'

'আজব জায়গা বটে! চলো নামা যাক—'

নদীতীরের রাস্তাটি অতি পরিচ্ছন্ন, কণামাত্র আবর্জনা নেই কোনোখানে, অধিকন্তু বাতাসে কেমন সুবাস। বোঝা যাচ্ছিল, গন্ধবারি সিঞ্চন করে রাজ-বর্ত্ম সুবাসিত কবা হয়েছে। পদাতিক ও অশ্বারোহী প্রহরীগণ টহল দিয়ে যাচ্ছে ঘন ঘন—হট্টগোল নেই এতটুকু। নিঃসন্দেহে নদীতীরটি অভিজাত অঞ্চল, মহামান্য ব্যক্তিগণের বাস, তাঁদের নিদ্রা বা বিশ্রামের যাতে কোনো-রূপ ব্যাঘাত না-হয় সেজন্যে নিখুঁত ব্যবস্থা।···এখন আশ্বিনের বিকেল, পেঁজা তুলোর মতো সাদা মেঘের আনাগোনা আকাশে, মেঘলা-ভাঙা রোদে সম্মুখের সৌধমালা, দুর্গ-মুরচা, প্রাসাদশ্রেণী ঝলমল কবছিল। অস্পষ্ট কুতুব-ধ্বনি (খত্‌বা) শোনা যাচ্ছিল দূরের মসজিদে—অতুল-প্রভাব শাহানশা আকবরের মঙ্গল-প্রার্থনায় শুধু একটি নয় সবগুলি মসজিদ সর্বদা মুখবিত। ঠিক ঈর্ষা নয় কেমন-একটা জ্বালা বোধ করতে লাগলেন প্রতাপাদিত্য। হিন্দুস্থানের বাইরে, মধ্য-এসিয়া থেকে মুষ্টিমেয় কজন বীর-পুরুষ রাজ্য-লালসায় এদেশে এসে জেঁকে বসেছে বুকের উপর; আজ সমস্ত সুখৈশ্বর্য তাদের দখলে, নিজ-দেশে পরবাসী হিন্দুস্থানের অধিবাসীবৃন্দ। হিন্দুর হৃত-গৌরব কী কিছুতেই পুনরুদ্ধার করা যায় না, ভাবছিলেন তিনি।

হাতির পিঠে হাওদায় চড়ে বৈকালিক ভ্রমণে বেরিয়েছেন পদস্থ আমির-উজিরের দল, তাদের সামনে-পিছনে অশ্বারোহী প্রহরী। আট বাহকে তাঞ্জাম নিয়ে গেল একটা—হুম্‌ব্রো হুম্‌ব্রো শব্দে কিছুক্ষণ মুখরিত হল পরিবেশ। তাঞ্জামের চতুর্দিক মুক্তাখচিত ঝালরে ঢাকা, ঈষৎ উন্মুক্ত এক-

দিকের পাল্লা, কে বসে আছে বোঝা না-গেলেও প্রতাপাদিত্য অনুমান করে নিলেন স্ববর্ণকলস-চিহ্নিত সৌধমালার কোনো সৌদামিনী নিশ্চয়, ইনিও ভ্রমণে বেরিয়েছেন কিংবা সমশ্রেণীর আত্মীয় গৃহে চলেছেন নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে। ···খানিকটা বাড়াবাড়ি মনে হচ্ছিল। এরা কেমন নিস্পৃহ ও নিরাসক্ত, নবাগতদের সম্বন্ধে কোনো কৌতূহল নেই। অথচ যশোর হলে? যশোরে···

'আপনাদের লোক এখনও আসে নি ?'

নদীতীর-রক্ষীদের একজন প্রশ্ন করেছিল আগে, ফিরে এসে জিজ্ঞেস করল আবার।

'খবর পাঠানো আছে, হয়তো এসে পড়বে এখনই—'

রক্ষী বললে, 'বেশি দেরি কোরো না। এখানে দাঁড়াবার নিয়ম নেই। কে নিতে আসবে তোমাদের ?'

নাম বলা যেত, কেননা যশোরের মহারাজার ব্যক্তিগত প্রতিনিধি ভুজঙ্গ-ভূষণের স্থায়ী বসতি আছে আগ্রায়, কখন্ কী কারণে বাদশাহের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে হয় বলা যায় না—মোগল-তুষ্টির জন্যে ছোট-রাজার পরামর্শে বড়রাজা তাই তাঁকে নিযুক্ত রেখেছেন এখানে। এ-রকম ব্যবস্থা অবশ্য সকলেই করেছেন। তামাম হিন্দুস্থানের ছোট-বড় সকল রাজ্যই বাদশাহের অধীন, তার দরবারে রাজা স্বয়ং অথবা তাঁর প্রতিনিধি উপস্থিত থাকা অলিখিত নিয়ম, তদর্থ আনুগত্যের স্বীকৃতি এবং যথাযথ শ্রদ্ধাসহকারে তা যদি না-ঘটে তাহলে অনুপস্থিত রাজার কপালে অশেষ দুর্ভোগ, এক্ষেত্রে শ্রদ্ধা অর্থে উপঢৌকন।···কিন্তু শিষ্টাচার এমনই যে সামান্য রক্ষী পর্যন্ত তুমি-সম্বোধন করে! অবশ্য আত্মপরিচয় দেওয়া হয় নি একথা ঠিক, তা বলে নবাগতের সঙ্গে এভাবে কথা বলবে নাকি? এত তুচ্ছজ্ঞান! প্রতাপাদিত্যের মেজাজ গরম হয়ে উঠেছিল, হয়তো কড়া জবাব দিতেন, কেননা চমৎকার ফারসি ভাষা জানেন তিনি, রক্ষীকে স্বভাষাতেই কড়া জবাব দিয়ে সমঝে দিতে পারতেন তিনি কোন্ শ্রেণীর আগন্তুক এবং কার জন্যে অপেক্ষা করছেন; তৎপূর্বে দেখতে পেলেন অশ্বপৃষ্ঠে ভুজঙ্গভূষণ

এবং তদপশ্চাতে হাওদাযুক্ত হাতি। সম্ভবত গজেন্দ্র-গমনের জন্যেই দেরি হয়েছে ভুজঙ্গভূষণের।

শংকর বললেন, 'ওই-যে আসছেন—'

প্রতাপাদিত্য অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়েছিলেন, সেইভাবে বললেন, 'দেখতে পেয়েছি।'

ভুজঙ্গভূষণ অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে নত হয়ে প্রণাম জানালেন, বয়স্ক ব্যক্তি, কুণ্ঠা লাগল প্রতাপাদিত্যের। দেরি হওয়ার জন্যে ক্ষমা চাইছিলেন তিনি, রক্ষী বললে, 'এ ভুজা-সাহাব, হাত্তি কিস্ লিয়ে?'

'ইনি যশোরের যুবরাজ, এঁকে নিতে এসেছি আমি। হাতি ওঁর জন্যে—'

ভাবা গিয়েছিল রক্ষী তটস্থ হবে, সেলাম ঠুকবে। কিন্তু সেদিক দিয়ে গেল না রক্ষীপ্রবর, ট্যাঁক থেকে সিদ্ধির কৌটা বার করে একটিপ গালে দিয়ে প্যাচ করে থুথু ফেলল সকলের সামনে। বললে, 'ঠিক হ্যায়। লে যাও। লেকিন দেখ, দুসরা হাত্তি কো সাথ কভ্ভি না ভিড়াও, রঈস আদমি ইধার-উধার যাতি হ্যায়।'

অর্থাৎ যশোরের যুবরাজের চেয়েও ভারি-ভারি লোক হাতির পিঠে যাতায়াত করছে, তোমাদের হাতি যেন তাদের কারো সঙ্গে গোলমাল না-বাধায়। আর-একবার পিক ফেলে হেলে-দুলে চলে গেল রক্ষী।

ভুজঙ্গভূষণ লজ্জিত হলেন। ছোট করে বললেন, 'এ হল আগ্রা। এখানকার ব্যাপারই আলাদা। আকবর বাদশার সাথে রক্ষী বা চৌকিদারের কোনো ভেদ নেই—'

'হুঁ।' প্রতাপাদিত্য হাতির হাওদায় উঠে বসলেন। শিক্ষিত হাতি মাহুতের নির্দেশে নিচু হয়েছিল, আবার সোজা হল। ঠুন ঠুন গলার ঘণ্টি বাজিয়ে চলল এগিয়ে। পেছনে আসতে লাগল দলবল। ভুজঙ্গভূষণ বাড়ি ঠিক করে রেখেছিলেন একটু ভেতরে, সকলে চলল সেদিকে।···যত ভেতরে যাচ্ছিলেন, বাড়ি ঘরের চেহারা তত বদলে যাচ্ছিল, হাতির হাওদা থেকে প্রতাপাদিত্য দেখতে পাচ্ছিলেন, সৌধ-এলাকা শুধু নদীর ধারটুকুই,

ভেতরের দিকে খড় বা পাতা-ছাওয়া ঘরের সংখ্যা বেশি। বুঝতে অসুবিধা হল না যে আগ্রায় মাত্র দু-শ্রেণীর লোকের বাস, একদল ধনী আর একদল দরিদ্র। মাঝামাঝি কোনো শ্রেণী নেই। খড় বা পাতা-ছাওয়া ঘরের বাসিন্দাদের দরকার পড়ে যুদ্ধের সময়, নাম লেখায় ফৌজে, কৃতিত্ব দেখালে সম্ভবত পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে, যুদ্ধকালে মরে গেলেও তাই…বাঁচুক বা মরুক তাদের অবস্থার পরিবর্তন হয় না কখনও। অন্যপক্ষে সৌধমালার অধিবাসীরা পদস্থ ব্যক্তি বলে ঘন ঘন কৃপা লাভ করেন, সুখে ও বিলাসে নিমজ্জিত থাকাই তাদের ললাটলিপি।…ভুজঙ্গভূষণ অবশ্য আরও একটি তথ্য পরিবেষণ করলেন, বললেন, 'কি-দরিদ্র কি-ধনী, স্বামী মারা গেলে বিধবা স্ত্রীর অবস্থা শোচনীয়…স্থাবর অস্থাবর সব সম্পত্তি চলে যায় বাদশাহের দখলে, যদি পুত্র থাকে এবং কর্মক্ষম হয় তাহলে বাদশাহ অনুগ্রহ করে তাকে কর্ম দিতে পারেন, অন্যথায় বিধবার জীবন দুর্বিষহ—'

যথেষ্ট ভেতরের দিকে ভুজঙ্গভূষণ প্রকাণ্ড একটি বাড়ির ব্যবস্থা করেছিলেন। সম্ভবত নিরিবিলি বাসের জন্যে কোনো ধনী ব্যক্তি নির্মাণ করেছিলেন বাড়িটি, এখন পরিত্যক্ত, চারিদিক নির্জন ও খোলামেলা। অট্টালিকা বিশেষ। পথশ্রমে ক্লান্ত ছিলেন প্রতাপাদিত্য, হাওদা থেকে নেমে সোজা ঢুকে পড়লেন অন্দরে।

প্রাত্যহিক বাজার-করার ভার ছিল ভুজঙ্গভূষণের উপর, দলটি তো ছোট নয়, প্রতিদিন রাশি রাশি খাদ্যসম্ভার লাগত। যুবরাজ ও তাঁর প্রিয় সঙ্গীদের আহারের বিশেষ ব্যবস্থা। ··· না-বাজারের সেরা সেরা জিনিসগুলি তুলে আনতেন তিনি। ভুজঙ্গভূষণের ব্যস্ততার সীমা ছিল না। সকালবেলা শয্যাত্যাগ করেই চলে যেতেন বাজারে, টাটকা জিনিস যা পাওয়া যেত লোক-মারফত নিয়ে আসতেন কিনে।…আগ্রা শহরের দ্রষ্টব্য বিষয়গুলি দেখার পর সুন্দরের ইচ্ছা হল সেও সঙ্গী হবে ভুজঙ্গভূষণের, বাজার

দেখবে। বললে, 'মদনদা, চলো-না ঘুরে আসি বাজারে। আজ বাদে কাল দরবারে যাব, বাদশার সঙ্গে দেখা হলেই তো আমাদের আগ্রা-বাস ফুরিয়ে গেল, এইবেলা বাজারটা ঘুরে দেখে আসি—'

মদনের কেমন আলস্য লাগছিল, কোনো কাজ নেই, খাও আর ঘুম দাও। আগ্রা দেখার আগে পর্যন্ত কৌতূহল চরম ছিল, না-জানি কোন্ অমরাবতী দেখবে, প্রথমদিকে আগ্রাকে সেই রকম মনে হয়েছিল বটে কিন্তু চমক কেটে যাবার পর নিত্য-দেখা মলিনতায় ম্লান। নানান দেশীয় লোকের বাস, হাতি ঘোড়া উট চলাচল করে বলে ঠাট-ঠমক খুব, বাদশাহ-প্রভায় বহুদূর পর্যন্ত এমন আলোকিত যে চোখে ধাঁধা লেগে যায় বাস্তবিক। বিশাল মোগল-সাম্রাজ্যের অধিপতি যিনি, তাঁর পরিপার্শ্ব এ-রকম হওয়াই স্বাভাবিক; যশোর সে-তুলনায় অতি নগণ্য, তবু যশোরে প্রাণের স্পর্শ আছে, আত্মীয়তা-সুলভ আন্তরিকতা আছে, অপরিচিত লোকের সঙ্গেও দু-দণ্ড কথা বলা যায় দাঁড়িয়ে। এখানে কেউ কারো তোয়াক্কা করে না, যে যার কাজে ব্যস্ত, কৌতূহল নেই কারো সম্বন্ধে কণামাত্র।...মদনের মন ভালো ছিল না এজন্যে, নিষ্কর্মার মতো বসে থাকা আর ভর-পেট আহারের ফলে তার শরীর মোটা হচ্ছিল আরও, যশোরে ফেরার জন্যে মন হাঁপিয়ে উঠত।

সুন্দরের আবদার শুনে মদন খিঁচিয়ে উঠল। বললে, 'তুই যা ছোঁড়া, তোর উঠতি বয়স, বাজারে ঘুরে আয়—'

কথাটার মধ্যে নিহিতার্থ ছিল। বাজারের রাস্তার দু-পাশে ছোট ছোট ঘরে হুরী-পরীদের বাস, দিবালোকেও তাদের প্রত্যক্ষ করা যায়। কেউ দাসীকে দিয়ে চুল আঁচড়িয়ে নিচ্ছে হাতের সামনে আয়না রেখে, কেউ বা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সুঠাম ভঙ্গিতে, কেউ হাসি-মশকরা করছে কম-বয়সী রাস্তার ছেলেদের সঙ্গে—মদন দেখেছে। ইংগিতটা সেই উপলক্ষে। সুন্দর তা বুঝল না, এ-সব গূঢ় তত্ত্ব তার মাথায় ঢোকে না আদৌ। সে বললে, 'বেশ তুমি থাকো, আমি তবে ঘুরে আসি। চলুন ভুজঙ্গদা—'

ঘোড়ায় চড়ে ধীরে ধীরে বাজারের দিকে আসছিল ওরা। সকাল বেলাতেই

রাস্তার ধারে ছক পেতে বসেছে জ্যোতিষীরা এবং রীতিমত ভিড় এক-এক জায়গায়। প্রায় প্রত্যেকেই হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে জ্যোতিষীদের সামনে আর দক্ষিণা দিয়ে চলে যাচ্ছে হাসিমুখে। গণনা নিশ্চয় শুভ, প্রত্যেকের ভবিষ্যৎ নিদারুণ উজ্জ্বল।···ভুজঙ্গভূষণকে অপেক্ষা করতে বলে সুন্দর দাঁড়িয়ে পড়েছিল জমাট-ভিড় এক জ্যোতিষীর সন্নিধানে। লোকটি কোন্ জাতীয় বোঝা যাচ্ছিল না, পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে ও কথাবার্তা শুনে মনে হল বিদেশী, মনোযোগ সহকারে হাত দেখছে আর থেমে-থেমে কথা বলছে, কটা চোখ, ফর্সা গায়ের রঙ। নাবিকের মতো পোশাক, বহু ব্যবহৃত, শতচ্ছিন্ন। লোক-আকর্ষণের প্রধান বস্তুটি উঁকি মেরে দেখল সুন্দর, মাটিতে মেলে-রাখা হিজিবিজি নক্সা একটি···সেটা আর-যাই হোক জ্যোতিষ শাস্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কহীন, গ্রহ-নক্ষত্রের নক্সা হতে পারে, পালিয়ে-আসা জাহাজের নাবিকের পক্ষে যা সংগ্রহ করা সহজ এবং সাধারণ আগ্রাবাসীর পক্ষে সাক্ষাৎ জ্যোতিষ-চিত্র! সন্দেহ হল সেখানেই এবং কিছুক্ষণ হস্তবিচার পদ্ধতি লক্ষ্য করে খরিদ্দার-তুষ্টির কৌশলটি যখন ধরতে পারল তখন তার উৎসাহ একেবারে স্তিমিত হয়ে গেল। অর্থোপার্জনের এ এক চমৎকার ফিকির! যেহেতু বাদশাহ জ্যোতিষগণনা ব্যতীত কোনো শুভকর্ম করেন না এবং তাঁর দরবারে জ্যোতিষীদের সম্মান প্রভূত সেই হেতু, কিংবা কে জানে, প্রতি মানুষের মনে অজানা ভবিষ্যৎ ভীতি আছে বলেই হয়তো ওদের এত প্রসার, যা-হোক একটা ছক পেতে বসলে ওদের ব্যবসা ঠেকায় কে। সুন্দর নিজের ভবিষ্যৎ জানবে বলে স্থির করেছিল, এমন-কি লজ্জার মাথা খেয়ে বিয়ে এবং পাত্রী-সংক্রান্ত দু-একটা কথা জিজ্ঞেস করার বাসনা ছিল কিন্তু ব্যাপার দেখে সামলে নিল নিজেকে ভুজঙ্গদা শুনে ফেলতেন জিজ্ঞাসা, ক্রমে মদনদার কান হয়ে শংকরদার কানে উঠত কথাগুলো, লজ্জার শেষ থাকত না তাহলে! কী মনে করতেন ওঁরা—ছি! তার চেয়ে গুটি গুটি বাজারের দিকে যাওয়াই ভালো।

বাজারের দিকে আসতে আসতে পাঁচিল-ঘেরা জাফরান রঙের বাড়িগুলো

তাকিয়ে দেখছিল সুন্দর। সুদীর্ঘ পাঁচিল আর সারি সারি বাড়ি—সবগুলো এক রঙ। পাঁচিলের দ্বারে খোজা প্রহরী—লোকজনের যাতায়াত পড়ল না চোখে, নিস্তব্ধ, যেন বাতাসেরও প্রবেশ এমনই নিঃসাড়। অথচ উজ্জ্বল রঙের প্রলেপ ও গঠনের কারুকার্য দেখে মনে হয় বাড়িগুলোতে লোকের বাস আছে। রসস্তপুরীর মতো, বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় না।

সুন্দর বললে, 'ভুজঙ্গদা, এ-সব বাড়িতে কারা বাস করে? পাশ দিয়ে ক'দিন যাতায়াত করলুম, কাউকে চোখে পড়ল না। কারা থাকে?'

'ওদিকে বেশি তাকিও না ভায়া, গর্দান যেতে পারে। খোজা প্রহরীর তলোয়ার বিঁধে যাবে চোখে—'

সুন্দর বললে, 'কেন ভুজঙ্গদা, আমি কী দোষ করলুম?'

'ওদিকে চেয়ে-থাকাই দোষের। ওটা বেগম-মহল। বাদশা আকবরের বেগমেরা থাকেন ওখানে—'

সুন্দরের চোখ কপালে উঠল: 'বেগমদের থাকবার জন্যে এতবড় মহল! বাদশা আকবরের কত বেগম?'

'আমি ঠিক জানি না। তবে শুনেছি চার কি পাঁচ হাজার—'

সুন্দর হাঁ বুজতে সময় লাগল: 'চার কি পাঁচ হাজার? বলেন কি! এত বেগম সামলাতে পারেন উনি একা?'

'তা বলতে পারি নে বাপু। সামলাতে পারেন বলে মনে হয়, তিনি দিল্লিশ্বরো-বা জগদীশ্বরো-বা, অসাম ক্ষমতাবান। সৈন্যবাহিনীর কুর্নিশ নেওয়ার মতো হয়তো বেগম-বাহিনীর জমিন-বুস্ গ্রহণ করেন, ভূমি-চুম্বন। কিংবা কোনো কক্ষে বসে তলব করেন বেগম-বাহিনীকে···তাও না, শুনেছি বাদশাহের পদধূলি পড়লে বেগম-মহল ধন্য হয়ে যায়, হুড়োহুড়ি পড়ে যায় বেগমদের মধ্যে।'

সুন্দর বললে, 'এই যে অবরোধ-প্রথায় দিনযাপন, বেগমেরা কী খুব সুখী মনে হয়?'

'বলা শক্ত। তবে উৎসবের নানা আয়োজন আছে। বাদশা আকবর নিজে

যত-না বিবাহ করেছেন তার চেয়ে বেশি লোক সাধাসাধি করে পাত্রী দিয়েছে তাঁর প্রীতি অর্জন মানসে। রাজপুত, অমন দুর্ধর্ষ যে-জাত, তারাও বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেছে ওই একই কারণে, কেউ দিয়েছে কন্যা কেউ বা ভগিনী। এদের বলা হয় ডোলার কন্যা। অথচ এদেরই একজন রাণা প্রতাপ মোগলদের বশ্যতা স্বীকার না-করে কী কঠিন ক্লেশে পর্বতে-কন্দরে ঘুরে বেড়িয়ে, অর্ধাহারে অনাহারে, মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছেন তিলে তিলে। তাঁর ত্যাগ ও সংগ্রাম রাজপুত জাতির মুখে মুখে—মোগলের দাস্যতা স্বীকার করেছে এমন রাজপুতও তাঁর গুণগান গায়—'

সুন্দর বললে, 'যথার্থ বীরপুরুষ তিনি। নমস্য ব্যক্তি। এই অনমনীয় মনোভাব থাকা দরকার প্রতিটি স্বাধীন-চেতা মানুষের মনে। আমাদের যুবরাজ এই ধরনের মানুষ। নামের সঙ্গে আশ্চর্য মিল, একজন প্রতাপাদিত্য অন্যজন প্রতাপসিংহ, একজন যশোরের যুবরাজ অপরজন চিতোরের রাণা। আমাদের যুবরাজ এ-কাহিনী জানেন?'

'হ্যাঁ। বলেছি। তাছাড়া মোগল-সেনাপতি মানসিংহের পরিচিত হয়ে এই কাহিনী জেনে নিয়েছেন বিশদভাবে। মানসিংহ দুর্ধর্ষ সেনাপতি—বাদশা আকবরের ডানহাত বলা যায়। তবু তিনিও ভগিনী সম্প্রদান করেছেন বাদশার হাতে—বজায় রেখেছেন সম্প্রীতি।...যুবরাজ আলাপ করেছিলেন তাঁর আবাসে উপস্থিত হয়ে, মানসিংহ যথোচিত সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন তাঁকে। এমনিতে লোকটি অতি ভদ্র কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে অতিশয় ভয়ংকর। ঠিক আমাদের যুবরাজের মতো—'

সুন্দর বললে, 'এই-সব জ্ঞানী-গুণী লোকদের সঙ্গে আলাপ ও পরিচয় হবে বলেই যুবরাজের আগ্রা আগমন। ইতিপূর্বে রাজা টোডরমল্লের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, বিকানীরের রাজকুমার কবিবর পৃথ্বীরাজ তো বন্ধুত্বে বরণ করে নিয়েছেন, তিনি সম্রাটের সভাসদ। যুবরাজ যেদিনই নগর-ভ্রমণে বেরোন সেদিন কোনো না কোনো গুণী ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ করে নেন, মোগলের শক্তি ও রাজনীতি বোঝবার চেষ্টা করেন।'

'বাস্তবিক মোগলের কাছ থেকে আমাদের শেখবার আছে অনেক-কিছু। যুবরাজ বুদ্ধিমান, কৌশলে কোনো রকমে যদি বাদশার নেকনজরে পড়তে পারেন তাহলে যশোরের ভবিষ্যৎ নিরাপদ হয়। বলা যায়-না গৌড়ের মতো কোন্‌দিন সর্বনাশ নেমে আসে যশোরে, আগে থেকে বাঁধন দিলে ভয় থাকে কম—'

'কিন্তু ভুজঙ্গদা,' সুন্দর বললে, 'এ পাঁচিল যে ফুরোয় না! আচ্ছা, এতগুলি মহিলা অবরোধে বাস করেন, ওদের দিন কাটে কী করে? তার ব্যবস্থা করেন নি সম্রাট আকবর?'

'করেছেন বই কি। অজস্র আনন্দানুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে। তোমরা যদি ফাল্গুনের পয়লা তারিখে এখানে আসতে তাহলে বিশেষ এক আনন্দানুষ্ঠান দেখতে পেতে, সেরা অনুষ্ঠান, নওরোজ—'

'সেটা কী?'

ভুজঙ্গভূষণ বললেন, 'নওরোজের অর্থ নববর্ষ। পারস্য সম্রাটদের অনুকরণে হিন্দুস্থানে এই উৎসব চালু করেন বাদশা আকবর—এমন-কি পারসী নও-রোজকেও ছাপিয়ে যায় তার জলুস। পারসী নওরোজ হত বারোদিন, তিনি চালু করেছেন উনিশ দিন। সূর্য যখন মেষরাশিতে প্রবেশ করে, ইরাণী পঞ্জিকায় সেদিন থেকেই নবর্ষের শুরু। মোগল নওরোজও তাই। হিন্দু-স্থানের ঋতু-বিচারে সেটা বসন্তের আবির্ভাব-লগ্ন—'

'আপনি দেখি অনেক খবর রাখেন!'

'রাখতে হয় রে ভাই। এখানে আছি যশোরের রাজার প্রতিনিধি হয়ে, চোখ-কান খুলে না-রাখলে দেখা যায় না কিছু, শোনা যায় না। বুদ্ধিকে জাগিয়ে রাখতে হয়, তা না-হলে আমার বদনাম তার মানে হিন্দুর বদনাম এবং যশোরের রাজাও তা থেকে রেহাই পাবেন না।' ভুজঙ্গভূষণ বললেন, 'অনেক কাণ্ড ঘটেছে এই নওরোজকে কেন্দ্র করে, দেশ-বিদেশ থেকে কত লোক যে আসে তার ঠিক নেই, থই থই করে রাজধানী। নওরোজের জলুস বাড়াবার জন্যে মীনাবাজার পর্যন্ত জুড়ে দিয়েছিলেন বাদশা আকবর—যার

প্রবর্তন করেন তস্য পিতা হুমায়ুন। এই মেলাতেই আকবরের চোখে পড়েছিল সভাসদ কবি পৃথ্বীরাজের ঘরনীকে। বিদ্যুল্লতার মতো সে রূপ মোগল-বাদশাকে বিভ্রান্ত ও ব্যাকুল করে তোলে। রূপ-বিমুগ্ধ বাদশা ভেবে-ছিলেন প্রেম দিবেদন করলেই পাওয়া যাবে রাজপুত-বালার দেহ-মন, তিনি তো সাধারণ ব্যক্তি নন, হিন্দুস্থানের বাদশা। কিন্তু জানা ছিল না রাজপুত-ললনাদের চরিত্র, প্রেম নিবেদন শুনেই ঝলসে উঠল তার হাতের ঝকঝকে কিরিচ, তেমনি উদ্ধত বলিষ্ঠ উত্তর ঃ 'সম্রাট, আপনি ভুল করেছেন। যদি জবরদস্তি করেন তাহলে আমার মৃতদেহই শুধু স্পর্শ করতে পারবেন, দয়া করে অন্যত্র দৃষ্টিপাত করুন। আমি আপনার ভোগের যোগ্য নই।'

'সাবাস—'

ভুজঙ্গভূষণ বললেন, 'আরও অনেক গল্প বলতে পারি। উনিশ দিনব্যাপী নওরোজে প্রতি বৎসর কত কাণ্ডই হয়েছে। মুশায়ারা ব্যবস্থা করেছিলেন, রুবাইয়ায়েতের ছন্দোমূর্ছনায় দেশের আকাশ-বাতাস বিহ্বল হয়ে ওঠে। শুধু কবিতাই নয়, নাচ আছে গান আছে, উল্লাসে-উচ্ছ্বাসে এই নওরোজ এ-আমলে সবচেয়ে বড় উৎসব। দেখবার মতো ব্যাপার। ফাল্গুন মাসে যদি আসতে—'

'আগ্রার বাজারটাও তা দেখবার মতো জায়গা। চলুন ঢোকা যাক।'

ঘোড়া থেকে নামল সুন্দর। ভুজঙ্গভূষণের পেছন পেছন চলল বাজারের ভেতরে। ঘোড়া দুটো বাঁধা রইল খোঁটায়।

বিরাট বাজার। কোথায় লাগে যশোরের বাজার তার কাছে। প্রতিটি চক ছিমছাম সাজানো। বিশেষত প্রবেশমুখে সোনা-রূপার চকে তো পা ফেলতে সংকোচ হয়—উজির-আমিরদের পদধূলি পড়ে বলে সরু গলিপথটি যেমন ঝকঝকে তেমনি তকতকে, স্বর্ণ · রত্নালংকারে দোকানগুলি এমনভাবে সুশোভিত যে চোখ যেন ধাঁধিয়ে যায়। এ-সব দোকানে ভিড় জমে বিকেলে—খসবুদার জলের পিচকারি ছোটে, সুগন্ধি তবক পানের ছড়া-ছড়ি। ধনী-খরিদ্দারের সঙ্গে তৎগৃহিণী এলে তো দোকানদারের পক্ষ থেকে

আদর-আপ্যায়নের বান ডেকে যায়, তখন সাধারণ খরিদ্দারের দিকে নজরই থাকে না।···চিত্রপটের মহল্লাটিও দর্শনযোগ্য। বেশির ভাগ ছবি দিল্লি-আগ্রার প্রাকৃতিক দৃশ্যের ওপর আঁকা, নৃত্যরতা সুন্দরী মহিলাদের ছবি আছে আর আছে বাদশা আকবরের অজস্র ছবি, বিক্রি নেই তেমন, সুন্দর দেখতে পাচ্ছিল শিল্পীরা চুপচাপ বসে, যেন তারা অবাঞ্ছিত দোকানদার। একজন শিল্পীর সঙ্গে আলাপ করে সুন্দর তাদের দুঃখের কাহিনী জানতে পারল। প্রকৃতপক্ষে বাজার থেকে ছবি কেনার রেওয়াজ নেই তেমন, উচ্চপদস্থ ধনী গ্রাহকেরা অনুগ্রহ করে তাদের স্মরণ করেন এবং বাড়ি গিয়ে একমাস কি দুমাস পরিশ্রম করে তাঁর মর্জিমতো যদি বা ছবি আঁকা শেষ করা যায়, নগদ-বিদায় পাওয়া যায় যৎসামান্য। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার মেলে না কিছুই। কথা বাড়াতে গেলে স্বকীয় প্রভাবে শিল্পীর আগ্রা-বাস খতম করে দেন। তবু, যেহেতু অন্য পেশা জানা নেই, ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে পড়ে থাকতে হয়।

ভুজঙ্গভূষণের তাড়া ছিল, তাঁকে ফিরতে হবে তাড়াতাড়ি। সুখ-দুঃখের কথা পরে হলেও চলবে, আপাতত চাউল-মহল্লা এসে গেছে সেখানে ঢোকা দরকার। নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি কেনাকাটা করতে না-পারলে ডানহাতের ব্যবস্থা অচল হয়ে যায়। চাল কিনলেন পাঁচ মন, উৎকৃষ্ট বাঁশ-ফুল চাল। যা দাম দিলেন, দেখে সুন্দরের চক্ষুস্থির। বললে, 'ভুজঙ্গদা, এ যে গলা-কাটা জায়গা গো। যশোরে এই বাঁশফুল চাল পাওয়া যায় টাকায় এক মন দশ সের। আর এরা কিনা—'

'এটা যশোর নয় সুন্দর, আগ্রা। এখানে জিনিসের দাম একটু চড়া হবে বই কি!'

সুন্দর বললে, 'তা বলে এত? কি জানি বাবা···আমার মনে হয় এখানকার লোকেরা টাকা চিবোয়, এ-দরে চাল কিনতে হলে যশোরের লোকেরা দম আটকে মারা যেত। টাকায় তিরিশ সের বাঁশফুল চাল—বাপের জন্মে শুনি নি বাবা—'

ভুজঙ্গভূষণ উৎকৃষ্ট গম কিনলেন টাকায় দু মন। ফের আঁতকে উঠেছিল সুন্দর, ভুজঙ্গভূষণ ধমক দিলেন। সুন্দর বিড়বিড় করে বললে, 'যশোরে টাকায় তিন মন করে পাওয়া যায়। ডাকাত, এরা ডাকাত—'

প্রথম শ্রেণী তেল ও ঘৃতের দাম শুনে গুম হয়ে গেল সুন্দর, কোনো কথা বললে না।

'কি হে চুপ করে গেলে কেন? এ দুটো বুঝি সস্তা যশোরের চেয়ে?'

সুন্দর বললে, 'আমাকে যদি বাজারে পাঠাতেন, এত দামে কোনো জিনিস কিনতে পারতাম না। আগুন, এখানকার বাজারে সব জিনিসের দর আগুন। তেল আর ঘি যে-দরে কিনলেন তা যশোরের লোক কল্পনা করতে পারে না। যশোরের দর কী জানেন? তেল টাকায় চব্বিশ সের আর ঘি সাড়ে দশ সের—কত তফাত! এখানকার সাধারণ মানুষেরা না-খেয়ে থাকে নিশ্চয়, চাল-গম-তেল-ঘি যেখানে এত উচ্চমূল্য সেখানে বাস করা কঠিন, রাজা-উজিরদের বাসের জায়গাই বটে! চলুন, বাজার দেখার সখ মিটেছে আমার—'

ফিরে আসতে আসতে কাপড়-পটীর সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল সুন্দর। সোনা-রূপার দোকানের মতোই কাপড়গুলি সাজানো—দৃষ্টি টেনে রাখে রঙের বাহারে ও কারুকার্যে। কত রকমের শাড়ি। কী নিপুণ সীবনশিল্প, যেন এক-একখানি অপরূপ নক্‌সা। বিচিত্র পাড় ও জমির কাজ। সব রকম শাড়ি আছে, অধিকাংশ ঢাকাই মসলিন। অত্যন্ত পাতলা, কিন্তু মজবুত শাড়ি।...তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে পড়ছিল রাধার কথা, ওর জন্যে নিয়ে গেলে হত একখানা। খুব খুশি হত। রাধার মুখখানি মনে পড়ছিল, বিদায়বেলার করুণ দৃশ্য। ছলছল চোখে বিদায় দিয়েছিল রাধা।

'কি হে, শাড়ি কিনবে নাকি?'

সুন্দর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, বললে, 'না চলুন। এখানে জিনিসের যা দাম, দরকার নেই—'

রাজস্ব ও উপঢৌকনের সামগ্রী সঙ্গে করে এনেছিলেন প্রতাপাদিত্য, ক-দিন বিশ্রামের পর দেহে-মনে চাঙ্গা হয়ে রাজকীয় বর্ণাঢ্য পোশাকে দলবলসহ যাত্রা করলেন দরবারের উদ্দেশ্যে, রাজস্ব রেখে গেলেন ভুজঙ্গভূষণের জিম্মায়। বললেন, 'ওটা থাক্। পরে দেব। এখন শুধু সাক্ষাৎ···'

সকালবেলা আম-দরবার বসে, সম্রাট দর্শন দেন সকলকে, প্রজাদের অভাব-অভিযোগ শোনেন। তৎক্ষণাৎ বিচার করেন কোনো অভিযোগ, কোনো-কোনোটা রেখে দেন পরে মতামত জানাবেন বলে। অতি সুষ্ঠু ব্যবস্থা। নিরাশ করেন না কোনো প্রজাকেই। জনগণের সঙ্গে যোগ থাকার ফলে তাঁর সাম্রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে নিরঙ্কুশ শান্তি, বিশেষত গত বছরে নওরোজের সময় 'তমঘা' জাতীয় কর রেহাই দেওয়ায় ব্যবসায়ী-মহলে খুশির ভাব। 'তমঘা' একরকমের বাণিজ্য-শুল্ক।···প্রতিদিন দরবারে দেশ-বিদেশ থেকে আসে ব্যবসায়ীরা, বাদশার পায়ের কাছে ঢেলে দিয়ে যায় নজারানা। শুধু ব্যবসায়ীরা নয় দরবারে উপস্থিত থাকেন সাধারণ প্রজা থেকে, আমির-উজিররা তো বটেই, নানা জাতের মানুষ : হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ জৈন পারসী খৃস্টান, সর্বজাত। সর্ব ধর্মের সমন্বয় নাকি এই দরবার। পবিত্র স্থান। বাদশার মনে কণামাত্র বিজাতীয় বিদ্বেষ নেই, সব ধর্মই নাকি তাঁর নিকট সমান আদরণীয়, বলেছিলেন রাজা বীরবল। বিদ্বান ও পণ্ডিত ব্যক্তি রাজা বীরবল, উজ্জ্বল রসিকতা ও শালীন ব্যবহারে মুগ্ধ করে রেখেছিলেন আলাপের ক্ষণগুলি। রাজা বীরবল, আবুল ফজল, মানসিংহ, তোডরমল্ল প্রভৃতি গুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তির সান্নিধ্যে থাকতে ভালবাসেন নাকি বাদশা আকবর, তিনি প্রতিভাবানদের সমাদর করতে জানেন, বহুদর্শী বিচক্ষণ ব্যক্তি।

দরবারে প্রবেশ করে সেই রকম মনে হল প্রতাপাদিত্যের। হ্যাঁ দরবার-গৃহ বটে একখানা। প্রকাণ্ড প্রকোষ্ঠ একটি, স্তরে স্তরে সাজানো মনোরম সজ্জা। মেঝেতে দামী গালিচা পাতা, উপরে সামিয়ানা টাঙানো। থামগুলো মূল্যবান সাটিনের কাপড়ে মোড়া, কোথাও কিংখাবের বনাত। প্রথম দিকে

স্বর্ণনির্মিত সরু বেড়, তৎপরে রৌপ্য, পিতল, তামা, লোহা প্রভৃতি ধাতু-নির্মিত বেড় দ্বারা দরবার-গৃহটি বিভিক্ত—পদমর্যাদা অনুযায়ী ব্যক্তিগণ সেই সেই এলাকায় অধিষ্ঠান করছেন। প্রত্যেকে দণ্ডায়মান, ঈশ্বরের প্রতিনিধি বাদশার সম্মুখে আসন গ্রহণ রীতিবিরুদ্ধ।…প্রতাপাদিত্য দেখতে পাচ্ছিলেন, স্বর্ণ-বেড় থেকে অল্পদূরে সিংহাসনে বসে আছেন আকবর, গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যাম, চক্ষু ও ভ্রূদ্বয় কৃষ্ণবর্ণ। দূর থেকে দেখা হলেও মনে হচ্ছিল, সম্রাটের শরীর সুদৃঢ় ও সুবিভক্ত, কপাল ও বক্ষ উন্নত, হস্ত ও ভুজদ্বয় দীর্ঘ। খর্বকায় তো ননই, বরং বেশ বলিষ্ঠ ও দীর্ঘ চেহারা। কণ্ঠস্বর গম্ভীর কিন্তু কথাগুলি সুমধুর। প্রজাদের অভাব-অভিযোগ শুনে অভিমত প্রকাশ করছিলেন বলে তাঁর কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছিল, ওজঃশক্তি সম্পন্ন কণ্ঠস্বর। বীরবল অথবা মানসিংহ, কিংবা আবুল ফজলই হবে হয়তো, বলেছিলেন, 'ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ।' দেখে তাঁই মনে হচ্ছিল।

লক্ষ্য করছিলেন, বাদশাহের দৃষ্টি কত সূক্ষ্ম ও বিশাল সাম্রাজ্যের সর্বত্র কী গূঢ় সঞ্চারী! দেহের শিরা-উপশিরার মতো বহু রাজ্যে-গাঁথা হিন্দুস্থানের মানচিত্রটি যেন তাঁর সম্মুখে প্রসারিত এবং যে কোনো রাজ্যের সমস্যা ব্যাপারে তিনি সমান কৌতূহলী ও সমাধানে তৎপর। তেমন দু-একটি ঘটনা দেখতে পেলেন তিনি।

নকীব হাঁকল, 'মালব দেশের শাসনকর্তা আবদুল খাঁ—'

আবদুল খাঁ কুর্নিশ করে জানালেন যে, মালব দেশের দুর্ভিক্ষ দমনে অকৃতকার্য হয়ে তিনি মহামান্য সম্রাটের কৃপালাভের প্রত্যাশায় দরবারে উপস্থিত হয়েছেন। মালব দেশে দুর্ভিক্ষে বহু ব্যক্তির প্রাণহানি হয়েছে এবং এখনও সংকটকাল চলছে। সর্বশক্তিমান বাদশা যদি এর বিহিত না-করেন সারা মালব উৎসন্নে যাবে।…আকবর মনোযোগ দিয়ে তাঁর আর্জি শুনলেন, জিজ্ঞাসা করলেন, 'খাঁ সাহেব! তোমার সুবায় দুর্ভিক্ষের কারণ কী?'

আবদুল খাঁ জানালেন, 'কারণ জলাভাব, অনাবৃষ্টি—'

'জলাশয় খনন করো নি কেন ?'

আবদুল খাঁ বললেন, 'সে-ব্যাপারে ত্রুটি করি নি জাঁহাপনা—'

'কতদূর কী করেছিলে ?'

আবদুল খাঁ বললেন, 'নর্মদা নদীর অববাহিকা থেকে আশি লক্ষ মুদ্রাব্যয়ে পনেরোটি বৃহৎ ও ষাটটি ক্ষুদ্র খাল খনন করা হয়েছে। তবু পিপাসার্ত মালবের দারুণ তৃষ্ণা নিবারিত হচ্ছে না। মালবের রাজকোষ এখন প্রায় শূন্য—'

'কত টাকা খয়রাতি সাহায্য পেলে আপাতত এই বিপর্যয় ঠেকাতে পারো?'

আবদুল খাঁর হিসাবী নিবেদন : 'এক কোটি মুদ্রা সাহায্য পেলে ক্ষুধার্ত মালববাসী রক্ষা পায়—'

'একসঙ্গে নেবে, না দফায় দফায় ?'

আবদুল খাঁ বললেন, 'জাঁহাপনা যদি অনুগ্রহ করেন তাহলে একসঙ্গে পেলেই সুবিধা হয়—'

'ঠিক আছে। উজির, মালব দেশের দুর্ভিক্ষ-খাতে এক কোটি টাকা মঞ্জুর, আপনি যথাযথ ব্যবস্থা করবেন ও হিসাব রাখবেন। মালববাসীরা যেন অধিক দুর্দশাগ্রস্ত না-হন—'

আবদুল খাঁ পুনরায় কুর্নিশ করে চলে গেলেন।

'জৌনপুরের শাসনকর্তা খাঁন খানান উকীল-ই-সুলতনৎ মীর্জা আবদুল রহমান খাঁন—' নকীব হাঁকল। এবং তৎসহ যোগ করে দিল, 'মীর্জা খাঁনের একমাত্র পুত্র বিষপানে আত্মহত্যা করায় তিনি কিছুদিনের জন্য অবসর-প্রাপ্তির প্রার্থনায় দরবারে হাজির—'

এগিয়ে এলেন মীর্জা খাঁন। সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ কিন্তু বিষণ্ণতার প্রতিমূর্তি।

'ভাইজান! পুত্র আত্মহত্যা করেছে কেন ?'

বাদশার কোমল সম্ভাষণে ও সহানুভূতির স্পর্শে বৃদ্ধের চোখ দুটি ছলছল করে উঠল। তিনি কপালে হাত চাপড়াতে চাপড়াতে বললেন, 'নসীব। আমার নসীব। এ ছাড়া আমি আর-কিছু জানি না জাহাঁপনা—'

'ভাইজান ! আপনার প্রার্থনা মঞ্জুর করা হল । অন্য যোগ্য ব্যক্তি জৌনপুর শাসন করবে যতদিন-না আপনি সুস্থ হয়ে ওঠেন । এখন আপনার বিশ্রাম প্রয়োজন । আপনি শাহী বিশ্রামাগারে গিয়ে বিশ্রাম করুন, আমার লোক আপনার সেবা করবে ।'

টপটপ করে জল পড়ছিল চোখ দিয়ে, বৃদ্ধ কুর্নিশ করে চলে গেলেন ।

'আহমদ নগরের দ্বিতীয় সুলতান বুরহানকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে শাহাজাদার সাহায্যার্থে সৈন্য পাঠিয়েছেন আবার—'

নকীবের ঘোষণা ।

'কেন ? কী জন্যে ? শাহাজাদার সৈন্যশক্তি কী কম ছিল ?' স্বরে ঈষৎ কর্কশতা, বাদশা বললেন, 'ঠিক আছে । সৈন্য সাহায্যের প্রয়োজন নেই, অন্য যোগ্য ব্যক্তির দ্বারা আহমদনগর জয় করা হবে, নতুবা খেলাত পাঠাব চাঁদ সুলতানার কাছে ! একটা মেয়েছেলেকে দমন করতে কত সৈন্যের দরকার ! এবং এতদিনই বা লাগছে কেন ? ওদের সৈন্য ফেরত পাঠিয়ে দাও আর ফিরে আসতে বলো সেলিমকে—'

নকীব বললে, 'যশোরের যুবরাজ প্রতাপাদিত্য…'

প্রতাপাদিত্য দাঁড়িয়েছিলেন পশ্চাতের ভিড়ে, নাম ঘোষণা হতেই এগিয়ে গেলেন সিংহাসনের দিকে। উপঢৌকনসহ অনুসরণ করলেন সূর্যকান্ত ও শংকর—বাহিনী চলল পেছনে । যথোচিত অভিবাদন জানিয়ে তিনি সরে আসতেই বাহকেরা উপহারের সামগ্রী নামিয়ে রাখল বাদশাহ সকাশে ঃ মণিমুক্তাখচিত খাপে চমৎকার একটি তরবারি, দশ থান উৎকৃষ্ট বস্ত্র, পনেরটি ঘোড়া, পাঁচটি উট ও একটি হাতি । …বাদশাহ পলকমাত্র সেদিকে তাকালেন, বললেন, 'যুবক, তুমি শাহী দরবারে তোমার পিতার প্রতিনিধিত্ব করতে এসেছো, তোমাকে পাঁচ হাজার মনসবদারি দেওয়া গেল—'

এটা সম্মান। ভিড়ে সাধারণ মানুষের মতো না-দাঁড়িয়ে বিশেষ এক পংক্তিতে দাঁড়াবার নির্দেশ । প্রতাপাদিত্য লৌহ বেষ্টনীর মধ্যে স্থান পেলেন, সঙ্গীরা ফিরে গেলেন পূর্বের জায়গায়।…যতক্ষণ দরবার চলছিল, প্রতাপাদিত্য

চুপচাপ লক্ষ্য করে যাচ্ছিলেন বাদশা আকবরের ব্যক্তিত্ব ও মোগলের বিপুল মহিমা। আকবরের প্রখর ব্যক্তিত্ব ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি অস্বীকার করা যায় না, কূটকৌশলীও বটেন, সহৃদয় ও সজ্জন এ-বিষয়েও কোনো ভুল নেই ; তবু কেমন অসহ্য লাগছিল। রাণা প্রতাপসিংহের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী মনে পড়ছিল বার বার, আগ্রার রাজপুত-মহলে শ্রদ্ধায় উচ্চারিত হয় সে-নাম, অনমনীয় সংগ্রামের অপর নাম প্রতাপসিংহ ; আলাপ হয় নি কোনোদিন, পরিচয় হয় নি কখনও. কিন্তু এখন, এই লৌহ-বেষ্টনীর মধ্যে অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে মোগল-মহিমা শুনতে শুনতে বিজাতীয় এক আক্রোশ জেগে উঠছে. অনুপ্রেরণা আসছে যেন আরাবল্লী পার্বত্য প্রদেশের গভীর অরণ্য থেকে. যেখানে দুর্জয় মনোবলে রাণা প্রতাপসিংহ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন ! স্বাধীনতা-স্পৃহা কী দুর্দমনীয়—অধীনতা-পাশ ছিন্ন কবার কী অটুট দৃষ্টান্ত !···চিতোর পারে নি, রাজপুতনার প্রবল পরাক্রান্ত মহাবীর রাজপুতগণ এখনও প্রতিপদে প্রতিহত হয়েও মোগল-বাহিনীকে নিপীড়নে পশ্চাদপদ হচ্ছে না ; যশোর কী পারে না? হিন্দুশক্তি কী এতই দুর্বল ? ঈশ্বর যদি কখনও সুপ্রসন্ন হন তবে এ অসম্ভব চিন্তা একেবারে ব্যর্থ না হতে পারে। তৎপূর্বে তুষ্ট রাখতে হবে বাদশাকে, বুঝিয়ে দিতে হবে তিনি তাঁর একান্ত অনুগত ও কৃপাপ্রার্থী। আগে যশোর চাই নিজের কবজায়, পরে ধীরে ধীরে শক্তি বাড়িয়ে মোকাবিলা করা যাবে। বড়রাজা ও ছোটরাজার কবজা থেকে যশোর উদ্ধার করে নতুন রূপে সাজাতে না-পারলে, শক্তি সাহস ও বীর্যমন্ত্রে উদ্বোধিত করতে না-পারলে, এখন যশোরে নিরুত্তাপ ভাব-বন্যার যে গড্ডল ধারা, ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে না, যশোরবাসী জাগবে না। হয়তো চিতোরের মতো ছোট জায়গা যশোর, বিশাল মোগল সাম্রাজ্যের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র, তবু মানসিক চিন্তার দিক থেকে দুটি রাজ্য এক ও অভিন্ন হতে পারে···রাণা প্রতাপ চলে গেছেন স্মরণীয় সংগ্রামের নজির রেখে, যুবরাজ প্রতাপাদিত্য সেই সংগ্রাম সম্পূর্ণ করবেন, যেন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন মোগল-দরবারে দাঁড়িয়েই।

আপাতত দরকার যশোরের কর্তৃত্ব এবং কর্তৃত্ব-ভার দিতে পারেন স্বয়ং আকবর। অতএব অপেক্ষা করতে হবে এই প্রসন্নতা লাভে, কবে সুযোগ আসে তার অপেক্ষা···

'কি ভাবছেন, যুবরাজ ?'

তিনি ফিরে আসছিলেন দরবার থেকে, চিন্তান্বিত দেখে প্রশ্ন করেছেন সূর্যকান্ত।

'ভাবছি,' তিনি বললেন, 'আরও কিছুদিন থেকে গেলে কেমন হয় ?'

'আগ্রা আসার সুযোগ বার বার পাওয়া যায় না।' সূর্যকান্ত বললেন, 'তাড়াতাড়ি ফিরতে আমারও ইচ্ছা নেই।'

'তাছাড়া যে কারণে আসা,' শংকর স্মরণ করিয়ে দিলেন, 'সেই রাজস্ব তো দেওয়া হল না এখনও—'

'ওটা দেব শেষদিন, যাবার সময়।'

'বাদশা আকবরকে আমার খারাপ লাগল না—'

সূর্যকান্ত অভিমত ব্যক্ত করলেন।

'অতিশয় ধূর্ত—'

শংকর সংক্ষেপে মন্তব্য করলেন।

'বিশ্বাস করা যায় না হিন্দুস্থানের সম্রাট নিরক্ষর, কী বুদ্ধি, তেমনি বিবেচনা-জ্ঞান—'

শংকর বললেন, 'বিদ্যার সঙ্গে বুদ্ধি যুক্ত নয়। সংসারে বহু ব্যক্তি আছেন যাঁর পেটে অগাধ বিদ্যা কিন্তু বুদ্ধি নেই ঘটে। একটি অভ্যাস দ্বারা অর্জন করা যায় অন্যটি বিধিপ্রদত্ত, সকলে পায় না, দুর্লভ জিনিস।'

প্রতাপাদিত্য বললেন, 'আমি রোজ একবার করে দরবারে আসব। আরও ভালো করে বুঝে নিতে চাই বাদশা আকবরের হালচাল, রীতি-প্রকৃতি, মেজাজের গঠন। আগ্রা শহরে ওই একজনকেই দেখা চলে এবং বোঝবার জন্যে সময় ব্যয় করা যায়—'

সূর্যকান্ত ও শংকর বুঝলেন, যুবরাজ অভিভূত হয়ে গেছেন বাদশা আকবরকে

দেখে, তাঁর অনুরক্ত হয়ে পড়েছেন বুঝি বা।···সহচরদ্বয়ের মনোভাব বুঝে হাসলেন প্রতাপাদিত্য। এখন ওদের কাছে প্রকাশ করা যাবে না মনোগত বাসনা, কূটনীতির ধরনই এ-রকম, চারকান হলেই তার উদ্দেশ্য বিনষ্ট হয়। ওরা ভুল বুঝলে কিছু যায়-আসে না. মূল উদ্দেশ্য বিনষ্ট হলেই সব মাটি। সেটা অনেক গূঢ় ও গভীর। এখন বলা যায় না কিছুতেই।

···ছোটরাজা জ্ঞানলাভের জন্যেই আগ্রা-নির্বাসন দিয়েছেন, তাঁর ওজর যা-ই হোক, প্রকৃতপক্ষে এই জ্ঞান সঞ্চিত হচ্ছিল আপনা থেকে। সারাদিন আগ্রা-শহর ঘুরে ঘুরে দেখে সঙ্গীরা, কেউ সৌধমালা দেখে গঠন-কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করে কেউ বা বাজারের দিকে চলে যায়—ভোগে-উপভোগে জড়ানো আগ্রা যেন তাদের নেশা ধরায়। জীব-জগতের স্থূল আকর্ষণ অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু তদপেক্ষা বড় নেশা আছে, সেই নেশার সন্ধান সকলে পায় না। মোগল-সাম্রাজ্যের শাসন-প্রণালী ও যুদ্ধ-কৌশল সম্বন্ধে অনুসন্ধানী হওয়া সর্বোত্তম নেশা, চেতনার স্তরে স্তরে তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে, বুঁদ হয়ে যেতে হয়। সেনাপতি মানসিংহ, ভগবানদাস, বিহারীমল প্রমুখ সুধীব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করলে তার স্বাদ পাওয়া যায়, মহামতি টোডরমল্লের অসাধারণ প্রতিভাবলে মোগল রাজ্যের রাজস্ব-সংস্কার কিভাবে কাজে লেগেছে বুঝতে গেলে নেশা আরও জবর হয়ে ওঠে···জ্ঞানলাভ করা যায়। ধারণা আরও সমৃদ্ধ হয়। তিনি সকল শ্রেণী ব্যক্তির সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রত্যেকের অবস্থা যেমন অবগত হতে থাকেন তেমনি প্রধান-প্রধান কর্মচারীদের সঙ্গে মিশে হৃদ্যতা বজায় রাখেন। দরবারে গমন করেন প্রত্যহ। মুসলমানগণের আচার-ব্যবহার শিক্ষা করে কেতাদুরস্ত হয়ে ওঠেন, শালীনতা ভদ্রতা ও নম্রতায় আমিরগণের প্রিয়-পাত্র হতে বেশি দেরি লাগে না।

এইভাবে নিয়মিত দরবারে যাতায়াতের ফলে সুযোগ একদিন এল। সেই প্রথম দিনের সাক্ষাতের পর সম্রাটের সুনজরে পড়া যাচ্ছিল না। এই সুযোগে সেটুকু অন্তত লাভ করা গেল।

দরবারের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল তখন। হালকা কথাবার্তা চলছিল। গুণী-জ্ঞানী ব্যক্তিরা উপস্থিত। রসিক বাদশা তাদের সামনে একটি সমস্যা উত্থাপিত করলেন, পূরণ করে দিতে হবে। সম্রাট বললেন, 'সেত ভুজঙ্গিনী, জাত চলি হেঁ—এই পর্যন্ত মনে এসেছে, আপনারা কেউ পূরণ করে দিন—' চেষ্টা করলেন অনেকে, কিন্তু কোনোটাই মনঃপূত হল না তাঁর।

'আজকের দরবারে এমন কেউ উপস্থিত নেই যে এই সমস্যাটি পূরণ করে দিতে পারে ?—'

চুপ করে রইলেন সভাসদেরা। দু-একজন চেষ্টা করলেন নতুনভাবে, কিন্তু সন্তুষ্ট করা গেল না তাঁকে। ঠিক সুরটি বেজে উঠছে না কারো পূরণ থেকে, কাব্যরস পূর্ণতা পাচ্ছে না। কি-যেন অভাব। তিনি মাথা নাড়তে লাগলেন বার বার।

'আর কেউ ?'

মাথা নত করে রইলেন সকলে। সাহস হল না কারো। সভাসদেরা নীরব।

'কী আশ্চর্য! এত শক্ত সমস্যা এটা ? শ্বেত ভুজঙ্গিনী চলে যাচ্ছে—আগে পরে শব্দ বা বাক্য রচনা করে কাব্যরূপ দেওয়া এতই কঠিন ? যে-কেউ, দরবারে উপস্থিত যে-কোনো ব্যক্তিকে, আহ্বান জানাচ্ছি এটা পূরণ করে দেবার জন্যে—'

সভাসদেরা যেখানে ব্যর্থ, অন্য কে আর এগোবে।···আকবর তাকিয়ে ছিলেন অচঞ্চল জনতার দিকে। বিস্ময় ফুটে উঠল। পাঁচ হাজারী মনসবদারদের জন্যে নির্দিষ্ট জায়গায় কে যেন নড়ে চড়ে উঠেছে, বেরিয়ে আসছে ভিড় ঠেলে। দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ এক [illegible]ক। প্রশস্ত বক্ষ, উন্নত ললাট··· নির্ভীক ও নিঃশঙ্ক। আড়ম্বরপূর্ণ পরিচ্ছদে আত্মপ্রত্যয়ের ভাব সুপ্রকট। সুদর্শন, দিব্যকান্তি। মনে পড়ল পূর্বে এই যুবককে তিনি দেখেছেন, যশোরের যুবরাজ প্রতাপাদিত্য।

'তুমি পারবে ?'

ছেলেবেলায় ফারসি কবিতা রচনায় সুখ্যাতি ছিল, 'বিশেষত এখন, এই মুহূর্ত ওই শব্দ কটির সংযোগে কল্পনায় যে চিত্র ফুটে উঠেছে তার সঙ্গে পত্নী শরৎসুন্দরীর ভিজে-কাপড়ের মনোরম মিল। কতদিন সাক্ষাৎ নেই শরৎসুন্দরীর সঙ্গে! এখন, এই সকালে কী করছে শরৎসুন্দরী? বুটিদার সাদা রেশমের শাড়ি জলে নিঙড়ে অন্য শাড়ি পরিধানের জন্যে হাত বাড়িয়েছে কী? যদি ওই সাদা শাড়ি পরে বাইরে এসে কক্ষান্তরে যেতে হত তাহলে কেমন দেখাত?—শ্বেত ভুজঙ্গিনী চলে যাচ্ছে মনে হত নাকি!··· আবেগ স্পন্দিত হচ্ছিল হৃদয়ে, এই ভাবটিকে কেন্দ্ররস হিসাবে স্থাপন করে কাব্যরূপ দেওয়া যায়। উত্তম ফারসি জানা আছে, মনের মধ্যে বিজবিজ করছে পংক্তিগুলি।

সবিনয়ে তিনি বললেন, 'আপনি যদি অনুমতি করেন, চেষ্টা করে দেখতে পারি—'

'বেশ বলো।'

প্রতাপাদিত্য ভরাট গলায় আবৃত্তি করলেন:

'শো বর কামিনী নীর নাহারতি রিত (রীত) ভালি হেঁ।
চির মচরকে গচপর বাবিকে, ধারেছ চল্লি হেঁ॥
রায় বেচারি আপন মনমে উপমা ও চারি হেঁ।
কে ছঙ্গ মরোরতি সেত (শ্বেত) ভুজঙ্গিনী, জাত চলি হেঁ॥'

—বরকামিনী জলে স্নান করছিলেন, এ রীতি ভাল। পরে পুষ্করিণীর ঘাটের উপর বস্ত্র নিঙড়ে তার ধারে ধারে চলে যাচ্ছিলেন। তা দেখে রায় বেচারা আপন মনে উপমা স্থির করলেন যেন মূর্তিমতী শ্বেত ভুজঙ্গিনী চলে যাচ্ছে।

সভাসদেরা সচকিত। আকবর উৎফুল্ল। সমস্যাটি মনের মতো পূরণ করা হয়েছে। যথার্থ কাব্যরস।

'সাবাস। বহুত খুব—'

তিনি ইংগিত করলেন উজিরকে পুরস্কার দিতে। উজির মসলিনের থান ও

জরিদার উষ্ণীষ দিচ্ছিলেন, তিনি অধিকন্তু যোগ করে দিলেন ঃ সাতনরী মুক্তার মালা একটি, হীরকাঙ্গুরীয় আর একশত স্বর্ণ-মোহর। খুশির উপহার।

···সেইদিন থেকে বিশেষ পরিচয়ের সূত্রপাত। এই পরিচয়ের সুযোগে কার্যোদ্ধার করতে হবে। যতদিন-না তা হচ্ছে দরবারে হাজিরা দেওয়া যেতে পারে নিয়মিত, আকবর-চরিত্র অধ্যয়ন করে মানুষটাকে বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে। তাই করতে লাগলেন প্রতাপাদিত্য। মেধাবী ছাত্রের মতো অনুধাবন করতে লাগলেন কোন্ কোন্ নীতি অবলম্বন করে দুর্জয় পাঠান-শক্তিকে পরাস্ত করেছেন তিনি, কোন্ নীতির আশ্রয়ে এই সুবিশাল হিন্দুস্থানের প্রতিটি রাজ্য আপন শাসনাধীন রেখেছেন, কোন্ বুদ্ধি ও কৌশল-বলে মুষ্টিমেয় মোগল সৈন্যের সাহায্যে কোটি কোটি প্রজাসাধারণকে বশীভূত করেছেন···শেখবার এবং বোঝবার বিষয় অনেক। প্রকৃত জ্ঞানের আকর এখানেই। যেই যাদুদণ্ড প্রয়োগের মন্ত্রগুলি জেনে নিতে হবে, দরকার হতে পারে ভবিষ্যতে।

কুমার সেলিম রাজধানীতে ছিলেন না, সর্বাধিনায়ক হয়ে আহমদনগরে গেছেন যুদ্ধযাত্রায়। পরিচয় হয় নি তাঁর সঙ্গে, সম্ভাবনা কম, কিন্তু পরিচয় হয়েছে বিপুলধী বীরবল, মহাপ্রাজ্ঞ টোডরমল্ল, মহাবীর মানসিংহ, উদারধী ফৈজী, আবুলফজল প্রমুখ অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মনীষীগণের সঙ্গে··· এঁদেরই সাহায্যে পরিচালিত হচ্ছে বিশাল মোগল সাম্রাজ্য, পরিচিতির ফলে বিস্তৃতি ঘটেছে মনের পরিধির, ব্যাপ্ত হয়েছে জ্ঞানের পরিমণ্ডল। অবকাশ পেলে এঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন তিনি, আলোচনা হয় নানা বিষয়ে। অধিকন্তু দেশ জানার আগ্রহে বেরিয়ে পড়েন কখনও কখনও। শংকর সূর্যকান্ত মদন সুন্দর প্রমুখ দলবল নিয়ে বেরিয়ে পড়েন কাছাকাছি প্রদেশগুলি দেখে আসার মানসে। দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা স্বচক্ষে দেখে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন প্রচুর। কোনো সময়ে পাঞ্জাব, কখনও রাজপুতনা, কোনোদিন বা গুজরাট অঞ্চলে চলে যান তিনি, অধিবাসীদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে, কারণ প্রজাবৃন্দই তো সাম্রাজের ভিত্তিস্বরূপ।…ফিরে আসেন আবার। যত দেখেন ও বোঝেন ততই যেন স্বাধীনতা-স্পৃহা প্রবল হয়ে ওঠে চিত্তে। পরামর্শ করেন দুই সহচরের সঙ্গে। শংকর ও সূর্যকান্তও যেন বদ্ধপরিকর। তিনজনের চিত্ত একই সুরে বাজতে থাকে…স্বাধীনতা! স্বাধীনতা! স্বাধীনতা! কিন্তু কীভাবে লাভ করা যায় এই স্বাধীনতা? প্রথমে যশোর হস্তগত না হলে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখা বৃথা। কই, সম্রাট তো একবারও রাজস্বের কথা তুললেন না! ওটাই শেষ কূট-চাল। কূট-নীতির বৈশিষ্ট্য এই যে নিজে থেকে প্রসঙ্গ তুললে অন্য পক্ষের মনে সংশয় দেখা দিতে পারে, অথচ এত বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে যে…

'কুমার বাহাদুর, তোমাদেব দেয় রাজস্ব পেলাম না কেন এখনও?'

উঠে পড়েছে প্রসঙ্গ। সতর্কভাবে কৈফিয়ত দিতে হবে। চালে সামান্য উনিশ-বিশ হলে চতুর সম্রাট বুঝে ফেলবেন সব। শংকর বা সূর্যকান্ত নেই পাশে, ওঁরা দাঁড়িয়ে আছেন সর্বপশ্চাতে ভিড়ের মধ্যে। এখন তিনি যে উত্তর দেবেন তা সম্পূর্ণ একক দায়িত্বে। ভাবা ছিল আগে থেকে, প্রতাপাদিত্য সবিনয়ে বললেন:

'জাহাঁপনা, আমার পিতা বৃদ্ধ হয়েছেন, বিষয়-কর্ম ত্যাগ করেছেন তিনি। খুল্লতাত রাজা বসন্তরায়ের উপর রাজ্যশাসনের ভার। জানি না কোন্ গূঢ় কারণে তিনি মহামান্য সম্রাটের দেয় কর প্রদানে শৈথিল্য প্রকাশ করছেন, আমি এ বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্যে স্বদেশে আমার প্রতিনিধি পাঠিয়েছি। তবে মনে হয় উপযুক্ত শাসনের অভাবে রাজ্যমধ্যে অরাজকতা ও বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়েছে, নির্দোষ প্রজাগণ যে উৎপীড়িত হচ্ছেন না তা-ও বলতে পারিনে। কেননা এই ধারাই চলে আসছে রাজা বসন্তরায়ের আমলে। এখন আপনি যা আদেশ করেন, এই সেবক তা পালনে প্রস্তুত জানবেন—'

'হুঁ।' খানিক চিন্তা করে নিলেন আকবর, বললেন, 'প্রতাপ, তোমাকে আমি বিশ্বাস করি এবং মনে করি তোমার ওপর নির্ভর করা যায়। দেখ, তুমি যদি তোমাদের দেয় রাজস্ব কোনো রকমে সংগ্রহ করে রাজকোষে জমা

দিতে পারো তাহলে তোমাকেই সেই রাজ্যে প্রতিষ্ঠা করি। ঈশ্বরের কৃপায় তুমি সুশৃংখলার সঙ্গে রাজ্যশাসন করতে পারবে মনে হয়।'

'অনেক টাকার ব্যাপার জাহাঁপনা,' প্রতাপাদিত্যের নিখুঁত প্রত্যুত্তর: 'এখনই কিছু বলতে পারি না, আমাকে কিছুদিন সময় দিন। দেখি অর্থ-সংগ্রহ করতে পারি কিনা—'

'বেশ। কতদিন সময় চাও?'

'জাহাঁপনা, কমপক্ষে এক মাস—'

'মঞ্জুর করা গেল।'

তাড়াহুড়া করার মানে হয় না। হাতে অর্থ মজুত আছে। যখন খুশি জমা দেওয়া যায়। অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তির সম্ভাবনায় উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল চিত্ত, সংযত না-হলে পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যাবে। ঠিক সময়ে ঠিক কাজটি করা চাই। এত দিন যখন ধৈর্য ধরা গেছে আরও কিছুকাল অপেক্ষা করা যেতে পারে। কারণ আগ্রার বিজ্ঞ-মহলই শিক্ষা দিয়েছে যে কূটনীতি অতি কুটিল বিষয়, সেক্ষেত্রে সরল শিশুর মতো সাদা-মন নিয়ে চলাফেরা করা যায় না, নারীর কোমল হৃদয় অচল আর ধার্মিকের মতো নিরাসক্ত দিনযাত্রা বিড়ম্বনামাত্র। পিতৃব্য বসন্তরায়ের নামে দোষারোপ করাই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য, সেজন্যে এই দীর্ঘ প্রতীক্ষা, তা সফল হয়েছে—এবার রাজ্য-শাসনের সনদটুকু হাতে পেলে আগ্রা-আগমন সার্থক হয় এবং তা শিগগির পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়। উলটো চালে খুড়োমশায়ের পরিকল্পনা নস্যাৎ করা গেছে ভেবে প্রতাপাদিত্য ক-দিন মনের আনন্দে এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ালেন, এর পর যশোরে প্রত্যাগমন মানে মাথা উঁচিয়ে প্রবেশ, যুবরাজ থেকে রাজায় উন্নীত হওয়া। ঢেলে সাজাতে হবে যশোর। নতুন শক্তির হবে জাগরণ···স্বাধীন, স্বরাট রাজা হবেন তিনি। জলে স্থলে বাড়াতে হবে শক্তি, রাজ্যের যুব-সমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে নতুন চেতনায়, এবং তিনি তা অবশ্যই পারবেন।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা যেন প্রস্তুত করে রেখেছেন মনে মনে, স্বপ্ন দেখছিলেন

তিনি।

একমাসকাল কাটে নি, তৎপূর্বেই প্রদেয় রাজস্ব রাজকোষে জমা দিয়ে দিলেন। তাঁর কর্মতৎপরতায় সম্রাট সন্তুষ্ট। কূট-কৌশল তিনি ধরতে পারেন নি বটে কিন্তু মানুষ চিনতে ভুল হয় না এতটুকু। এবং যোগ্য ব্যক্তির সমাদরে তিনি যে অকৃপণ তার প্রমাণও পাওয়া গেল। প্রদত্ত রাজস্ব থেকে তিন লক্ষ টাকা প্রত্যর্পণ করলেন খুশি হয়ে, বললেন, 'প্রতাপ, এই টাকা রেখে দাও, তোমার কাজে লাগতে পারে। আর এই নাও ফরমান, তোমাকে তোমার পিতৃরাজ্যে নিয়োগ করলাম। বাঙলা দেশে ফিরে যাও। শাসনদণ্ড হাতে নিয়ে রাজ্য পরিচালনা করো। দেখো, কর্তব্যে যেন ত্রুটি না-হয়—'

প্রতাপাদিত্য ফরমান হাতে করে সম্রাটকে অভিবাদন জানালেন। সর্ববুদ্ধি নিয়োগ করেছিলেন এইটুকু পাওয়ার ব্যাপারে। পেয়ে, উদ্দীপিত হলেন আরও। আগ্রা-বাসের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। অতঃপর সম্রাটকে তোষণ করার আর মানে হয় না। এবার ফেরা দরকার। উদ্যোগ-আয়োজন করতে হবে। মনসবদারের সম্মান যখন পাওয়া গেছে তখন সৈন্য পাওয়া যাবে নিশ্চয়, যশোরে প্রবেশের পূর্বেই রাজ্যপ্রাপ্তির সংবাদ পৌঁছে যাবে এবং রাজা বসন্তরায় সমূহ সর্বনাশের আশংকায় প্রতিরোধ জোরদার করতে পারেন, শাহীসৈন্য সঙ্গে থাকলে তার মোকাবিলা করা যায়। আবেদন করেছিলেন তিনি, যাবার দিন আকবর ফৌজ পাঠিয়ে দিলেন বাইশ হাজার···

বিরাট বহর নিয়ে যশোরে ফিরে চললেন প্রতাপাদিত্য।

৮

'অরু, যেও না। শোনো—'

প্রণাম করে অরুন্ধতী চলে যাচ্ছিল, এইমাত্র ফিরেছেন উনি, দীর্ঘ পথশ্রমে ক্লান্ত এবং বিশ্রাম প্রয়োজন মনে করে যেমন এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে প্রণামটুকু রেখে চলে যাচ্ছিল সে, ডাক শুনে ফিরে দাঁড়াল।

'তোমার বাবার নাম স্মরণ হয়?'

বড় বড় চোখ দুটি তুলে প্রশ্নকর্তার মুখের পানে তাকিয়েছিল, আস্তে আস্তে জলে ভরে গেল। এ প্রশ্ন আজ নয় বহুবার করা হয়েছে, আবার কেন? বড় ব্যথার স্থান। এত ছোট বয়সে পিতাকে হারাতে হয়েছে যে তাঁর নাম স্মরণে নেই। মাথা নত করল অরুন্ধতী।

'না দুঃখ দিতে চাই নি তোমাকে।' সূর্যকান্ত বললেন, 'আচ্ছা কোনো স্মৃতি, ধরো তুমি যেখানে জন্মগ্রহণ করেছো সেই বাড়ি সম্বন্ধে কোনো আবছা স্মৃতিও মনে পড়ে কী? বাড়িটা ছোট কী বড়, কার কোলে বেশি সময় থাকতে ভালবাসতে, এই রকম সামান্য কিছু মনে আসে যদি—'

'আমাদের বাড়িটা বড় ছিল। চারিদিক ঘেরা। খুব লোকজন যাতায়াত করত বাড়িতে—'

'আর?'

'বাবার কথা মনে পড়ে না, তিনি ব্যস্ত থাকতেন বাহির-মহলে। মায়ের কাছে থাকতাম বেশি, আর একজন, অস্পষ্ট মনে পড়ে, আমাদের বাড়িতে রান্নার কাজ করত, ব্রাহ্মণ, ভারি ভালো লোক—আমাকে ভালবাসতেন খুব—'

'তুমি মঙ্গলগড়ের জায়গীরদার রাজা বিজয়েন্দু রায়ের কন্যা—'

'কী বললেন?'

চমকে মুখ তুলল অরুন্ধতী।

'তোমার বাবার নাম বিজয়েন্দু রায়। গৌড়ের সংলগ্ন মঙ্গলগড়ের রাজা

ছিলেন তিনি। দাউদ খাঁ ছিলেন তাঁর পরম বন্ধু। তাই বন্ধুর বিপদে সাহায্য করতে গিয়ে দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি মারা যান এবং মোগল-বাহিনী প্রতিশোধ নেবার জন্যে তোমাদের প্রাসাদে আক্রমণ চালায়। পুরুষেরা প্রতিরোধ করতে করতে প্রাণ বিসর্জন দেন এবং মহিলারা অপমানের ভয়ে বিষপানে আত্মহত্যা করেন। একদিনে তোমাদের বংশ বিনষ্ট হয়ে যায়—'

অরুন্ধতী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল একটা।

'সেই মড়ক ডিঙিয়ে আমি কী করে যে বেঁচে রইলাম সেটাই আশ্চর্য—'

সূর্যকান্ত বললেন, 'তুমি যে রাঁধুনি ব্রাহ্মণটির কথা বললে, যে তোমাকে খুব ভালবাসত, তার কাছে তখন ছিলে তুমি। চারদিকে হানাহানি আর আত্মহত্যা দেখে ব্রাহ্মণটি গোপনে বেরিয়ে আসে প্রাসাদ থেকে তোমাকে নিয়ে। মঙ্গলগড় পার হয়ে গৌড়ে এসেছিল নিরাপদ আশ্রয়ের আশায়, কিন্তু গৌড়ে তখন প্রচণ্ড ডামাডোল, কোথায় আশ্রয়? শ্রমে ও ক্ষুধায় ক্লান্ত হযে ব্রাহ্মণটি বসে পড়েছিলেন বৃক্ষচ্ছায়ায়, ঘুম এসে গিয়েছিল তার চোখে, সেই ফাঁকে তুমি কচি কচি পা ফেলে চলে গিয়েছিলে অন্যদিকে কিংবা রাজা বসন্তরায় তোমাকে একা দেখে স্নেহবশত তুলে নিয়েছিলেন কোলে এবং যশোরে এনে কিভাবে প্রতিপালন কবা যায় ভাবতে ভাবতে মায়ের হাতে সমর্পণ করেন এজন্যে যে আমার মায়ের একটি কন্যাব সখ ছিল, তিনি তা জানতেন। সেই থেকে প্রতিপালিত হচ্ছ তুমি—'

'এত কথা আপনি জানলেন কী করে?'

সাহস করে জিজ্ঞেস করল অরুন্ধতী। আগ্রার গল্প নয়, যশোরে পদার্পণ করে যুবরাজের নেতৃত্বে যেভাবে ওঁরা দুর্গ অবরোধ করে যশোরবাসীর মনে বিস্ময় ও আতংকের সৃষ্টি করেছিলেন সে সম্বন্ধে দু-চার কথা হলেও না-হয় স্বাভাবিকতা বজায় থাকত, প্রকৃতপক্ষে ওই বিষয়ে ধারাবাহিক বিবরণ শুনবে বলেই আশা করেছিল অরুন্ধতী। পরিবর্তে তার বংশতালিকা নিয়ে টানাটানি। যদিচ কৌতূহল প্রচুর তবু দুটি বড় ঘটনা—আগ্রা থেকে প্রত্যাবর্তন ও যশোর-দুর্গ অবরোধ, বিশেষত দ্বিতীয় ঘটনাটি সদ্য

সংঘটিত এবং তার প্রতিক্রিয়া অন্দরে-বাইরে সর্বত্র অব্যাহত, আলোচনার একমাত্র বিষয় হয়ে উঠেছে—এসব বাদ দিয়ে তার জন্মবৃত্তান্ত সামনে এগিয়ে আসে কী করে ?···প্রথমত বুকের মধ্যে অপার আনন্দ ছিল প্রত্যাবর্তনের সংবাদ যখন পাওয়া গিয়েছিল লোকমারফত, মা পূজা দিয়েছেন ঠাকুরের উদ্দেশ্যে, সে নিজে প্রার্থনা জানিয়েছে ; দর্শনের পিপাসা মেটে নি বলে আবার এসেছিল কক্ষে। যুবরাজের কথা নয়, যুবরাজ নাকি স্বনামে সনদ নিয়ে এসেছেন, তিনি যশোরের রাজা হবেন ; শংকরদার কথা নয়, শংকরদা নাকি অনুক্ষণ যুবরাজের পাশে থাকতেন ছায়ার মতো, তিনি যশোর-দুর্গ অবরোধ সমর্থন করেছিলেন , আর নিজে, নিজে তো যুদ্ধের জন্যে একপায়ে খাড়া, এখন থেকেই সেনাপতির পদ গ্রহণ করে বসে আছেন ! এত-সব বিষয় তুচ্ছ করে তার জন্মবৃত্তান্ত ও পিতৃপরিচয় বড় হয়ে উঠল ? কোথায় কী শুনেছেন ? আগ্রার জ্যোতিষীদের কাছে গণনা করে জানতে পেরেছেন নাকি ! এত নিখুঁত গণনা করতে পারে আগ্রার জ্যোতিষীরা ? অদ্ভুত গণনা তো !

'সেই ব্রাহ্মণটির নাম মনে আছে তোমার ?'

'না—'

'তাকে দেখলে চিনতে পারবে ?'

'হয়ত পারব—'

'আগ্রা যাবার সময় গৌড়ে তার সঙ্গে আলাপ হয়। তার কাছ থেকেই সব জেনেছি। ভেবেছিলাম ফেরার পথে তুলে নেব তাকে। কিন্তু যত যশোরের কাছে আসতে লাগলাম ততই দুর্গ-অবরোধের উত্তেজনায় তার কথা আর মনে ছিল না—'

'হঠাৎ দুর্গ-অবরোধ করতে গেলেন কেন ?'

'কারণ ছিল—'

'এখন ঘরে-বাইরে এ নিয়ে তুমুল আলোচনা।'

'স্বাভাবিক। যুবরাজ রাজ্যপ্রাপ্তির সনদ নিয়ে ফিরেছেন। আলোচনা তো

হবেই—'

ছোটরাজা বড়রাজার তরফ থেকে কোনো গণ্ডগোল হয় নি ?'

'হতে পারত কিন্তু হয় নি। পুত্রের ঔদ্ধত্যে বড়রাজা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন খুব, কিন্তু ছোটরাজার বুদ্ধি ও পরামর্শ ক্রমে অবস্থার বিশেষ তারতম্য ঘটে নি ; আগে যা ছিল, দুর্গ-অবরোধের পরও তাই আছে। ছোটরাজা বড়রাজাকে সঙ্গে নিয়ে একেবারে আমাদের শিবিরে এসে হাজির—সম্পূর্ণ নিরস্ত্র ও সৈন্যহীন,—দেখে আমরা অবাক—'

'তারপর ?'

'সব গণ্ডগোলের মীমাংসা করে দিলেন ছোটরাজা স্বয়ং। তিনি বিদ্রোহী যুবরাজকে ডেকে পাশে বসালেন, বললেন, 'দেখ প্রতাপ, তোমার আচরণে আমরা দুই ভ্রাতা কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট হই নি, বরং খুশি হয়েছি এই কারণে যে আমাদের জরাজীর্ণ দেহে রাজত্ব করার বাসনা আর নেই। তুমি বাদশাহী সনদ এনেছো তা ভালই হয়েছে, দাদার মৃত্যুর পর আর আনতে হবে না ; সনদ না-আনলেও আমরা দুজনে কিন্তু স্থির করেছিলাম তুমি আগ্রা থেকে ফিরলে যশোরের সিংহাসনে তোমাকে অধিষ্ঠিত করব। বাদশাহ যে তোমার প্রতি অনুকম্পা দেখিয়েছেন সেজন্যে আমরা দুজনে তো বটেই, যশোর-বাসীরা পর্যন্ত ধন্য ধন্য করছে।'···ছোটরাজার ধৈর্য ও বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারা যায় না—'

'যুবরাজ কী করলেন ?'

'তাঁর মনোগত বাসনা টের পাওয়া গেল না বটে তবে এটুকু বোঝা গেল যে পিতার ভগ্ন শরীর দেখে তিনি বিচলিত হয়ে উঠেছেন। বাস্তবিক আমাদের অনুপস্থিতি-কালের মধ্যে বড়রাজার স্বাস্থ্যের যথেষ্ট অবনতি ঘটেছে, সম্ভবত বেশিদিন বাঁচবেন না। তদুপরি ছোটরাজা কথাগুলি এমন আবেগের সঙ্গে বললেন যে তাঁর ভাষা থেকে স্নেহ যেন ঝরে পড়ছিল।··· যুবরাজের বিদ্রোহের বহ্নি ভেসে গেল, তাঁর রুদ্রমূর্তি শান্ত হল। তিনি হাসিমুখে আবার রাজপুরীতে প্রবেশ করলেন। আনন্দের স্রোত বয়ে গেল

চারিদিকে। নগরের আনন্দ-কোলাহল, তোরণের দুন্দুভির আর অন্তঃপুরের হুলুধ্বনির মধ্যে তিনি ভিতরে চলে গেলেন আর আমি ফিরে এলাম বাড়িতে—মাকে, তোমাকে মনে পড়ল। অরু, মা কোথায়?'

'ডেকে দিচ্ছি—'

অরুন্ধতী বেরিয়ে এল কক্ষ থেকে।

এতদিন পরে ফিরে এল সুন্দর, রাধার সঙ্গে কত গল্প করা যাবে ভেবে ছটফট করছিল, ঠায় বসে আছে পথের দিকে চেয়ে, অথচ রাধার দেখা নেই। ওদের ফেরার খবব শোনে নি নাকি রাধা? রাজ্যশুদ্ধ লোক যে-খবর শুনেছে, হইচই পড়ে গেছে ওদের প্রত্যাবর্তনের পর নাটকীয় ঘটনায়, প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে ওরা এখন শান্তভাবে যে-যার ডেরায় ফিরেছে; তবু অনুমান করা কঠিন নয় যে সা-- যশোরের প্রতিটি গৃহ এখনও তাদের আলোচনায় মুখর এবং এ-আলোচনা চলবে বেশ কিছুদিন যাবৎ, যুবরাজ প্রতাপাদিত্য যশোরবাসীগণের চিত্তমূলে নাড়া দিয়েছেন প্রবলভাবে··· রাস্তায়, এই ডেরায় ফিরে আসতে আসতে যত লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটেছে, পরিচিত ও অপরিচিত, প্রত্যেকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে নানাকথা, অভিনন্দন জানিয়েছে যুবরাজের সনদপ্রাপ্তিতে; কেউ-কেউ বাঁকা মন্তব্য যে করে নি তা-ও নয়, ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়ার তুলনা দিয়েছে দু-একজন দুর্মুখ, পিপীলিকার পাখা গজানোর পরিণামের কথা বলেছেন কোনো কোনো সাক্ষাৎকারী···বিচিত্র প্রতিক্রিয়া, নানান মন্তব্য···যেন একটা প্রবল ধাক্কা, ভারসাম্য বজায় রাখা কঠিন। যশোর যেন টগবগ করে ফুটছে ওই একটি ঘটনার উত্তাপে, এখন নিশ্চিন্তে ঘরে বসে জানালার ফাঁকে চঞ্চল যশোরবাসীর যাতায়াত ও উত্তেজিত কথাবার্তা শুনে তার মনের প্রতিক্রিয়াও অদ্ভুত। বহর নিয়ে ফেরার পথে এবং এখন যুদ্ধ-ভূমিকা ত্যাগ করে চুপচাপ ঘরের কোণে বসে ভাবতে ভালো লাগছে যে, যুবরাজ প্রতাপাদিত্য

সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়েছেন 'যশোরেশ্বর' উপাধি ধারণ করে···মাথায় মুকুট, রাজদণ্ড হাতে, কুর্নিশ ঠুকছে মোগল নবাবেরা···যে-রকম কুর্নিশ ঠোকা দেখেছে বাদশাহের দরবারে। স্বপ্নের মতো অপরূপ, কিন্তু সত্য হতে পারে এবং এই স্বপ্ন সত্য করবার জন্যেই তারা বদ্ধপরিকর, সে সূর্যদা শংকরদা মদনদা, সকলে। জরির কাজ-করা লাল চাঁদোয়া ভাসছে যশোর-দরবারগৃহে, নিচে অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে মোগল-প্রতিনিধিবৃন্দ, স্বয়ং বাদশা আকবর বুঝি বা। সম্ভব, এই স্বপ্ন সার্থক হওয়া সম্ভব। যুবরাজের রক্তের মধ্যে বাসা বেঁধেছে এই স্বপ্ন, শংকরদা আজন্ম এই স্বপ্নের উপাসক, সূর্যদার খোলা-তলোয়ার এই স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত করার পক্ষে। উদ্যত আর তার নিজের তূণীরের সব-কটি শরই তো ওই একটি লক্ষ্যে বিদ্ধ হবে বলে অব্যর্থ সন্ধানী!—জ্ঞান এত পক্ক ছিল না, রাজনীতির গোলকধাঁধায় তার মাথা পরিষ্কার নয় কোনোকালে, আদেশ পালনে সে তৎপর, তীরন্দাজ হিসাবে তার খ্যাতি···তবু আগ্রাবাসকালে যুবরাজের সংসর্গে এবং শংকরদার জ্ঞান-গর্ভ আলোচনার মাধ্যমে বহু জটিল তত্ত্ব ক্রমশ পরিষ্কার হয়েছে, আবছা একটা ধারণা গড়ে উঠেছে জাত হিসাবে হিন্দুস্থানে হিন্দুদের স্থান এখন কোথায় এবং পররাজ্যলোভী মোগলেরা কোন্ তুঙ্গে···স্বাধীনতা শব্দটির সঙ্গে সেই প্রথম পরিচয়, পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন যুবরাজ স্বয়ং, আবেগা-য়িত স্বরে তিনি বলেছিলেন, 'গৌড়-বঙ্গ থেকেই স্বাধীনতার সংগ্রাম সুরু হবে এবং তার কেন্দ্রস্থল হবে যশোর···' সমর্থন করেছিলেন শংকরদা, বলে-ছিলেন, 'যেভাবে হোক মোগলের হাত থেকে ছিনেয়ে নিতে হবে স্বাধীনতা, প্রতিষ্ঠা করতে হবে হিন্দুর রাজত্ব। আপনাকে হতে হবে অগ্রদূত—একবার এই সংগ্রামের স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠলে দিকে দিকে তার উত্তাপ ছড়িয়ে যাবে, পাঠানেরা হাত মেলাবে, এগিয়ে আসবে মোগল-বিদ্বেষী আরও অনেকে। কিন্তু তার আগে শক্তি সংগ্রহ করতে হবে প্রচুর, পরিকল্পনা চাই নিখুঁত। মোগলের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করতে হলে সর্বতো-প্রস্তুতি প্রয়োজন···'

শক্ত শক্ত কথা। গূঢ়ার্থ বোঝা যায় না সব সময়। তার দরকার হয় না

অবশ্য। ও-সব আলোচনা করুন প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা, শংকরদা বা সূর্যদা অথবা যুবরাজ প্রতাপাদিত্য ; সে সুন্দর, বনে-জঙ্গলে বড়-হওয়া নিতান্ত জঙলি যুবক, মগজে রাজনীতির ঘোরপ্যাঁচ ঢোকে না মোটে। আসক্তি নেই কণা-মাত্র তবু ব্যাপারটা বুঝে ফেলেছে, বিদ্যাশিক্ষার মতো ধাপে ধাপে না-হলেও জ্ঞান ও বুদ্ধি দ্বারা বিষয়টি বোধগম্য হয়েছে মোটামুটি।···জানা ছিল না হিন্দুস্থান দেশটি কত বড়, কতখানি তার পরিধি, লোকের বাস কত, তাদের ভাষা কত রকম—ধর্ম কী, প্রকৃতি কেমন। আগ্রা গমনের ফলে জ্ঞানের এই একটা দিক খুলে গেছে আপনা থেকে, মিশতে পেরেছে বহু লোকের সঙ্গে, জানতে পেরেছে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং দেখতে পেয়েছে তাদের জীবনযাত্রা। শুধু আগ্রাই হিন্দুস্থানের সবটুকু নয়, আরও বহু প্রদেশ আছে, খণ্ড বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন···আকবর-বাদশার সর্বদর্শী সম-শাসনে বিদ্রোহ কোথাও তেমন হয় না বটে, হলেও তা দমনে আকবর-বাদশা বিশেষ তৎপর ; তথাপি ধূমায়িত বিদ্বেষ-বহ্নি লক্ষ্য করা গেছে নানা জায়গায়। দেশভ্রমণ ও জন-সংযোগে এই জ্ঞান লাভ করা যায়। বঙ্গদেশে অরাজকতা সমানভাবে চলছে, কতটুকুই বা সংবাদ পাওয়া যেত যশোর নামক ক্ষুদ্র একখণ্ড ভূভাগে কালাতিপাত করে, মুসলমানদের অত্যাচারে ও নিপীড়নে নিরীহ-প্রকৃতির প্রজাগণ ত্রাহি-ত্রাহি ডাক ছাড়ে··· প্রজাদের গৃহ লুণ্ঠন ও দাহ করা মোগলসৈন্যদের প্রাত্যহিক আমোদের অঙ্গ, সর্বদা সশংকিত বঙ্গবাসী। রাজপথ ও জলপথ নিরাপদ নয় কোনো অব-স্থাতেই, দস্যুর ভয়ে দূরযাত্রা বিঘ্নিত। আশ্বাস শুধু এইটুকু যে বঙ্গদেশ থেকে পাঠানশক্তি এখনও সম্পূর্ণ নির্মূল হয় নি, কিঞ্চিন্মাত্র সুযোগ পেলে তারা মোগলদের আক্রমণ করে বসে, যদিচ তারা রাজধানী থেকে দূরতর প্রদেশে বাস করে, কেউ জমিদার কেউ তালুকদার কেউ জায়গীরদার। আক্রমণের কালে হিন্দুরাও মিলিত হয় দলে দলে ভাগ্যচক্র পরিবর্তনের আশায়। পরি-বর্তিত হয় না ভাগ্যচক্র, এক মোগল-বাহিনী পরাজিত হলে আর এক মোগল বাহিনী আসে, আক্রমণ চলে দফায় দফায় দফায়···হয়তো ক্ষোভ মেটে,

জ্বালা উপশম হয়।

জানা যেত না যুবরাজের সঙ্গে আগ্রায় না গেলে। যাওয়া-আসার পথে অনেক-কিছু দেখেছে সুন্দর, যাওয়ার পথে বঙ্গদেশের প্রকৃত চেহারা স্পষ্ট হয়েছে তার কাছে, এককবেলা গৌড়-বাসে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে মিশে তাদের ক্ষোভ দুঃখের সাথে পরিচিত হয়েছে যেমন, তেমনি ফেরার পথে দেখেছে বিহারের রাজধানী পাটনায় অবদমিত অশান্তিবহ্নি। কৌতূহলী যুবরাজ অনুসন্ধান করেছিলেন কারণ, তাতে জানা গিয়েছিল যে স্থানীয় তুর্কিগণ প্রতারণা দ্বারা সম্রাটের নিকট থেকে যথেষ্ট পরিমাণে অর্থোপার্জন করত বলে সম্রাটের নতুন নিয়মানুসারে সে-সমস্ত পথ রুদ্ধ হয়েছে এবং ফলত অসন্তুষ্ট তুর্কিগণ সম্রাটের বিরুদ্ধে জোট বেঁধে সুযোগের অপেক্ষায় আছে। এতদ্ব্যতীত সাধারণ প্রজাবর্গ রাজপুরুষ ও বিদ্রোহীগণের প্রবল অত্যাচারে এরূপ জর্জরিত যে রাজশক্তির বিভীষিকা সরে গেছে তাদের মন থেকে, দলবদ্ধ হয়েছে তারাও, যথোপযুক্ত নেতৃত্ব পেলে যে কোনো মুহূর্তে আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

'প্রভা-বৌদি আপনার খাবার পাঠিয়ে দিয়েছেন, কোথায় রাখব?'

সন্ধ্যা হয়ে গেছে, আলো কম। দরবার-গৃহে লাল সামিয়ানা বলে যা মনে হয়েছিল, প্রকৃতপক্ষে সেটা সন্ধ্যার আকাশ, রক্তের মতো লাল। এখন অন্ধকার নেমেছে, ঘরে আলো জ্বালা হয় নি। দরজার কাছে আবছা দাঁড়িয়ে একটি নারীমূর্তি, হাতে থালা।···ধ্বক করে ধাক্কা লেগেছিল বুকের মধ্যে, পরক্ষণে ঝিমিয়ে গেল। রাধার দাঁড়াবার ভঙ্গি ও-রকম নয়, কণ্ঠস্বরেও তফাৎ। আলো জ্বেলে দেখল, বয়স্কা। নতুন মুখ।

বললে, 'রাখো এইখানে।···তুমি কেন, রাধা কোথা?'

'জানিনে। প্রভা-বৌদি আমার হাতে থালা তুলে দিলেন, আমি এসেছি—'

সুন্দর তাকিয়ে দেখল, ভাবলেশহীন মুখ। দাসীবৃত্তি পেশা।

বললে, 'কতদিন কাজ করছো তুমি?'

'এক বছর কি তারও বেশি হবে—'

সুন্দর হিসাব করে দেখল, প্রায় বৎসারাধিক কাল সে যশোর ছাড়া। এর মধ্যে এমন কি ঘটনা ঘটল যার জন্যে রাধাকে ছাড়িয়ে নতুন দাসী রেখেছেন প্রভা-বৌদি? রাধা কি অবহেলা প্রকাশ করেছিল কাজে? তেমন মেয়ে তো সে নয়! প্রভা-বৌদি সামান্য কারণে তাকে ছাড়িয়ে দেবেন না। কী ঘটেছে? রাধা সুস্থ আছে তো!

'তুমি কি জানো, তোমার আগে যে কাজ করেছিল তাকে কেন ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে?'

দাসী ঘাড় নাড়ল।

'না। আমি কিছু শুনি নি—'

সুন্দর বললে, রাধা নামে কোনো মেয়েকে তুমি চেনো?

'অনেক মেয়ে আছে রাধা নামে, দু-চারজনকে চিনি, কিন্তু আপনি যার কথা বলছেন তাকে চিনিনে—'

সুন্দর বললে, 'প্রভা-বৌদি কী করছেন এখন?'

'এইমাত্র কর্তা-ঠাকুর ফিরেছেন, ব্যস্ত সেজন্যে—'

সুন্দর বললে, 'আচ্ছা তুমি যাও।'

...বিস্ময় পুরো মাত্রায়। রাধার কী হল? সে তো চুপ করে থাকার মেয়ে নয়! নিশ্চয় দৌড়ে আসত তার ফেরার খবর শুনে। গুরুতর কিছু ঘটেছে এবং কী সেটা? প্রভা-বৌদি তাকে যে-রকম ভালবাসতেন তাতে অহেতুক ছাড়িয়ে দিতে পারেন না কাজ থেকে, বিশেষত সে ও শংকরদা যখন উপস্থিত নেই যশোরে। অবশ্য তার অনুপস্থিতি গণনার মধ্যে আসতে না-পারে এ ব্যাপারে, কিন্তু শংকরদার বিনা অনুমতিতে এমন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না প্রভা-বৌদি। এখনই জিজ্ঞেস করার ইচ্ছা ছিল, আকুল হয়ে উঠেছে মনটা, কিন্তু শংকরদা এসে গেছেন বাড়িতে, প্রভা-বৌদি ব্যস্ত। আজ থাক্। জিজ্ঞেস করা যাবে পরে, সুযোগ বুঝে। খেতে ইচ্ছা ছিল না, তবু আহারের থালা টেনে নিল। প্রভা-বৌদি পাঠিয়ে দিয়েছেন।

'জানো, ফেরার পথে কাশীতে যখন এলাম,' রাত্রে শুয়ে শুয়ে শংকর বলছিলেন, 'আমার কেবলই মনে পড়ছিল সেই বিখ্যাত শ্লোকটি ঃ

যশোহর পুরী কাশী, দীর্ঘিকা মণিকর্ণিকা।
তর্কপঞ্চাননো ব্যাসঃ বসন্তঃ কালভৈরবঃ॥

যশোর নগর বারাণসী তুল্য। কাশীক্ষেত্রে দুষ্কৃতকারীদের দণ্ডবিধান করে নগর-রক্ষার ভার নিয়েছেন যেমন কালভৈরব, তেমনি যশোরের যাবতীয় শাসনভার গ্রহণ করেছেন বসন্তরায়। এখানকার দীঘিগুলো মণিকর্ণিকা ঘাটের মতো পবিত্র আর ব্যাসদেবের মতো মহিমা নিয়ে এখানে বাস করেন তর্কপঞ্চানন। 'বাস্তবিক ছোটরাজা বসন্তরায়ের তুলনা নেই, তিনি একক প্রচেষ্টায় যশোরকে যেভাবে সাজিয়েছেন…'

'ছোটরাজা বসন্তরায়ের প্রশংসা সকলেই করে,' প্রভাবতী স্বামীর দিকে পাশ ফিরে শুয়েছিলেন, উপাধানের উপরে মাথার নিচে হাত, গল্প শোনার আগ্রহে চক্ষু দুটি উজ্জ্বল ঃ 'কাশীতে পৌঁছে শুধু যশোরের কথা মনে পড়ল, আর কিছু না?'

'কাশীর পুণ্যভূমিতে পদার্পণ করে আমার মনে নানা ভাবের উদয় হয়েছিল।' শংকর স্ত্রীর কৌতূহল দেখে হাসলেন, বললেন, 'আমি হিন্দু-ব্রাহ্মণের ছেলে, যশোর-সংক্রান্ত শ্লোকটি স্মরণে আসে আচমকা, কিন্তু রক্তের মধ্যে যে-টান তা যাবে কোথায়? প্রকৃতপক্ষে বারাণসী হিন্দুজাতির ধর্মকেন্দ্রস্থল… রাজনৈতিক সম্পর্কও অস্বীকার করা যায় না। আমার মনে হয়েছে কি-ধর্মনৈতিক কি-রাজনৈতিক, সকল বিষয়ে যদি কাশীকে কেন্দ্র করে কার্য করা যায় তাহলে সেই ধারা অবশিষ্ট ভারতে প্রসারিত হতে বেশি সময় ও শ্রম লাগে না। ধর্ম ও কর্মজগতে কাশী হল প্রধান ঘাঁটি। ভেবে, প্রস্তাব করলাম যে, কাশীধামে একটি কেন্দ্র সংস্থাপিত হলে আমাদের ভবিষ্যৎ-প্রচেষ্টা অচিরে ফললাভ হবে বলে মনে করি—'

'যুবরাজ কী বললেন ?'

অন্ধকারে পত্নীর চোখে হাজার জিজ্ঞাসা। আরও কি-যেন। সেই চোখের ওপর চোখ রেখে শংকর কিন্তু শান্ত। বললেন, 'যুবরাজের পরিকল্পনা ছিল আগে থেকে। গভীরভাবে চিন্তা করেছেন তিনি ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা।··· ভগবতী চতুঃষষ্টি যোগিনীর নিকট গঙ্গাতীরে ঘাট তৈরির জন্য প্রকৃষ্ট স্থান নির্বাচন করে ফেলেছিলেন পর্যন্ত। আমি ইন্ধন যোগানোর ফলে ঘাট নির্মাণ এগিয়ে চলল দ্রুতগতিতে। প্রতিষ্ঠা করলেন ভদ্রকালী মূর্তি। এই শুভকাজে তিনি অর্থব্যয় করলেন প্রচুর, কাশীবাসী জনসাধারণকে অকাতরে দান করলেন খাদ্যদ্রব্য, বস্ত্র ও অর্থ। অধিকন্তু, জীর্ণতাবশত বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছিল দশাশ্বমেধ ঘাট, তার সংস্কারের জন্যে যে অর্থ দান করলেন তা দেখে ধন্য ধন্য করতে লাগলেন সকলে।···লোকমুখে ছড়িয়ে গেল তাঁর খ্যাতি। দূর দূরান্ত থেকে ছুটে এল আবালবৃদ্ধবনিতা, তাঁকে একটিবার দেখার জন্যে। এমন অবস্থা হল যে ভিড় ঠেলে আমরাই এগোতে পারি না তাঁর কাছে! জয়গানে ভরে গেল কাশীর গগন। ঈর্ষান্বিত হয় নি যে কেউ তা নয়, বিভিন্ন প্রদেশেব আমির ওমরাহ এবং নৃপতিবর্গ তো ঈর্ষায় ভুরু কুঁচকে লক্ষ্য করলেন ২ পাবটা, হয়তো গণ্ডগোল করার বাসনা তাদের কারো ছিল কিন্তু যখন জানতে পারলেন যে এই দানবীর যুবক সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ কবেছেন এবং সঙ্গে আছে নিজস্ব সৈন্য ছাড়া বাইশ হাজার শাহী সৈন্য, তখন দুষ্টবুদ্ধি সংযত করে নিলেন তাঁরা। অবশ্য আমিও লক্ষ্য রেখেছিলাম তাঁদের ওপর, সে-রকম গতি-প্রকৃতি দেখলে উচিত-শিক্ষা দিয়ে দিতাম। আমি ও সূর্যকান্ত সর্বদা টহল দিয়ে বেড়িয়েছি শুভকর্মের আগে ও পরে—'

'কাশী থেকে অন্য কোথাও গিয়েছিলে নাকি ?'

শংকর বললেন, 'প্রয়াগ-তীর্থ হয়ে কাশী এসেছিলাম। প্রয়াগে পুণ্যকৃত্য সমূহ সম্পন্ন করা হয়েছিল অতি সমারোহের সঙ্গে···সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলাম আমরা। বিদ্যার্থীদের

অভাব মোচনের জন্যে যথেষ্ট দান করেছিলেন যুবরাজ।...কাশী থেকে বেরিয়ে পাটনায় অবস্থান করেছিলাম কিছুদিন। পাটনা বিহার প্রদেশের রাজধানী। ওখানকার রাজনৈতিক অবস্থা বেশ ঘোলাটে। রাজপুরুষগণের অন্যায় অত্যাচারে প্রজাসাধারণ জর্জরিত, তুর্কিগণের প্রতারণামূলক ধনোপার্জনে দূরদর্শী সম্রাট বাধা সৃষ্টি করায় তাদের মনে অসন্তুষ্টি...এ-সব তুমি বুঝবে না, কারণ এগুলো ধর্মের বিবরণ নয়, রাজনীতির সূত্র...'

'ইদানীং রাজনীতি তোমরা বেশি করে অনুশীলন করছো বলে মনে হয়।'

স্পষ্ট না-হলেও সামান্য পরিমাণে ব্যঙ্গের ছোঁয়া যেন কণ্ঠস্বরে। শংকর উত্তেজিত।

'রাজনীতি বা দেশের কথা ছাড়া অন্য কোনো চিন্তা আমরা করি নি বা করব না। বারাসাত থেকে যখন যশোরে চলে আসি তখন কি বলেছিলাম, মনে আছে? মোগলের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াব আর হিন্দুশক্তির পুনর্জাগরণ ঘটাব, নইলে বেঁচে থাকার অর্থ হয় না। আমি একা এ-কাজ করতে পারি না...বারাসাত থাকাকালীন একটিমাত্র লোকের নাম শুনেছিলাম, তিনি ছোটরাজা বসন্তরায়। যশোরে চলে এসেছিলাম তাঁর চরণতলে আশ্রয় নেব বলেই, কিন্তু পেলাম আরও একটি সুদৃঢ় আশ্রয়; বয়সে ছোট বটে কিন্তু তিনি আমার স্বপ্নের পুরুষ, ভাবীকালের যশোরেশ্বর প্রতাপাদিত্য...'

আকণ্ঠ আবেগ। যেন আবেগের মধ্যে ভাসিয়ে দিলেন নিজের বক্তব্য।

'তাই যশোরে পদার্পণ করে প্রথম মহড়া নিলে দুই বৃদ্ধের ওপর, যাঁরা স্নেহপ্রবণ এবং সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত। স্বীকার করি তোমাদের সঙ্গে প্রচুর সৈন্য ছিল এবং তোমরা এক-একজন মস্ত বীর, কিন্তু বড়রাজা যদি হাঁক দিতেন তাঁর সৈন্যদের আর ছোটরাজা যদি তাঁর বিখ্যাত 'গঙ্গাজল' তরবারি খুলে তোমাদের সামনে দাঁড়াতেন, তাহলে—'

'আবার বলি,' শংকরের স্বরে গাম্ভীর্য নেমেছে: 'এটা রাজনীতি। তোমাদের পক্ষে বোঝা কঠিন এবং আমি তা বোঝাতে চাই না। শুধু এইটুকু জেনে

রাখো, রাজনীতিক্ষেত্রে ভাবালুতার স্থান নেই আর যুদ্ধে নেমে কোন্ পক্ষ হারবে ও কোন্ পক্ষ জিতবে, আমি বাঁচব না মরব একথা যারা ভাবে তারা প্রকৃত যোদ্ধা নয়। যুদ্ধে হারজিত আছেই। জোর করে বলা যায় না কারা জিতত কারা হারত, যুদ্ধে যারা নামে তারা জেতার জন্যেই নামে।…তবে এক্ষেত্রে আমি বলব আমাদের জিত ঠিক হয় নি, দখল পেয়ছি বটে, প্রতাপাদিত্যের সিংহাসন-লাভ কেউ ঠেকাতে পারবে না; কিন্তু প্রকৃত জয় ছোটরাজা বসন্তরায়েরই। এই বয়সে তিনি যা বুদ্ধির খেলা দেখিয়েছেন তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে এবং এজন্যেই, বুদ্ধির জোরে তিনি এক বিরাট বিপর্যয় সামলে নিতে পেরেছেন বলেই, লোকক্ষয় হত প্রচুর; আমি যুবরাজকে অনুবোধ করেছি তিনি যেন খুড়োমশায়ের প্রতি কোনো বিরাগ পোষণ না করেন। জানি না তিনি কতদূর তা মেনে চলবেন। বসন্তরায় যতই বৃদ্ধ বা অথর্ব হোন, আমার কেবলই মনে হয়, তিনি যশোরের জীবন্ত কল্যাণ-বিগ্রহ; তাঁর আশীর্বাদ পেলে সকল অমঙ্গল দূর হয়ে যায়—'

'কেন, যুবরাজ কী তাঁর প্রতি অপ্রসন্ন?'

শংকর ছোট করে জবাব দিলেন, 'সত্য কিনা জানিনে তবে আমার তাই ধারণা।'

'কিন্তু উনি তো সিংহাসনের দাবি ছেড়ে দিয়েছেন—'

শংকর বললেন, 'তবু। কোথা দিয়ে কী ঘটে বলা যায় কী?'

'আমার বাপু ভালো লাগছে না। তোমাদের রাজনীতি বড় বিচ্ছিরি ব্যাপার—'

শংকর বললেন, 'এবার ঘুমোও। অনেক রাত হল।'

'আলোটা জ্বলবে?'

শংকর ফের দেখতে পেলেন জ্বলজ্বলে দুটি চোখ। বললেন, 'না নিবিয়ে দাও—'

একেবারে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল নিপুণিকা। এ কী হল! অন্তঃপুরমধ্যে বিপুল আনন্দের সাড়া পড়ে গিয়েছিল বাল্য-সহচর প্রতাপাদিত্যের প্রত্যাবর্তন সংবাদে, পাটনা পার হয়ে সপ্তগ্রাম ডিঙিয়ে তারা ক্রমশ যশোর সন্নিকটবর্তী, অভ্যর্থনার জন্যে স্বয়ং ছোটরাজা সদলে প্রস্তুত হয়ে এগিয়ে গিয়েছেন নদীতীর পর্যন্ত—যেমন গিয়েছিলেন যাত্রার দিনে; নগরবাসীরা খুশিমনে বেরিয়ে পড়েছিল দলে দলে, সেদিন ছিল নিরানন্দের দিন, আজ যেন চতুর্গুণ ফিরে এসেছে আনন্দের সাড়া, স্বতোৎসারিত। অভ্যর্থনার যাতে কোনো ত্রুটি না হয় সেজন্যে পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে পথঘাট, সজ্জিত হয়েছে প্রতিটি গৃহাঙ্গন, অন্তঃপুরচারিকাদের হাতে মংগলশঙ্খ। যুবরাজ প্রতাপাদিত্যের দেখা পেলেই বেজে উঠবে গৃহান্তঃপুর থেকে,—পত্রপুষ্পে সাজানো হয়েছে প্রাসাদ-তোরণ, ছোটরানী কমলার নির্দেশে শঙ্খ উঠেছে তাদের সকলের হাতে। ছোটরানী কমলা সংবাদ শোনামাত্র যোড়শো-পচারে পূজা দিয়ে এসেছেন ভবানী-মন্দিরে, তাঁর আনন্দ আর খুশি যেন ধরে না। অন্য মহল শুধু কিছুটা অচঞ্চল, তাঁরা তেমন উদ্বেলিত নন, বিশেষত গোবিন্দরায় ও তৎসম্প্রদায়। ওঁদের ঈর্ষার কারণ বোঝা যায়—যুবরাজ সম্রাটের অনুগ্রহ লাভ করেছেন এ সংবাদে তাঁরা আদৌ পুলকিত হতে পারেন নি। গোবিন্দরায় নিজে থেকে বলেছেন, 'এ আর কঠিন কাজ কি। যে কেউ পারে। আমি আগ্রা গেলে, উপঢৌকনের ডালি সাজিয়ে অনায়াসে সম্রাটকে বশ করতে পারতুম। তোষামোদে সকলকে গলানো যায়। আকবর সম্রাট হলেও মানুষ তো বটে!—'

যুবরাজের কৃতিত্ব নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন ছোটরাজার জ্যেষ্ঠপুত্র গোবিন্দ-রায়।···হয়তো তাই হবে। তবু যুবরাজের কৃতিত্ব একেবারে অস্বীকার করা যায় না। রাজন্তঃপুরে তাই মিশ্র প্রতিক্রিয়া। ও-মহলের পরিচারিকারা দর্শনীয়ভাবে সজ্জিত নয়, কারো হাতে শঙ্খ আছে কেউ ঘুরে বেড়াচ্ছে নিছক কৌতূহলী হয়ে। ওদের মনে রেখাপাত করে নি বিশেষ, যেন সাধারণ ঘটনা। অথচ ছোটরানী কমলার ব্যস্ততার সীমা নেই, বারংবার ডাক

দিয়েছেন যুবরাজ্ঞী শরৎসুন্দরীকে, সাজের নির্দেশ দিয়েছেন। দেরি হচ্ছে দেখে নিজেই সাজাতে বসে গেছেন যুবরাজ্ঞীকে···নিপুণিকা দেখেছে শরৎসুন্দরীর চোখে-মুখে কেমন লজ্জার আভা। পুত্র-কোলে তাঁকে অপরূপ দেখাচ্ছিল, সত্যিকার রাজেন্দ্রাণী। পুত্র উদয়াদিত্যের পোশাকই হয়েছে সবচেয়ে জমকালো, এখনও পুত্র-মুখ দর্শন করেন নি যুবরাজ, দূত মারফত সংবাদ পাঠানো হয়েছিল আগ্রায়, যুবরাজ সে-সংবাদ পেয়েছেন কিনা কে জানে। পুত্রটি হয়েছে ঠিক পিতার মতো, যেমন বলিষ্ঠ গড়ন তেমনি চঞ্চল, স্থির নয় একমুহূর্ত—দাপিয়ে বেড়ায় মায়ের কোল এ বয়সেই। সন্তান হিসাবে প্রথম উদয় বলে ওর কাব্যরসিক ছোট ঠাকুরদা নাম রেখেছেন, উদয়াদিত্য।···জন্ম-নামও দিয়েছিলেন একটা ঃ জগন্নাথ। ছোট্ট শয্যায় ছটফট করছে উদয়াদিত্য আর মায়ের দিকে তাকিয়ে হাত-পা ছুঁড়ছে, কোলে ওঠার বাসনা। যুবরাজ্ঞীর পোশাক ও প্রসাধন-পর্ব শেষ হয়েছে, কোলে তোলার জন্যে হাত বাড়িয়েছিলেন তিনি, ছোটরানী কমলা বললেন, 'ওকে আমি নিচ্ছি, তুমি আর ঘাঁটাঘাঁটি কোরো না বাপু।'— লজ্জায় আরও লাল হয়ে উঠলেন শরৎসুন্দরী। স্বামীর জন্যে সর্বতোপ্রস্তুতির ইংগিত রয়েছে কথাটায়। সুসজ্জা বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে।

ছোটরানীমা শিশুক্রোড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন কক্ষ থেকে, আস্তে আস্তে দুলিয়ে ভোলাবার চেষ্টা করছিলেন, নিপুণিকা দেখতে পাচ্ছিল তিনি পা পা করে দালানের কোণে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন যেখানে পিঞ্জরাবদ্ধ একটি পাখি এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়ে বসে থেকে হঠাৎ ডেকে উঠেছে ঃ 'কে রে প্রতাপ এলি ?'—অবিকল মনুষ্যস্বর, সুস্পষ্ট, সুমিষ্ট। ছোট পাখি, গাঢ় কালো রঙ, সরু কিন্তু লম্বা লেজ। শেষবার শিকারে গিয়ে সুন্দরবনের গভীর থেকে এই পাখিটি ধরে নিয়ে এসেছেন প্রতাপাদিত্য, কিছুকাল বিমর্ষ ছিল, তারপর আশ্চর্য বুলি ফুটেছে। ছোটরানী যুবরাজের প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে উদ্‌গ্রীব থাকতেন বরাবর, কারো পদশব্দ শুনলেই তিনি বলে উঠতেন, 'কে রে প্রতাপ এলি ?' পাখি হুবহু সেই বুলি তুলে নিয়েছে কণ্ঠে। দিনের মধ্যে

বহুবার শোনা যায় ঃ 'কেরে প্রতাপ এলি?'···দুর্লভ পাখি, ভীমরাজ। এখন, ছোটরানীমা উদয়াদিত্যকে কোলে নিয়ে ওর কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই প্রশ্নটি সরব হয়ে উঠেছে। ছোটরানীমা বললেন, 'দাঁড়া, দাঁড়া, আসছে। তুইও যে আমাদের মতো ব্যস্ত হয়ে উঠলি বাপু—'

নিপুণিকা বললে, 'ব্যস্ত হবে না? যুবরাজ যে নিজের হাতে ওকে খেতে দিতেন। আমাদের হাতে খাওয়া ওর পছন্দ হয় নি বোধহয়···'

'বাস্তবিক, এতদিন প্রতাপ ছিল না, পুরী যেন খাঁ খাঁ করছিল।'

নিপুণিকা বললে 'আমাদের যুবরাজের উপস্থিতি মানেই প্রাণের সাড়া··· যেখানে তিনি থাকুন সেখানটাই সরব হয়ে ওঠে, মাতিয়ে রাখতে পারেন তিনি।'

'একদিকে তাতে যেমন আনন্দ অপরদিকে তেমনি আতংক। কারো বশীভূত নয় প্রতাপ। নিজে যা ভাল বুঝবে, সে-কাজ করবেই। ভীষণ জেদী। একরোখা। আমার ভয় হয় সেইজন্যে, আবেশের বশে কখন কী করে বসে···'

নিপুণিকা বললে, 'তিনি আর-যাই করুন, এমন কোনো কাজ করবেন না যার ফলে বংশের বা যশোরের বদনাম হয়। একটু বেশি ভাবেন। নিয়ত চিন্তার ফলে মনের মধ্যে নানা দ্বন্দ্বের সংঘাত। আমি ওঁর বাল্য-সহচরী বলে ওঁকে অনেকখানি বুঝতে পারি।'

'তুই ওর বাল্য-সহচরী, আর বলতে গেলে, আমি ওর প্রতিপালিকা মা। আঁতুড়ে ওর মা মারা যাওয়ার পর থেকে কোলে করে মানুষ করেছি আমি, দিনে দিনে প্রতাপের এত পরিবর্তন দেখেছি যে এখন ওঁকে আর আমি চিনতে পারিনে। কেন জানিনে আমার কেবলই ভয় হয়, প্রতাপ বদলে যাচ্ছে, এখন যে-পথে সে চলতে চাইছে···হয়তো মিথ্যা ভয়, প্রতাপ সে-প্রকৃতির ছেলে নয়, তবু থেকে-থেকে আমার বুকের ভেতরটা কেঁপে ওঠে। তোরা কেউ দেখিস নি, রাত্রে খেতে বসে প্রতাপ এক-এক সময় একেবারে অন্য মানুষ হয়ে যেত, ডাকলে সাড়া পেতাম না, চোখ তুলে যদিবা তাকাত

সে-দৃষ্টির মধ্যে বাহ্যজ্ঞান থাকত না···আমার সন্দেহ হয়, প্রতাপের দেহে কেউ বুঝি ভর করে, মা-মরা ছেলে···'

নিপুণিকা বললে, 'সম্ভবত তিনি অতৃপ্ত।'

'সেটাই তো আমার জিজ্ঞাসা। কিসে প্রতাপের অতৃপ্তি? কেন বংশছাড়া ধারা পেল? আমার শ্বশুর-বংশে, যতদূর আমি জানি, কেউ কখনও ওর মতো স্বভাব পায় নি। এ যেন সৃষ্টি-ছাড়া···ওমা, এত চেঁচামেচি কেন? লোক ছুটছে কেন দুর্গের দিকে? কী হল?'

'তাই তো! খুব গোলমাল মনে হচ্ছে—'

'সর্বনাশ! কেউ দুর্গ আক্রমণ করে নি তো! যা দিনকাল!'

···প্রথমে টের পাওয়া যায় নি, পরে জানা গেল দুর্গ আক্রমণ করা হয়েছে সত্যি এবং সে-আক্রমণের নেতা প্রতাপাদিত্য স্বয়ং। জলপথে যশোরে অবতীর্ণ হয়ে তৎক্ষণাৎ দুর্গ-অবরোধ করেছেন তিনি।

'সে কি! প্রতাপ! আমাদের প্রতাপ!'

বিস্ময়ে ও আতংকে বার-কয় ঢোঁক গিললেন ছোটরানী কমলা।

'দেখলি তো আমি কী বলেছিলাম!' তিনি বললেন, 'বোঝো ছেলের মতি-গতি! বউ-ছেলে-বাপ পড়ে রইল প্রাসাদে, উনি বিদেশ বেড়িয়ে দেশের মাটিতে পা দিয়েই অবরোধ করে বসলেন দুর্গ। দুর্মতি নয়?'

নিপুণিকা বললে, 'নিশ্চয় কোনো উদ্দেশ্য আছে। আমরা হয়তো ঠিক তাঁকে অনুধাবন করতে পারছি না—'

'মহৎ উদ্দেশ্য নেই নিশ্চয়। ওর খুড়োমশায় আর বাপ ওকে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে নি, সে-দুর্বাসনা তাঁদের নেই, তবে কেন এই শক্তির বড়াই। যৌবনকালে মানুষ একটু অবুঝ হয়, তা বলে কেউ নিজের পায়ে কুড়ুল মারে না। মারে কী···? এ হল সূত্রপাত, তোকে আমি বলে রাখছি এরপর আরও অনেক-কিছু ঘটবে। প্রতাপ আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যে হিতাহিতজ্ঞান হারাবে।'

নিপুণিকা বললে, 'আপনি বেশি উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন ছোটরানী-মা।'

'হব না? আমার মনে সহজে কু গায় না, কিন্তু একবার যদি গাইতে সুরু করে তাহলে একের পর এক অনর্থ ঘটে, আমি দেখেছি।'

'ওকে আমার কাছে দিন।' শরৎসুন্দরী বেরিয়ে এসেছে কক্ষের বাইরে, চোখ-মুখ বিবর্ণঃ 'কী হবে ছোট মা?'

'তোমার পিতা-শ্বশুর যা রাগী,' কমলা উদয়াদিত্যকে সমর্পণ করে বললেন, 'ক্ষেপে না-ওঠেন আবার। আর যাই হোক, পিতা-পুত্রে লড়াই কারো কাম্য নয়। তোমার খুড়া-শ্বশুর খুব বুদ্ধির বড়াই করেন, দেখা যাক এই পরিস্থিতি তিনি কী করে সামাল দেন—'

'তিনি নদীঘাট পর্যন্ত গিয়েছেন. একটু বুঝিয়ে বললে কী উনি শুনতেন না?'

নিপুণিকা বললে, 'আমি খবর পেয়েছি উনি ফিরে এসেছেন, বড়রাজার সঙ্গে শলা-পরামর্শ করছেন—'

'তাহলে একটা-কিছু ফল আশা করা যায়।'

নিপুণিকা বললে, 'ওই দেখুন—'

দেখা গেল ফল ফলেছে।

অপূর্ব একটি শোভাযাত্রা এগিয়ে আসছে প্রাসাদ-অভিমুখে। একেবারে সামনে ছোটরাজা ও বড়রাজা আর তাঁদের ঠিক মাঝখানে হাস্যমুখ প্রতাপাদিত্য। পেছনে সূর্যকান্ত, শংকর, মদন প্রমুখ অন্য সকলে সারিবদ্ধভাবে আসছে মিছিল করে। বোঝা যায়, দুর্যোগ কেটে গেছে, প্রসন্নতায় ঝলমল করছে সব কটি মুখ।···নিপুণিকা বললে, 'দেখুন, যুবরাজকে কী সুন্দর দেখাচ্ছে। আমরা এবার শঙ্খধ্বনি করতে পারি ছোটরানী-মা?'

'দাঁড়া, ওঁরা প্রাসাদ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করুন—'

তৎপূর্বে বেজে উঠেছে কাড়া-নাকাড়া। ভেরী বাজতে সুরু করেছে। শঙ্খনিনাদ শোনা যাচ্ছে বাতাসে। মেয়েরা ঝুঁকে পড়েছে গৃহ-অলিন্দ থেকে। পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে।··· তোরণ পার হয়ে সরোবরের পাশ দিয়ে ওঁরা হেঁটে আসছেন। সরোবরের পাশে বিচরণরত হরিণযূথ মুখ তুলে তাকাল চকিতে,

ময়ূর হঠাৎ মেলে দিল পাখা। হেসে উঠল যেন সকালটি, অল্পক্ষণ আগে যে-সকালের রঙ মনে হয়েছিল বিষাদে বিবর্ণ। প্রাসাদ-শীর্ষ থেকে কে-যেন উড়িয়ে দিল একঝাঁক সাদা পায়রা, বর্ণোজ্জ্বল হয়ে উঠল আকাশের রঙ। —এগিয়ে আসছেন ওঁরা। অনেক কাছে এসে গেছেন। চেনা যাচ্ছে প্রায় প্রত্যেককেই। নিপুণিকা দেখতে পাচ্ছিল প্রভাত-সূর্যের রশ্মিপাতে ঝলমল করে উঠছে মহারাজা বিক্রমাদিত্যের রত্নমুকুট, ছোটরাজার মাথায় মুকুট আছে বটে তবে অপেক্ষাকৃত ছোট। উজ্জ্বল দেখাচ্ছে যুবরাজ প্রতাপাদিত্যের মাথার মুকুটটি। নবরত্নের মিশ্রণে তৈরি মুকুটের নক্‌সা ও কল্‌কা। মধ্য-মণির শীর্ষে শ্বেতময়ূরের পাখনার পালকের গুচ্ছ। হাওয়ায় কাঁপছে শির-শির।

শংকরদা সূর্যদাকে দেখা যাচ্ছে পিছনে। ··তাঁদের পিছনের সারিতে বিরাট বপু মদনদা ও আরও অনেকে। কিন্তু কোথায় গেল সেই ছোঁড়াটা? পাতলা, ছিপছিপে গড়ন—হাতের লক্ষ্য যার অব্যর্থ। আগ্রা থেকে ফিরে চেহারাটা কেমন হয়েছে দেখার আগ্রহ ছিল, কিন্তু বাহিনী প্রবেশ করেছে প্রাসাদে, দেরি করা যায় না আর।

নিপুণিকা শাঁখ তুলে নিল। ফুঁ দিল জোরে।

'এ কী কাণ্ড করলে বলো তো?'

প্রণাম সেরে মুখ তুলেছেন পত্নী, প্রথম সম্ভাষণ।

'কাণ্ড! কিসের কাণ্ড?'

হাসছিলেন প্রতাপাদিত্য। মন ভরে যাচ্ছে পিতার ঔদার্যে, খুড়োমশায়ের আন্তরিক ভাষণে। বাস্তবিক পিতার শরীর ভেঙে পড়েছে এবং খুড়োমশায় বিষয়কর্মে নির্লিপ্ত। বৎসরাধিক কাল পরে দেখা, দুজনে এত অথর্ব হয়ে গেছেন ভাবা যায় নি যেন। ভাবলে, বিদ্রোহীর ভূমিকা গ্রহণ না-করে অন্য-মূর্তিতে আসা যেত। এবার থেকে সময়ের প্রতি নজর রাখতে হবে, সময়

বহু সমস্যা সমাধান করে দিতে পারে নিজে। পিতার অভ্যর্থনা ও খুড়োমশায়ের সম্ভাষণে খাদ ছিল না, তাই অকপটে ক্ষমা চেয়ে নিতে পেরেছেন তিনি—যদিচ পিতা তাঁকে জন্মাবধি দুর্বিপাকে ফেলতে চেয়েছেন বারবার এবং খুড়োমশায় যতই নির্লিপ্ত থাকুন, আপন পুত্রদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একেবারে নির্লোভ কিনা সন্দেহ। কোন্ মানুষ তা থাকতে পারে? সাবধানে থাকা উচিত, রাশ ঢিলা করা চলবে না। নম্রতায় সমস্ত কথা মেনে নেবেন, শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাতে কার্পণ্য করবেন না এতটুকু, যেখানে দৃঢ়তার প্রয়োজন সেইখানে শুধু অনমনীয় থাকলেই হবে। আপাতত সেই ভূমিকা তাঁর। তাছাড়া রাজ্যবাসী কতখানি প্রসন্নতার সঙ্গে এই বিদ্রোহ গ্রহণ করেছেন বলা শক্ত, জমি প্রস্তুত করা দরকার, বিপক্ষে গোবিন্দরায় প্রমুখ প্রচারে বিষক্রিয়া শুরু করেছে কিনা কে জানে, তাঁর দীর্ঘ অনুপস্থিতির সুযোগে কোন্ নদী দিয়ে কত জল বয়ে গেছে কে তার হিসাব রাখে। রাজ্যের অধিবাসীদের হৃদয় জয় করে নিতে হবে এবং সেজন্যে অপেক্ষা প্রয়োজন। বৃদ্ধ পিতা ও খুড়োমশায়ের বিরুদ্ধে যদি সত্যই যুদ্ধে রত হতে হত, পিতা নিশ্চয় স্বেচ্ছাচারী পুত্রকে উচিত-শিক্ষা দেবার এমন সুবর্ণ সুযোগ বিনষ্ট হতে দিতেন না, খুড়োমশাইকে যুদ্ধ-পরিচালনার আদেশ দিতে পারতেন অনায়াসে এবং খুড়োমশায় খোলা-তরবারি 'গঙ্গাজল' নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে ফলাফল কী-যে হত বলা যায় না, প্রচুর লোকক্ষয় হত নিশ্চয়; প্রজাসাধারণের মনে যেটুকু শ্রদ্ধার ভাব আছে তা-ও মুছে যেত একেবারে, যশোরেশ্বরের পরিবর্তে স্বজনদ্রোহী হিসাবে ছড়িয়ে পড়ত তাঁর নাম।··· তা আদৌ কাম্য ছিল না। শুধু ভূখণ্ডের লোভ তাঁব নেই, তার চেয়ে বড়, প্রজা-বৎসল হওয়া। এই শিক্ষা দিতে হবে সম্পদে-বিপদে যশোর একা যশোরেশ্বরের নয়, সকলের, যশোরে যারা বাস করে তাদের প্রত্যেকের। অধিবাসীদের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা না-পেলে এই বোধ প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। সময়ে সংযত হয়ে ফল যে ভাল হয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে পথে আসতে আসতে শঙ্খধ্বনির অভ্যর্থনায়, বাতায়নের ফাঁকে পুষ্পবৃষ্টি মারফত, চারিদিকে

উচ্ছ্বাসের প্রাবল্যে। এই প্রীত-মনোভাব আচ্ছন্ন রাখতে পারলে ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে। ভাবতে ভাবতে কক্ষে প্রবেশ করেছিলেন তিনি।

'তোমার বুদ্ধি ও বিবেচনা-শক্তি আছে আমি জানি,' সালংকারা শরৎসুন্দরী দূরে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন, কণ্ঠস্বর বেজে উঠছে যেন সংগীতের মতো : 'কিন্তু হঠাৎ তোমার দুর্গ-অবরোধের সংবাদ শুনে শুধু আমি কেন, আমরা সবাই, ছোট-মা পর্যন্ত, কি-রকম হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম···ভেবে পাচ্ছিলাম না এমন আচরণের কারণ কী ? মাঝে মাঝে তুমি যে-সব কাণ্ড বাধাও—'

'প্রিয়ে', তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন কক্ষে অদূরে যেন শ্বেতপদ্ম ফুটে আছে একটি, কিছু লালের আভা, বুঝি কাব্য-সুন্দরী হয়ে উঠেছে শরৎসুন্দরী, অদর্শনে আরও মহিমময়ী : 'এ-সব তুমি বুঝবে না। এ হল রাজনীতি। শুধু একটা কথা বলে রাখি, আমার কোনো আচরণে তুমি বিস্মিত হয়ো না। সর্বদা মনে রেখো নিজের স্বার্থে আমি কখনও কোনো কাজ করব না। ভুল হয়তো করতে পারি, মানুষ মাত্রেই ভুল হয়, কিন্তু সাধারণভাবে তা বিচার করতে গেলে আরও বড় ভুল হবে—আমি একটা মহত্তর উদ্দেশ্য সাধন করতে চাই বলে ঠিক পথটি খুঁজে বার করতে চাইছি,—সেজন্য গুরুজনদের অপ্রিয়ভাজন হতে পারি কিন্তু আমার পক্ষে সেটা গুরুতর অন্যায় হবে না—'

'তোমার সব কথা আমি বুঝিনে,' শরৎসুন্দরী ঘুমন্ত পুত্রের দিকে ঝুঁকলেন : 'তবে আমি বিশ্বাস করি তুমি কোনো অন্যায় করবে না। তোমাকে সবাই ভবানী-সহায় বলে, আমি জানি, ঈশ্বরের আশীর্বাদ আছে তোমার শিরে—'

'ওটি কে ?'

এইবার হাসলেন শরৎসুন্দরী : 'দূত-মারফত সংবাদ পাও নি ?'

'না। আমার সঙ্গে দূতের সাক্ষাৎ হয় নি—'

শরৎসুন্দরী বললেন, 'ওর ছোট-ঠাকুরদা নাম রেখেছেন জগন্নাথ, আমরা ডাকি উদয়াদিত্য।'

'আরে ভারি সুন্দর হয়েছে তো দেখতে। নামটিও চমৎকার—'

শরৎসুন্দরী কোলে তুলে নিয়েছেন শিশুকে। প্রতাপাদিত্য দেখছিলেন। 'তোমার কোলে ওকে যা মানিয়েছে!···তুমিও দেখতে সুন্দর হয়েছো শরৎ। আরও ভরে উঠেছো—'

লজ্জা পেলেন শরৎসুন্দরী। বললেন, 'যা-হোক এতক্ষণে নজর পড়ল। ভেবেছিলাম আগ্রা-সুন্দরীরা তোমার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে বুঝি!'

'মেয়েমানুষ, যত সুন্দরীই হোক, আমার চোখ ধাঁধাতে পারে না শরৎ।' তিনি বললেন, 'আমি আগ্রা গিয়ে মেয়েমানুষের চেয়ে সুন্দর জিনিস দেখে এসেছি, সেটা আকবরের রাজনীতি। এখন আমার প্রেয়সী তিনজন: একজনের নাম শরৎসুন্দরী, দ্বিতীয় যশোর এবং তৃতীয় হল রাজনীতি। স্বভাবতই প্রথমার চেয়ে দ্বিতীয়া ও তৃতীয়ার প্রতি টান বেশি হয়, আমার সেই দশা।···তা বলে ভেবো না যে তোমার দিকে আমার নজর নেই। কক্ষে প্রবেশ করেই আমি তোমার নতুন রূপ ও সজ্জা দেখে নিয়েছি—'

'আ-হা কী এমন সেজেছি!'

'বলো কী!' তিনি কৃত্রিম বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করে বললেন, 'এ যদি সাজ না-হবে তবে সজ্জা বলে কাকে! কালো কেশে বাঁধা তিনসূত্রে গাঁথা শিরবন্দী। নাসায় অর্ধচন্দ্রাকৃতি কেশর। কানে মকর-কুণ্ডল দেখছি স্বর্ণ-নির্মিত ও মুক্তাখচিত। কণ্ঠে আঁটসাট গ্রীবাপত্র আর বক্ষে শোভা পাচ্ছে সাত লহরের হার। বাহুতে ওগুলো কি—অনন্ত, তার নিচে—নাম মনে থাকে না, হ্যাঁ তাড় ও জসম। আরও নিচে কেয়ূর ও লক্ষ্মীবিলাস শাঁখা। হাতের পাতায় অত যত্ন করে কে এঁকে দিয়েছে হস্তপদ্ম?—সখি অরুন্ধতী এসেছিল বুঝি! না সে আসবে কী করে, সূর্যকান্তের জন্যে অধীর প্রতীক্ষা। বুঝেছি, ছোটমার কাজ —পায়ে ওগুলো কি, বাঁকাপাতা মল আর পায়ের আঙুলগুলোতে চুটকি পরেছো বটে, রত্নখচিত। সবচেয়ে সুন্দর হয়েছে তোমার পরণে কনকচাঁপা রঙের সোনালী জঙলা শাড়িটি।···অরুন্ধতী তোমাকে এ রূপে দেখলে আর-একখানি ছবি এঁকে ফেলত নির্ঘাত। আমারও একটা-কিছু এঁকে দিতে ইচ্ছা করছে, তবে পটে নয় ঠোঁটে। দেখি

এদিকে এসো—'

'না না ছি ! এই সকালে—কে কোথা থেকে এসে পড়বে—'

'আমার বিশ্রামের ব্যাঘাত হবে ভেবে কেউ এখন আসবে না, দরজা বন্ধ, একমাত্র ছোটমা যদি—'

'ওই শোনো, দরজায় শব্দ হচ্ছে। ছোটমা বুঝি এলেন—'

'খুব বেঁচে গেলে। রাত্রে কিন্তু এর শোধ উঠবে—'

'দেখা যাবে—'

হাসতে হাসতে পাশ কাটিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন শরৎসুন্দরী। প্রতাপাদিত্য পুত্রের মুখ-দর্শনে মনোযোগী হলেন।

'আমি কী বলেছিলাম মনে আছে, জানকীবল্লভ ? প্রতাপ পুত্র বটে কিন্তু ও-ই আমার দুশ্চিন্তার কারণ—'

দেওয়ানখানায় শুধু ওঁরা দুজনে। আলোচনা হচ্ছে। পরামর্শের জন্যেই আসা, কিন্তু পরামর্শ অপেক্ষা আক্ষেপ ফুটে উঠল বৃদ্ধ মহারাজ বিক্রমাদিত্যের কণ্ঠে। তাঁকে দুশ্চিন্তিত দেখাচ্ছিল বাস্তবিক।

'তুমি যাই বলো দাদা, আমি কিন্তু আদৌ দুশ্চিন্তা করি না।' বসন্তরায়ের মনোভাব সদাপ্রফুল্ল, এখনও তাই, বললেন, 'প্রতাপের মতো তেজি যুবকের পক্ষে মোটেই অসংগত হয় নি এ-আচরণ। তুমি একটু স্থির হয়ে চিন্তা করলেই দেখবে পিতার সিংহাসন লাভের জন্যে সমর্থ পুত্রের বিদ্রোহ এই নতুন নয়। গৌড়ের সিংহাসন নিয়ে এ হানাহানি প্রচুর হয়েছে। বরং আমি বলব, প্রতাপ যথেষ্ট সুবিবেচক, তুমি পর আমি হঠাৎ যখন ওর শিবিরে উপস্থিত হলাম সেই সময়কার আচরণ কত ভদ্র—প্রতাপ আমাদের বন্দী করতে পারত, অসম্মান করতে পারত, কিন্তু সে তা না করে শ্রদ্ধাভরে আমাদের অভ্যর্থনা করেছে। শুধু তাই নয়, আমাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে তৎক্ষণাৎ ঘরের ছেলে ফিরে এসেছে ঘরে—'

'জানকী, আমার মনে হয় অন্ধ স্নেহে তোমার জ্ঞানচক্ষু এখনও খোলে নি। পরে যেদিন খুলবে সেদিন আর সংশোধনের পথ পাবে না—বলে রাখলুম।' পুত্র-প্রশংসায় অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিলেন পিতা বিক্রমাদিত্য ঃ 'আমি ওর চরিত্রের ভবিষ্যৎ গতি-প্রকৃতি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। আমাদের পক্ষে সেটা শুভ নয়। তুই ওর শিবিরে যাওয়ার পরামর্শ না-দিলে আমি এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতাম অন্যভাবে। তোর-আমার বয়স হয়েছে সত্যি, ভোগস্পৃহা স্তিমিত, কিন্তু তাই বলে উচ্ছৃংখল পুত্রের সর্ববিধ ঔদ্ধত্য মেনে নেবার মতো হীনবল হয়ে পড়ি নি এখনও। তোর হাতের তরবারিতে এখনও জোর আছে আর আমি যতই বিষ্ণু-ভক্ত হই না কেন শত্রুর মুখোমুখি হবার সাহস রাখি—সৈন্যবল আমারও কম ছিল না। অবশ্য একথা ঠিক, তোর পরামর্শমতো কাজ করে অনর্থক হানাহানি থেকে রক্ষা পাওয়া গেছে—বরাবর তোর বুদ্ধিকে এইজন্যে উচ্চে স্থান দিয়েছি আমি, প্রশংসা অবশ্য প্রাপ্য। দ্যাখ্ জানকী, আমি তোকে যেভাবে বুঝেছি এবং যে-মূল্য দিয়েছি, প্রতাপ সেভাবে বুঝবে কিনা সন্দেহ···আমার অবর্তমানে তোকে হয়তো অপদস্থ করতে পারে সে। আমার শরীর যেভাবে ভেঙে যাচ্ছে তাতে—'

'না না প্রতাপ সে-রকম ছেলেই নয়।' তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ করলেন বসন্তরায় ঃ 'আমাকে সে যথেষ্ট মান্য করে, শ্রদ্ধা করে। অন্তত এখনও পর্যন্ত তার আচরণে এমন-কিছু দেখি নি যে···'

'ভাই জানকী,' বাধা দিয়ে বিক্রমাদিত্য বললেন, 'প্রতাপের প্রতিবন্ধক তুমি হবে না তা জানি, কিন্তু আমি যেন আর ভরসা পাচ্ছি না। এই বিদ্রোহ আমাকে অনেক শিক্ষা দিয়েছে। তুমি ওর মঙ্গল চাইলেও প্রতাপ তার কদর্থ করতে পারে। ওর মনের মধ্যে এক অশুভ শক্তির কালো ছায়াপাত আমি যেন লক্ষ্য করেছি, হয়তো পিতা বলেই এটা দেখা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। তাই সাবধানতা দরকার।'

'দাদা, তুই যতই পুত্র-বিদ্বেষ প্রকাশ করো,' বসন্তরায় নরম করে নিলেন

শব্দগুলি ঃ 'আমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি ওর মধ্যে প্রচণ্ড শক্তির জাগরণ। আমরা দুজনে সাহস করে যা করতে পারি নি, মোগলের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করার দুর্বার সংগ্রাম, আমাদের যুব-বয়সে তা করার উপযুক্ত অবকাশ ছিল না, গৌড়ের যুদ্ধ আর যশোহর প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেই কেটে গেছে আমাদের সমগ্র সাধ ও শক্তি ; প্রতাপ তার পরের কাজটুকু করতে চায়। আমি বরাবর প্রতাপের মতিগতি দেখে আসছি এদিক দিয়ে। আমার নিজের যদি সর্বগুণসম্পন্ন এ-রকম একটি পুত্র থাকত—'

বিক্রমাদিত্য বললেন, 'প্রতাপকে তুমি পুত্রাধিক স্নেহের চোখে দেখে আসছো, প্রকৃতপক্ষে তুমি ওর প্রতিপালক পিতা।···কিন্তু কথা নয়। জানকী, সংসারে স্নেহ অতি বিষম বস্তু, মানুষকে একেবারে অন্ধ করে দেয়। তোমার সেই দশা। তোমার পরামর্শে প্রতাপকে আমি সিংহাসন ছেড়ে দিয়েছি, সমারোহের সঙ্গে ওর রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন করেছি। আমি শুধু-মাত্র সিংহাসনে বসি জীবিত আছি বলে, প্রতাপ রাজ্য চালায় তার ইচ্ছা-মতো। তুমি লক্ষ্য করেছো কিনা জানি না, প্রতাপের নির্দেশে বৈষ্ণবদের আখড়াগুলো পরিণত হয়েছে যুবকদের ব্যায়াম-চর্চার কেন্দ্ররূপে···পাড়ায় পাড়ায় ব্যায়াম, লক্ষ্যভেদ ও অসি-চালনা প্রভৃতি অস্ত্রশিক্ষার জোর অনু-শীলন চলছে। যশোর বদলে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।'

'দাদা, এর মধ্যে আমি তো ভীতিকর কিছু দেখছি না। দেশকে জাগাতে হলে এই রকম পরিকল্পনা চাই—'

'তোমাকে বুদ্ধিমান বলে জানতাম,' বিক্রমাদিত্য যেন ঈষৎ বিরক্ত, 'এখন দেখছি তোমাকে সতর্ক হতে বলা বৃথা। কোষ্ঠীর ফলাফল তুমি ব্যর্থ করে দিয়েছো বটে, কিন্তু আমার সন্দেহ হয়, বিষবৃক্ষে জল-সেচনের ফল তুমি অচিরেই পাবে। হ্যাঁরে জানকী, যশোর-প্রতিষ্ঠার জন্যে তুই এত-যে খেটে ম'লি, বলতে গেলে আমি তোর মাথায় কাঁঠাল ভেঙে দিব্যি এতকাল রাজত্ব চালিয়ে গেলাম, এখন শেষ-বয়সে তোর কী হিসাব-নিকাশ করতে মন চায় না? আমার তো একটি ছেলে, তোর যে একাধিক! তাদের ভবিষ্যতের

জন্যেও ভাববিনে ?'

'দাদা, যশোহর বেঁচে থাকলে আমি বেঁচে থাকব। ইতিহাস কখনও মিথ্যা বলবে না। তবে ওই-যা বললে, ছেলেদের ভবিষ্যৎ চিন্তা। আমি নিজের জন্যে কোনোদিন কিছু চাই নি, চাইবও না, দু-বেলা দুটো খাওয়া আর ঈশ্বরের নাম করতে পারলেই আমার পরম পাওয়া মিটে যায়। আমার ছেলেদের জন্যে তুমি ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা করে দিয়ে যাবে আমি জানি—'

'তুই যথার্থ নির্লোভ। এক-একসময় স্নেহে-প্রেমে হু হু করে ওঠে বুকের মধ্যে তোর জন্যে···তোর জন্যে আমি কী করলাম, অথচ তোরই তো সব পাবার কথা ; অন্য ভাই হলে আমি এতদিন রাজত্ব করতে পারতাম না। বড় আশ্চর্য তোর চরিত্র ও মনোবল !'

'দাদা, ছেলেবেলায় শাস্ত্রগ্রন্থ পড়তে গিয়ে আমি শুধু মুখস্থ করি নি, মনে রাখার চেষ্টা করেছি আর অল্পমাত্র মেনে চলেছি জীবনে। তার একটি প্রতাপকে শিখিয়েছি আর নিজেও মানি, সেটি হল এই—'

আবৃত্তি করলেন ঃ 'ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।

হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাবি বর্ধতে—'

বললেন, 'প্রতাপকে এর মানে বুঝিয়ে দিয়েছিলুম। অধিকন্তু ব্যাখ্যা করে বলেছিলুম যে মানুষের চাহিদা হল চারটি ঃ সম্পদ, আধিপত্য, নারী ও পশু। মজা হল এই যে চাহিদার কোনো নিবৃত্তি নেই এবং সেই কারণেই আসে দুঃখ, বিষাদ, ক্ষয় ও ক্ষতি। এ-সব থেকে নিবৃত্ত হবার একটিমাত্র জিনিস আছে সংসারে, তার নাম সংযম। মানুষ যদি আত্মসংযম করতে না পারে তাহলে তার মতো দুঃখী আর কেউ নেই। দাদা, 'আমি এই আত্ম-সংযমের শিক্ষাটি গ্রহণ করেছি মনে-প্রাণে—'

'কিন্তু প্রতাপ যদি সেই শিক্ষা না-পেয়ে থাকে ?' বিক্রমাদিত্য বললেন, 'আমি বলি, আমরা বেঁচে থাকতে থাকতে সম্পত্তি ভাগ হওয়া উচিত। এ বিষয়ে আমি চিন্তা করেছি। তোমার সঙ্গে পরামর্শ শেষ করে প্রতাপকে বলব এবং তখনই দলিলে স্বাক্ষর করব। আমার কথাটা মনোযোগ-সহকারে

শোনো। প্রতাপ যশোরের দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগে ধুমঘাট নানক স্থানে নতুন পুরী স্থাপন করার জন্যে আমার কাছে অনুমতি চেয়েছে, আমি অনুমতি দিয়েছি, বুঝতে পারছি এ স্থান তার মনঃপূত নয়। সে নতুন করে গড়ে তুলতে চায় যশোরের মানচিত্র। তোমাকেও বলি, তুমি প্রতাপের আওতা থেকে দূরে নতুন পুরী নির্মাণ করে নিশ্চিন্তে বসবাস করো। তোমার পুত্রদের প্রকৃতি অন্যপ্রকার, প্রতাপের সঙ্গে মিলবে না, শরিকী বিবাদ যত কম হয় ততই মঙ্গল।...যদিচ আমার বিবেচনায় আধাআধি ভাগ হওয়া উচিত, তোমার নামে সমগ্র যশোর লিখে দিতে পারলে সবচেয়ে খুশি হতাম, এখন তা হবার আর উপায় নেই, পুত্র বড় হয়ে উঠলে অনেক সাধ-ইচ্ছা দমন করে নিতে হয় নইলে অনর্থ বাধে; সেই অনর্থ ও অমঙ্গলের কথা ভেবে প্রতাপকে দশ আনা আর তোমাকে ছ-আনা দিতে চাই। এ বিষয়ে তোমার কী মত জানাও।'

বসন্তরায় বললেন, 'অতি উত্তম প্রস্তাব। আমার পূর্ণ সম্মতি আছে—'

'কিন্তু তোমার পুত্রগণ হয়তো খুশি হবে না। তাদের সামলাতে পারবে কী?'

বসন্তরায় বললেন, 'তার দরকার দেখি না। তুমি দলিল ও সাক্ষী প্রস্তুত রেখো, আমি সানন্দে স্বাক্ষর দেব। ছ-আনা আমার পক্ষে যথেষ্ট—'

'বেশ। তবে ওঠা যাক।'

বসন্তরায় বললেন, 'চলো—'

৯

ধুমঘাটে পুরী নির্মাণকার্য প্রায় শেষ হয়ে এসেছে···যশোরের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশটি নিবিড় জংগলাকীর্ণ, সেটি পরিষ্কৃত করে গড়ে উঠছে সুরক্ষিত রাজপুরী। যদিচ প্রতাপাদিত্য স্থান নির্বাচন করেছেন এবং পুরী নির্মাণের তদারকি ও দায়িত্ব অর্পণ করেছেন অধীনস্থ কর্মচারীবৃন্দের উপর, তবু নিশ্চেষ্ট থাকতে পারেন নি ছোটরাজা বসন্তরায়, অবশ্য দেখাশোনার ব্যাপারে অনুরোধ করেছিলেন শয্যাশায়ী বিক্রমাদিত্য···প্রতাপের স্বতন্ত্র রাজধানী নির্মাণের মূলদেশে সামান্য পরিমাণে সংযুক্ত থাক্ সমগ্র যশোরের ভাগ্য-বিধাতা কৃতিপুরুষ বসন্তরায়ের আশীর্বাদ, এমনও হতে পারে যে এই মেলা-মেশার ফলস্বরূপ প্রতাপের মনোভাব প্রসন্ন হবে খুড়োমশায়ের উপর, মানসিক আবহাওয়া অনুকূল হয়ে উঠতে পারে তাতে জানকীবল্লভের যত না-হোক প্রতাপের মঙ্গল। এখন শয্যাশায়ী দিন, নিশ্চিন্ত মনে শ্রীহরির নাম স্মরণ করা যায় না, যদিচ তাঁর নিজের নাম শ্রীহরি, নবশক্তি প্রতাপের জন্যে দুর্ভাবনা ; পূর্বাপর ধারা রক্ষা না-করে প্রতাপ স্বকীয় শক্তি ও পরি-কল্পনায় স্থির, কী-যে ওর বাসনা বোঝা কঠিন, মোগলের বিরুদ্ধে যদি সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে চায়, সেই রকম ইচ্ছাই যেন ব্যক্ত করেছিল প্রতাপ দুর্গ-অবরোধের সময় তার শিবিরে, তাহলে ভুল হবে প্রচণ্ড। রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে ভাবছিলেন বিক্রমাদিত্য, প্রতাপের হয়তো ধারণা নেই মোগল কত বড় শক্তি এবং তার সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হতে গেলে স্বপক্ষে কতখানি প্রস্তুতি দরকার। যদি বা আশানুরূপ প্রস্তুতি গঠন করা যায়, ঘরশত্রু বিভীষণের দল নিতান্ত কম নয়, স্বার্থ, স্বার্থের দিকে তাকিয়ে কেউ পক্ষে আসতে পারে কিন্তু বিপক্ষদলে কারো কারো যোগদানের সম্ভাবনাও আছে। জ্ঞাতিশত্রু বিদ্যমান। এত প্রতিকূলতা উত্তীর্ণ হয়ে ক্ষুদ্র এক রাজ্যের অধিপতি হিসাবে বিরাট দেশ হিন্দুস্থানের দণ্ডমুণ্ডের অধীশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করা মানে আত্মধ্বংসের পথ বেছে নেওয়া···যদি সম্ভব হত,

বসন্তরায় তা করত···প্রতাপ নব্য-যুবক, সম্যক জ্ঞান হয় নি এখনও রাজনীতিক্ষেত্রে, কে ওকে পরামর্শ দেবে? তাঁর দিন ঘনিয়ে এসেছে, যতদিন বসন্তরায় আছে, ওর মতিগতির দিকে যদি নজর রাখতে পারে তবু খানিক নিশ্চিন্ত হয়ে চোখ বোজা যায়। বসন্তরায় ওর কোষ্ঠীর ফলাফল ব্যর্থ করে দিয়েছে, অন্তত পিতৃহত্যার মতো গুরুতর অপরাধ সংঘটিত হয় নি, আতংকিত ছিলেন সেজন্যে এতকাল: হয়তো বসন্তরায় ওকে রক্ষা করতে পারে ভাবীকালের বিপদ থেকে। সে-কারণেই মেলামেশা করার সুযোগ দেওয়া। প্রতাপ কতখানি তা গ্রহণ করছে কে জানে!

'ধুমঘাটে তোমার পুরী নির্মাণ কতদূর?'

প্রতাপ সবিনয়ে নিবেদন করলেন, 'আপনার আশীর্বাদে প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে—'

'তোমার খুড়োমশায়ের মতামত নিয়ে কাজকর্ম করছো তো! তিনি অভিজ্ঞ ব্যক্তি। প্রচুর জ্ঞান।'

প্রতাপ বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। প্রয়োজনে তাঁর সুপরামর্শ গ্রহণ করি—'

'শুনে সুখী হলুম। আমি অথর্ব হয়ে পড়েছি। বেশিদিন বাঁচব বলে মনে হয় না।'

প্রতাপ বললে, 'বাবা, আমি অনেক আশায় ধুমঘাটে পুরী নির্মাণ করছি। আপনি যদি সেখানে পদধূলি না দেন—'

'প্রতাপ, আমার শরীর খুব খারাপ। সমারোহের সঙ্গে তোমার রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান দেখে যেতে পেরেছি এই যা সান্ত্বনা। আমার বুকের মধ্যে একটা কষ্ট হয়, বুঝতে পারি মৃত্যু সন্নিকট। তোমার নবনির্মিত পুরীতে উপস্থিত থাকার অবকাশ বোধহয় পাব না। আ, কষ্টটা দেখা দিয়েছে আবার। মনে হয় এটাই শেষ সংকেত। সময় ঘনিয়ে আসছে—'

প্রতাপ বললে, 'রাজবৈদ্যকে সংবাদ দিই।'

'দরকার নেই। বেচারীকে মিছামিছি কষ্ট দিয়ে কী হবে? তার চেয়ে আমি যা বলি শোনো, অহোরাত্র কীর্তনের ব্যবস্থা করো আর অবিরাম হরিনাম।

ঈশ্বরের নামগান শুনতে পেলে আমি শান্তি পাব অনেক। তুমি এইটুকু ব্যবস্থা করে দাও—'

প্রতাপ বললে, 'আপনার আর কী বাসনা আছে বলুন? আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।'

'সবৎসা ধেনু দান করতে চাই।' শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল তাঁর, কোনোমতে বললেন, 'আর কিছু দানধ্যান—'

'বেশ তাই হবে।'

…অহরহ কীর্তনের ব্যবস্থা হল রাজপুরীতে। অবিরাম হরিনাম বর্ষিত হতে লাগল তাঁর কর্ণকুহরে। মৃত্যু যে আসন্ন তা তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলে সবৎসা ধেনু দান করলেন বৈতরণী পার হওয়ার জন্যে… তিন কাহন কড়ি দিলেন সেই সঙ্গে। স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা দান করলেন ব্রাহ্মণদের। তাঁর অন্তিম বাসনা কিছুই অপূর্ণ রাখলেন না প্রতাপাদিত্য। মহারাজের মৃত্যুর পর দানসাগর শ্রাদ্ধের আয়োজন করে পিতৃদায় মুক্ত হলেন তিনি।

…সত্যি মুক্ত। পিতা যথাকর্তব্য করে গেছেন, দশ আনা অংশ দিয়ে গেছেন তাঁকে এবং ছয় আনা খুড়োমশায়কে। কিন্তু যশোরের এ অঞ্চলে থাকা আর চলে না, ধুমঘাটে পুরী ও দুর্গ নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে, বাজার-হাট বসেছে, জনবসতি বাড়ছে; চলে যেতে হবে ওই নতুন রাজধানীতে। সাজাতে হবে সমগ্র যশোর, কোনো একটা বিশেষ স্থানের নাম তো যশোর নয়, চার পাঁচ ক্রোশব্যাপী সমস্ত ভূখণ্ডেরই সাধারণ নাম যশোর; উদ্বুদ্ধ করতে হবে নতুন শক্তিতে। খুড়োমশায় প্রথমত বসন্তপুর থেকে জংগল পরিষ্কার করতে করতে অল্পদূরে মুকুন্দপুর নামে যে গ্রাম, সেখানে রাজধানী স্থাপন করেন এবং সেটাই এতকাল যশোহরের রাজধানী রূপে গণ্য হত। এখন মুকুন্দপুর থেকে চার-পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণে, যেখানে যমুনা ও ইছামতীর মিলিত প্রবাহ বিভক্ত হয়ে দুদিকে চলে গিয়েছে সেই 'যমুনেচ্ছাপ্রসঙ্গমে'র দক্ষিণপারে নির্মিত হয়েছে ধুমঘাট দুর্গ। যদিচ জংগল সম্পূর্ণ পরিষ্কৃত

হয় নি, জনবসতি জমজমাট হয়ে ওঠে নি, তবু ওখানেই চলে যেতে হবে। স্থানটি সর্বদিক থেকে নিরাপদ। উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে উপযুক্ত। মন বলছে, ওখানে গেলে অলৌকিক কিছু-একটা ঘটতে পারে। কে যেন টানছে, কি-যেন নির্দেশ আসছে স্বপ্নে। যেতে হবে ধুমঘাটে।
একমাস কেটেছে অশৌচে। পিতৃদায় চুকেছে আড়ম্বরপূর্ণ দানসাগর শ্রাদ্ধের আয়োজনে। এবার শুভদিনে যেতে হবে নতুন রাজধানীতে।

ধুমঘাট !—
পিছনের আকর্ষণ ত্যাগ করে এক শুভদিনে ধুমঘাটে এসে উঠলেন প্রতাপাদিত্য। পুরনো রাজধানী খালি হয়ে গেল ক্রমে। বাজার-হাট আগে থেকেই বসেছিল, ব্যবসায়ীরা উঠে এল দলে-দলে, যে-পদ্ধতিতে বসন্তরায় যশোর-সমাজ সৃষ্টি করেছিলেন সেই পথ অবলম্বন করার ফলে জ্ঞাতি-কুটুম্ব ও ব্রাহ্মণবর্গ সমবেত হলেন সপরিবারে। দেখতে দেখতে জনমানবে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল ধুমঘাট। বসতি উপলক্ষে যাতে কারো কোনো অসুবিধা না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখেছিলেন তিনি। সর্বপ্রকার সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি থাকায় জংগলাকীর্ণ পতিত জায়গাটি ভরে উঠল অল্পদিনে।···
বসন্তরায় একা পড়ে রইলেন পুরনো রাজধানীতে। ঠিক একা অবশ্য নয়, পত্নী পুত্র ও পরিজন পরিবেষ্টিত হয়ে স্বীয় রাজ্যাংশ পরিচালনা করতে লাগলেন, যদিচ বুঝতে পেরেছিলেন এরূপ সন্নিকটে থাকলে জ্ঞাতি-বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাবে উত্তরোত্তর, পুত্রগণের মধ্যে প্রতাপ-বিরুদ্ধ মনোভাব সুস্পষ্ট এবং প্রতাপও বিশেষ সন্তুষ্ট নয় গোবিন্দরায় প্রভৃতি খুল্লতাত ভ্রাতৃবর্গের উপর। এ আশংকা ছিলই, অধিকন্তু কোন্ স্থানে রাজধানী স্থানান্তরিত করলে শাসনের সুব্যবস্থা হয় এই চিন্তায় তিনি প্রায়ই নিজরাজ্যের চতুঃসীমা পরিভ্রমণে বহির্গত হতেন। মনোমতো স্থান নির্বাচনে বিলম্ব হওয়ায় তিনি পুরাতন যশোরেই বাস করছিলেন।

'মদনদা, এ যে আমাদের পুরনো যশোরের চেয়েও জমকালো পুরী। মহারাজা প্রতাপাদিত্য পুরীর চারিদিকে এমন সুন্দরভাবে ঘিরে রেখেছেন যে এটা প্রায় দুর্ভেদ্য দুর্গ বলা যায়।···ঢালী-সর্দার মদনের সঙ্গে সুন্দর বেরিয়েছিল ধুমঘাটের চতুষ্পার্শ্ব পরিদর্শনে, যত দেখছে ততই সে অবাক : 'একদিকের জঙ্গল এখনও পরিষ্কার হয় নি বটে, হবে হয়তো আস্তে আস্তে, কিন্তু যমুনা-ইছামতীর দু-আড়াই ক্রোশ দক্ষিণে এই-যে মাটির প্রকাণ্ড বুরুজখানা এবং বুরুজের ওপরে কামান সাজানো, দেখে আমার মনে হচ্ছে, জলপথে এদিক দিয়ে কোনো শত্রুকে আর প্রবেশ করতে হবে না— তোপের মুখে উড়ে যাবে একেবারে--'

মদন এসেছিল সূর্যকান্তের সন্ধানে। ধুমঘাটে আসার পর থেকে সূর্যকান্তের নাওয়া-খাওয়া জ্ঞান নেই, যুবক-সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে টো-টো করে, ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠা করছে যত্রতত্র, অস্ত্র-চালনা শিক্ষা দিচ্ছে বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে। ধনুর্বাণ, খড়্গ ও বন্দুক ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত করে তুলেছে ইতিমধ্যে অনেককেই।···বন্দুক সংগ্রহ করা যাচ্ছিল না বেশি, অর্থলাভের আশায় কিছু কিছু বিদেশী বণিকগণের যাওয়া-আসা শুরু হয়েছে এদিকে, সূর্যকান্ত তাদের নিকট থেকে উচ্চমূল্যে বন্দুক ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করে ব্যাপকভাবে শিক্ষাদান-কার্যে মেতে উঠেছেন। বাড়িতে থাকে না কোনো সময়, তাঁর বসবাসের জন্যে যমুনা-তীরে সুবৃহৎ একটি অট্টালিকা নির্মাণ করে দিয়েছেন মহারাজা প্রতাপাদিত্য, পাশে শংকরের অট্টালিকা ; আহ্বান মাত্রেই যাতে তাঁরা উপস্থিত হতে পারেন তার ব্যবস্থা নিখুঁত। এখন মহারাজা স্মরণ করেছেন তাঁকে, শংকর ঠাকুর উপস্থিত হয়েছেন কখন, অথচ সেনাপতি সূর্যকান্তের দেখা নেই।···বুরুজখানার পাশে নদী-তীরে প্রায়ই তিনি আসেন বিদেশী বণিকদের নিকট থেকে অস্ত্রশস্ত্র ক্রয়ের আশায় জানা ছিল ; কিন্তু নদীতীর শূন্য, সামনাসামনি সূর্য ছিল বলে চোখের উপর হাত আড়াল করে নদীর উভয় তীরে দৃষ্টি সঞ্চালিত করে দিল মদন। কেউ নেই। দৃষ্টিপথে শুধু ভেসে উঠল প্রধান বুরুজের দুইপার্শ্বে

উভয় নদীর কূলে কূলে পূর্বে ও পশ্চিমে বহুদূর পর্যন্ত, মাটির প্রাচীরের উপর সারি সারি বুরুজ—প্রত্যেকটির উপরে কামান স্থাপিত।

'মদনদা, দেখতে পেলে নাকি?'

'না। এই এক লোক—' মদন যেন ঈষৎ বিরক্ত: 'কবে যুদ্ধ হবে ঠিক নেই, তিনি পাড়ায় পাড়ায় ছেলে তৈরি করে বেড়াচ্ছেন!…চল্ জাহাজঘাটা ঘুরে যাই—'

'আচ্ছা মদনদা, তোমার কী মনে হয় যুদ্ধ শিগগির বাধবে?'

মদন বললে, 'কে জানে বাপু। আমি ও-সব বুঝি না। আমাকে ঢালী-সর্দার করে দিয়েছেন, হুকুম পেলেই ঢাল আর বল্লম নিয়ে নেমে পড়ব। তারপর দেখে নেব কে হারে আর কে জেতে—'

মদনদার যা চেহারা, গর্ব ওর শোভা পায়। ঢালী-সর্দার বটে একখানা! গায়ে তেমনি জোর। অবশ্য তীরন্দাজসৈন্য পারিচালনার ভার দেওয়া হয়েছে তাকে, সূর্যদার মতো সে-ও মহড়া দিয়ে যাচ্ছে অধীনস্থ সৈন্যদের। সৈন্য-বিভাগে যোগ দেবার জন্যে লোক আসছে দলে দলে। কেউ পদাতিক, কেউ ঢালী, কেউ তীরন্দাজ, কেউ তলোয়ারবাজ—বিভিন্ন দল পুষ্ট হয়ে উঠছে ক্রমে, কেউ বন্দুকধারী, কেউ বা গোলন্দাজ…স্থলভাগে যেমন জল-ভাগেও তেমনি সৈন্যসংখ্যা বাড়ছে দিনে দিনে। অল্পদূরে জাহাজঘাটা। পর্তুগীজ কর্মাধ্যক্ষ ফ্রেডারিক ডুডলি' অধীনে বহু হিন্দু ও মুসলমান রণতরী ও বিভিন্ন নৌযান নির্মাণে ব্যস্ত, সর্বদা খটাখট শব্দে ওদিক মুখর, কান পাতা যায় না।

ওরা যত কাছে আসছিল তত দেখতে পাচ্ছিল নদীগর্ভ ভরে উঠেছে নানা শ্রেণীর নৌযানে। জাহাজঘাটার চত্বর জুড়ে শুকনো বড় বড় সুন্দরী ও গরাণ গাছ, করাতের শব্দ হচ্ছে, ফালা ফালা কাঠ স্তূপাকারে জমানো চারিদিকে। পেরেক পাটদড়ি লোহার আঙটা ছড়াছড়ি, আলকাতরা ফুটছে বড় বড় পাত্রে। কর্মব্যস্ততায় গমগম করছে জাহাজঘাটা।

'আব্বাস-ভাই, আদাব—'

জাহাজঘাটার তত্ত্বধায়ক খাজা আব্বাস যাচ্ছিল পাশ দিয়ে। সে বললে, 'আদাব মদন-ভাই। তুমি এতদূর ? কী খবর ?'

মদন বললে, 'বুরুজখানার দিকে এসেছিলাম সেনাপতি সূর্যকান্তের খোঁজে, তাঁর অস্ত্রশস্ত্র কেনার বাতিক আছে তো, ওখানে দেখা না-পেয়ে ভাবলাম এদিকে এসেছেন কিনা একটু দেখে যাই। তা দেখেছো নাকি তাঁকে ?'

'ঘণ্টা দুই আগে একবার যেন দেখেছিলাম। ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছিলেন, কর্তা ডুডলির সঙ্গে কি-সব কথাবার্তা বলে তখনই চলে গেলেন। আর দেখি নি তারপর—'

'আচ্ছা চলি ভাই।'

ওরা বেরিয়ে আসছিল জাহাজঘাটার ভেতর থেকে। সুন্দর বললে, 'আব্বাস-ভাই, নানা ধরনের নৌযান দেখছি। কিছু জলে ভাসছে কিছু তৈরি হচ্ছে। কার কাজ কি-রকম জানতে ইচ্ছা হয়—'

সে জাহাজঘাটার উপর থেকে জলে-ভাসা নৌকোগুলি দেখছিল।

'ওই-যে ছোট, লম্বা, একপাশে ছইওয়ালা নৌকো ওগুলোকে বলে 'বলিয়া' বা 'ভাউলিয়া', খাজা আব্বাস অঙ্গুলি নির্দেশে নৌকাগুলি দেখিয়ে দিচ্ছিল আর তাদের গুণাগুণ বোঝাচ্ছিল ঃ 'দ্রুতগামী নৌকো। 'পাল' বা 'পল-ওয়ার' নৌকার মাস্তুল একটা কিন্তু বোঝা চাপানো যায় প্রচুর। ওইগুলো—'

'এ-সব কারিগরেরা এসেছে কোথা থেকে ?'

আব্বাস বললে, 'সপ্তগ্রাম থেকে এসেছে বেশি, পূর্ববঙ্গ থেকেও এসেছে অনেকে। এই দুই স্থানের সঙ্গে মহারাজের সম্পর্ক নিকট বলে, পূর্ববঙ্গে মহারাজের পৈত্রিক নিবাস আর সপ্তগ্রামের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক, ওই স্থানের কারিগর প্রায় সমান সমান। আমরা 'বেপারি' ও 'কোশা' নির্মাণ করেছি কতক, আরও করব ভবিষ্যতে, 'মাচোয়া আর 'পশ্‌তা' নির্মাণ চলছে এখন। মাচোয়া নৌকার তক্তাগুলি নির্মাণের বিশেষ একটা পদ্ধতি আছে, এই জাতীয় নৌকা তরঙ্গের বেগ বেশি সহ্য করে বলে এদের তক্তো-

গুলি প্রস্তুত হয় কাতা বা শণ দিয়ে। পশতা খুব মজবুত জাহাজ। সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী নৌযান হচ্ছে 'ঘুরাব'। উর্দু ভাষায় ঘুরাব শব্দের অর্থ, কাকপক্ষী। এতে সাধারণত তুটো এবং বড়গুলোতে তিনটি মাস্তুল থাকে। দৈর্ঘ্যের অনুপাতে বেশ প্রশস্ত—জলযুদ্ধে এদের প্রয়োজন লাগে, সামনে তুটি বড় কামান এবং পার্শ্বে সারিবদ্ধ ছোট ছোট কামান সাজানো থাকে, ওই যেমন রয়েছে···মহারাজেব নির্দেশে আমাদের তৈরি ঘুরাবের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে—'

'এত নৌযান প্রস্তুতের কারণ কী বলতে পারো ভাই আব্বাস ?'

খাজা আব্বাস কী উত্তর দিতে যাচ্ছিল, তৎপূর্বে মদন যেন খিঁচিয়ে উঠল : 'কেষ্ট ঠাকুরের মতো তুমি নৌকো-বিলাসে বেরুবে বলে·· যত্ত সব ! আরে বাপু অত খোঁজে দরকার কী ? এদিকে জাহাজঘাটায় তৈরি হচ্ছে রণতরী আর ওদিকে দমদমায় তৈরি হচ্ছে গোলা-বারুদ—কান পাতা যাচ্ছে না কোনোখানে। রাজ্যরক্ষা করতে হলে এ-সব না-হলে চলে না···সেই থেকে ঘ্যানর ঘ্যানর। উত্তর শুনলে তো, এবার লক্ষ্মী ছেলের মতো মুখ বুজে ফিরে চলো—'

ধমক খেয়ে চুপচাপ ফিরে আসার কথা, কিন্তু সুন্দরেব পক্ষে চুপ করে থাকা কঠিন। কারণ প্রধান বুরুজ থেকে শতাধিক হস্ত দক্ষিণে তুর্গের যে বেষ্টন-পরিখা, সুন্দর জানত পরিখাটি তুর্গের চারধার ঘিরে আছে, এক-একটি নদীর মতো প্রশস্ত এবং জল-পরিপূর্ণ···পরিখার বাইরেও পরিখা, উত্তর ও পূর্বদিকে যমুনা ও ইছামতী নদীদ্বারা এবং অন্য তুইদিকে তুইটি খনিত খাল দ্বারা তুর্গটি পরিবেষ্টিত ; পশ্চিমের খালটির নাম কামারখালি, তার কূলে কূলে গোলাগুলি ও অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণকারী কামারদের বসতি বলে লোকে এ-নাম দিয়েছে, সুন্দরের জানা ছিল ; কিন্তু ওরা দক্ষিণের খালের তীর ধরে ফিরছিল বলে সে জিজ্ঞেস না-করে পারল না : 'মদনদা, এ খালটা তো নতুন কাটা হয়েছে, এটি গিয়ে মিশেছে ইছামতীতে, তাই না ?'

মদন বললে, 'হ্যাঁ—'

'এ খালের নাম কী ?'

মদন উত্তর দিলে, 'আমরা বলি হাবরের খাল, কেউ কেউ বলে হানর-খালি—'

'এ-খালে জাহাজ আসা-যাওয়া করে নাকি ?'

মদন বললে, 'এর চেয়ে চওড়া খাল হচ্ছে কামারখালি। সাধারণতঃ পাথর ও লোহা বোঝাই জাহাজ আসে ওই খাল দিয়ে—কখনও কখনও এ-খালেও জাহাজ চলাচল করে—'

বাইরের বেষ্টন-পরিখা পার হয়ে ওরা ভেতরে ঢুকছিল, সুন্দরের চোখে পড়ে গেছে একটি মৃন্ময় দুর্গ, অতএব জিজ্ঞাসা : 'আচ্ছা মদনদা, অধিকাংশ দুর্গ দেখছি মাটি দিয়ে তৈরি, এর কারণ জানতে ইচ্ছা হয়।'

মদন বললে, 'আমি সূর্যদাকে জিজ্ঞেস করছিলুম, তিনি বলেন, নিম্নবঙ্গে পাথরের দুর্গ অসম্ভব ; ইটের দুর্গ হয়তো তৈরি করা যেত কিন্তু তাতে সময় লাগে অনেক আর কামানের মুখে তা নিরাপদ নয়। তাঁর বিবেচনায় উন্নত প্রণালীতে নির্মিত হলে মাটির দুর্গই সর্বাপেক্ষা দুর্ভেদ্য। মহারাজাও তাঁর সঙ্গে একমত—'

'এই দুর্গের প্রাচীরের পাশ দিয়ে ওই-যে অপ্রশস্ত খালটি উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে বেরিয়ে কামারখালিতে গিয়ে মিশেছে, এটা তৈরির কী প্রয়োজন আমি ঠিক বুঝছি না।'

মদন বললে, 'তোমাকে কেউ মাথার দিব্যি দেয় নি যে সব-কিছু বুঝতে হবে ! একেবারে গাঁইয়া ! সামান্যতম বুদ্ধি ঘটে থাকলে বুঝতে পারতে যে ওটা তৈরি করার উদ্দেশ্য, যদি কখনও প্রয়োজন হয় তাহলে ওই পথ ধরে বেরিয়ে কামারখালিতে পড়া যাবে এবং কামারখালি থেকে যমুনায়, ওটা পলায়নের গুপ্তপথ, বুঝলে হাঁদারাম—'

'আমাদের সৈন্যাবাসটি তৈরি হয়েছে মৃত্তিকা-দুর্গের ঠিক পাশে সমতল ভূমির ওপর। আমরা তো সৈন্যাবাসের কাছে এসে পড়েছি, তুমি কোন্-দিকে যাবে মদনদা ?'

মদন বললে, 'খুঁজতে বেরিয়েছিলুম সূর্যদাকে, সাক্ষাৎ-যে পেলুম না এই কথাটি মহারাজকে বলে আসা দরকার। তুই বরং চলে যা সৈন্যাবাসে, আমি খবরটা দিয়ে আসি—'

'আমি যাব তোমার সঙ্গে ?'

মদন বললে, 'আসতে পারিস—'

···দুর্গ পর্যন্ত যেতে হল না ওদের, দেখতে পেল, দুর্গের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছেন সূর্যকান্ত ও শংকর। মদন তাকাল সুন্দরের দিকে, সুন্দর তাকাল মদনের দিকে। যাঁর সন্ধানে ওরা বেরিয়েছিল, তিনি কখন দুর্গে এসে হাজির হয়েছেন···বোকা-বোকা দেখাচ্ছিল ওদের। মদন বললে, সূর্যদা, মহারাজ আপনাকে খুঁজছিলেন—'

'দেখা হয়েছে।'

তিনি চলে গেলেন শংকরদার সঙ্গে কথা বলতে বলতে। মদন ও সুন্দর ফিরে চলল সৈন্যাবাসের দিকে।

'কমল খোজা, রাত্রকালে সতর্ক থেকো। নতুন জায়গা, বনজঙ্গল পরিষ্কার হয় নি ভালমতো, কখন্ কিসের উৎপাত ঘটে বলা যায় না—'

যদিচ সুরক্ষিত প্রাসাদ, জন্তু-জানোয়ার কর্তৃক আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা নেই এতটুকু, হলেও মহলের বাইরে মোতায়েন যথেষ্ট সংখ্যক রক্ষী, তবু প্রাসাদ-রক্ষকদের সর্দার কমল খোজাকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন মহারাজা প্রতাপাদিত্য। লোকটি পাঠান, বিশ্বস্ত ও সাহসী। ধাপে ধাপে পদোন্নতি ঘটেছে তার, বিশ্বাস অর্জন করেছে আপন কর্মগুণে। আগ্রা থেকে যে সৈন্যদল আসে প্রথমে তার অধিনায়ক ছিল কমল খোজা, পরে মহারাজার চরিত্রগুণে মুগ্ধ হয়ে থেকে যায় যশোরে—প্রতাপাদিত্য তাকে শরীররক্ষীদলের অধিনায়ক-পদে বহাল করেন। তার বুদ্ধি ও কর্মক্ষমতার পরিচয় পেয়ে পুরনো যশোহর থেকে ধুমঘাটে রাজধানী স্থানান্তরিত করার

সময় দুর্গ-নির্মাণের প্রধান তত্ত্বধায়ক নিযুক্ত করে দেন তাকে। দুর্গ ও সৈন্যাবাস নির্মাণকার্য শেষ হলে প্রাসাদরক্ষীদের সর্দার-পদে উন্নীত করেছিলেন। কমল খোজা নিষ্ঠা সহকারে সে-কাজ করে যাচ্ছিল। এখন প্রতাপাদিত্যের সে প্রিয়পাত্র।

কী বিচিত্র তার কর্মজীবন!—ধুমঘাটের আকাশে, ইচ্ছামতী-যমুনার চার কূল জুড়ে অন্ধকার নেমে এসেছে গাঢ় হয়ে, বহুক্ষণ সাড়াশব্দ নেই আশে-পাশে, রাত্রি যেন পাথরের মতো নিরেট: সদ্যপ্রস্তুত সৈন্যাবাসের কোনো কোনো কক্ষে ঈষৎ আলোকাভাস দেখা যায় শুধু, দূর থেকে টহলরত প্রহরীদের কি-রকম অশরীরী লাগে সেই আলোকে, মনে হয় ধুমঘাটের অতৃপ্ত আত্মাই বুঝি শরীরি হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে নিঃসাড়ে···প্রায় মুখোমুখি, পূর্বদিকে, সদর তোরণ: তারই একপাশে দুর্গাধ্যক্ষের আবাস···এই নিকষ-কালো নিঃশব্দ রাত্রে কমল খোজা দ্বার-সন্নিকটে বসে কখনও সৈন্যাবাসের দিকে তাকাচ্ছিল, কখনও বা তারকাকীর্ণ আকাশের পানে চেয়ে নিজের বিচিত্র কর্মজীবনের কথা চিন্তা করছিল। এখন কোনো কাজ নেই, বসে থাকা ছাড়া। বসে থেকে পাহারা দিতে হবে দুর্গতোরণ, কাকপক্ষী যেন না ঢোকে কিংবা কোনো জন্তু-জানোয়ার। মহারাজ প্রতাপাদিত্য স্মরণ করিয়ে না-দিলেও অধিক রাত্রি, এমন-কি সারারাত্রি জেগে পাহারা দেওয়া তার অভ্যাস। আগ্রায় যখন ছিল তখন থেকে এ-অভ্যাস তার আয়ত্ত। সেখানেও তার সুনাম ছিল নিষ্ঠাবান রক্ষী-সর্দার হিসাবে, ক্লান্তি নেই তার রাত্রি জাগরণে, মাঝে মাঝে টহল দিয়ে বেড়াত কর্তব্যরত রক্ষী-এলাকায়—দেখে আসত অধীনস্থ রক্ষীবৃন্দ সজাগ আছে নাকি ঘুমিয়ে পড়েছে, কেউ যদি ঘুমিয়ে পড়ত তাহলে চাবুক পড়ত তার পিঠে···কর্তব্যকর্মে অবহেলা সে একেবারে সহ্য করতে পারে না। অধিকন্তু সাহস ও শক্তি থাকায় কঠিন কাজেও সে পেছপা হত না। তার বীরত্বের পরিচয় বহুবার পেয়েছেন বাদশাহ আকবর, সাধারণ সৈনিক হিসাবে যুদ্ধে গিয়ে বহু কীর্তি স্থাপন করে আসা সত্ত্বেও বাদশাহ তাকে সম্মানজনক উন্নত পদে নিযুক্ত করেন নি

…অভিমান ছিল মনে আর রক্তে ছিল প্রচণ্ড স্বাজাত্যাভিমান, সে পাঠান আর পাঠান বলেই কি মোগল বাদশাহ তার উপর নির্ভর করতে পারেন নি? কেবলই অনুগ্রহ লাভ করতে হবে তাঁর? স্বক্ষেত্রে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়াতে পারবে না কোনোদিন?
দুঃখ ও ক্ষোভ ছিল জমাট বেঁধে,…সুযোগ ও সুবিধা পেলে সে-ও প্রমাণ করতে পারত পাঠানেরা এখনও বীর, যত দিন গেছে কমল খোজা তত দেখেছে তার বীর-হৃদয় মোগল-বাদশাহের অনুকম্পা ব্যতীত অন্য সম্মান লাভে বঞ্চিত হচ্ছে ক্রমাগত; এমন-কি, মনে হয়েছে মোগলের দাসানুদাস হয়েই বুঝি কাটাতে হবে সারাজীবন। অস্থির হয়ে পড়েছিল সে মুক্তির জন্যে, অন্য কোনো প্রভুর অধীনে নতুন করে জীবন শুরু করার বাসনা প্রবল হয়ে উঠেছিল। বাঙলা ভাষা সে ভাল বোঝে না, আগ্রা থেকে যশোরে আসতে দীর্ঘদিন সময় লেগেছিল, কার সঙ্গে যশোরে যাচ্ছে এবং সে লোকটি কেমন, বোঝবার চেষ্টা করেছিল সেই অবকাশে…শংকর ও সূর্যকান্তের সঙ্গে আলাপ করেছিল যেচে। পছন্দ হয়েছিল ওঁদের দুজনকে, তেজোদীপ্ত, বুদ্ধিমান ও মোগল-বিদ্বেষী…যদিচ শেষোক্ত মনোভাব বুঝতে সময় লেগেছিল বেশ; কিন্তু এই আবেগ ও প্রাণস্ফূর্তি নাড়া দিয়েছিল তার চিত্তমূলে এবং যুবক প্রতাপাদিত্যের চেহারা, ব্যক্তিত্ব ও শালীনতা মুগ্ধ করেছিল তাকে। ক্রমে বুঝতে পারে এই তিনজনের মনে মোগলের অধীনতা পাশ ছিন্ন করার বাসনা শুধু প্রবল নয়, প্রবলতর। তখনই, সেই মুহূর্তে, সে আত্ম-আবিষ্কার করেছে যে এই একটি দিকে সে-ও ওঁদের সঙ্গে এক এবং ওঁদের সাহচর্যে নতুন করে যাত্রা শুরু করা যায়। আগ্রা এখান থেকে বহুদূর, সে যদি ফিরে না-যায় কারো কিছু যায়-আসে না…অন্য সৈন্যদের ফিরে যাবার নির্দেশ দিয়ে সে নিজেই কর্মের প্রার্থনা জানিয়েছিল প্রতাপাদিত্যের কাছে। প্রতাপাদিত্য তাকে শরীররক্ষীদের অধিনায়ক করে দেন। ধাপে ধাপে উন্নতি করে এখন সে প্রাসাদরক্ষীদলের সর্দার। মহারাজা তার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহশীল।

রাত বাড়ছে। সৈন্যাবাস নিঝুম হয়ে এসেছে। দু-একটি আলোক-রেখা যদিবা দেখা যাচ্ছিল, এখন অন্ধকারে ডুবে গেছে সব। সুন্দর ছেলেটা বড় চঞ্চল, কৌতূহল বেশি—সন্ধ্যা-রাত্রে এসে গল্প করে গেছে কিছুক্ষণ, মদন ঢালী এসে ভাঙের সরবত খেয়ে গেছে এক লোটা, মোটা মানুষ, রাত্রে ঘুমাতে পারবে না নইলে এই গরমে। বাস্তবিক গরম পড়েছে বটে! সাজ-পোশাক খুলে ফেলতে পারলে যেন স্বস্তি পাওয়া যায়, আগ্রা মুলুকেও গরম পড়ে কিন্তু এ-রকম ঘাম-বার-করা অবসাদ দুর্বল-হওয়া গরম বুঝি সে নয়, কোথাও হাওয়া নেই এক ফোঁটা, গাছের পাতাটি পর্যন্ত অনড়। ঢুলুনি আসে আপনা থেকে।...হাত-পা টান করল কমল খোজা, হাই উঠছিল, তুড়ি দিল মুখগহ্বরে। কোটরে ভ্যাপসা গরমে থাকা যাচ্ছে না, কোটর থেকে বেরিয়ে এল, পায়চারি করতে লাগল তোরণের সামনে। খুব অস্পষ্ট, প্রায় অশ্রুত, একটা সুর শোনা যাচ্ছে বাতাসে। মহারাজের নিদ্রা আসে নি, তিনি এখনও বার-মহলে প্রমোদকক্ষে, আসরে বসে গুণী সংগীতজ্ঞের গান শুনছেন পাত্র-মিত্রদের নিয়ে। মনে পড়ল সূর্যকান্ত প্রবেশ করেছেন সন্ধ্যার কিছু আগে, শংকর তারপরে, ওঁরা দুজনে সর্বদা মহারাজের দুই পার্শ্বে আছেন যেন দুই বাহু। চমৎকার মানুষ দুজনেই।

আগ্রা, কমল খোজা আগে যেখানে ছিল, সংগীতের মহাক্ষেত্র বলা যায়। বাদশাহ আকবরের দরবারটি নানা গুণীজনের মিলনক্ষেত্র! সংগীতেও বিশেষ অনুরাগ তাঁর। সাধক মিয়া তানসেন তাঁর দরবার অলংকৃত করেছেন, তাঁর সংগীত শুনেছে কমল খোজা...সে-রকম সুমিষ্ট না হলেও এখন যে সংগীতগুণীর কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে সেটিও চিত্তদ্রাবী। একটু ভেতরের দিকে চলে গিয়ে গান শুনল কমল খোজা, ঘাড় নেড়ে বাহবা দিল, আজ সারারাত চলবে হয়তো এ-গান; বড় মৌজে গান পরিবেশন করছে ওস্তাদ, ঘাড় নাড়তে নাড়তে ফিরে আসছিল সে, পায়ের ওপর দিয়ে কি-যেন দৌড়ে গেল। তৎক্ষণাৎ বর্শা ছুঁড়ে মারল কমল খোজা, অন্ধকার, এত অন্ধকার যে মৃত্তিকা-বিদ্ধ বর্শাটি খুঁজে বার করতে হল হাতড়ে হাতড়ে। না,

লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে, স্বাভাবিক। সমস্ত জংগল পরিষ্কৃত হয় নি, দক্ষিণ দিকে তো ভীষণ অরণ্য, ব্যাঙ-জাতীয় কিছু হবে, লাফাতে লাফাতে চলে যাচ্ছে··· খড় খড় শব্দ হচ্ছে।

পূর্বস্থানে ফিরে এসে চতুর্দিকে তাকাচ্ছিল কমল খোজা। কিছুই দেখা যায় না, চরাচর-পরিব্যাপ্ত নিরেট অন্ধকার। সৈন্যাবাস নিঝুম হয়ে গেছে, আরও দূরে জাহাজঘাটা নিস্তব্ধ, কর্মচঞ্চল কামারপাড়া নিঃশব্দতায় যেন মৃত; একটু যেন বাতাস পাওয়া যাচ্ছে, যমুনা-ইছামতীর উন্মুক্ত বুকে তরঙ্গের ঈষৎ দোলা জাগিয়ে স্নিগ্ধ বাতাস যেন ভুল করে পরশ বুলিয়ে গেল— আবার অচঞ্চল প্রকৃতি। থেমে দাঁড়ালেই যেন গুমোট লাগছে বেশি। কমল খোজা হাঁটতে লাগল। সৈন্যাবাসেব দিকে গেল একবাব, তোরণ অবধি এল, এগিয়ে চলল দক্ষিণে জংগলের দিকে।···রাত্রির রূপ নাকি ভয়াবহ, তদুপরি সামনে যদি থাকে ঠাসবুনন জংগল, সৌন্দর্য অপেক্ষা ভীতিকর বোধের সঞ্চার হয় মনে, কিন্তু কমল খোজা না-সৌন্দয না-ভীতি, রাত্রিকে যেন আপন করে নিতে পারার প্রিয়তায় আচ্ছন্নের মতো ক্রমশ জংগলের গভীরে প্রবেশ করছিল। কীট-পতঙ্গের বিচিত্র ডাক, থম-ধরা নিবিড় অন্ধকার, বৃক্ষশাখায় মাঝে মাঝে ভূতুড়ে আন্দোলন···নিশি-ডাকের মতো কে-যেন ওকে আরও গভীরে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। অবশ্য ভয় তার ছিল না আদৌ, দারুণ সাহসী, কটিতে ক্ষুরধার তরবারি, হাতে তীক্ষ্মমুখ বর্শা; দিনের বেলা এ-জংগলে কেউ ঢোকে না ভয়ে, রাত্রিবেলা সে চলেছে একা।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল কমল খোজা। বর্শা উদ্যত কবেছিল, কটিদেশে হাত চলে গিয়েছিল আপনাআপনি। শিউরে উঠল গা-হাত। কাঁপতে লাগল সর্বাঙ্গ। চোখ রগড়ে নিল আবার!···অলৌকিক কাণ্ড! আজব দেশ বটে বাঙলা! জংগলে বাঘ থাকে হাতি থাকে ভাল্লুক থাকে, এতকাল তাই দেখে এসেছে কমল খোজা, ধুমঘাট পত্তনের সময় জংগল পরিষ্কার করতে করতে কত হিংস্র জন্তু মারা পড়েছে তার হাতের অস্ত্রের ঘায়ে, কিন্তু এমন

আশ্চর্য ব্যাপার সে আগে আর কখনও দেখে নি। চোখ যেন ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। আলো যেন ঠিকরে পড়ছে অদূরে একটা গাছের গোড়া থেকে। এত আলো কেন গাছের গোড়ায়? তাকাতে পারা যাচ্ছে না দীপ্তির ছটায়। হীরকখণ্ড যেন, না, সূর্যের প্রদীপ্ত একটা ভাঙা অংশ বুঝি! স্পষ্টত কারো কারসাজি নয়, মানুষের সাধ্য নেই যে এমন আলো জ্বালায়, মনে হয় আল্লার একটি গূঢ় ইচ্ছাই বুঝি দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলছে ওখানে—অলৌকিক বিভার মতো লাগছে! জীবনে কখনও এমন বিমূঢ় হয় নি কমল খোজা। সে হতভম্ব।

গাছের ডালে মাথার ওপর নিশাচর পাখির পাখা ঝাপটানি। কীট-পতঙ্গের কর্কশ ডাক! শৃগাল ডেকে উঠল হুক্কাহুয়া রবে।

সম্বিত ফিরে পেয়ে সে সোজা দৌড় দিল প্রাসাদের দিকে।

…গানের আসর তখন জমজমাট। মহারাজ প্রতাপাদিত্য সুরাবিষ্ট। মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা সরবতের পাত্র তুলে নিচ্ছেন আর বাহবা দিচ্ছেন।

দরজার বাইরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল কমল খোজা। হাঁপাচ্ছিল। উত্তেজনায় মুখ লাল।

'মহারাজ—'

ডাক দিল সাহস করে। সুর কেটে গেল। ওস্তাদজি পর্যন্ত চকিত, থামিয়ে দিলেন গান। মহারাজা বিরক্ত চোখে তাকালেন, যদিচ জানেন জরুরি প্রয়োজন ব্যতীত কমল খোজা রসভঙ্গে সাহসী হত না। নিশ্চয় কিছু ঘটেছে নইলে এভাবে ছুটে আসবে কেন সে? ওর ভঙ্গির মধ্যে বিস্ময়কর বিভ্রান্তি। যেন দিশাহারা।

'কী সংবাদ কমল খোজা?'

'অদ্ভুত ব্যাপার?' ঢোঁক গিলল সে, দম নিল আবার: 'আপনি শিগগির একবার আসুন মহারাজ—'

'কেন বলো তো?' মহারাজ উত্তরোত্তর বিস্মিত: 'কোথায় যাব?'

'আজ্ঞে ওই দক্ষিণের জংগলে—'

'জংগলে ? এত রাত্রে ? বাঘ বেরিয়েছে নাকি ?'

কমল খোজা বললে, 'আজ্ঞে বাঘ বেরুলে তো আমি একাই মোকাবিলা করতে পারতুম। তার চেয়ে গুরুতর। মাথা-মুণ্ডু আমি কিছু বুঝতে পারছি না—'

'জিনিসটা কী ?'

কমল খোজা বললে, 'আলো মহারাজ, আলো। বনের একটা অংশ আশ্চর্য আলোয় ভরে গেছে। আমি এমন আলো জীবনে কখনও দেখি নি—'

'আলো ! ওই জংগলে ?'

কমল খোজা বললে, 'হ্যাঁ মহারাজ। একটা গাছের গোড়ায়। দেখুন, আমার গা এখনও কাঁপছে—'

'তুমি নেশা করো নি তো কমল খোজা ?'

সে বললে, 'আজ্ঞে না মহারাজ। আমি স্পষ্ট দেখেছি। আপনি দয়া করে একবার চলুন। নিজে দেখলে আর অবিশ্বাস করবেন না। মিথ্যা হলে আমার গর্দান জামিন—'

'আচ্ছা চলো।'

উঠে দাঁড়ালেন তিনি। যাবার জন্যে পা বাড়ালেন। পারিষদবৃন্দ বললে, 'আপনি একা যাবেন না মহারাজ, আমরাও সঙ্গে যাই। ওর অন্য অভি-সন্ধি আছে কিনা কে জানে। তাছাড়া বন্য জন্তু-জানোয়ার বিপদ আপদ ঘটতে পারে—'

প্রতাপাদিত্য বললেন, 'আমি একাই সামলাতে পারব। আপনাদের যাবার দরকার নেই। কেবল সূর্যকান্ত চলুক আমার সঙ্গে।'

'আমি ?'—শংকর গিয়ে দাঁড়িয়েছেন পাশে

'বেশ। তুমিও চলো আমরা তিনজনেই যথেষ্ট। আপনারা বিশ্রাম নিন। আমরা ঘুরে আসি—'

···সেই চেতনা যা নাকি প্রায়ই নাড়া খেয়েছে পুরনো যশোরে, কিংবা স্বপ্নের সেই নির্দেশ যা ঠিক বোঝা যায় নি, অথচ সমগ্র সত্তায় মিশে রয়েছে

তার বেদনা-মাধুরী ; কে-যেন আসছে, কী-যেন আসছে, কী-যেন পাওয়া যাবে, এমনি এক যুক্তিহীন প্রত্যাশা গতকালও ভরিয়ে রেখেছিল চিত্ত। স্বরূপ বোঝা যায় নি, যেন একটা অপ্রত্যাশিত আশীর্বাদ। অঘটনের তীব্র দ্যুতিতে ভরে উঠেছিল হৃদয়, ঘুম ভেঙে গিয়েছিল মধ্যরাত্রে, চমক লেগেছিল বক্ষে। বহুক্ষণ কেটে গিয়েছিল বুকের সেই ধকধকানি কাটাতে, অনুভবে পাওয়া গেছে তার উপস্থিতি কিন্তু বাস্তবে নেই অস্তিত্ব, ধরা-ছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেছে রহস্যটি। এখন কমল খোজার সঙ্গে প্রাসাদ-তোরণ পার হয়ে জংগলের দিকে যেতে যেতে, ঠাস নির্জনতায়, দুপাশের চাপা অন্ধকারে, বার বার সেই বিস্মৃত বোধটি ধাক্কা খাচ্ছিল ; কথা না-বলে তিনি যেন মোহগ্রস্তের মতো এগিয়ে যাচ্ছিলেন। এই অমানিশা, এখন মধ্যরাত্রি, যেন স্তবে বসেছে : সমস্ত প্রকৃতি যেন করজোড়ে এক মহাশক্তির উদ্বোধন ঘটাতে চাইছে। লোমকূপ ভরে উঠতে চাইছে শিহরণে, কী দেখবে কাকে দেখবে এই চিন্তায়। পোশাক বেধে যাচ্ছে জংগলের ডালপালায়, শংকর ও সূর্যকান্ত ছাড়িয়ে দিচ্ছেন দুপাশ থেকে। কমল খোজা চলেছে সবার আগে।

'ওই দেখুন মহারাজ—'

না, মিথ্যা বলে নি কমল খোজা। সত্যি এক অপূর্ব জ্যোতি, বৃক্ষমূল আলোকিত তার প্রভায়। বিহ্বল হয়ে যেতে হয় তাকিয়ে থাকলে, ঘোর নামে। মাথা নুয়ে আসে আপনা থেকে। অলৌকিক কাণ্ড তো বটেই, যাঁরা প্রত্যক্ষ করেন তাঁরাও ভাগ্যবান। যুক্তকর উঠে এসেছিল কপালে, প্রণামের জন্যে মাথা নত করলেন প্রতাপাদিত্য। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, এই রকম একটি আলোক-প্রভাই যেন তাঁর চেতনায় দেখা দিয়েছে বার বার, স্বপ্নকে করে তুলেছে রহস্যময়, কিনারা করতে পারেন নি পুরনো যশোর থেকে কেন ধুমঘাটে এত টান। এখন মনে হচ্ছে এই আলোক-প্রভাই তার ভাগ্য-নিয়ন্তা, শিলাখণ্ড, তিনি আরও এগিয়ে আবিষ্কার করেছেন একখণ্ড শিলা থেকেই নিঃসৃত হচ্ছে এই অপরূপ জ্যোতি, মাটি খুঁড়লে নিশ্চয়

পাওয়া যাবে কোনো জাগ্রতা দেবীর মূর্তি যিনি রক্ষা করবেন যশোর আর আশীর্বাদ জানাবেন তাঁর ভক্তজনদের। ওটা দেবীর পীঠস্থান, জ্যোতি হল তার আত্মপ্রকাশের ইংগিত। খনন করতে হবে ওই স্থান, সমাদরে প্রতিষ্ঠা করতে হবে দেবীকে।

'ধন্য কমল খোজা, তোমার জন্যে আজ আমার জীবন ধন্য হল—'

সূর্যকান্ত বললেন, 'ওটা কিসের আলো মনে হয় মহারাজ?'

'আমি স্বপ্নে দেখেছি এই আলো, আজ প্রত্যক্ষ করলাম। দেবী আবির্ভূতা হবেন, এই আলো তার সংকেত—'

শংকর বললেন, 'আমারও তাই মনে হয়।'

'স্থানটি চিনে রাখো শংকর, আগামীকাল সকাল থেকেই খননকার্য স্থুরু করবে—'

শংকর বললেন, 'যথা আজ্ঞা মহারাজ।'

'শিলাখণ্ডটি যেন পূজিত হয়। বেশি লোক লাগাবে, তাড়াতাড়ি আমি দেখতে চাই কী-আছে মাটির নিচে—'

শংকর বললেন, 'তাই হবে মহারাজ।'

…কিন্তু নিশ্চেষ্ট থাকতে পারলেন না তিনি নিজেই। ঘুম হল না রাত্রে। ছটফট করতে লাগলেন উত্তেজনায়। ঊষার আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন কমল খোজাকে [illegible]য়ে। গিয়ে দাঁড়ালেন গতরাত্রে-দেখা সেই বৃক্ষমূলে। বাস্তবিক একখণ্ড শিলা রয়েছে অর্ধপ্রোথিত।…শংকর এসে গেলেন পুরোহিতসহ, তাড়াতাড়িতে সংবাদ দেওয়া হয় নি তন্ত্র-সাধক তর্কপঞ্চাননকে, তিনি থাকেন পুরনো যশোরে। পূজার্চনা শেষ হল। পিছনে এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল [illegible]ননকারী লোকজনরা। পূজা-অন্তে তাদের খননের আদেশ দিলেন শংকর। স্থুরু হল খননকার্য।

কৌতূহল ছড়িয়ে গিয়েছিল অধিবাসীদের মধ্যে, তারাও এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল ব্যাপার কী দেখবার জন্যে। খননকার্য কিছুদূর অগ্রসর হলে মৃত্তিকাগর্ভে যখন রাশি রাশি ইট কাঠ দেখা যেতে লাগল, প্রতাপাদিত্য

নিঃসংশয় হলেন ওই স্থানে দেবী-মন্দির ছিল এবং ভাগ্যগুণে সেটি পুনরাবিষ্কার হতে চলেছে। তিনি খননকারীদের উৎসাহ দিতে লাগলেন এবং সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে ঘোষণা করলেন, 'এই মৃত্তিকাগর্ভে মহামাতৃকার আবির্ভাব ঘটেছে। আপনারা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন, আমার কথা সত্য কিনা দেখতে পাবেন। আমি স্বপ্নে তাঁর আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করেছি—'
অধিবাসীদের অধীর প্রতীক্ষা সার্থক করে দেখা দিলেন দেবীমূর্তি, কিন্তু সে-মূর্তির পানে তাকিয়ে তারা যেমন স্তম্ভিত তেমনি বিহ্বল, এমন মূর্তি আগে কেউ দেখে নি। অতীব কৃষ্ণবর্ণ বা কষ্টিপাথরে নির্মিত ভয়ংকরী কালীমূর্তি একখানি। পশ্চিমবাহিনী। প্রকাণ্ড। অতি বিস্তার বদনা জিহ্বা-ললন-দশনা ভীষণা মূর্তিটির কেবল প্রস্তরময় মুখমণ্ডল মাত্র দৃষ্টিগোচর হয়, ভক্তিবিহ্বল প্রতাপাদিত্য দেখলেন, কণ্ঠের নিম্নাংশে হস্তপদাদি কিছুই নেই। একটি প্রস্তরময় প্রায় সমচতুষ্কোণ বেদীর উপর এই কৃষ্ণপ্রস্তরের মুখমণ্ডলটি দৃঢ়ভাবে বসানো, তাঁর মনে হল ঠিক যেন জগজ্জননীরূপে অধিষ্ঠান করছেন। লক্ষ্য করে বুঝলেন, প্রথমত ওই সমচতুষ্কোণ উৎকৃষ্ট প্রস্তর-নির্মিত বেদীটি প্রায় এক হস্ত পরিমাণ চতুর্দিকে উচ্চ হয়ে, তৎস্থান থেকে ক্রমশ সরু হয়ে কণ্ঠদেশে গিয়ে মিশেছে···প্রস্তরাবরণের মধ্যে কণ্ঠদেশের নিম্নভাগ যে কী প্রকার তা দেখবার বা জানবার উপায় নেই, কেননা প্রস্তরাবরণ অতিশয় দৃঢ়রূপে বেমালুম সংবদ্ধ, তা খোলা বা ভাঙা সম্পূর্ণ অসাধ্য! অন্তত প্রথম দর্শনে তাঁর তাই মনে হল। নইলে মুখমণ্ডলের আকার যে-রকম বড় সেই অনুপাতে যদি দেহ ও হস্তপদাদি থাকে তাহলে সমগ্র মূর্তি এত অনুচ্চ হতেই পারে না! অতএব এই সিদ্ধান্তে তিনি এলেন যে মৃত্তিকা-গর্ভে নিশ্চয়ই কতকাংশ প্রোথিত আছে। কিন্তু তা খনন করে বার করা যাবে না, প্রোথিত অঙ্গে আঘাত লেগে যেতে পারে।
তিনি মা-মা বলে লুটিয়ে পড়েছিলেন। 'আমায় রক্ষা করিস মা, আমি তোর অধম সন্তান—' ধুলিধুসরিত দেহ, মহারাজ সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে দেবীর করুণাভিক্ষা করছেন, আবেগে থরথর করে কাঁপছে সর্বাঙ্গ, চক্ষে

বিগলিত অশ্রুধারা।···অধিবাসীরা আতংকে রোমাঞ্চিত হয়েছিল প্রথমে, কিন্তু ভীতির সঙ্গে ভক্তি বিজড়িত থাকায়, কেননা বাহ্যদৃষ্টিতে যা মৃত্যু-মূর্তি প্রকৃতপক্ষে সেটাই তো বিশ্বমাতার শ্রীমূর্তি ; তারাও সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানাল আর মহারাজা প্রতাপাদিত্যের দৈবানুগ্রহ-লাভের কথা শতকণ্ঠে প্রচার করতে করতে ফিরে চলল স্ব-স্ব গৃহে। সদ্যপ্রতিষ্ঠিত নতুন রাজধানী ধুমঘাট চঞ্চল হয়ে উঠল তাঁর গুণগানে। লোক-মুখে বহুদূর অবধি ছড়িয়ে গেল তাঁর অলৌকিক কৃপালাভের বৃত্তান্ত। 'দেখো, এই দেবী যুদ্ধে বা রাজ্যশাসনে চিরকাল আমাদের মহারাজার সহায় থাকবেন, তিনি স্বেচ্ছায় দর্শন দিয়েছেন, অনাচার না ঘটলে ভক্তকে ত্যাগ করবেন না কখনও। আর আমাদের মহারাজ যে ধরনের লোক···'

'তুমি অনাচার কাকে বলছো ?'

উত্তরদাতা থমকিয়ে গেলেন। বললেন, 'অনাচার নানা রকম হতে পারে। পূজার্চনায় ত্রুটি ঘটলেই যে অনাচার ঘটে তা নয়, আমার বিবেচনায় তিনি যদি স্ত্রীলোকের ওপর অত্যাচার না-করেন, তা তিনি করবেন বলে মনে হয় না ; আর রাজলক্ষ্মীকে যদি নিজে দূর করে না-দেন, কেনই-বা তিনি দেবেন—তাহলে এই দেবী কোনোদিন তাঁর প্রতি বিমুখ হবেন না—'

'আচ্ছা দেবীকে তো দেখলাম অতি ভীষণা, কালীমূর্তি, তুমি এমন মূর্তি দেখেছো কখনও ?'

সঙ্গী বললেন, 'না ভাই। দেখি নি। প্রথমে তো আমি চোখ বন্ধ করে ফেলেছিলুম দেখে, আতংকে শিউরে উঠেছিল গা-হাত, পরে চোখ মেলে চাইলুম এবং চেয়ে রইলুম। অপূর্ব একটা ভক্তিভাব জাগছিল চেয়ে থাকতে থাকতে—'

'আমারও ঠিক তাই। জাগ্রতা দেবী। আচ্ছা কী নাম হতে পারে বলো তো ?'

সঙ্গী বললেন, 'কালীমূর্তি যা দেখেছি তার সঙ্গে এর অনেক তফাৎ। জিভ বেরিয়ে থাকলেই সকলে কালী হয় না, আর বলতে গেলে ইনি তো

জিহ্বা-সর্বস্ব ; নাম একটা নিশ্চয় আছে, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা খুঁজে বার করবেন ; আমি শাস্ত্র জানিনে পণ্ডিতও নই, সুতরাং আমার পক্ষে নাম বলা শক্ত—'

···নাম ? কী নাম দেওয়া যায় এ মূর্তির ? অধিবাসীদের মধ্যে গুঞ্জন উঠেছিল, প্রতাপাদিত্য নিজে চিন্তা করছিলেন, একটা নাম অবশ্য মনে এসেছে, শাস্ত্রের সমর্থন পেলে সে-নাম দেওয়া যায় ঃ যশোরেশ্বরী। ভবিষ্যপুরাণে অবশ্য লেখা আছে, প্রাচীন যশোর একটি প্রসিদ্ধ পীঠস্থান, কেননা এখানে সতীদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাহু ও পদ পতিত হয়। তাছাড়া কবিরাম কৃত 'দিগ্বিজয় প্রকাশ' নামক গ্রন্থের অংশবিশেষ মনে পড়ছিল এই প্রসঙ্গে ঃ পূর্বকালে অনরি নামে এক ব্রাহ্মণ দেবীর জন্যে শতদ্বারযুক্ত এক বিরাট মন্দির নির্মাণ করেন এখানে। পরে মন্দিরটি ভগ্ন হয়। ধেনুকর্ণ নামে এক ক্ষত্রিয় নৃপতি তীর্থদর্শনে এসে মায়ের ভগ্নমন্দিরের জায়গায় একটি নতুন মন্দির প্রস্তুত করে দেন।—এ কী সেই মন্দির, বিগ্রহ কী সেই ? প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সুন্দরবন অঞ্চলে বহুবার ভাঙা-গড়া হয়েছে, একে প্রস্তরশূন্য বঙ্গদেশ, তাতে লবণাক্ত বায়ু-প্রবাহ, এই দুই কারণে প্রাচীন অট্টালিকাসমূহ বিনষ্ট হয়। তেমনি মহতী বিনষ্টি কী ঘটেছিল এ ক্ষেত্রেও ? যে অপূর্ব কষ্টিপাথরে এই কালীমূর্তি নির্মিত হয়েছিল, আপাতত কালীমূর্তি ছাড়া অন্য কী বলা যায়, যখন শাস্ত্রসম্মত নাম পাওয়া যাচ্ছে না ; তার বিনাশ ঘটে নি, ক্ষয় হয় নি। মূর্তি যেখানে উঠেছেন সেখানেই আছেন, কারণ সে বিরাট প্রতিমা অচল অটল, যেন পাহাড়ের মতো ভারি···দেহের যেটুকু অংশ প্রকাশিত, ততোধিক এবং স্থূলতর অংশ ভূপ্রোথিত রয়েছে। লোকেরা তাঁর নামে ধন্যধ্বনি দিচ্ছে, দৈবানুগৃহীত মানব বলে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দিচ্ছে ; সমস্ত মনেপ্রাণে প্রজাদের অন্তরে এই স্থানটুকু পেতে চেয়েছিলেন তিনি, নিজেকে অসংশয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন তাদের মনে, এবার যা তিনি বলবেন প্রজাসাধারণ নির্দ্বিধায় তা শুনবে, যেদিকে চালিত করবেন সেইদিকে চলবে—এই অকপট শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রয়োজন ছিল, দৈবের

আনুকুল্যে নিজের মধ্যেও শক্তি জেগেছে, প্রতিপত্তি-লাভের আশায় শিগগিরই যুদ্ধে বহির্গত হবার বাসনা আছে তাঁর, অন্তত প্রতিবেশী রাজ্য উড়িষ্যা যাত্রা করে দেখতে হবে তাঁর শক্তি কতখানি, তাছাড়া মিত্রতার যাত্রা বলেও একটা কথা আছে। দল ভারি করতে হবে, নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে দ্বাদশ ভৌমিকগণের অবিসংবাদী নেতা রূপে। তারপর আছে মোগলের সঙ্গে মোকাবিলা, স্বয়ং বাদশা আকবরের সঙ্গে শত্রুতা। অনেক কাজ বাকি। আরব্ধ কাজ সুরু করা হয় নি একটিও। দৈব সহায় হলে, দেবীর আশীর্বাদ পেলে যে-কোনো দুরূহ কাজে নামা যায়। মনে হচ্ছে এই দেবীর আশীর্বাদে তিনি বিশ্বজয় করতে পারবেন। কিন্তু ইনি কোন্ দেবী ? কী এর নাম ?

ভেবেছিলেন শংকরের সঙ্গে তিনি এ বিষয়ে আলোচনা করবেন, এখন শংকর দেওয়ানি ও মন্ত্রণা বিভাগের কর্তা, মন্ত্রী ; সে সুপণ্ডিত, ধীর স্থির কর্তব্যকঠোর এবং ব্রাহ্মণোচিত প্রতিভা-সম্পন্ন, তার সঙ্গে আলোচনা করে সংশয়ের নিরসন ঘটানো যেত। কিন্তু তৎপূর্বে পুরনো যশোর থেকে এসে হাজির হলেন দুই প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ঃ একজন খুল্লতাত বসন্তরায় এবং অপরজন পূজ্যপাদ তান্ত্রিক গুরু কমলনয়ন তর্কপঞ্চানন। অবশ্য এসেছিলেন চারজনে। ছোটরাণী কমলা এসেছিলেন প্রতাপ-সন্দর্শনে, কতদিন দেখা নেই। সঙ্গে প্রধানা সহচরী নিপুণিকা। তাঁদে অভ্যর্থনার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন প্রতাপাদিত্য।

'দেবী নাকি দেখা দিয়েছেন তোমাকে,' বসন্তরায় ও তর্কপঞ্চানন একযোগে নিবেদন করলেন, 'আমরা সেজন্যেই এসেছি : চলো আগে দেবীকে প্রণাম করে আসি—'

ছোটরাণী কমলা অন্তঃপুরে চলে গেছেন। সঙ্গে নিপুণিকা। ওরা বিকেলে যাবেন দেবী-দর্শনে।

'আমি মায়ের শ্রীমন্দির নির্মাণের আদেশ দিয়েছি,' প্রতাপাদিত্য সবিনয়ে বললেন, 'এখন মন্দিরের কাজ চলছে। আপনারা কী এখনই যাবেন ?'

বসন্তরায় বললেন, 'দেবী-দর্শন তো সর্বাগ্রে হওয়া উচিত, কী বলেন তর্ক-পঞ্চানন মশায়?'

'অবশ্য। আমি যথেষ্ট কৌতূহলী। প্রতাপ-বাবাজিকে কোন্ দেবী করুণা করেছেন তা জানবার জন্যেই এতদূর ছুটে এসেছি—'

প্রতাপাদিত্য বললেন, 'বেশ চলুন তাহলে! মূর্তি দেখে আপনারাই বলে দেবেন তিনি কোন্ দেবী. আমি কার কৃপালাভ করেছি। চলুন, আমি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। এই রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্বে কালীঘাটে পীঠমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছিল এবং খুড়োমশাই ক্ষুদ্র একটি মন্দির নির্মাণ করে দিয়েছিলেন তাঁর, সে-মূর্তি আজও পূজিত হচ্ছে সমারোহের সঙ্গে। খুড়ো-মশায় হয়তো চিনতে পারবেন। আর তর্কপঞ্চানন মশায় তো দিব্য-দ্রষ্টা মহাপুরুষ, তিনি নিশ্চয় বলে দিতে পারবেন ইনি কোন্ দেবী—'

'চলো দেখা যাক।'

মায়ের মূর্তি আবিষ্কারের পরে পার্শ্ববর্তী জংগল বহুদূর পর্যন্ত পরিষ্কার করার আদেশ দিয়েছিলেন প্রতাপাদিত্য, পাশাপাশি চলছিল মন্দিরের ভিত্তি-গাঁথুনি, লোক-সমাগমে থইথই করছিল জায়গাটি। ওঁরা গিয়ে উপস্থিত হলেন। ভক্তিভরে প্রণাম জানালেন। বসন্তরায় চিনতে পেরেছিলেন, বিড়বিড় স্বরে তিনি বললেন, 'প্রতাপ, পীঠমূর্তি, পীঠমূর্তি। নিত্য পূজা করিস, তুই ভাগ্যবান···'

'ইনি মাতা যশোরেশ্বরী। একান্নপীঠের অন্যতম পীঠ-দেবতা।' তর্কপঞ্চানন তৎক্ষণাৎ তন্ত্রোক্ত শ্লোক উদ্ধার করলেন:

'যশোরে পণিপদমঞ্চ দেবতা যশোরেশ্বী
চণ্ডশ্চভৈরবস্তত্র যত্র সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ—'

বলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'চণ্ডভৈরব পাও নি, প্রতাপ? তাঁকে তো এই সঙ্গেই পাওয়ার কথা—'

'পেয়েছি।' প্রতাপ বললেন, 'সবটা নয় অংশবিশেষ। জংগল পরিষ্কার করাতে করাতে বাণলিঙ্গের উর্ধ্বভাগটুকু শুধু পেয়েছি আবর্জনার মধ্যে,

শ্বেত মর্মরের প্রস্তরে গঠিত। ওই-যে দেখুন, মায়ের মূর্তির পাশে সযত্নে রেখে দিয়েছি। ইচ্ছা আছে, মন্দির তৈরি হলে শ্বেতপাথরের ত্রিকোণ পীঠ প্রস্তুত করে দেব যাতে পঞ্চমুণ্ডী আসন কল্পনা করা যায়—'

'পরে হয়তো আরও কোনো মূর্তি পাবে, রেখে দিও এই মন্দিরে। মাতা যশোরেশ্বরী বড় জাগ্রতা দেবী। জেনে রেখো সত্যযুগ থেকে ইনি বর্তমান। বহু ভাগ্য না-হলে মানুষ পীঠমূর্তি আবিষ্কার করতে পারে না। তোমার অশেষ পুণ্যফল, মাতা যশোরেশ্বরী তোমাকে রক্ষা করবেন সর্ববিপদে, তুমি তাঁর বরপুত্র…'

প্রতাপাদিত্য বললেন, 'আমারও মন বলছিল উনি মাতা যশোরেশ্বরী, আপনাদের কথায় আমি নিঃসংশয় হলাম। ঠিক করেছি মায়ের নাম অনুসারে এই জায়গাটির নাম রাখব, যশোরেশ্বরীপুর।'

'তাই উচিত।' বসন্তরায় বললেন, 'যশোর-রাজ্যের এটাই যখন পীঠস্থান তখন ওই নাম রাখাই উচিত। পূর্বে আমি যেখানে শহর প্রতিষ্ঠা করে 'যশোহর' নাম রেখেছিলাম, এখন মনে হচ্ছে, তা ঠিক হয় নি। প্রকৃত যশোর এটাই। মা এখানে দেখা দিয়েছেন। তবে স্থানের নামকরণে আমি একটু কাটছাঁট করতে চাই। 'যশোরেশ্বরীপুর' বড্ড ভারি শোনাচ্ছে, শুধু ইশ্বরীপুর রাখলে কেমন হয়?'

'বেশ তাই হবে। চলুন এবার আপনারা আমার আতিথ্য গ্রহণে ধন্য করুন—'

'চলো।'

'এই ছোঁড়া, মুখ ঘুরিয়ে চলে যাচ্ছিস যে বড়—'

থমকে দাঁড়াল সুন্দর। কাকে বলছে? আশেপাশে তো অন্য-কেউ নেই।

'আমাকে বলছেন?'

চোখ তুলে আবার নামিয়ে নিল সুন্দর। পুরো মুখ দেখা যাচ্ছে না, পথি-

পার্শ্বের বৃক্ষশাখা অবনত হয়ে ঠিক মুখ-বরাবর রচনা করেছে পত্র-জাফরি চিবুকের সামান্য অংশ আর বড় বড় চক্ষু দুটি উদ্ভাসিত, কোমল গ্রীবায় চিরকালের রহস্য বিধৃত, অপরূপ সুন্দরী এক তরুণী।···ভুল হয়েছে নিশ্চয়, ঈশ্বরীপুরে ওভাবে সম্বোধন করার মতো মেয়ে একটিও নেই। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিল, আলো-ছায়ার রহস্যে পথঘাট এমনিতেই অপরিচিত লাগছিল, তদুপরি এই ডাক শুনে সে বিস্মিত না-হয়ে পারল না। অভিজাত ঘরের তরুণী, তাকে ডাকে কেন ?

'এদিকে এসো। গাছের আড়াল সরে গেলেই চিনতে পারবে। হাঁদারাম—'

দূরত্ব ছিল বেশ কিছুটা। অবোধ্য আকর্ষণে এগিয়ে যেতে হল কাছে। জংগল-পরিষ্কারকের দল ফিরে আসছে সারাদিনের পরিশ্রমের পর, আলোর অভাবে মন্দিরের ভিত্তি-গাঁথুনি স্থগিত রেখে হাত-মুখ ধুয়ে নিচ্ছে রাজ-মিস্ত্রীরা, তাদের কলরব শোনা যাচ্ছে; আস্তে আস্তে নেমে আসছে অন্ধকার। অন্যদিনের মতো ধুমঘাট-পরিভ্রমণে বেরিয়েছিল সুন্দর, মদনদা বা আর-কেউ সঙ্গে নেই, একা: মাতা যশোরেশ্বরী আবির্ভূতা হওয়ার সংবাদে চতুর্দিকে শুধু ওই আলোচনা, দূর-দূরান্ত থেকে কত নারী-পুরুষ যে ধুমঘাটে এসেছে তার ইয়ত্তা নেই, থইথই করছে নবনির্মিত শহর। অপ্রত্যাশিত এই দেবীর আবির্ভাবে তারাও খুব চঞ্চল, দ্বিগুণ উৎসাহে যে-যার কাজ সুরু করেছে, কামার-পাড়ায় গোলা-বারুদ আর জাহাজঘাটায় রণতরী নির্মাণ কার্য চলেছে পুরোদমে, জন-বসতিতে ভরে উঠেছে জায়গাটা। পুণ্যার্থিনী কোনো অপরিচিতা তরুণী মনে করেছিল, কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই সে-ভুল ভাঙল।

'আরে তুমি!—'

'মানুষটাকে না-হয় চিনতে পারো নি দূর থেকে,' নিপুণিকা যেন ধমক দিল, 'গলার স্বরও কী ভুলে গেলে এর মধ্যে ?'

'আমি ভাবতে পারি নি, সত্যি!'

লজ্জিত হল সুন্দর।

'ছোটরাণীর সঙ্গে এসেছি।' নিপুণিকা বললে, যশোরেশ্বরী দর্শন করে ছোটরাণীমা আর অন্য-সকলে চলে গেছেন আগে, আমি পিছিয়ে পড়েছিলুম বলে দেখা হল তোমার সঙ্গে···বেশ ছেলে যা-হোক, পুরনো যশোরে যেতে নেই বুঝি একবার ?'

সুন্দর তাড়াতাড়ি বললে, 'আমরা এদিকে এত ব্যস্ত যে···চলো কোথাও একটু বসিগে, ছুটো কথা বলা যাবে প্রাণভরে—'

'আমার সঙ্গে কথা বলে কী তোমার প্রাণ ভরবে ?'···অথচ প্রস্তাবটি গ্রহণ করে নিপুণিকা নির্জনতার দিকে হাঁটছিল, তার রূপ পথচারী অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, রাস্তার মাঝে এ-রকম আলাপ শোভন হচ্ছে না তা সে টের পাচ্ছিল।

'ইচ্ছা করলে তুমি অনেকের প্রাণ ভরিয়ে দিতে পারো।···দীঘি, টলটলে কালো জল, বাঁধানো ঘাট, জংগল ঘুরে সেই দীঘির ঘাটে এসে বসল ছুজনে, দূরত্ব বজায় রেখে। কারণ, নিপুণিকার নিপুণ প্রসাধন ভেদ করে উগ্র সুগন্ধ উঠছিল, মোহময় আকর্ষণে তার শরীর লোভনীয়ঃ 'সে-শক্তি তোমার আছে।' মৃদু, প্রায় অস্পষ্ট, চাপাস্বরে অর্থবহ করে তুলল ইংগিত।

'আমার জানা ছিল না,' সূর্য ডুবে গেছে পুরোপুরি, পূর্ব দিগন্তে থালার মতো গোল চাঁদ থাকায় স্থানটি জ্যোৎস্নালোকে উদ্ভাসিত, সুন্দরী নিপুণিকাকে মনে হচ্ছিল হলুদ মোমে গড়া অপূর্ব প্রতিমা একখানিঃ 'বন থেকে বেরিয়েই কেউ বৃন্দাবনলীলা করতে পারে। তোমার উন্নতি দেখে খুশি হলাম, সুন্দর। বুঝতে পারছি তোমার লীলা-সঙ্গিনী যথার্থ মানুষ করে তুলেছে তোমাকে। আজকাল ঘন ঘন দেখা-সাক্ষাৎ হয় বুঝি ? পুরনো যশোরে তবু একটু খোঁজ-খবর পেতাম. এখানে আর কে খবর দেবে বলো। তা শ্রীমতী রাধিকে আছে কেমন ?'

'হায় সখি,' সুন্দরী কৃত্রিম খেদে কপাল চাপড়াল ঃ 'তার খবর কে আমায় দেবে ? সেই-যে আগ্রা চলে গিয়েছিলুম তারপর থেকে ওর কোনো সংবাদ আমি জানিনে। পুরনো যশোরে যদি বা আশা করেছিলুম ওর খবর কোনো

না-কোনো সূত্রে পাব, তা পাই নি, এখানে এসে তো গভীর অন্ধকারে পড়লাম। লোকে বলে আমি শুধু টো-টো করে বেড়াই, এখানে-সেখানে উঁকিঝুঁকি মারি, কৌতূহলবশত নানা কথা জিজ্ঞাসা করি ; সখি, তারা কেউ জানে না কেন আমি হন্যের মতো ঘুরি, কোথায় আমার ব্যথা, কে আমাকে ঘোরায়। তুমি সেই ব্যথার স্থানে আঘাত করে বসলে !'

'আ-হা রে মরে যাই—'

তীব্র ঈর্ষায় নিপুণিকা যেন জ্বলে উঠল ঃ 'সংসারে আর যেন মেয়ে নেই ! এত দেমাক কেন গো তোমার ? লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে কতবার ডেকেছি, পুরুষ মানুষের মতো এগিয়ে আসতে পারো না সব অবরোধ ভেঙে ? চুম্বনে-আলিংগনে পিষ্ট করে দিতে পারো না একটি নারী-শরীর ? যদি বলি, রাধার বিয়ে হয়ে গেছে তোমার আগ্রাবাসকালে এবং সে-বিয়ে দিয়েছি আমি তার হাত থেকে তোমাকে ছিনিয়ে নেব বলে এবং সে আছে এখানেই, একজনের বউ হয়ে সংসারের কর্ত্রী, তাহলে···তাহলে ?'

'নিপুদি, এ কী করলে ভাই ?'

অসহ্য ব্যথায় যেন পাথর হয়ে গিয়েছিল সুন্দর, ভরা-দীঘির মতো জল টলমল করছিল তার চোখে। বললে, 'রাধাকে যে কথা দিয়েছিলাম ওকে আমি জীবনের সঙ্গিনী করব ! এতদিনেও ভুলি নি তাকে, সব সময়, শয়নে স্বপনে নিদ্রায় জাগরণে তার মুখখানি মনে পড়ে—'

'দেখ, আমার দিকে চেয়ে দেখ সুন্দর। গায়ে হাত দাও। বুকে টেনে নাও। দেখবে রাধার চেয়ে কোনো অংশে আমার শরীর তুচ্ছ নয়। বুকে কান পাতলে, আমি চাই তুমি আমার বুকে আলিংগনে জড়িয়ে থাকো, শুনতে পাবে সেখানে একটি নাম নিয়ত ধ্বনিত হচ্ছে ঃ সুন্দর, সুন্দর, সুন্দর। রাধাকে সরিয়ে দিতে হয়েছে, রাধা আমার প্রতিবন্ধক ছিল, সে যাতে সারাটা জীবন সুখে কাটাতে পারে তার ব্যবস্থা করে দিয়েছি···আমি ওই দীঘিরমতো বুক পেতে আছি, দেখ, চাঁদ কত অনায়াসে ওর বুকে ভাসছে ; তুমি ওই চাঁদের মতো আমার বুকে এসো, আমি তাই চাই—'

হাত বাড়িয়ে সুন্দরের মাথার চুল মুঠো করে ধরেছিল নিপুণিকা, উপরদিকে তুলে ধরল। সুন্দর দেখতে পাচ্ছিল নির্মল আকাশ, চাঁদ, রহস্যময় প্রকৃতি··· কিন্তু চোখে জল ! অতি মৃদু ঝিঁঝির কলরোল উঠছিল দীঘির পাড় থেকে, বাতাসে নিপুণিকার বুকের সুগন্ধ, কাছে টেনে নিয়েছে বলে সে আরও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল নিপুণিকার জ্যোৎস্নাধবল বক্ষদেশ ঈষৎ উন্মুক্ত, যেন দুটি পরিপুষ্ট বেলফল, কণ্ঠদেশে-গ্রীবায় অকৃপণ জ্যোৎস্নার প্লাবন, কোমল চিবুকে-ওষ্ঠে আত্মনিবেদনের কী-এক প্রস্তুতি, জ্যোৎস্না-ডুবানো ললাট বাঁকানো ভুরু আর ঘন আঁখিপল্লব, আচ্ছন্ন-করা গাঢ় দৃষ্টির মধ্যে সমস্ত জগৎ যেন থমকানো। সেই মুহূর্তে মনে হল এ নারীর আবেদনে অসত্য নেই কোনোখানে, প্রত্যাখ্যান মানে নারীত্বের অপমান, তা সে যতই কুটি-লতার পরিচয় দিয়ে থাক। এখন আর দেবী বলে মনে হচ্ছে না, নারী হয়ে উঠেছে নিপুণিকা, পরিপূর্ণ নিবেদিতা নারী, সংসারে এ অতি দুর্লভ বস্তু। আন্তরিক বলেই সমগ্র পুরুষ-সত্তায় তার আবেদন অকুণ্ঠিত।
সুন্দর সাড়া না-দিয়ে পারল না।

'সখি তুই এত ঘর-বার করছিস কেন? ওঁরা এখন দরবারে। সূর্য ঠাকুরপোর বেরিয়ে আসতে দেরি হবে—'
অরুন্ধতী লজ্জা পেল। বাস্তবিক একটা চাঞ্চল্য জেগেছিল ওর, কতদিন দেখা নেই, দিনান্তে অন্তত একবার দেখা পেলে তৃপ্তি পাওয়া যায়। উনি সারাদেশ টো-টো করে ঘুরে বেড়ান, গোলা-বারুদের তদারকি হয়, বিদেশী বণিকদের কাছে অস্ত্র-ক্রয়ের আশায় হা-পিত্যেশ করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকেন বুরুজখানার পাশে, অস্ত্র-শিক্ষায় তৈরি করা হচ্ছে যত যুবকদের, তাদের আড্ডায় ও আখড়ায় ঘন ঘন উপস্থিতি ; অথচ সবচেয়ে নিকটবর্তী স্থানে, এই প্রাসাদে, একজন তাঁর দর্শন-প্রত্যাশায় কত-যে কাতর তা যদি এতটুকুও হুঁস থাকে !

'বাঃ, সেজন্যেই বুঝি ঘর-বার করছি—'

শরৎসুন্দরী হাসছিলেন, 'তবে ?'

'এমনি। মন্দিরের কাজ কতদূর এগোল, তাই দেখছি। এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায়—'

শরৎসুন্দরী বললেন, 'আরও স্পষ্ট দেখা যায় দরবার-গৃহ থেকে, একেবারে মুখোমুখি। মন্দিরের কাজ শেষ হয়ে এসেছে, শিগগিরই মায়ের মূর্তির অঙ্গ-রাগ ও অভিষেক সম্পন্ন হবে, তারপর পূজা।…কিন্তু সখি, এ-সব ভাবনা তো তোমার নয়, যিনি ভাববার তিনি ঠিকই ভাবছেন। মহারাজা যথা-বিহিত ব্যবস্থা করবেন। আমি বলি তুমি তুলিটা আবার তুলে নাও, অদর্শনে ব্যথাতুরা বিরহিনী নায়িকার ছবি আঁকো একখানা। আমার মনে হয় এখন ছবিটা ফুটবে ভালো'

'সখি, তুমি ঘেমে উঠেছো। কক্ষে চলো, বিশ্রাম দরকার। এ অবস্থায় বেশি হাঁটা-হাঁটা করলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে।'

শরৎসুন্দরী বললেন, 'সূর্য-ঠাকুরপোর মায়ের মৃত্যুর পর তোমাকে আমার প্রধানা সহচরী করায় এই এক অসুবিধে হয়েছে যে, কে কাকে হুকুম চালায় সব সময় বুঝতে পারিনে। আমি বললাম ছবি আঁকতে আর তুমি হুকুম করছো আমি যেন কক্ষে গিয়ে বিশ্রাম করি।…দিনরাত সর্বক্ষণই তো কক্ষমধ্যে আছি, তোর তীক্ষ্ণ নজর ফাঁকি দিয়ে কুটোটি পর্যন্ত নাড়ার জো নেই, ওরে মা কী আমি এই প্রথম হতে যাচ্ছি ? পেটের সন্তানের প্রতি তোদের চেয়ে আমার দরদ বেশি এটা মনে রাখিস—'

'সখি, উদয়াদিত্য কোথা গেল, তাকে দেখছিনে কেন ?'

শরৎসুন্দরী হাসলেন, হাঁটতে শিখে ছেলের দশটা পা বেরিয়েছে। সুন্দর ওকে তীর-ধনুক তৈরি করে দিয়েছে, ছোট ছোট হাতে তাক করে কেবলি ঘরের জিনিসপত্র ভাঙছিল, আমি বাইরে নিয়ে যেতে বলেছি দাসীকে। হুবহু বাবার স্বভাব পাচ্ছে, বড্ড দস্যি হয়েছে—'

'দামাল ছেলেদের আমার খুব ভালো লাগে। উদয়াদিত্য দামালপনা করলে

আমাকে ডেকো সখি, আমি ওকে সামলাব।'

শরৎসুন্দরী বললেন, 'বেশ, এখন কিছুদিন তুই ওর ভার নে। আমি একটু স্বস্তি পাই—'

'দেখে আসি উদয়াদিত্য কার কাছে আছে। নিয়ে আসি ওকে। যাব?'

শরৎসুন্দরী আবার হাসলেন। বললেন, 'তুই কেন কক্ষের বাইরে যেতে চাইছিস তা আমি জানি। কিন্তু বললাম তো, দরবার ভাঙতে দেরি আছে আচ্ছা যা—'

মহারাণীর কাছে লুকানো নেই কিছু, আগাগোড়া সব জানেন। নিতান্ত সখি বলে কাছে টেনে নিয়েছেন তাই, নইলে মায়ের মৃত্যুর পর ওই অট্টালিকায় সম্বন্ধহীন দুজনে বাস করা কঠিন হত, যদিচ দৃঢ়চেতা সূর্যকান্তের তরফ থেকে অসম্মানসূচক আচরণের সম্ভাবনা ছিল না আদৌ। সংসারে দু-একটি লোক আজও আছে যাঁদের সঙ্গে অসংকোচে রাত্রিবাস করা যায়। উনি সেই প্রকৃতির লোক।···তবু সংকোচ আর দ্বিধা প্রতি পদে পদে, কানাঘুসা ছিলই, কুৎসা রটে যেত অতঃপর। তাতে নিজের যত না হোক ওর চরিত্রে কলংক পড়ত। তার আছে কী যে কলংকিত হবে? বরং তিনি অসমসাহসী, মহাযোদ্ধা, সর্বশাস্ত্র বিশারদ এবং লোক-পরিচালনে অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালী বলে এখন তিনি রাজ্যের প্রধান সেনাপতি···সৈন্যরক্ষণ, যুদ্ধব্যবস্থা ও বলসঞ্চয়ের সর্বদায়িত্ব তাঁর। এই চরিত্র কলংকিত হলে লজ্জা রাখার ঠাঁই পাওয়া যেত না!···লোক-অপবাদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন স্বয়ং মহারাজা, মায়ের মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণমাত্রেই উপস্থিত হয়েছিলেন তিনি, শবদেহ নিয়ে সবাই চলে গেল শ্মশানে, তাকে এনে তুললেন রাজপ্রাসাদে, মহারাণীর হাতে সঁপে দিয়ে বলছিলেন, 'আজ থেকে অরুই হল তোমার প্রধানা সহচরী, ওর কেউ নেই···।' আশ্বস্ত হওয়া গিয়েছিল এই আশ্রয় পেয়ে, কিন্তু মন মানে কই? মহারাণী বরাবরই বুদ্ধিমতী, উনি ঠিক ধরেছিলেন মনের বাসনা, তার অন্তর-চাঞ্চল্যের কারণ; দীর্ঘদিনের অভ্যাস পরস্পরকে দর্শন, নীরব দৃষ্টির মধ্যে প্রীতি ও শ্রদ্ধার ডালি সমর্পণ, সে-

সুযোগ আর ঘটছে কই ?···অনিয়ম ছিল এমনিতেই, মা বেঁচে থাকার সময়েও, এখন আরও বেড়েছে নিশ্চয় ; কোনো-একজন আপন-লোক না-থাকলে এই-রকম উদ্দাম প্রকৃতির পুরুষকে নিয়মের মধ্যে বেঁধে রাখা যায় না ; অবশ্য তাঁর চেয়েও উদ্দাম পুরুষ মহারাজা প্রতাপাদিত্য, তাঁর চেহারার মধ্যে প্রখর ব্যক্তিত্ব, চেহারাখানাও তেমনি, যথার্থ রাজপুরুষ, তেজস্বী বীর ও নির্ভীক, তদুপরি দৈবানুগৃহীত—সখি শরৎসুন্দরী তাঁর মনের নাগাল পায় কি করে বোঝা মুশকিল। বোধহয় সব স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর মনের নাগাল পাওয়া সম্ভব, যদি যথার্থই স্বামী-স্ত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যায় !—স্বামী-স্ত্রী ! স্বামী-স্ত্রী ! কথাগুলো বেজে-বেজে উঠছে যেন, একটা আশ্চর্য অনুরণন ছড়িয়ে পড়ছে মনে। এই সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া কী এতই অসম্ভব ছিল ? আগ্রা থেকে ফিরে এসেই তো তার কুল-পরিচয় জ্ঞাত করেছিলেন সব সংবাদের আগে, কী লাভ হল তাতে ? অভিমানে ভরে উঠছিল মন, মাঝে মাঝে আজকাল এই অভিমান জাগে, প্রতীক্ষার বুঝি শেষ নেই। কোথায় গেল সেই ব্রাহ্মণ পাচক, যার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটেছিল আগ্রা যাত্রাপথে গৌড়ে ? এতদিনেও কী তার আসার সময় হল না ? যশোর থেকে গৌড় কী এতই দূর ?···নাকি ভুলে গেছেন গুরুতর কর্মের চাপে ? সেটাই সম্ভব। তার যেমন ভাগ্য, সুখের হাতছানিটুকু পেতে না-পেতেই তা মিলিয়ে যায়।

ছোট তীর এসে বিঁধল দেহে। গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছিল, হাতে নিয়ে পেছনে লুকিয়ে ফেলল অরুন্ধতী।

'উরে বাস ! কী টিপ ! উদয়াদিত্য দেখ, আমার বুক ভেদ করে চলে গেছে তোমার হাতের তীর—'

ছোট্ট উদয়াদিত্য তীর ছুঁড়ে লুকিয়ে পড়েছিল সিঁড়ির আড়ালে। বেরিয়ে এসে আধো আধো স্বরে বললে, 'তুমি ম'লে গেছ ?'

'হ্যাঁ। একদম। দেখ, আমি বেঁচে নেই—'

উদয়াদিত্য এগিয়ে এসে অঙ্গস্পর্শ করল। অরুন্ধতী জিব বার করে, চোখ

বুজে, মৃতের ভান করে দাঁড়িয়ে রইল।

'বাবা বকবে—'

উদয়াদিত্যের কান্না পাচ্ছিল, একহাতে ধনুক, অন্যহাতে চোখ রগড়াচ্ছিল।

'আমি মরে গেলে কেউ বকবে না তোমাকে। ছিঃ কাঁদে না—'

অরুন্ধতী তাকে কোলে তুলে নেবার জন্যে নিচু হল।

'তুমি বেঁচে ওঠো। আমি কক্‌খনো তীর ছুঁড়ব না—'

গলার স্বর ফ্যাসফেসে। বুঝি এখনই কেঁদে ফেলবে।

'আচ্ছা বেঁচে উঠলুম। এসো আমার কোলে এসো—'

উদয়াদিত্য সচরাচর কারও কোলে উঠতে চায় না। এখন স্বচ্ছন্দে কোলে উঠল। বললে, 'আমি মায়ের কাছে যাব।'

'হ্যাঁ তাই চলো। আমি তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি—'

দাসী সব দেখছিল পাশে দাঁড়িয়ে। বললে, 'বাব্বা, আমি শত চেষ্টাতেও কোলে তুলতে পারি নি। আপনি এলেন আর সঙ্গে সঙ্গে কোলে উঠল। ধন্যি ছেলে বাবা—'

অরুন্ধতী হাসতে হাসতে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে লাগল।

মিত্রতার যাত্রা করারই বাসনা ছিল, উড়িষ্যার বিভিন্ন নৃপতিবর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সখ্য ও মৈত্রীর বন্ধন স্থাপন করতে চেয়েছিলেন তিনি, পরিশেষে জগন্নাথ-দর্শন করে ফিরে আসা। দরবারে বলেছিলেন সেকথা, এমনকি যাত্রাপূর্বে রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করে ফেলেছিলেন পর্যন্ত, কিন্তু, শেষ মুহূর্তে সংকট দেখা দিল, দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠল পর-পর দুটি পত্রপ্রাপ্তিতে। পত্র দুটি এসেছে দুজন গুরুতর ব্যক্তির নিকট থেকে, প্রথম পত্রের লেখক বঙ্গের শাসনকর্তা মানসিংহ স্বয়ং, যদিচ তিনি এদেশের আবহাওয়ায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে বাস করতেন বিহারে তথাপি তাঁর তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিল সর্বত্র···পত্রে তার আভাস ও আবেদন সুস্পষ্ট। শীলমোহর-করা পত্রখানি পড়ে গম্ভীর হয়ে গেলেন প্রতাপাদিত্য। সভাসদদের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, 'আপনারা অবগত আছেন উড়িষ্যায় পাঠানগণ বার বার বিদ্রোহী হয়েছে, সুযোগ পেলেই তারা বিদ্রোহের ধ্বজা উড়িয়ে দেয়, কখনও হারে কখনও বা জেতে—ওদের এখনও সম্পূর্ণ দমিত করা যায় নি। এবার পরিস্থিতি গুরুতর হয়ে উঠেছে। বঙ্গের শাসনকর্তা মানসিংহের চিঠি থেকে জানতে পারছি যে উড়িষ্যার জগন্নাথ মন্দির অধিকার করে তারা ক্রমশ কটক ও জলেশ্বরের দিকে অগ্রসর হয় এবং বঙ্গের সীমানায় প্রবেশ করে বিষ্ণুপুরের ভুইঞা হাম্বীর মল্লের রাজ্য আক্রমণ করে বসেছে। শুধু আক্রমণ নয়, এমনভাবে গ্রামের পর গ্রাম লুণ্ঠন করে দেশ ছারখার করে দিয়েছে যে প্রজাকুল একান্ত ব্যাকুল হয়ে হাম্বীরের কৃপাপ্রার্থী। আমরা জানি, হাম্বীর বহুকাল যাবৎ আকবরের অনুরক্ত সামন্ত প্রজা এবং মানসিংহ তার প্রতি সদয়। বিশেষতঃ কয়েক বৎসর পূর্বে যখন কতলু খাঁর সৈন্যদল মানসিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র জগৎসিংহকে পরাজিত ও আহত করেন তখন হাম্বীর মল্লই তাঁকে বিষ্ণুপুরে আশ্রয় দেন, ফলে তিনি প্রাণে রক্ষা পান। এখন কৃতজ্ঞ মানসিংহ হাম্বীর মল্লকে সাহায্য করতে বদ্ধপরিকর।'

শংকর জানতে চাইলেন, 'আপনাকে চিঠি লেখার কারণ? মানসিংহের সহকারীরূপে রাজধানী তাণ্ডায় শাসনদণ্ড ঘোরাচ্ছেন সৈয়দ খাঁ, চিঠি লেখা উচিত ছিল তাঁকে—'

'হয়তো লিখেছেন।' প্রতাপাদিত্য বললেন, 'হয়তো কেন, নিশ্চয় লিখেছেন। সৈয়দ খাঁ অসুস্থ, তবু, সাধ্যমতো আয়োজন করবেন তিনি··· অন্যান্য সামন্ত রাজার নিকটও মানসিংহ এ-রকম পত্র-প্রেরণ করেছেন বলে অনুমান করি, আমার সঙ্গে তাঁর পূর্ব-পরিচয় ছিল, সেজন্যে হোক বা এবার সর্বশক্তি একত্রিত করে পাঠানদের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হতে চান বলেই হোক, আমাকে তিনি স্মরণ করেছেন এবং সক্রিয় সাহায্যের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। আমার মিত্রতার যাত্রাটি শেষ পর্যন্ত কী রূপ নেবে তাই ভাবছি—'

শংকর বললেন, 'অর্থাৎ আপনি মোগলের পক্ষে যুদ্ধযাত্রা করবেন কিনা এখন তাই চিন্তা।'

'সত্যি আমি চিন্তায় পড়ে গিয়েছি।···এখানে বসে সামনাসামনি দেখতে পাচ্ছি যশোরেশ্বরীর মন্দির, ওর নির্মাণকার্য সমাপ্ত করে পরিকল্পনামতো প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সঙ্গে স[illegible] ও মৈত্রী স্থাপনের নিমিত্ত মিত্রতার যাত্রা সুরু করতে বাস্তবিক অনেক দেরি হয়ে গেল, অধিকন্তু মহারাণীর শরীর ভালো যাচ্ছিল না, আপনারা অবগত আছেন আমি একটি কন্যাসন্তানের জনক হয়েছি—নাম রেখেছি বিমলা, সবদিক সামলে বেরুতে দেরি হল খুব, যদি বা মনস্থির করেছিলুম, মানসিংহের চিঠি এসে এই যাত্রা আরও জটিল করে তুলেছে। তোমাদের অভিমত জানতে পারলে আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি সহজে, তোমরা কী বলো। ওদিকে খুড়োমশায়ের অনুরোধ শুনেছো তো, উড়িষ্যা যাত্রার আয়োজন করছি শুনে তিনি অনুরোধ করে পাঠিয়েছেন পুণ্যক্ষেত্র পুরীধাম থেকে গোবিন্দদেবের বিগ্রহ ও উৎকলেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ যেন নিয়ে আসি তাঁর জন্যে,—তাঁর শেষ-জীবনের একটি বাসনা পূর্ণ হয় তাহলে। আমি কথা দিয়েছি চেষ্টা করব —'

'মহারাজ', সূর্যকান্ত এতক্ষণ একটিও কথা বলেন নি, এবার বললেন, 'আমরা মোগলের বিরুদ্ধে লড়ব বলেই সর্বতোভাবে প্রস্তুত হচ্ছি, আমার মনে হয় এখন উড়িষ্যার দিকে যাত্রা না-করে চুপচাপ থাকাই ভালো···আমরা কেন মিছামিছি তেলা-মাথায় তেল ঢালতে যাই ? সেজন্যে অন্য সামন্তরাজারা আছেন, নেই কী ?'

'ঠিক এখন, এভাবে, মোগলের বিরুদ্ধাচরণ করতে আমার মন চাইছে না।' প্রতাপাদিত্য অকপট হলেন, 'কারণ বলি, তুমি উদয়াস্ত পরিশ্রম করে যতখানি প্রস্তুত হয়েছো, আমার ধারণা তার থেকে অনেক অ-নে-ক বেশি প্রস্তুতি দরকার মোগলের বিপক্ষে দাঁড়াতে হলে। সেজন্যে বহু বৎসর সময় লাগবে। ভুলে গেলে চলবে না যে মোগল এমন এক শক্তি যার পদানত সারা হিন্দুস্থান। যদিচ মূল লক্ষ্য আমাদের তাই তবু এখনই, এ মুহূর্তে, সেই ভূমিকা গ্রহণ করলে অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় দেওয়া হবে বলে মনে হয়। রাজনীতি-ক্ষেত্রে হঠকারিতার স্থান নেই, অনেক ভেবে, মেপে-মেপে পা ফেলতে হয়। পূর্ণ-প্রস্তুতির আগে বিপক্ষকে জানাতে নেই তলে-তলে আমরা কী করছি, তাদের প্রতি আমাদের মনোভাব কী রকম। তাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না—'

ঠিক এভাবে, এতখানি সংযম ও দূরদর্শিতা যেন আশা করা যায় নি। মহারাজের গাম্ভীর্য অটল, কিন্তু ধীর স্থির ও সংযত। উত্তরে সূর্যকান্ত কি-যেন বলতে যাচ্ছিলেন, দেখতে পেলেন মহারাজ তাকিয়ে আছেন সম্মুখস্থ মন্দিরের পানে, যেন তন্ময়। কথাগুলো তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল বটে, কিন্তু মনে হল কেন অন্য-কেউ বলিয়ে নিচ্ছে, যে-মহারাজা কিছুক্ষণ পূর্বেও দ্বিধার মধ্যে ছিলেন এখন তাঁর কণ্ঠস্বরে সংশয়হীনতার সুর ! বিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ। —তিনি বিজ্ঞ ব্যক্তি এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, প্রাজ্ঞ তো বটেনই, তবু ইদানীং ওই মন্দিরের পানে তাকিয়ে যখন কথা বলেন তখন মনে হয় যেন দৈববাণী, অন্য-কেউ ভর করেছে বুঝি ! থতিয়ে গেলেন। বিড়বিড় স্বরে শুধু বললেন, 'ছোটরাজা মশায়ের গোবিন্দদেব আর উৎকলেশ্বর'

শিবলিঙ্গের কী হবে?'

'আনতে হবে। আমি কথা দিয়েছি—'

শংকর জিজ্ঞাসা করলেন, 'দ্বিতীয় পত্রটি কার?'

'হাম্বীর মল্ল—'

'নিশ্চয় ওই একই অনুরোধ?'

'হ্যাঁ।'···ঘোর বুঝি কাটে নি এখনও, তিনি বললেন, 'শোনো, বিশেষ কয়েকটি কারণে আমি এখনই মোগলের বিরুদ্ধাচরণ করতে চাই না। প্রথমত আমি মনে করি, আমাদের শক্তি যথেষ্ট সঞ্চিত হয় নি। দ্বিতীয়ত সুবেদারের আদেশ অমান্য করলেও হিন্দু ভুইঞাদের মধ্যে অন্যতম হাম্বীর মল্লের এই চিঠির অনুরোধ উপেক্ষা করা যায় না। তৃতীয়ত পাঠানগণ জগন্নাথের মন্দির লুণ্ঠন করে এবং পূজা বন্ধ করে সর্বজাতীয় হিন্দুর কাছে যে অন্যায় আচরণের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, আমি হিন্দু হিসাবে তার নিন্দা করি এবং মনে করি, তাদের শাস্তি প্রাপ্য। চতুর্থত বীর মাত্রেই বীরত্বের পরিচয় প্রদান সর্বদা অগ্রণী, বিশেষত এ-রকম একটা বিরাট অভিযানে শিক্ষা-লাভের বহুসুযোগ থাকে, আমি এ-সুযোগ বিনষ্ট করতে চাই না—'

'তাহলে?'

প্রতাপাদিত্য বললেন, 'তোমরা প্রস্তুত হও। আমি যুদ্ধযাত্রায় বেরুব—'

বিগ্রহ দুটি পেয়ে বৃদ্ধ বসন্তরায় এত আনন্দিত যে তিনি ঘুরে ঘুরে নৃত্য করতে লাগলেন, সমস্ত মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত, ভক্ত-প্রাণের অকপট আনন্দ প্রকাশ পেতে লাগল একই কথার বারংবার পুনরুক্তিতেঃ 'অপূর্ব! অপূর্ব!—প্রতাপ, এমন সুন্দর গোবিন্দ-মূর্তি আমি কখনও দেখি নি, সাক্ষাৎ গোবিন্দ যেন! হ্যাঁ আমার একটি মনস্কামনা পূর্ণ হল বটে। তুমি অক্ষয় কীর্তিমান হও—' ভ্রাতষ্পুত্রক আশীর্বাদ করেন আর নৃত্য করতে

থাকেন।

বাস্তবিক দেব-বিগ্রহটি অপূর্ব। প্রতাপাদিত্য খুড়োমশায়ের আনন্দ দেখে হাসছিলেন। তাঁর মন ভরে গেছে।···মিত্রতার যাত্রা করা যায় নি বটে, প্রকৃত যুদ্ধেই লিপ্ত থাকতে হয়েছে সর্বক্ষণ, লাভ হয়েছে সেদিক থেকেও। মানসিংহ তাঁর বীর্যপ্রভা দেখে চমকিত হয়েছেন এবং অশেষ প্রশংসাবাক্য দ্বারা সংবর্ধিত করেছেন। মানসিংহ উৎকৃষ্ট একদল সৈন্য নিয়ে যাত্রা করেছিলেন গঙ্গাপথে, বিহারের সৈন্য নিয়ে তাঁর অধীনস্থ আর-এক সেনাপতি ঝাড়খণ্ডের মধ্য দিয়ে স্থলপথে মেদিনীপুর অভিমুখে রওনা হয়েছিলেন, অসুস্থ সৈয়দ খাঁ কোনোপ্রকারে রোগশয্যা থেকে উঠে বঙ্গ-সেনানী নিয়ে মিলিত হন তাঁর সঙ্গে; তিনি উপস্থিত হন অল্প পরে। প্রতাপাদিত্য বৃদ্ধ খুড়োমশায়ের আনন্দ-নৃত্য উপভোগ করছিলেন আর স্মৃতিপথে মোটামুটি যুদ্ধচিত্রগুলি নতুন করে ঝালিয়ে নিচ্ছিলেন, সদ্য যুদ্ধ-প্রত্যাগত, যুদ্ধের চিত্রগুলি ফুটে উঠছিল বার বার।···বিভিন্ন দিক থেকে আগত সমগ্র বাদশাহী সৈন্য একত্রিত হয়ে জংগলের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হলেন জলেশ্বরের দিকে, কেননা জানা গিয়েছিল, সুবর্ণরেখার কূলে কোনো স্থানে সমবেত হয়েছে বিদ্রোহী পাঠানগণ। সুবর্ণরেখায় কূলে কূলে আরও উত্তরে অগ্রসর হতে হয়েছিল অতঃপর, ।বদ্রোহীরা ঠিক কোন্‌স্থানে অবস্থান করছে বোঝা যায় নি, বনপুর, সুবর্ণরেখার তীরবর্তী এক গ্রাম, সন্ধান পাওয়া গেল সেইখানে। মনে পড়ছিল, মানসিংহ অপর তীরে বিপুল সৈন্যবাহিনী সমবেত করে একটি দুর্গ নির্মাণের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তা সম্ভব হয় নি পাঠান সৈন্যদের আকস্মিক ভীম-আক্রমণ।

···ওরা স্বেচ্ছায় ঝাঁপ দিয়েছিল মরণ-যজ্ঞে, এখন তাই মনে হচ্ছিল, কিংবা হয়তো বুঝতে পারে নি এবারে মোগল-পক্ষের প্রস্তুতি কী ভয়ংকর—ফলত রণক্ষেত্রে তিন শতের বেশি সাথীদের বিসর্জন দিয়ে পরাজয় বরণে বাধ্য হয় এবং আত্মরক্ষার জন্যে পলায়নে তৎপর হয়ে ওঠে। জলেশ্বর পুনর্দখল হয়েছিল, মানসিংহের নির্দেশে তাড়া করে যেতে হয়েছিল ওদের

বহুদূর পর্যন্ত, স্বেচ্ছায় এ-ভার নিয়েছিলেন তিনি এই উদ্দেশ্যে যে পথে দেখা হলে বিদ্রোহীদের দমন ও বন্দী করা যাবে আর উড়িষ্যার তীর্থ-স্থানগুলি দর্শন করে অনুসন্ধান করা যাবে কোথায় আছে গোবিন্দদেবের শ্রীবিগ্রহ এবং কিভাবে তা হস্তগত করা যায়। বিগ্রহ-মূর্তি কী সহজে কেউ হাতছাড়া করবে ?

'বাস্তবিক, কী করে সংগ্রহ করলে বলো তো ?'

উচ্ছ্বাস কমে এসেছে, বসন্তরায় কৌতূহলী নিজেই।

'ঠিক জানি না, কোনো রাজা বা জমিদার হবে বোধহয়,' প্রতাপাদিত্য বললেন, 'পাঠানেরা তাঁর আশ্রয় নিয়েছে মনে করে আমরা তাঁকে আক্রমণ করেছিলুম। তিনি তৎক্ষণাৎ সন্ধিস্থাপন করে আমাদের স্বাগত জানিয়েছিলেন তাঁর প্রাসাদে। অভ্যর্থনা করেছিলেন যোগ্যভাবে, কিন্তু থাকতে পারেন নি বেশিক্ষণ, তাঁর পূজার সময় অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছিল। আমরাও বিলম্বে ইচ্ছুক ছিলুম না, চলে আসার সময় আমার কি-খেয়াল হল, উঁকি মারলাম তাঁর পূজা-মন্দিরে···বিগ্রহ-মূর্তি দেখে চোখের পলক আর পড়ে না। শুনলাম ইনি গোবিন্দদেব এবং মনে পড়ল, এই মূর্তি সংগ্রহ করার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন আপনি। কিন্তু কী করে সংগ্রহ করি ? উনি তো স্বেচ্ছায় দান করবেন না ! তখন পায়ে পা তুলে বিবাদ বাধাতে হল, অভ্যর্থনার ত্রুটি হয়েছে বলে সোরগোল তুলি আর পাঠানেরা এখানেই কোনো গোপন স্থানে লুকিয়ে আছে বলে প্রাসাদ ও দুর্গের চারিদিক অবরোধ করে ফেলি। সেই অবস্থায় মন্দির থেকে তুলে আনি শ্রীবিগ্রহটি, কিছুতেই আনতে দেবেন না, জোর করতে হয়েছিল। আর বল্লভাচার্য নামে যে উড়িয়া ব্রাহ্মণটিকে সঙ্গে করে এনেছি তাকে বশ করেছি অর্থ দিয়ে, ওকে না আনলে বিগ্রহ-সেবার ত্রুটি হত···'

'কিন্তু বাবাজি,' বসন্তরায়ের মন খুঁতখুঁত করছিল, 'একা গোবিন্দদেবকে আনলে, ওঁর শ্রীরাধিকা মূর্তিটি কোথায় ?'

প্রতাপাদিত্য অপরাধীর মতো ক-মুহূর্ত নীরব। বললেন, 'সে-মূর্তিটিও ভারি

সুন্দর ছিল। সুবর্ণরেখা পার হবার সময় অসাবধানবশত হাত থেকে নদীমধ্যে পড়ে যায়, আমি বহু চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু কিছুতেই উদ্ধার করতে পারি নি—'

'শ্রীরাধিকা থাকলে বেশ হত। একা কেমন মানাচ্ছে না। দেখি কী করা যায়।' বসন্তরায় বললেন, 'এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার জন্যে যোগ্যস্থান নির্বাচন করো, মন্দির তোলো, সমারোহের ত্রুটি হয় না যেন। মনে রেখো তোমার উড়িষ্যাভিযানের চেয়ে এই বিগ্রহ আনয়ন ও তাঁর প্রতিষ্ঠাই বড় হয়ে উঠবে দেশবাসীর কাছে. লোকের মুখে মুখে ফিরবে তোমার নাম—'

'আপনি বলুন কোন্ স্থানে প্রতিষ্ঠা করা যায় এই বিগ্রহ? একটি কেন একাধিক মন্দির নির্মাণ করে দেব আমি, সমারোহের কোনো ত্রুটি থাকবে না এ-বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। তবে স্থানটি আমার রাজ্যাংশের মধ্যে হলেই খুশি হই—'

'বা, তুমি বিগ্রহ এনেছো এত কষ্ট করে আর প্রতিষ্ঠিত হবে অপরের রাজ্যে, তা কখনও হয়?' তিনি অল্প হেসে দরাজস্বরে বললেন, 'তোমার রাজ্যাংশে তো বটেই। আমি শুধু ভাবছিলাম, এমন একটি স্থান নির্বাচিত হলে কি-রকম হয় যাতে আমার যাতয়াতে অসুবিধা হবে না এবং তুমিও সহজে বিগ্রহ-দর্শন করতে পারো? অর্থাৎ তোমার-আমার প্রাসাদের মাঝামাঝি কোনো স্থান—'

প্রতাপাদিত্য বললেন, 'তাই হওয়া উচিত। বলুন কোন্ জায়গাটি?'

'ভাবতে একটু সময় দাও। পরে তোমাকে জানাব—'

প্রতাপাদিত্য বললেন, 'আজ তবে আসি। প্রণাম হই।'

'এসো বাবাজি—'

শুধু গোবিন্দদেব বিগ্রহ নয়, প্রতাপাদিত্য যে শিবলিঙ্গটি এনেছিলেন, উৎকল দেশ থেকে আনা হয়েছিল বলে ওর নাম উৎকলেশ্বর শিবলিঙ্গ,

যুগপৎ তার প্রতিষ্ঠা স্থানের কথাও ভাবতে হচ্ছিল তাঁকে। ওদিকে এগিয়ে যাচ্ছিল তাঁর রাজধানীর কাজ। ছ-আনা রাজ্যটি পরিচালনার সুবিধার্থে তিনি উপযুক্ত স্থান অন্বেষণে বেরিয়ে কালীঘাটে মায়ের মন্দিরে যাতায়াত করেন বেশ কয়েকবার, সেই সূত্রে বিশেষ আলাপ ও পরিচয় হয় সেবক যোগসিদ্ধ ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারীর সঙ্গে। যথার্থ যোগসিদ্ধ মহা-পুরুষ ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী। আকর্ষণ তীব্রতর হয়ে ওঠে। তাঁর সঙ্গে আলাপের ফলেই, মায়ের মন্দিরের কাছাকাছি বাস করা যাবে বিবেচনা করে, তিনি কালীঘাটের সন্নিকটে বেহালা ও বড়িষা উভয়ের মধ্যে সরশুনা গ্রামের উত্তরাংশে রাজধানী স্থাপনের স্থান নির্বাচন করেছিলেন এবং সেই-মতো কাজ এগিয়ে যাচ্ছিল। দুর্গের নির্মাণকার্য প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তিনি তার নাম রেখেছেন রায়গড়। তদারকির জন্যে মাঝে মাঝে যেতে হয় ওখানে, দেখাশোনা করতে হয়। শেষ-জীবনে যত নির্লিপ্ত থাকতে চেয়েছিলেন তিনি, ততই যেন জড়িয়ে যাচ্ছেন বিষয়কর্মে। পুত্রগণের ওপর নির্ভর করা যায় না বিশেষ, ওরা সর্বদা নিজেদের চিন্তা ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে আছে, প্রতাপ দু-আনা অংশ বেশি পেয়েছে এখনও ওদের ক্ষোভ দূরীভূত হয় নি। পাছে জ্ঞাতি-বিদ্বেষ বৃদ্ধি পায় এবং সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে সেজন্যেই তিনি নতুন রাজধানীর নির্মাণ-কার্য দ্রুত সম্পন্ন করতে চাইছিলেন …অথচ প্রতাপের আনীত মংগলময় দুটি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার যথাযোগ্য স্থান নির্বাচন করে দিতে হবে এবং মন্দির-নির্মাণকার্য যাতে উপযুক্ত হয় সেজন্যে প্রতাপ সর্বদায়িত্ব অর্পণ করেছে তাঁর উপর।…যশোর-রাজ্যের সব স্থানই তাঁর নখ-দর্পণে, সেদিনই হয়তো বলা যেত স্থান দুটির নাম, কিন্তু প্রতাপের মতিগতি ইদানীং অন্য প্রকার, দশ আনা অংশের মহারাজা সে, তার নিজস্ব নির্বাচন থাকতে পারে; জোর করে কোনো মত বা ইচ্ছা কারো ওপর আরোপ করা উচিত নয়, প্রতাপ বিগ্রহ দুটি সংগ্রহ করে এনেছে এই যথেষ্ট মনে করেছিলেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে মনে তার যা-ই থাক, প্রতাপের মানসিক অবস্থা মাঝে মাঝে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, তা না হলে

অবিবেচকের মতো কখনও যশোর-দুর্গ অবরোধ করত না ; মুখে সে যথেষ্ট ভদ্র ও নম্র, অন্তত এখনও পর্যন্ত তার আচরণে শ্রদ্ধাহীনতার লক্ষণ পাওয়া যায় নি। প্রতাপ বদলে যাচ্ছে, কিন্তু গুরুর মতো গুরুজনের মতো শ্রদ্ধার প্রকাশ আজও অটুট। তিনি প্রতাপের গুরু এবং গুরুজন বটে।···ওর জন্মকোষ্ঠী বদলে দিয়েছেন তিনি, অন্তত দাদার মৃত্যু ঘটে নি তার হাতে, দাদা স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করে পুণ্যধামে চলে গেছেন ; এখন সেইভাবে তাঁর মৃত্যু ঘটলে আর-কিছু প্রত্যাশা থাকে না। ছেলেরা বড় হয়েছে, প্রতাপ বড় হয়েছে, যশোরে শান্তি ও সুশাসন বিরাজ করছে, এই দেখতে দেখতে চক্ষু দুটি বুজতে পারলে আর-কী চাই।

'মন্দিরের কাজ কতদূর এগোল ?'

অবসাদ আসে, চিত্ত মাঝে মাঝে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে···বেশি বয়সের এই এক অভিশাপ। শক্তি শিথিল হয়েছে, গাত্রচর্মে লোলভাব দেখা দিয়েছে, এ-বয়সে নতুন করে রাজধানী স্থাপনে কারই বা ইচ্ছা হয় ? এখন ধর্মকর্ম, গোবিন্দের চরণটুকু স্মরণ করা ব্যতীত আর-কি ভালো লাগে। ঢের হয়েছে, ভোগ-বাসনায় বহুদিন যাবৎ তিনি ক্লান্ত। রাজধানী স্থাপন করতে হচ্ছে পুত্রদের নিরাপত্তার জন্যে, ওরা থাকবে ওই নতুন রাজধানীতে, প্রতাপের সংস্পর্শ থেকে দূরে ; তিনি কখনও কখনও যাবেন ওখানে, কিন্তু আছেন গোবিন্দদেব, উৎকলেশ্বর শিবলিঙ্গ, সর্বোপরি আছেন যশোরেশ্বরী··· যশোর বদলে যাচ্ছে, বদলাচ্ছে এখানকার মানুষ, প্রতাপাদিত্য স্বয়ং ; এই পরিবর্তনের ধারাটুকু লক্ষ্য করতে হবে নিবিষ্টচিত্তে, এ তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠা করা রাজ্য, গৌড়বঙ্গ সর্বশ্রেষ্ঠ নগররূপে গড়ে তোলার বাসনা ছিল, কতটুকু পেরেছিলেন তা বিচার করবে ভবিষ্যৎ···প্রতাপ তাকে চালিত করতে চাইছে অন্যদিকে, শক্তির জাগরণ ঘটিয়ে স্বাধীন রাজা হবার অসম্ভব স্বপ্ন দেখছে সে এখন থেকেই। না, সম্ভব নয়। অনেক ভেবে দেখেছেন তিনি, দুঃসাহস ছাড়া একে আর-কি বলা যায়। আগ্রা তিনি কোনোদিন যান নি, ইদানীংকালের রাজনীতির রূপ কেমন সে-বিষয়ে হয়তো

সম্যক জ্ঞান নেই কিন্তু অভিজ্ঞতার দ্বারা, বহু সংঘটিত ঘটনার বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারা, যে-সত্য তিনি উপলব্ধি করেছেন তাতে প্রতাপের একক ক্ষমতা নগণ্য মনে হয়, মোগলের বিপুল শক্তি তাকে নস্যাৎ করে দেবে। সে বুদ্ধিমানের মতো কাজ করেছে শুধু একটি, উড়িষ্যা গেছে মোগল-পক্ষে যোগ দিয়ে···

'গোবিন্দ বলছিল, তুমি নাকি রাজধানী-স্থাপনকার্যে তেমন মনোযোগ না-দিয়ে গোপালপুর আর বেদকাশীতে পড়ে আছো সব সময় ?'

ছোটরাণী কমলা ছাড়া কাছে আসে না কেউ বড়-একটা। ওর সঙ্গেই যা দু-একটা কথা হয়। অন্য রাণীদের কক্ষে বেশিক্ষণ থাকা যায় না। রাজ্য-প্রাপ্তির চুলচেরা হিসাব চলে সেখানে, ছেলেরা বানের জলে ভেসে এসেছে কিনা সেই আক্ষেপ। তিনি জানেন, অন্তঃপুর মধ্যে এ আক্ষেপ প্রচারের মূল গায়েন তাঁরই জ্যেষ্ঠপুত্র গোবিন্দরায় এবং গোবিন্দকে এ-বিষয়ে যে উদ্বুদ্ধ করছে সে ওরই সমবয়সী আশ্রিত, চাটুকার ও সুবিধাবাদী, ভবানন্দ মজুমদার। অসাধারণ ধূর্ত। ভাগ্যান্বেষণে এসেছিল যশোরে, নিরাশ্রয় ; চাটুকারিতায় বিশেষ রপ্ত বলে গোবিন্দরায়ের মন ভিজিয়ে আশ্রয় নিয়েছে এখানে এবং নিয়তই প্রতাপের বিরুদ্ধে বিষিয়ে তুলছে তার মন। গোবিন্দ-রায়ের মুখ্য পরামর্শদাতা এখন ওই ভবঘুরে ভবানন্দ মজুমদার, যাকে তিনি একদিনের আলাপেই ধরে ফেলেছিলেন কত-বড় স্বার্থান্বেষী, ছেলেটি জীবনে উন্নতি চায়, সুযোগ খুঁজছে। নির্বোধ গোবিন্দরায় বুঝতে পারছে না তার কাঁধেই মই চাপিয়ে অনাগত সৌভাগ্যের দিকে হাত বাড়াতে চায় ছেলেটি। যেমন করে হোক, যার কাছে হোক, একটি শক্ত অবলম্বন চায় সে। আজ গোবিন্দরায়কে তোষামোদ করছে, কাল প্রতাপাদিত্যকে করতে পারে, তার-পর অন্য কাউকে···এ-ধরনের চরিত্রের সঙ্গে তার পরিচয় আছে। লক্ষ্মী-কান্ত গঙ্গোপাধ্যায় ওই ধরনের চরিত্র। সে প্রতাপের আশ্রয় নিয়েছে। গোবিন্দরায় না-হয় নির্বোধ, কিন্তু প্রতাপের লোকচরিত্রজ্ঞান প্রখর, সে কেন তাকে আশ্রয় দিয়েছে বোঝা কঠিন। যশোরেশ্বরী দর্শন করতে গিয়ে

ওর সঙ্গে আলাপ, ছেলেটিকে মোটেই ভালো লাগে নি।

'যত বয়স হচ্ছে, তুমি যেন বোবা হয়ে যাচ্ছ।' ছোটরাণীর মৃদু ঝংকার শোনা গেল : 'আমার হয়েছে শতেক জ্বালা। ওদিকে গেলে প্রতাপের নিন্দায় কান পাততে পারি না, এদিকে এলে এমন নীরবতা যে কানে একটিও কথা আসে না। শাস্ত্রে সাধে কী বলেছে পঞ্চাশের পর বনে বাস করা উচিত ? আমাকে বাপু বনেই পাঠিয়ে দাও, সুখে থাকব…'

আক্ষেপ করা স্বাভাবিক। প্রতাপ ছিল ওর সর্বচিত্ত জুড়ে, আপন সন্তানের মতো চিন্তা-উদ্বেগ-মমতা জড়ানো অতীতের ক্ষণগুলি বিস্মৃত হতে পারছে না কিছুতেই, অথচ মজা এই, প্রতাপ মন্দির-গঠন বিষয়ে কবার দেখা করতে এসে একবারও ছোট-মার নামোল্লেখ করে নি, অবশ্য ব্যস্ত ছিল প্রতিবার, তার দেখা করার মতো পর্যাপ্ত সময় কই ? পরিবর্তন, বিরাট পরিবর্তন এসে গেছে প্রতাপের। ইদানীং তর্কপঞ্চাননের কাছে তন্ত্র-মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করে শক্তির উপাসনা করছে আর শোনা যায়, গুরু-প্রসাদাৎ কারণবারি সেবন করে মত্ত হয়ে থাকে অধিকাংশ সময়। তবু ভাগ্য বলতে হবে, ওর রক্তের মধ্যে আছে বৈষ্ণব ভাবরসের বীজ, ধুমঘাট দুর্গ থেকে দেড় ক্রোশ উত্তরে দক্ষিণ-বাহিনী যমুনাব পশ্চিমকূলে গোপালপুর নামক স্থানে, যে-স্থানটি মনে মনে নির্বাচন কবেছিলেন তিনি নিজে, বিপুল অর্থ ব্যয়ে মন্দির-নির্মাণ করেছে গোবিন্দদেবের জন্যে। একটি নয়, চত্বরের চারধারে চারটি উঁচু মন্দির। উত্তর ও দক্ষিণ পোতার মন্দিরে অন্য বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হবে, প্রতাপের যা অভিরুচি, সামঞ্জস্য বিধান করে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করবে সেখানে। পশ্চিম পোতাটি তো নির্দিষ্ট হয়ে আছে সাধু-সন্ন্যাসীদের আশ্রয়-গৃহরূপে—প্রতাপ নিজেই এ-ব্যবস্থা করে দিয়েছে। পূর্বদিকের পোতায় থাকবেন গোবিন্দদেব আর শ্রীরাধিকা-মূর্তি…শ্রীরাধিকা সঙ্গে আনতে পারে নি প্রতাপাদিত্য, তিনি কারিগরের সাহায্যে গঠন করেন একাধিক পিতলের শ্রীরাধিকা, খুঁতখুতে মন, তদুপরি স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে জানতে পারেন কোনো মূর্তিটিই গোবিন্দদেবের পছন্দ হয় নি, বাতিল হয়ে যায় সবগুলি

মূর্তি। পরে, মন্দিরের কাজ চলতে চলতে আবার নির্মাণ করান আর-একটি এবং সেইটি তাঁর পছন্দ হয়, সযত্নে রেখে দিয়েছে নিজের কাছে, বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাকালে নিয়ে যাবেন তিনি।...বাতিল রাধিকা-মূর্তিগুলি কিন্তু একেবারে বাতিল হয় নি, প্রতাপ চেয়ে নিয়ে গেছে এবং নতুন কৃষ্ণমূর্তি তৈরি করে ইতিমধ্যেই নানাস্থানে প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছে তাঁদের।...প্রতাপ মন্দির নির্মাণ করেছে অসংখ্য, যশোর রাজ্যে এখন মন্দিরের ছড়াছড়ি, মন্দির আর দীঘি। বিশেষত গোপালপুরে প্রায়-সমাপ্ত মন্দিরগুলির পশ্চিম দিকে যে প্রকাণ্ড দোলমঞ্চ তৈরি করা হয়েছে তা থেকে অল্প দূরে সুবৃহৎ একটি দীঘি, এত বড় দীঘি যশোরে দ্বিতীয়টি আছে কিনা সন্দেহ। এই দীঘির সঙ্গে মণিকর্ণিকার মতো তীর্থ-সরোবরের তুলনা করা যায় অনায়াসে, অন্তত তাঁর নিজের তাই মনে হয়েছে। সেজন্যেই, কপোতাক্ষীর অপর পারে, নতুন শহর প্রতিষ্ঠার ইচ্ছাতেও বটে এবং নামকরণের মোহেও বটে, উৎকলেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠার স্থান-নির্বাচন করেছিলেন; তার কাজ সমাপ্তপ্রায়। স্থানটির নাম রেখেছেন, বেদকাশী। গোপালপুরের মতো প্রকাণ্ড না-হলেও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সুন্দর একটি দীঘি খনন করেছেন সেখানে। পরম তীর্থ কাশীর মতো যশোরও হোক পুণ্যক্ষেত্র, এই ছিল বাসনা।

'আশ্চর্য! বোবা হয়ে গেলে নাকি? কথার উত্তর দেবে না?'

অল্প অল্প হাসি দেখা দিয়েছে ওষ্ঠপ্রান্তে, রসিক স্বভাবে ফিরে এসেছেন আবার, এ তাঁর দুর্লভ ক্ষমতা। বাইরে থেকে বোঝা যায় না তিনি কী গভীর চিন্তামগ্ন ছিলেন।

'বন-বাসের ইচ্ছা প্রকাশ করছিলে না?—'

ছোটরাণীর ক্রমবর্ধিত উষ্মা: 'করেছিলামই তো! কেন বনে পাঠাবে নাকি?'

'দেখ, এ জায়গাটা আগে তখন বনই ছিল।' তিনি বললেন, 'আমি তাকে মানুষের বাসের উপযুক্ত করে তুলি। এখন প্রতাপ যেভাবে মন্দির প্রতিষ্ঠা করে চলেছে তাতে বৃন্দাবন হয়ে উঠেছে বলা যায়। তোমার আক্ষেপ করা

আর সাজে না। একসঙ্গে বনে আর বৃন্দাবনে বাস করছো তুমি—'

'ছোটরাণী বললেন, 'মন্দিরের কাজ শেষ হয়ে গেছে?'

'প্রায়। বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হবে শিগগির। এই উপলক্ষে বিরাট মহোৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে প্রতাপ—'

ছোটরাণী বললেন, 'দেব-দ্বিজে ওর ভক্তি অগাধ। তবে বড় জেদী আর একরোখা।···ওর ছেলেমেয়ে দুটি বেশ বড় হয়েছে, না?'

'প্রতাপের মতোই সাহসী আর প্রতিভাবান হয়েছে ছেলে উদয়াদিত্য। আর মেয়েটি দিব্যি সুন্দর, বিমল আনন্দে এর-ওর কোল ঘুরে বেড়ায় বিমলা, আমাকে দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে কোলে। মুখখানি ঠিক ওর মায়ের মতো—'

ছোটরাণী বললেন, 'ওর মা কেমন আছে?'

'একটুও বদলায় নি। আমি গেলে প্রতাপের মতোই শ্রদ্ধা-ভক্তি করে। তোমার কথা জিজ্ঞেস করে খুঁটিয়ে—'

ছোটরাণী বললেন, 'আ-হা বড় ভালো মেয়ে! যেদিন যশোরেশ্বরী দর্শন করতে গিয়েছিলুম সেদিন কী যত্ন। ওদের কতদিন যে দেখি নি!'

'শিগগির দেখা হবে, বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার দিন। আমি এখানে থেকে শ্রীরাধিকা নিয়ে যাব, আব প্রতাপ ওখান থেকে নিয়ে আসবে গোবিন্দদেব, ওই মন্দিরটাই শেষ হচ্ছে আগে।···কে? কে ওখানে? আমার গঙ্গাজল নিয়ে এসো তো—শিগগির—'

চকিতে দ্বারপ্রান্তে তাকালেন ছোটরাণী কমলা।

'ছি। এভাবে চিৎকার করতে আছে? প্রতাপ এসেছে। তোমাকে কিছু বলবে হয়তো। এসো প্রতাপ—'

প্রতাপাদিত্য কক্ষমধ্যে প্রবেশ করলেন না। দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত দ্রুত কণ্ঠে বললেন, 'আপনাদের নিমন্ত্রণ করতে এসেছি। আগামীকাল গোপালপুরে গোবিন্দদেবের প্রতিষ্ঠা হবে। যাবেন নিশ্চয়—'

যেমন এসেছিলেন তেমনি অকস্মাৎ চলে গেলেন।

'এ কী করলে বলো তো?'
'হঠাৎ কেন জানি না, আমি অত্যন্ত ভয় পেয়েছিলাম।' বসন্তরায় বললেন, 'এ-রকম কখনও হয় না। সত্যি লজ্জিত—'

সুন্দর একেবারে তাজ্জব। এলাহি কাণ্ড। রাজসূয় ব্যাপার বোধহয় একেই বলে! মন্দিরে বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে এত অর্থব্যয় ও লোক-সমাগম দেখে তার চোখ কপালে উঠে গেছে। বিরাট মহোৎসবের আয়োজন, গোপালপুর ছোট জায়গা, দেখতে দেখতে সেখানে লোক উপ্‌চে গেল, দেশ-দেশান্তর থেকে লোক আসছে তো আসছেই···তাদের থাকা-খাওয়ার সুবন্দোবস্ত করতে বিপুল-বাহিনী রাজকর্মচারীরা হিমসিম, কে কোথায় থাকবে তার নির্দেশ দিতে-দিতেই কর্মচারীরা গলদঘর্ম। সমাগত পণ্ডিতদের দল সামলানো যায় তো সাধু-সন্ন্যাসীগণ অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন। কদিন যাবৎ ব্যস্ততার সীমা ছিল না। মহারাজা মুক্তহস্ত গোবিন্দদেব বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে, আদর-আপ্যায়ন ও দান-ধ্যানে তিনি যেন সর্বস্ব পণ করে বসে আছেন। দিগ্‌দেশ থেকে সুধীজনবৃন্দের আগমন, ব্রাহ্মণ যে কত এসেছেন, লক্ষাধিক হবে সম্ভবত, গণনায় আনা যায় না। উড়িষ্যায় যুদ্ধাভিযান অপেক্ষা, বাস্তবিক, এই গোবিন্দদেব বিগ্রহ আনয়ন ও তাঁর প্রতিষ্ঠা সারা দেশকে সচকিত করেছে এবং নাড়া দিয়েছে। পুণ্যার্থিনী পুরনারীরা এসেছেন দলে দলে। গোপালপুর লোকে লোকারণ্য।
এত লোক এসেছে, নারী ও পুরুষ, সারা যশোর ভেঙে পড়েছে গোপালপুরে, যশোরের বাইরে থেকেও এসেছেন বহু জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি···নানা লোকের আগমনে থইথই করছে ছোট্ট গোপালপুর, যেখানে মানুষের বাস ছিল না সেখানে আজ অবাধ ও অগাধ প্রাণের বন্যা, একজন, সে তো যশোরেই আছে কারো গৃহকর্ত্রী হয়ে, তার সেই সুখের সংসারে কোনোরূপ ভাঙন সৃষ্টি করতে চায় না সে; শুধু একবার চোখের দেখা, সেটুকু কী

খুব বেশি প্রত্যাশা ? পথ দিয়ে চলতে চলতে যখনই কোনো বাড়ি থেকে নারীকণ্ঠস্বর কানে বেজেছে, কেউ ডেকেছে কাউকে কিংবা আলাপ করছে গৃহমধ্যে, অমনি কান সজাগ হয়ে উঠেছে। পুষ্করিণী কিংবা দিঘির ঘাটে বারে বারে দৃষ্টি চলে গেছে ঘোমটা-ঢাকা বধূদের পানে, দলে দলে কত বধূ আসে স্নানে অথবা গাগরি ভরণে, তাদের মধ্যে একটি সেই চেনা-মুখ হবে না··· যে-মুখ শয়নে-স্বপনে অহরহ জাগরূক ? এত মন্দির চতুর্দিকে, মেয়েদের স্বাভাবিক আকর্ষণ নাকি ধর্মকর্মে, কই, একবারও দেখা হল না কোনো মন্দিরের সামনে ? প্রাণের যেখানে আকুলি-বিকুলি, লোকে বলে, সেখানে নাকি সাক্ষাৎ সম্ভব। এ-প্রবাদ মিথ্যা, অন্তত সুন্দর জোর-গলায় তা বলবে। রাজ্যের লোক এসেছে ও আসছে গোপালপুরে, এমন-কি গৌড়-দেশ থেকে এসেছে হায়দার মানকুলি এবং এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ; পরিচয় ছিল না, হায়দার মানকুলি নিজে পরিচয় করে নিয়েছিল, তরতাজা যুবক ; মহারাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিল আলাপের পর কিন্তু মহারাজা এখন ব্যস্ত বলে ওদের দাঁড় করিয়ে রেখেছে মন্দিরের পাশে, শংকরদা কিংবা সূর্যদা এলে ওদের থাকা-খাওয়ার একটা সুব্যবস্থা করে দেওয়া যাবে···কত লোকের সঙ্গে দেখা হচ্ছে এখানে দাঁড়িয়ে, এখন, শুধু একজন বুঝি ভুলে গেছে গোপালপুরে আসতে, দেখা বুঝি আর হবে না ইহ-জন্মে।

বেদনা দুঃখ ক্ষোভ জমছিল মনে। যশোরের ইতিহাসে আজ একটা পুণ্য-দিন। আজ গোবিন্দদেব প্রতিষ্ঠিত হবেন মন্দিরে। অপূর্ব কারুমণ্ডিত মন্দির, বেজায় ভিড়, চারদিকে চারটি মন্দির নির্মিত হয়েছে কী কারণে বলা শক্ত, সম্ভবত চতুর্দিকেই যাতে তিনি আশীর্বাদ দান করতে পারেন, যশোরে চিরশান্তি বিরাজ করবে তারই আয়োজন···মন্দিরের ভিড় থেকে দূরে সরে এসে অপেক্ষাকৃত নির্জন স্থানে দাঁড়িয়ে সুন্দর লক্ষ্য করছিল প্রকৃতি কেমন নিথর, মেঘ করেছে আকাশে, গুমোট আবহাওয়া। গ্রীষ্মকালের মাঝামাঝি এটা, ঝড় উঠবে নাকি ? এখন মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত, ব্রাহ্মণেরা সেবায়

বসবেন, সুন্দর দেখতে পাচ্ছিল জংগল পরিষ্কার করে ভারি ও মজবুত খোঁটার সঙ্গে বেঁধে প্রকাণ্ড সামিয়ানা টাঙানো হয়েছে যাতে আহার-কালে সূর্যতাপে ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয়। কিন্তু যেভাবে পুঞ্জীভূত মেঘ দেখা দিয়েছে ঈশান কোণে তাতে সে শঙ্কাবোধ না-করে পারল না। ঝড়-বৃষ্টি যদি হয় তাহলে সব আয়োজন পণ্ড।

'আরে হায়দার মানকুলি যে! কতক্ষণ?'

সূর্যদা এসে গেছেন। গৌড়ের অতিথির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে হল না, তিনি নিজেই উচ্ছ্বসিত হলেন।

'এই তো—'

সূর্যদা বললেন, 'বড় শুভদিনে এসেছো ভাই। সঙ্গে ও কে? সেই ব্রাহ্মণ নাকি?'

'হ্যাঁ। মহারাজার যে দূত আমাকে নির্মন্ত্রণ জানাতে গিয়েছিল, তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন এই ব্রাহ্মণকেও যেন সঙ্গে আনি—'

সূর্যদা বললেন, 'বেশ করেছো। ব্রাহ্মণেরা আহারে বসবেন এখনই, তার আয়োজনে ব্যস্ত থাকব। মহারাজার সঙ্গেও দেখা হবে না এখন, তিনি আরও বেশি ব্যস্ত। এসো আমার সঙ্গে, তোমাদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিই।'

সূর্যদা চলে গেলেন ওদের নিয়ে। ব্রাহ্মণেরা জমায়েত হয়েছেন সামিয়ানার নিচে। আহার পরিবেশিত হচ্ছে শ্রদ্ধাসহকারে। মহারাজা এসে দাঁড়ালেন বিনীত ভঙ্গিতে। প্রতিদিনই ব্রাহ্মণদের আহারের পূর্বে তিনি উপস্থিত থাকেন এবং সবিনয়ে ত্রুটি মার্জনা ভিক্ষা করে আহার গ্রহণে অনুরোধ করেন, সুন্দর দেখতে পেল, আজও তার ব্যতিক্রম হল না। অধিকন্তু বসন্তরায় মশায়ের আগমন ও তত্ত্বাবধানের ফলে ব্রাহ্মণ-সমাজ পরম প্রীত-চিত্তে আহারে মনোনিবেশ করলেন। রাজকীয় আয়োজন। কোথাও ত্রুটি ছিল না এতটুকু। ব্রাহ্মণবর্গের আহারের হাপুস-হুপুস শব্দ একটানা।

যা আশংকা করা গিয়েছিল, তাই। আহারপর্ব যখন মধ্যপথে, হঠাৎ অন্ধ-

কার করে এল আকাশ, প্রথমে ধুলি-ঝড়ের মতো বাতাসের ঘূর্ণি উঠল একটা, প্রকৃতি নিথর ক-মুহূর্ত, তারপরই দমকা ঝড়ে সামিয়ানার খুঁটি টলমল করে উঠল। ঝড়ের প্রচণ্ড বেগে সামিয়ানার খুঁটি হেলে পড়ে আহার-পর্ব বিনষ্ট হবার উপক্রম। সুন্দরের চোখে-মুখে ধুলো ঢুকে গিয়েছিল, হাত মুঠো করে সে চোখ রগড়াচ্ছিল আর তার ফাঁকে ফাঁকে দেখতে পাচ্ছিল, ঝড়ের দাপটে যজ্ঞ পণ্ড হয় আর-কি—বসন্তরায় মশায় হায়-হায় করে উঠেছেন আর মহারাজা চিত্রার্পিতের মতো স্থির···কী বা বলার আছে তাঁর, আহার সমাপ্ত করার অনুরোধ ছাড়া ? মহারাজা সেই অনুরোধ করছিলেন আর ব্রাহ্মণবর্গ সামিয়ানা ভেঙে পড়ার ভয়ে আসন ত্যাগ করবেন কিনা পরস্পর আলোচনা করছিলেন। পরিস্থিতি ক্রমশ আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছিল।

'উঠবেন না, আপনারা কেউ আহার সমাপ্ত না-করে উঠবেন না—'

বিশাল চেহারা, অমিত শক্তিধর রত্নেশ্বর এসে হাজির কোথা থেকে, সুন্দর দৌড়ে মন্দিরের ঢাকা-চত্বরে আশ্রয় নেবে কিনা ভাবছিল, দেখতে পেল, রত্নেশ্বর নড়বড়ে খুঁটিটি আঁকড়ে ধরেছে প্রাণপণ শক্তিতে···সামিয়ানার ওপরে ঝড়ের প্রচণ্ড বেগ সংহত করে ফেলেছে সে একাই। ব্রাহ্মণেরা আহারে মনোযোগী হলেন আবার।

'সাবাস।' প্রতাপাদিত্য তার পিঠ চাপড়ে দিলেন, 'তুমি আমার যজ্ঞ রক্ষা করেছো, আজ থেকে তোমার নাম রাখলাম যজ্ঞেশ্বর রায়। সূর্যকান্ত, ও হবে আমার দেহরক্ষীদলের প্রধান আর ওর পুরস্কারের বন্দোবস্ত করে দিও—'

'চিনতে পারো একে ?'

ভাবলেশহীন মুখ, পাচক ব্রাহ্মণ ফ্যালফ্যাল করে চোখ তুলে তাকাল। অপূর্ব সুন্দরী এক তরুণী। স্থিরদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে। কে এ তরুণী ? কেনই বা তাকে জিজ্ঞেস করা ?···মহারাজা বসে আছেন সিংহাসনে, প্রশ্ন

করেছেন তিনি ; একদিন ঘটনাক্রমে গৌড়ে তাঁর আহার রন্ধন করে দিয়েছিল বলেই কি তাবৎ তরুণীকুল চেনা হয়ে গেছে তার কাছে ? কী অন্বেষা ! এভাবে কেউ কাউকে চিনতে পারে নাকি ? বহুকাল নির্জনে বাস, আঘাতে আঘাতে স্মৃতি জর্জরিত, সাংসারিক সকল বন্ধন থেকে বিমুক্ত থাকা যাবে বলে একান্তে বাসের চেষ্টা, কারো সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নেই··· হায়দার মানকুলি সজ্জন ব্যক্তি, উদার-হৃদয়, অভাবে-দুঃখে বিপদে-আপদে প্রতিবেশী-সুলভ আন্তরিকতায় সাহায্য করে গেছেন বলে আজও সে টি*ঁকে আছে কোনোমতে। নিজের কোটরটুকু ছাড়া অন্য-কোথাও নড়ার ইচ্ছা ছিল না, কী হবে মোগলের উৎপাত ও শক্তিদম্ভের নজির দেখে, সোনার গৌড় ছারখার করে দিয়েছে ওরা···কত সোনার সংসার পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, নতুন করে কোনো কান্নার রাজ্যে পদার্পণে মন চায় না, কিন্তু মানকুলি, হায়দার মানকুলির অনুরোধ বা আদেশ যাই হোক, উপেক্ষা করা যায় নি—চলে এসেছে যশোরে। বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার পর কেটে গেছে বেশ কিছুদিন, বেদকাশীতে গিয়েও দেখে আসতে হয়েছে উৎকলেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা, মহারাজ প্রতাপাদিত্যের দেব-ভক্তি দেখে প্রশংসা করতে হয়। বিজয়েন্দ্র রায়, মঙ্গলগড়ের স্বর্গত জায়গীরদার, তাঁরও এ-রকম দেব-ভক্তি ছিল···কিন্তু কী হল তাতে ? পাঠান-পক্ষে যুদ্ধে নিহত হলেন তিনি আর সমগ্র পরিবার গেল ধ্বংস হয়ে ; দেবতারা কেবল নামে দেবতাই, মোগলেরা তাদের চেয়ে শক্তিমান। গভীর অভিমানে বুক ভরে আছে তার ; এখানে, যশোরেও, প্রবল দেব-ভক্তি—তাঁর করুণা কতখানি বর্ষিত হবে, আদৌ হবে কিনা সন্দেহ। ভাবতে গেলে চমক লাগে বুকের মধ্যে, চমকে ওঠে অন্তরাত্মা···গৌড় বিধ্বংস হয়েছে বলে যশোরও ধ্বংস হবে নাকি ! প্রকৃতপক্ষে পাপ, মানুষ যদি পাপ না-করে, বিশেষত রাজা, দেবতার রোষ নেমে আসে না। দাউদ খাঁর পাপ ছিল কোথাও, তাই ধ্বংস হয়ে গেছেন তিনি ; মোগলেরা পাপ করলে তারাও ধ্বংস হয়ে যাবে। যশোরে এখনও পাপের ছায়া পড়ে নি, অন্তত মহারাজ প্রতাপাদিত্যের রাজ্যব্যাপী যে সুনাম ও শ্রদ্ধা

সেখানে দেবতার আশীর্বাদ আছে মনে করা যায়। বাস্তবিক, প্রাণ ভরে গেছে এখানে এসে, মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করে। সূর্যকান্ত, যিনি গৌড়ে গিয়ে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন মহারাজের সঙ্গী হয়ে, তিনিও উদার-হৃদয় মানুষ, সামান্য পাচক হিসাবে গণনা না-করে নিজের বিরাট প্রাসাদে আশ্রয় দিয়েছেন তাকে, যত্ন করেছেন সাধ্যমতো···তিনি দাঁড়িয়ে আছেন সিংহাসনের নিচে একপার্শ্বে, উজ্জ্বল দৃষ্টি নিবদ্ধ তার মুখেই। ব্যথা ও বিস্ময় এ-কারণে। সে নগণ্য এক পাচক ব্রাহ্মণ, সংসারে তার মতামতের মূল্য দেয় নি কেউ, আজ দরবারে দাঁড়িয়ে সর্বসমক্ষে বলতে হবে তরুণী তার পরিচিতা কিনা! এত গুরুত্ব কেন তার মতামতে? কখনও দেখেছে কী?

ফের চোখ তুলল বৃদ্ধ।

'দীনুদা—?'

বহু যুগের ওপার থেকে ভেসে-আসা এক কণ্ঠস্বর, সেই মসৃণতা হয়তো নেই, কিন্তু স্বরের মধ্যে কী-যেন কী আছে···হাহাকার-ভরা বুক প্রবলভাবে নাড়া খেয়ে উঠল। মুখশ্রী বদলে গেছে, গড়নে তারতম্য, ভরে উঠেছে আগের চেয়ে অনেক বেশি, কুঁড়ি দেখলে কী ফুল চেনা যায়? তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখা দরকার কোথায় সেই ঠোঁটের নিচে কাটা চিহ্ন, খেলতে খেলতে পড়ে গিয়েছিল ছোটবেলায়, দীননাথ পাতার রস লাগিয়ে বন্ধ করে দিয়েছিল রক্ত পড়া···আছে, এখনও আছে নাকি কাটার চিহ্ন? আদলে মিলে যাচ্ছে, শৈশবের সে-মুখ কী ভোলা যায় কখনও, কিন্তু বিধাতা বড় নিষ্ঠুর, এ যদি তাঁর ছলনা হয়? বিশ্বাস করা শক্ত সেই মেয়ে এতবড় হয়েছে! নাম জানল কী করে? পুরুষ মানুষের চেহারার পরিবর্তন হয় না তেমন, কিন্তু মেয়েদের চেহারা বদলায়। স্থবির দৃষ্টি ভরে উঠেছে আগ্রহে ও উৎসাহে, আবেগে কাঁপছে অন্তর, দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে, দেখা যাচ্ছে না কিছু।

'দীনুদা, চিনতে পারছো না? আমি—'

'অরু!' কাটা-চিহ্ন চোখে পড়ে গেছে: 'অরুন্ধতী মা-আমার! তুই বেঁচে

আছিস ?'

ব্রাহ্মণ যেন মূর্ছিত হয়ে পড়ে যাচ্ছিল, সূর্যকান্ত ধরে ফেলল হাত বাড়িয়ে। 'নিপু, তুমি অরুকে অন্তঃপুরে নিয়ে যাও। আমার যা জানবার ছিল, শেষ হয়েছে।' মহারাজার নির্দেশ ঃ 'সূর্যকান্ত, তুমি ওকে বিশ্রামাগারে নিয়ে যাও। ব্রাহ্মণ বড় দুর্বল—'

নিপুণিকা বিদায় নিয়ে চলে গেছে। সুন্দর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। কেবল এড়িয়ে-এড়িয়ে যেতে হয়েছে তাকে, দেখা হলেই 'কাজ আছে' কিংবা 'আসছি' বলে সরে পড়েছে, কখনও কখনও কথা বলেছে অল্পক্ষণ দাঁড়িয়ে। কারণ এই নয় যে নিপুণিকা কুশ্রী বরং ঠিক উলটো, ওর চোখের দিকে তাকালে বিশ্বভুবন টলে যায়, নিপুণিকা সুন্দরী-শ্রেষ্ঠাদের অন্যতমা। ওর আকর্ষণ অতি তীব্র, পুষ্টাঙ্গ দেহ যেন ভরা-দীঘির মতো টলটলে, সমস্ত চেতনা বিবশ করার মতো চাতুরী জানে সে। একদিনের অভিজ্ঞতায় সারা-জীবনের জ্ঞান সঞ্চয় করেছে সুন্দর। ভয় সেখানেই।···বনে মানুষ যদিও, বন্যতা ওর মধ্যে তে[illegible] উগ্র নয়, অধিকন্তু বয়োজ্যেষ্ঠা বলে সম্ভ্রমসূচক দূরত্ব গড়ে উঠেছিল আপনা থেকে—মনে যে চিত্রটি রচিত হয়েছিল তাতে শ্রদ্ধার প্রলেপ ছিল গাঢ় রঙে রঞ্জিত। সেই মূর্তি ভেঙে যাওয়ায় এখন যেন খড়-মাটি বেরিয়ে এসেছে, তুচ্ছ আর সাধারণ হয়ে গেছে ওর আকর্ষণ। সান্নিধ্য এড়াতে হয়েছে তাই। অথচ আকর্ষণ যেখানে, যার মুখখানি ভোলা যাচ্ছে না কিছুতেই, দেখা হচ্ছে না তার সঙ্গে···মাঝে মাঝে মনে হয় মিথ্যা বলেছে নিপুণিকা, রাধা যশোরে কোনোখানে নেই, যদি সে বেঁচে থাকে তাহলে সে আছে যশোরের বাইরে অন্য কোথাও, যে জায়গার নাম সে জানে না। এখানে যদি সে থাকত, পথে-ঘাটে কিংবা মন্দিরে দেখা হয়ে যেত নিশ্চয়। পরক্ষণে ভেবেছে, মিথ্যা সংবাদে নিপুণিকার লাভ ? আশ্চর্য !

সূর্যকান্তের বিবাহ-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে বিশেষ আড়ম্বরের সঙ্গে, মহারাজা

স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন এই বিবাহে, সূর্যকান্তের অট্টালিকা থেকে নিমন্ত্রণ রক্ষা করে ফিরে আসছিল সুন্দর সৈন্যাবাসে। পথ ঘুরে আসতে হয়। তাছাড়া এত সকাল-সকাল ফিরে গিয়ে কী হবে? মদনদা কিংবা কমল খোজার সঙ্গে অবশ্য গল্প করা যায়, মদনদার ঢালী-সৈন্যসংখ্যা বেড়ে উঠছে দিনে দিনে, পঞ্চাশ হাজার হবে কি তারও বেশি; শুধু কী মদনদার সৈন্যসংখ্যা? অন্যদিকেও সৈন্যবল বেড়ে যাচ্ছে হু হু করে। ঘুরে, কামার-পাড়ার মধ্যে দিয়ে ফিবে আসতে আসতে বিভিন্ন সৈন্যশক্তির কথাই চিন্তা করছিল অন্যমনস্কভাবে, দিনে দিনে বিরাট প্রস্তুতি গড়ে উঠেছে, অশ্বারোহী সৈন্যদলের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হযেছেন প্রতাপ সিংহ দত্ত···কোথা থেকে, কীভাবে যে ইনি এলেন এবং অশ্বারোহী সৈন্যদলের অধ্যক্ষ হলেন সুন্দর তা মনে করতে পারছিল না, তবে তিনি যোগ্য ব্যক্তি এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই, ঠিক লোকটিকে ঠিক জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করার দুর্লভ গুণ আছে মহারাজার, তিনি যেখানে যে-লোকটিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, বুঝতে হবে, সেটাই তার প্রকৃত স্থান। তীরন্দাজ সৈন্য-বিভাগে যেমন আছে সে নিজে তেমনি গোলন্দাজ সৈন্য-বিভাগের কর্তা ফিরিঙ্গি ফ্রানসিস্কো রডা··· বিখ্যাত যোদ্ধা। নৌ-সেনা বিভাগের সর্বাধ্যক্ষ অগস্টাস পেড্রোর অধীনে তো বেশ-কিছু সংখ্যক পর্তুগীজ কর্তাও আছে, চাকশিরি দুর্গের অধ্যক্ষ মুয়াজ্জিম বেগ প্রায়ই আসেন তাঁর সাহায্যার্থে, প্রকৃতপক্ষে নৌ-সেনাপতি পেড্রোর তত্ত্বাবধানেই পোতাশ্রয় ও পোত-নির্মাণ স্থানসমূহের রক্ষণা-বেক্ষণের কাজ চলে, লোকটি করিতকর্মা, জলযুদ্ধে দুর্ধর্ষ।···গুপ্তসৈন্য বহু। বিপক্ষের গতিবিধি ও অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্যে এই বিভাগের সৈন্যরা বিশেষ তৎপর। নদীপথে ফিরিঙ্গি ফাঁড়িতে রণতরী চলাচলের ব্যবস্থা যেমন আছে, স্থলপথেও তেমনি কয়েকদল সৈন্য সব সময় গুপ্তভাবে নানাদিকে ভ্রমণ করে। শংকরদা বলেছিলেন, 'চার-চক্ষু না-হলে রাজার রাজ্য চলে না।' প্রতাপ সিংহ দত্তের মতো সুখা যে কোন্ দেশ থেকে এসেছে সুন্দর জানে না, তবে সুখা যে দুঃসাহসিক বীর ও গুপ্তসৈন্যের অধিনায়ক এটুকু

জানা আছে। রক্ষী-সৈন্যদলের পরিচালক-পদে রত্নেশ্বর বা যজ্ঞেশ্বর রায় যেমন নিযুক্ত তেমনি পূর্ব থেকেই ছিলেন বিজয়রাম ভঞ্জচৌধুরী…ওঁরা ছাড়া আরও অনেকে আছেন, এঁদের কাজ মহারাজা ও তাঁর পরিবারবর্গ, প্রধানমন্ত্রী ও সেনাপতির দেহরক্ষা, প্রত্যেকেই সুগঠিত শরীরের অধিকারী সাহসী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি।—পার্বত্য কুকি-সৈন্যদলটি গড়ে উঠছে ধীরে ধীরে, ওদের দলনায়ক রঘু। যুদ্ধে এরা সহজে ক্লান্ত হয় না, আহারের ক্লেশে অচঞ্চল থেকে যুদ্ধ করে যায় প্রাণপণে; মুখ চিত্র-বিচিত্র করা এদের স্বভাব, হাতে-পায়ে-গায়ে নানা অদ্ভুত আদিম জাতীয় অলংকার পরে আর যুদ্ধকালে তীর-ধনুক বর্শা ও টাঙ্গি ব্যবহার করে; যুদ্ধপ্রণালীর মধ্যেও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, শত্রুগণ তা অবগত না থাকায় ওদের অব্যবস্থিত কঠোর যুদ্ধে বিপর্যস্ত হয়ে যায়। তাছাড়া হস্তি-সৈন্যবিভাগ তো আছেই। সূর্যকান্তদা প্রধান সেনাপতি, আজ যাঁর বিবাহের ভোজ খেয়ে ফিরে আসছে সে, শংকরদা প্রধানমন্ত্রী এবং সর্বোপরি আছেন মহারাজা…

'শোনো—'

সেই বাড়িটা এসে গেছে আবার। কদিন যাবত এক রহস্যময় আকর্ষণে নিজের অজ্ঞাতে এই পথ ধরে হাঁটে সুন্দর, বাড়িটির কাছাকাছি এলেই চলার গতি শ্লথ হয়, কোনো-এক নারী-কণ্ঠস্বর শ্রবণের জন্যে কান সজাগ হয়ে ওঠে, দাঁড়িয়ে যায় আপনা থেকে। বাড়ির পাশে কামারশালায় শব্দ ওঠে জোরে জোরে, সেইদিকে চেয়ে থাকে কোনো-কোনোদিন, কখনও বা পথিপার্শ্বে ক্রীড়ারত বালকটির সঙ্গে মেতে যায় ছেলেখেলায়, একদিন ছোট তীর-ধনুক তৈরি করে উপহার দিয়েছিল তাকে—লক্ষ্যভেদের কৌশল শিখিয়ে দিয়েছিল কাছে টেনে। ছেলেটি দেখতে ভারি সুন্দর, পরের বার ধুলোর মধ্যে খেলা করতে দেখে জিজ্ঞেস করেছিল, 'অর্জুন, তোমার তীর-ধনুক কী হল?' ছেলেটি খেলা ফেলে বাড়ির দিকে চলে যাচ্ছিল, আবার ডেকেছিল তাকে, ছেলেটি উত্তরে বলেছিল, 'মা বকবে।' ছোট ছেলে, ধুলো-কাদায় খেলবে অথচ তীর-ধনুক নিয়ে খেলা করলে বকবে, এ কেমন

মা ? এবং বুঝেছিল নিষেধ করা হয়েছে বলেই ছেলেটি তাকে দেখে খেলা ফেলে উঠে চলে গেছে। অপমান বোধ হয়েছিল।…আসে নি অনেক-দিন। আসবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিল মনে মনে, তবু কে-যেন অজ্ঞাতে টেনে আনে এই পথে। কোনোদিন দেখা হয়েছে ছেলেটির সঙ্গে, কোনো-দিন সামান্যক্ষণ অপেক্ষা করে ফিরে গেছে নিজের গন্তব্য পথে। কিন্তু কখনও আহ্বান শুনে থেমে দাঁড়াতে হয় নি। কাকে ডাকল দুঃসাহসিনী বধূটি ? রাস্তা ধারের বাতায়নে একখানি মুখ, চোখ তুলে তাকিয়ে সুন্দর স্তম্ভিত। কণ্ঠস্বর শুনেই চমক লেগেছিল, চোখাচোখি হতেই সন্দেহ ভঞ্জন হল। এত কাছে ছিল রাধা, হায়, ঈশ্বরের কী নিষ্ঠুর পরিহাস !

সুন্দর চিৎকার করে কি বলতে যাচ্ছিল, তৎপূর্বে রাধা বললে, 'আমার ছেলের সঙ্গে ভাব করতে চাইছো কেন ? আমি ওর তীর-ধনুক ফেলে দিয়েছি। আর-কখনও ওকে কিছু দিও না—'

আবেগহীন নিরুত্তাপ ঠাণ্ডা গলা।

বুদ্ধিমান হলে সুন্দর আর-একটিও কথা বলত না। কিন্তু তার পক্ষে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ঠেকিয়ে রাখা কঠিন হল। ক-ত-দি-ন পরে দেখা ! কণ্ঠস্বরে কী অগাধ মাধুর্য ! কোন্ কথা বলেছে এবং কী তার অর্থ বোধগম্য হয় নি এতটুকু। ভলকে ভলকে আবেগ উঠে আসছিল, নিজেকে ধরে রাখা কঠিন হচ্ছিল। সাক্ষাৎ যদি-বা ঘটেছে, এত সংক্ষেপে সমাপ্ত হবে কেন ? বাতায়নের ওপারে একজন শুধু মুখটুকু জাগিয়ে আর পথের প্রান্তে অপরিচিতের মতো অন্যজন…দীর্ঘ অদর্শনের পরে এই কী তার যোগ্য সংবর্ধনা ? রাধা কী চিনতে পারে নি ?

সুন্দর বললে, 'রাধা, তুমি আমাকে চিনতে পারছো না ? আমি সুন্দর—'

'তাতে কি। এটা আমার শ্বশুরবাড়ি। তোমার বোঝা উচিত এখানে পূর্ব-পরিচয়ের দাম নেই।' বাতায়নবর্তিনীর কণ্ঠস্বর অপরিবর্তিত : 'তোমাকে দেখেছি আমি অনেকবার, পথেঘাটে মন্দিরে, তুমি চিনতে পারো নি। আমি চাই না যে সেই সূত্র ধরে তুমি আবার যাওয়া-আসা সুরু করো কিংবা

আমার পুত্রের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলো—'

সচেতন হল সুন্দর। বদলে গেছে রাধা-নামে সেই প্রাণোচ্ছল মেয়েটি, আজ দেহে-মনে কোথাও তার চঞ্চলতা নেই। আত্মসম্মানে লেগেছে।

'বেশ। আমি চলে যাচ্ছি। এ-পথের ছায়া আর কোনোদিন মাড়াব না। তুমি সুখী হও—'

সুন্দর মুহূর্তমাত্র অপেক্ষা না-করে হনহনিয়ে হাঁটা সুরু করে দিল। চোখে জল এসে গিয়েছিল, এই পরিণতি সে স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি। আঘাতে প্রাণের ভেতরে যত কান্না ঘনিয়ে উঠছিল, মন তত বিরূপ হয়ে উঠছিল বাতায়নবর্তিনীর প্রতি। আজ সে গৃহকর্ত্রী, অপরের বৌ, তা বলে সাধারণ সৌজন্যবোধটুকু কী প্রত্যাশা করা যায় না? নাকি অহংকার! স্বামী-পুত্র নিয়ে সুখে আছে বলে কী মানুষের সঙ্গে স্বাভাবিক ব্যবহার বিস্মৃত? বাড়ির ভেতর ডেকে কী বসাতে পারত না? ছুটো ভদ্রতামূলক কথাবার্তা বললে কী মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত? কান লাল হয়ে উঠেছে, অপমানে মুখ-মণ্ডল উত্তপ্ত, পরিখা ঘুরে সৈন্যাবাসের এলাকায় পদার্পণের ফলে নির্জনতা দূরীভূত হয়ে সঙ্গী-সাথীদের কলহাস্য বেজে উঠছিল, কে যেন পেছন থেকে ডেকে কী-কথা বললে, সুন্দর উত্তর দিল না—কারণ, সেই মুহূর্তে তার মনে হচ্ছিল মেয়েরা ভীষণ স্বার্থপর, প্রকৃতপক্ষে তাদের হৃদয়ের প্রসারতা আছে কিনা সন্দেহ! নিপুণিকা যেমন আত্মস্বার্থের চক্রে বাঁধা, রাধাও তেমনি, স্বার্থের রকম-ফের হতে পারে কিন্তু মূলত এক, মেয়েদের আত্ম-পরিতৃপ্তির চেহারা অভিন্ন। রাধাকে দেখে আবেগে উচ্ছ্বসিত না-হওয়াই উচিত ছিল, এখন সে সুখী গৃহিণী, তার সাক্ষাৎ-অন্বেষণে বৃথা কাটিয়েছে দিবস-রাতের প্রহরগুলি, অতীতের লেশমাত্র সাড়া নেই ওর মধ্যে, অথচ সে কিনা,··· ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হল নিজেকে, নির্বোধ আখ্যা দিল। বাস্তবিক নির্বোধ সে, নইলে নিপুণিকার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে কিনা ওই মেয়ের স্মৃতি সম্বল করে কাটিয়ে দিল এতকাল? আক্ষেপ জাগছিল, যত প্রকারে তিরস্কার সম্ভব, এক এক করে তার সবগুলি প্রয়োগ করছিল নিজের উদ্দেশ্যে।···

সঙ্গী-সাথীরা জটলা করছে, সূর্যদার বিবাহ-সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনায় মশগুল, এ-বিবাহে সকলেই খুশি তা ওদের টুকরো কথাবার্তায় স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। খুশি সে নিজেও, খুশি-ভরা মন নিয়েই দলচ্যুত হয়ে ফিরে আসছিল কামারপাড়ার মধ্যে দিয়ে, খুশি আরও উপ্‌চে পড়েছিল রাধার অপ্রত্যাশিত ডাক শুনে, কানায় কানায় ভরে উঠেছিল হৃদয়াবেগ। সামান্য কটি কথা, রাধা যে এত গম্ভীর হতে পারে, এমন করে কঠিনস্বরে কথা বলতে পারে তা কে জানত! ছি ছি, একটা মেয়ের কাছে কত ছোট হয়ে গেল সে!

'কিরে, কেমন খেলি?'—মদনদা ঢেঁকুর তুলছিল, বোঝা গেল তার আহার হয়েছে গুরুতর, এখন জনে জনে ডেকে এই আহারের গল্প করবে মদনদা। পরিপাটি পরিবেষণের ব্যবস্থা ছিল, রাজসিক আহারের কোথাও কোনো ত্রুটি হয় নি। সূর্যদার সাহসী হৃদয়ের মতো উদার ও অনবদ্য আহারের ব্যবস্থা, চমৎকার মানিয়েছিল তাঁকে বরবেশে। ততোধিক সুন্দর লেগেছিল অরুদিকে। হায়দার মানক্‌লি যে ব্রাহ্মণকে সঙ্গে করে এনেছিল তার কাছ থেকেই জানা গিয়েছিল অরুদির পূর্ব-পরিচয়, মহারাজ অতঃপর বিলম্ব না-করে এই বিবাহ ঘটিয়ে দিয়েছেন। অরুদির দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটল এতদিনে। সূর্যদাও পাবেন জীবনের নতুন আস্বাদ। হৃদয়ের তপস্যা কখনও ব্যর্থ হয় না, শংকরদা বলেছিলেন একদিন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো তাই, কিন্তু রাধা? রাধা কী মূল্য দিল তার তপস্যার? রাধা···

মদনদার প্রশ্নের উত্তরে শুধু ঘাড় নেড়ে সৈন্যাবাসে নিজের কক্ষটিতে ঢুকে পড়েছিল সুন্দর। সকলে এখনও বাইরে, সে-ই শুধু আনন্দোচ্ছ্বাস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কক্ষের অভ্যন্তরে স্বেচ্ছাবন্দী। বেশি রাত হয় নি, কক্ষে গাঢ় অন্ধকার। আজ কোন্ তিথি কে জানে, অন্ধকার ঘরে-বাইরে সর্বত্র। শুয়ে শুয়ে চোখের ওপর হাত রাখল সুন্দর, ভেতরটা ফের খুঁজতে লাগল তন্ন-তন্ন করে। আলো আছে মনে করে সে কী শুধু আলেয়ার পিছে ঘুরে মরেছে এতকাল? রাধা কী সত্যি হৃদয়হীন? তার জন্যে হৃদয়ে সঞ্চিত রাখে নি

কিছু ?

অন্ধকারে রাধার মুখখানি দেখা যাচ্ছিল স্পষ্ট, কখনও অতীত-রাধা উঁকি দেয় কখনও বা বর্তমান রাধার কঠিন রূপ…মেলাতে পারছিল না কিছুতেই, দুটি যেন পৃথক সত্তা, সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি নারী। এভাবে কেন বদলায় মেয়েরা ? নিরাপত্তার জন্যে ? সুখের জন্যে ?—তার নিরাপত্তা তো বিঘ্নিত করতে চায় নি সুন্দর, সুখে কাঁটা হতে চায় নি দুঃস্বপ্নেও ! তবে ?

ওই পথে ওইখানে তার হারানো-হৃদয় ফিরে পাওয়া যাবে, কে-যেন অলক্ষ্যে বার বার নির্দেশ দিয়েছে…নইলে ছোট ছেলেটি আকর্ষণ করবে কেন তাকে ? সে কী জানত ছেলেটির মায়ের নাম রাধা ? তা তো নয় ! আন্তরিক দর্শন-কামনাই ও-পথে টেনে নিয়ে গিয়েছিল এবং পরিচিত করেছিল ছেলেটির সঙ্গে। ভারি সুন্দর দেখতে ছেলেটিকে। মাতৃলক্ষণযুক্ত, রাধার মুখের কমনীয়তাটুকু সর্বাগ্রে নজরে পড়েছিল, টান বেড়ে গিয়েছিল তাই। উপহার দিয়েছিল তীর-ধনুক। আর রাধা কি না…

অর্জুন !—মনে পড়ে গেল রাধা ছেলেটির নাম রেখেছে অর্জুন। সংসারে কত নাম রয়েছে, ছেলের নাম অর্জুন কেন ? অর্জুন অব্যর্থ-লক্ষ্য তীরন্দাজ, মহাভারতের বিখ্যাত বীর, তাঁর কথা মনে করেই কী এই নামকরণ ? এ-কালের কোনো কীর্তিমান তীরন্দাজের কথা মনে পড়ে নি কী ! পুত্রের নামকরণের মধ্যে রাধা কী সেই ইংগিত ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছে ?

সম্ভবত তাই !—আ, রাধা, তোমাকে ভুল বুঝেছিলুম, ক্ষমা করো ! তৃপ্তি, গভীর পরিতৃপ্তিতে ভরে গেল তার মন।…বাইরে কে-যেন ডাকছিল, সুন্দর তখন ঘুমিয়ে পড়েছে অকাতরে।

কোথাও কী বজ্রপাত হল ? কিংবা প্রচণ্ড ভূকম্পন ? সমগ্র যশোর কী নিমজ্জিত হল ভূগর্ভে ?

না, আকাশে মেঘের লেশমাত্র নেই। নির্মল সূর্যকরোজ্জ্বলে উদ্ভাসিত

সকাল। কেউ জানে না অলক্ষ্যে কী ভীষণ দুর্যোগ ঘনিয়ে উঠেছে। পাপ, অতি ভয়ংকর একটি পাপের রক্ত-তিলক আঁকা হল যশোর-ভাগ্যদেবীর শুভ্র ললাটে!

জ্ঞাতি-বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাচ্ছিল, বিশেষত গোবিন্দরায়ের পক্ষ থেকে, কুসঙ্গ প্ররোচনায় তিনি ক্রমাগত অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছিলেন প্রতাপাদিত্যের নামে···ফলত উভয়পক্ষে মনোমালিন্য উঠেছিল তুঙ্গে, বিবাদ-বিসম্বাদ চলছিল নিয়মিত। অধিকন্তু ছোটমা, তিনি গোবিন্দদেবের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ধূমধাটে এসে আর ফিরে যান নি পুবনো যশোরে যদিচ শুনেছিলেন স্বামী ও সপত্নী পুত্রগণ সদ্য স্থানান্তরিত রায়গড় দুর্গে, প্রতাপ-সঙ্গই তাঁর অধিকতর কাম্য ছিল; ইন্ধন জোগালেন এই বলে: 'জানিস, তোকে ওরা কেউ পছন্দ করে না। তোর বাড়-বাড়ন্ত দেখে গোবিন্দরায় আর অন্য-সকলে ঈর্ষায় জ্বলে-পুড়ে মরে। তোর নিন্দায় আমি বাপু তিষ্ঠোতে পারি নি ওখানে, এখানে এসে বেশ আছি—'

'হুঁ।' প্রতাপাদিত্য পোশাক পরিবর্তন করছিলেন, সকালেই প্রচুর কারণ-বারি সেবনে চোখ লাল, সামান্য টলছিলেন: 'তোমাকে মা বলে জানি, আমার কাছে থাকো তুমি, যতখানি পারি শান্তিতে রাখব। যখন কোনো অসুবিধা হবে, আমাকে বোলো। তোমার আশীর্বাদে আজ আমার কোনো অভাব নেই।—ছোটমা তুমি যাবে না?'

'কোথায় রে?'

'সেকি! আজ তোমার শ্বশুর মশায়ের শ্রাদ্ধতিথি, রায়গড় দুর্গে মস্ত আয়োজন, খুড়োমশায় আমাকে নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছেন। আর তুমি জ্যেষ্ঠা ধর্মপত্নী, তোমাকে বাদ দিয়ে তো ধর্মাচরণ হয় না—'

'গোবিন্দরায়ের মাকে উনি একটু ভয় করেন,' কমলা দেবী ম্লান হেসে বললেন, 'হয়তো তার চাপে এবারে বাদ পড়েছি আমি। নিষ্ঠাবান হিন্দু বলে গর্ব করেন উনি। এই বুঝি তার নমুনা?'

'আমার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র হচ্ছে তা আমি জানি—'

কমলা দেবী বললেন, 'কোথায় যচ্ছিস তুই ?'

'রায়গড় দুর্গে, খুড়োমশায়ের পিতৃশ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ রক্ষায়—'

কমলা দেবী বললেন, 'যদি পারিস, এর একটা হেস্তনেস্ত করে আসিস।'

বেরিয়ে যাচ্ছিলেন প্রতাপাদিত্য, ফিরে এলেন আবার।

'কি রে ?'

তিনি হাত বাড়িয়ে তরবারি পেড়ে নিলেন দেওয়ালের গা থেকে। বললেন, 'যাচ্ছি যখন, তৈরি হয়ে যাওয়াই ভালো—'

বেরিয়ে এলেন। পুরোপুরি যোদ্ধবেশ। ছোটমা যে ইংগিত করেছেন এবং তাঁর নিজের দৃঢ়বিশ্বাস, এই জ্ঞাতি-বিদ্বেষের অন্তরালে গোঁড়া হিন্দু খুড়ো মশায় একেবারে নির্লিপ্ত নন। তাঁর পিতৃশ্রাদ্ধের পিছনে অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে কিনা কে জানে, একা যাওয়া ঠিক হবে না, সঙ্গে চলুক অন্তত বাছা বাছা কিছু সশস্ত্র শরীররক্ষী···তাতে সম্মান রক্ষা হয় এবং বিপদে বাঁচা যায়। যজ্ঞেশ্বর রায় ও বিজয়রাম ভঞ্জচৌধুরী তো যাবেই, আরও কিছু রক্ষী সঙ্গে নিলেন।

···প্রচুর কারণ-বারি সেবনে স্নায়ু উত্তেজিত বটে, কোনো কোনোদিন মাত্রা ঠিক থাকে, আজ মাত্রা বেশি হয়ে গেছে, মস্তিষ্ক বেশ উত্তপ্ত ; তদুপরি উত্তেজনার কারণ সৃষ্টি করেছেন ছোটমা স্বয়ং, সচেতন করে দিয়েছেন জ্ঞাতি-বিদ্বেষ বিষয়ে। এখন চতুর্দিকে তাঁর বাড় বাড়ন্ত, জ্ঞাতি-বিদ্বেষ স্বাভাবিক। গোবিন্দরায় বরাবর ঈর্ষা প্রকাশ করে এসেছে, জোর করে বলা যায় না 'বৈষ্ণবকুল-চূড়ামণি' বসন্তরায়-খুড়োমশায় তলে-তলে ইন্ধন যুগিয়েছেন কিনা ! মুখে না বললেও তাঁর বিষয়-নিরাসক্তি যে প্রকাণ্ড ছলমাত্র, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। তাঁর চক্রান্তেই তো আগ্রা-নির্বাসনে যেতে হয়েছিল ! তবে ?

ঘোড়ার পিঠে চাবুক পড়ল। যেন আক্রোশ ঝরে পড়ল তাতে। লাগাম ঢিলে থাকার জন্যে এমনিতে ঘোড়া ছুটছিল জোর-কদমে, চাবুক-পড়ার ফলে তার গতি বৃদ্ধি হল। দুপাশে ছিল যজ্ঞেশ্বর রায় ও বিজয়রাম

ভঞ্জচৌধুরী, তারাও ঘোড়ার পাঁজরে পায়ের আঘাত দিয়ে গতি বাড়িয়ে দিল, পেছনের রক্ষিবৃন্দ পিছিয়ে গেল একটু।···ভাবনাটা গড়িয়ে যাচ্ছিল আপন-বেগে, কেন্দ্রবিন্দু বসন্তরায়, তাঁরই পিতৃশ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ রক্ষায় যেতে হচ্ছে বলে, রায়গড় দুর্গ যত কাছে এগিয়ে আসছিল, চরিত্র-বিশ্লেষণে তাঁকে বোঝবার চেষ্টা করছিলেন তিনি। লোকে যত প্রশংসা করুক, বহুকীর্তি হয়তো স্থাপন করেছেন বসন্তরায়, কিন্তু তিনি ভীরু; স্বদেশ-প্রীতির বড় নজির উপস্থাপন করতে পারেন নি সারা জীবনেও! বরং মোগলের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে সব আয়োজন যখন প্রস্তুত, তিনি বাধা দিয়েছেন এই বলে যে মোগলের বিরুদ্ধে দাঁড়ালে ঐশ্বর্যযুক্ত যশোর-রাজ্য হস্তচ্যুত হয়ে যাবে—অর্থাৎ ভ্রাতুষ্পুত্রের বলবীর্য সম্বন্ধে তিনি সন্দিহান। সব খবর হয়তো খুড়োমশায় রাখেন না, কতদিক দিয়ে কীভাবে তিনি প্রস্তুত হয়েছেন তা যদি জানতেন তাহলে ভীরুর মতো বারে বারে নিরুৎসাহের চেষ্টা করতেন না। গোপালদেবের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আগমন করে কিছুদিন পূর্বেও একথা তিনি বুঝিয়ে গেছেন। তদ্দ্বারাই তাঁর ভীরু মানসিকতা ধরা পড়েছিল এবং বোঝা গিয়েছিল, মোগলের প্রভুত্ব স্বীকারে তিনি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নন। কিন্তু তা কেন? মোগল তাঁদের কে? কেন স্বীকার করা হবে মোগলের বশ্যতা? যশোর-রাজ্য তারা প্রতিষ্ঠা করে নি, পাঠানদের অর্থ-সম্পদেই এ-রাজ্যে শ্রী ও সমৃদ্ধি, সুবিজ্ঞ খুড়োমশায়কে বোঝানো যায় নি যে পাঠানের রাজ্য ও অর্থের অধিকারী হয়ে মোগলের বশ্যতা স্বীকার মানে বিশ্বাসঘাতকতা। খুড়োমশায় প্রকৃত অবস্থা বিবেচনা করতে উপদেশ দিয়েছিলেন, প্রকৃত অবস্থা যাই হোক এই হীনতার মধ্যে কারও মঙ্গল আসতে পারে না; এ যার মনোভাব তাকে দেশদ্রোহী বলতে কুণ্ঠা নেই। আর, সকল রাজ্যে দেশদ্রোহীর একমাত্র দণ্ড মৃত্যু, যশোর-রাজ্যেই বা তা হবে না কেন, যখন স্পষ্টত বোঝা যাচ্ছে এক দেশদ্রোহী তাঁর রাজ্যে বাস করছে আত্মীয়তার মুখোসে?

'কোথায় এলাম যজ্ঞেশ্বর?'

'আজ্ঞে সবে কালীঘাট পেরুলাম—'

'জোরে আরও জোরে চল, আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।'

আবার চাবুক পড়ল ঘোড়ার পিঠে। ঘোড়া জোর কদমে ছুটল।···হাত চলে গিয়েছিল কোমরে, হ্যাঁ সেখানে শক্ত করে বাঁধা আছে তরবারি। বসন্তরায় খুড়ামশায়কে বিশ্বাস নেই, বিশেষত তৎপুত্র গোবিন্দরায়, ওটা কাজে লাগতে পারে। চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে, মুখ ভীষণ আকার ধারণ করেছে উত্তেজনায়। একবার কোনো চিন্তা এলে সহজে সেটা মুক্ত হতে চায় না, মনের মধ্যে চেপে বসে যায়। নিজস্ব বিশ্লেষণ ধারায় গড়িয়ে যায় বহুদূর পর্যন্ত। যদিচ রায়গড় দুর্গ কাছে এসে পড়েছে এবং তিনি চলেছেন খুড়ো-মশায়ের পিতৃশ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ রক্ষায়, এখন বিরূপ চিন্তা শোভন নয়, তবু ঘটনা-বিশ্লেষণ দ্বারা নিজের মতের পক্ষে যুক্তি খাড়া করে ফেললেন একটা। সদ্য সংঘটিত ঘটনা বলেই মনে এল তৎক্ষণাৎ।—কী ভীষণ চেষ্টা করেছিলেন চাকশিরি পরগণাটি নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার জন্যে, উদ্দেশ্য আর-কিছু না, দূরদৃষ্টি দ্বারা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন পূর্বদেশীয় শত্রুর হাত থেকে রাজ্যরক্ষা করতে হলে নদীতীরবর্তী চকশ্রী বা চাকশিরিতে একটি নৌ-দুর্গ স্থাপন একান্ত প্রয়োজন। সেজন্যে তিনি বহুবার গিয়ে-ছিলেন খুড়োমশায়ে কাছে অনুরোধ নিয়ে। ইচ্ছে করলে খুড়োমশায় সে-অনুরোধ রক্ষা করতে পারতেন, কারণ চাকশিরি তাঁর শ্বশুরের ভূসম্পত্তি এবং তিনি সেখানে বাস করতেন না। এমন অনুরোধ পর্যন্ত করেছিলেন অন্য যে কোনো স্থানের বিনিময়ে চাকশিরি তাঁকে দেওয়া হোক, গোবিন্দ-রায় আপত্তি তুলেছিল প্রবল, যা স্বাভাবিক, পুত্রের কথায় তিনি কখনও বিচলিত হন নি, কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা গেল পুত্রের বিরুদ্ধে যেতে সাহসী হলেন না। চাকশিরি পাওয়া গেল না। প্রচণ্ড ক্ষোভ জমেছিল মনে, এখন মনে হচ্ছে পিতা ও পুত্র, বসন্তরায় ও গোবিন্দরায় সমভাবে দেশের শত্রু। দুজনের কারো কাম্য নয় যশোর-রাজ্য সুরক্ষিত হোক। গোবিন্দরায়ের ঈর্ষা ও বিদ্বেষ সুস্পষ্ট, লোক-মুখে তার চরিত্র প্রকাশিত ; বোঝা যায় নি বসন্ত-

রায়-খুড়োমশায়কে, তাঁর বৈষ্ণবী-বিনয়ের মধ্যে সংগোপনে ঢাকা আছে আসল চেহারা। তিনি তো ওই গোবিন্দরায়েরই পিতা!

সেইখানে আজ নিমন্ত্রণ। প্রস্তুত হয়ে এসেছেন ভেবে স্বস্তি পেলেন প্রতাপাদিত্য।

'ওই রায়গড় দুর্গ দেখা যায়—'

প্রতাপাদিত্য বললেন, 'তোমরা একটু সতর্ক থেকো।'

সরক্ষীবাহিনী তিনি দুর্গে প্রবেশ করলেন।···খুড়োমশায় শ্রাদ্ধে বসেছেন, তাঁর সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ-মানসে রক্ষীদের অপেক্ষা করতে বলে তিনি অশ্বাবতরণে উদ্যোগ করছেন—দ্বিতলের বারান্দা থেকে দেখতে পেলেন গোবিন্দরায়। সঙ্গে সঙ্গে দুর্বুদ্ধি চাপল মাথায়। প্রথমত অতিরিক্ত মদ্যপানে প্রতাপের চক্ষু লাল, দারুণ মত্তাবস্থা, তদুপরি শরীররক্ষিবৃন্দ নিয়ে প্রবেশ, এভাবে কেউ আসে না শ্রাদ্ধ-নিমন্ত্রণে—নিশ্চয় কোনো কুমতলব আছে! সশস্ত্র ও সবাহিনী প্রতাপের গতিরোধ করা উচিত এখনই, গতিরোধ কেন, স্বগৃহে এ-রকম কব্‌জায় ভবিষ্যতে আর-কখনও পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ—একেবারে গুহায় প্রবেশ করেছে প্রতাপাদিত্য, ওর শক্তির দম্ভ এখনই স্তব্ধ করে দেওয়া উচিত চিরতরে। ধনুক-বীর শুধু প্রতাপ একাই নয়, ও-বিদ্যা জানা আছে একটু-আধটু, তীরন্দাজ হিসাবে খ্যাতি আছে তাঁরও। এই সুযোগে সেটা ব্যবহার না-করলে সারাজীবন আক্ষেপ থেকে যাবে।

ভাবনাটা এল তড়িদ্বেগে এবং তৎক্ষণাৎ তীর-ধনুক এনে শর-সন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন গোবিন্দরায়। শর নিক্ষিপ্ত হল। গোপন-হত্যার উত্তেজনা প্রবল ছিল বলে তীরটি প্রতাপাদিত্যের গায়ে না-লেগে যজ্ঞেশ্বরের ঝুলন্ত জামায় আটকে গেল। চকিতে দৃষ্টি তুললেন প্রতাপাদিত্য, কে তীর ছুঁড়ল তাঁকে লক্ষ্য করে? কার এত সাহস? দেখতে পেলেন দ্বিতলের বারান্দায় গোবিন্দরায় দাঁড়িয়ে এবং প্রথম তীর ব্যর্থ হওয়ার জন্যে ধনুকে দ্বিতীয় শর যোজনায় রত। স্পষ্টত গোবিন্দরায় তাঁকে হত্যা করতে চাইছে। কী

সাংঘাতিক ! নিমন্ত্রণ করে এনে এই কী তার যোগ্য সংবর্ধনা ?···আগুন জ্বলে উঠল মাথার মধ্যে। জবাব দিতে হবে, এমন জবাব যে গোবিন্দরায় যেন কোনোদিন এভাবে কাউকে অভ্যর্থনা করতে না পারে। সেই মুহূর্তে কোষ থেকে তরবারি উন্মুক্ত করে বেগে ধাবিত হলেন দ্বিতলে, দ্বিতীয় তীর সাঁ করে চলে গেল কানের পাশ দিয়ে। অল্পের জন্যে রক্ষা পেলেন তিনি এবং শরীর-রক্ষী বিজয়রাম ভঞ্জচৌধুরী, এবারের তীরটি উত্তেজনাবশত বাঁদিক ঘেঁষে এসেছিল এবং বিজয়রামের মাথার উপর দিয়ে চলে যায়। বিজয়রাম চিৎকার করে উঠলেন, 'সাবধান মহারাজ—'

ততক্ষণে প্রতাপাদিত্য দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে উঠে গেছেন দ্বিতলে এবং ক্ষণমাত্র দ্বিধা না-করে তরবারি চালিয়ে দিয়েছেন গোবিন্দরায়ের শরীর লক্ষ্য করে। মর্মান্তিক চিৎকার করে পড়ে গেল গোবিন্দরায়। অন্দর-মহল সচকিত হল। বিভিন্ন কক্ষ থেকে আত্মীয়-স্বজন ও দাস-দাসী বেরিয়ে এসে ত্রাসে চিৎকার জুড়ে দিল। মুহূর্তে বিকট কোলাহলে পরিণত হল রায়গড় দুর্গ।···কেউ সাহস করে না এগোতে। প্রতাপের হাতে খোলা তলোয়ার এবং তাঁর মূর্তি অতি ভীষণ। সাক্ষাৎ যম যেন।

সেই ত্রাস-কোলাহলের মধ্যে সহসা একটি বজ্রগম্ভীর হাঁক শোনা গেল, 'গঙ্গাজল, আমার গঙ্গাজল আন্ শিগগির···'

অন্য কেউ নন, বসন্তরায় স্বয়ং। সেখানে শ্রাদ্ধে বসেছিলেন তিনি, সেটা কাছেই, এবং পুত্রহত্যার আকস্মিক দুর্ঘটনায় রীতিমত ক্ষিপ্ত ও উত্তেজিত। এ অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য। শাস্তি পেতেই হবে, না-হলে অপরাধী হবেন তিনি নিজে, তা সে যে-ই হোক। প্রতাপের বহু অপরাধ ইতিপূর্বে ক্ষমা করা গেছে, এটা সহ্যের অতীত। কোন্ পিতা পারে পুত্র-হত্যা সহজভাবে নিতে ?

'শিগগির নিয়ে আয় গঙ্গাজল—'

নিকটে যে ভৃত্য উপস্থিত ছিল সে বুঝল উলটো। মনে করল শ্রাদ্ধকালে যে গঙ্গাজল লাগে, রাজা মশায় তাই চাইছেন। সে দৌড়ে গিয়ে একঘটি

গঙ্গা জল এনে উপস্থিত করল।···ভৃত্যের সামান্য ভুল অসামান্য হয়ে উঠল। কারণ সময় চলে গেল, হাতে অস্ত্র পেলেন না তিনি।

প্রতাপাদিত্য শুনতে পেয়েছিলেন তাঁর চিৎকার এবং বুঝতে পেরেছিলেন সে কোন্ গঙ্গাজল···সশস্ত্র হয়ে দাঁড়ালে বহু নিপুণ যোদ্ধা তাঁর নিকট শিশুতুল্য, সেই বসন্তরায় আজ গঙ্গাজল হাতে পেলে কারো নিস্তার নেই, নিহত গোবিন্দরায়ের ব্যর্থ দুটি তীর যা করতে পারে নি, উনি তা অনায়াসে সাধিত করতে পারেন। অনিবার্য মৃত্যু। অন্তত এখন বৃদ্ধের কণ্ঠস্বরে যে উত্তেজনা প্রকাশ পাচ্ছে তার পরিণতি ভয়াবহ। অথচ আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় পলায়ন নয়, প্রতিরোধ। যে ভাবে হোক প্রতিরোধ করতে হবে বৃদ্ধের ক্রোধ-বহ্নি, সুযোগ যেন না-পান অস্ত্র-চালনায়। ছুটে গেলেন শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের ক্ষেত্রে।

'গঙ্গাজলের ঘটি নয় মূর্খ, আমার গঙ্গাজল তরবারি আন্ শিগগির। অনেক অনেক ক্ষমা করেছি প্রতাপের অপরাধ, আজ তা কড়ায়-গণ্ডায় শোধ দিতে হবে ওকে। যা শিগগির আন্—'

ভৃত্য বেরিয়ে যাচ্ছিল, তাকে ঠেলে ঢুকল প্রতাপাদিত্য। এখনও আসে নি গঙ্গাজল তরবারি, বসন্তরায় সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। কে উনি? খুড়োমশায়? তাঁর অস্ত্রশিক্ষা-গুরু? পিতা অপেক্ষাও যিনি মহৎ?—না। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যে-বৃদ্ধ, তিনি শত্রু, হাতে অস্ত্র পেলে এখনই হত্যা করবেন তাঁকে। ক'টি ক্ষণ শুধু সময়। তার আগে···তার আগে···

হাতের তরবারি সবেগে বসে গেল কণ্ঠদেশে। ধড় থেকে দ্বিখণ্ডিত হল মুণ্ড। বসন্তরায়ের পিতৃশ্রাদ্ধানুষ্ঠান ক্ষেত্র ভেসে গেল রক্তে।

···বজ্রপাত কী হল কোথাও? ভূমিকম্প? অন্তত সেই মুহূর্তে প্রতাপাদিত্য তা টের পান নি।

রাত্রে ঘুম না-এলে, একা শয্যায়, মহিষী শরৎসুন্দরী থাকেন অন্য পালংকে, মোটা ঘটনাগুলি মনে মনে পর্যালোচনা করেন তিনি। মদ্যপানাসক্তি বেড়ে গেছে ইদানিং, বেপরোয়া ভাব এসেছে একটা, বিশেষত ওই দুর্ঘটনার পর। মনে ভীষণ লেগেছে, কৃতকর্মের জন্যে অনুতাপের অন্ত নেই, তিনি যে তখন সম্পূর্ণ নিজ-আয়ত্তের বাইরে ছিলেন, ন্যায়-অন্যায় বোধহীন এক প্রচণ্ড অন্ধশক্তি তাঁর আত্মায় ভর করেছিল—একথা কেউ বুঝবে না। অনুতাপে সারা হৃদয় ভেঙে গেছে পরে, নিশীথ-রাত্রে চোখের জলে ভাসিয়ে দিয়েছেন মাথার উপাধান, বারংবার ক্ষমা চেয়েছেন ঈশ্বরের কাছে···মৃত বসন্তরায়ের আত্মার উদ্দেশ্যে ক্ষমা-প্রার্থনা জানাতে জানাতে কেটে গেছে কত বিনিদ্র রজনী কেউ তা জানে না। এখনও, এতগুলি বছর কেটে যাবার পরেও, নিদ্রার মধ্যে চমকে চমকে ওঠেন তিনি, বিড়বিড় স্বরে বলে ওঠেন, 'ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন—' নিস্তব্ধ রাত্রি শুধু মর্মরিত হয়।

আজও ঘুম আসছিল না, চুপচাপ শুয়ে যেন বিভীষিকা দেখছিলেন তিনি। কী করে এ-কাজ করলেন ? ও, কী ভয়ংকর !···শরৎসুন্দরী ওদিকের খাটে নিঃসাড় ঘুমে, তরুণ উদয়াদিত্য পার্শ্ববর্তী কক্ষে, বিমলা চলে গেছে শ্বশুর-বাড়ি। বিমলার বিবাহ খুব নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয় নি ; ক্রোধ চেপে গেলে, যে-ধরনের ক্রোধ চেপেছিল রায়গড় দুর্গে, হিতাহিতজ্ঞান থাকে না বাস্তবিক। নইলে সর্বগুণান্বিত সদ্যবিবাহিত জামাতা রামচন্দ্রের প্রতি রুষ্ট হয়ে হত্যা করতে চেয়েছিলেন কিনা তাকে ? অবশ্য অপরাধ তার সামান্য ছিল না—অন্তত মহারাজা প্রতাপাদিত্যের সম্মানের দিক দিয়ে।···অথচ তিনি নিজেই উদ্যোগী হয়ে নাবালিকা কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ স্থাপন করেছিলেন, বাকলা-অধিপতি মহারাজা কন্দর্পনারায়ণের পুত্র রামচন্দ্রের বয়স অল্প হলেও, জানা ছিল, সে অতীব বুদ্ধিমান, বলশালী ও যুদ্ধবিশারদ। কন্দর্প-নারায়ণ নিজেই তো চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের উজ্জ্বল কীর্তিস্তম্ভ। কন্যাকে

সৎবংশে ও সৎপাত্রে সম্প্রদান করা যেমন হবে, তিনি আরও একটি বিষয় চিন্তা করে দেখেছিলেন এবং সেটি বিশেষ ক্রিয়াশীল ছিল চিত্তে, বাকলা হস্তগত হবে তেমনি। ছলে-বলে-কৌশলে রাজ্যবিস্তৃতি চাই। এক্ষেত্রে উভয় উদ্দেশ্য সাধিত হবে মনে হয়েছিল। বহু প্রাচীনকাল থেকে বাকলার নাম সমগ্র ভারতবর্ষে সুপরিচিত, সমৃদ্ধশালী স্থান, প্রচুর পরিমাণে চাউল তুলা ও রেশমের বস্ত্র উৎপন্ন হয় সেখানে। রামচন্দ্র তার উত্তরাধিকারী। কন্দর্পনারায়ণের সঙ্গেই দূত-মারফত যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল, তিনি সম্মতি প্রদান করেছিলেন, কিন্তু তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে এক বছরের মতো শুভকার্য স্থগিত ছিল। বাকলার মহারাজা এখন যুবক রামচন্দ্র, বিবাহের কথা আবার উত্থাপন করলেন প্রতাপাদিত্য। পিতৃবাক্য রক্ষার জন্যে সপার্ষদ বিবাহ-আসরে উপস্থিত হলেন রামচন্দ্র···পার্ষদদের মধ্যে ছিল ভাঁড় রমাই টুঙ্গি। রামচন্দ্রের অপরাধ তিনি রমাই টুঙ্গিকে সঙ্গে এনেছিলেন, শোভন-তার মাত্রাজ্ঞান যার নিতান্ত অল্প এবং ভাঁড়ামি যার একমাত্র পেশা। প্রকৃত অপরাধী, যদি তাকে অপরাধ বলতেই হয়, কেন না ভাঁড়েদের অপরাধ ক্ষমাযোগ্য—তবে সে রমাই টুঙ্গি। তার ভাঁড়ামি সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। অথচ···

···ঘুম নেই চোখে, নানা এলোমেলো ঘটনা মনে পড়ছে, পারম্পর্যহীন। কক্ষ অন্ধকার, রাত্রি কত ঠাহর হয় না, সন্ধ্যাকালীন গুমোট ভাব তরল হয়ে ঠাণ্ডা বাতাস ভেসে আসছে—সম্ভবত কোথাও বৃষ্টি হয়েছে। এখন ঘুম আসারই কথা, ঘুমুচ্ছে শরৎসুন্দরী, হয়ত সমগ্র যশোর···আ-হা কতদিন ভালোমতো আলাপ হয় নি শরৎসুন্দরীর সঙ্গে, কন্যার বিবাহের পরে সে যেন আরও বেশি গুটিয়ে নিয়েছে নিজেকে, এত অল্প বয়সে বিমলার বিবাহ দিতে শরৎসুন্দরী ইচ্ছুক ছিল না। কিন্তু রাজ্যের বিস্তৃতি চাই, ভুঁইঞারা বশীভূত, আরও দু-একটি স্থানের কর্তৃত্ব আয়ত্তে রাখতে হবে, যেমন বাকলা; হৃদয়াবেগের স্থান তারপরে। দুর্লভ সম্মানের অধিকারী হতে পেরেছেন তিনি, সারা গৌড়বঙ্গ স্বীকার করে নিয়েছে তাঁর আধিপত্য···বাকলা,

বাকলাকে হাতে রাখতে না-পারলে ভবিষ্যতে উদ্দেশ্য সাধিত না-হতে পারে। অল্পবয়স্ক রামচন্দ্র জামাতা হলে ক্রমে ক্রমে তার ওপর প্রভাব বিস্তার করা যায় এবং বাকলাকে নিজের অধীনে আনা যায়।

…কন্যা, কন্যার চিন্তাই এখন আসছে বেশি করে। আশ্চর্য! তাকে বিধবা করতে চেয়েছিলেন বিবাহের রাত্রেই!—ক্রোধ এমনই চণ্ডাল। সমস্ত ঘটনাটি শুনছিলেন আগাগোড়া। জামাই অন্তঃপুরে বাসরঘরে প্রবেশ করেছেন এবং এ ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে, বাসর-সুন্দরীদের হাসিঠাট্টা নাকি চলছিল পুরোদমে। চারিদিকে সুন্দরীদের পরিবেষ্টন, কারো কঠোর পরি-হাসে রামচন্দ্রের মুখ লাল, কেউ-বা নিটোল বাহুর তীব্র তাড়নে তার চিত্ত-চাঞ্চল্য বাড়িয়ে তুলছে, কোনো সুন্দরী চম্পক-অঙ্গুলির চন্দ্রনখরের তীক্ষ্ণ পীড়নে বিব্রত বাড়িয়ে দিচ্ছে আরও।

জনৈকা প্রৌঢ়া মহিলাকে, অন্তত মহিলা বলেই মনে হয়েছিল সকলের, ঢুকতে দেখা গিয়েছিল এই সময়। সে কোন্ পক্ষের নিমন্ত্রিতা বোঝা যায় নি, পাত্র অথবা পাত্রীপক্ষ; সুবেশা, বাসরে প্রবেশ করেই বিব্রত রামচন্দ্রকে রক্ষার জন্যে পুরসুন্দরীদের পরিহাসের উত্তরে এমন সব কথা-বার্তা বলতে থাকে যা সব সময় শালীনতার মাত্রা বজায় রাখে নি।…তরলতা বেশি, আদিরস-মিশ্রিত। অধিকন্তু বাসর থেকে বেরিয়ে সে ঢুকে পড়ে মহারাণীর মহলে, আহারে বসেছিল দাসদাসীরা, তাদের আহার-পর্ব তদারক করছিলেন মহারাণী। প্রৌঢ়া এত দুর্বিনীত যে সে মহারাণীর কাছে গিয়ে সম্মান প্রদর্শন তো দূরের কথা, যেন সমগোত্রীয় সখী বা নিকট-আত্মীয়া, এমন ভঙ্গিতে বলে, 'এই-যে নিকষা জননী। দেখি তোমার গায়ের রঙটা আসল না নকল—'

বলে, যা কেউ কখনও চিন্তা করতে পারে না, মহারাণীর গায়ে সজোরে কাটল চিমটি। যেন তিনি সত্যি সত্যি কন্যা বিমলার গাত্রবর্ণের জন্যে দায়ী, বিমলা শ্যামলী, গায়ের রঙ ঈষৎ চাপা। কিন্তু এ কোন্ ধরনের রসিকতা? প্রৌঢ়াটি কে? তাকে কখনও দেখেছেন বলে তো মনে হয় না! সম্পূর্ণ

অপরিচিতা।—'উঃ' বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন মহারাণী, দেহ-আঘাত হয়তো সামান্য, কিন্তু যে ভাবে ও ভাষায় প্রৌঢ়া দাসদাসীর সমক্ষে তাঁকে সম্বোধন করেছেন সেই অপমানে তাঁর চিৎকার তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল এবং দ্বারপ্রান্ত থেকে ছুটে এসেছিল প্রহরী অনন্তরাঘব···প্রৌঢ়ার হাত ধরে সে টেনে বার করে দিতে চেয়েছিল, তখনই, টানাটানিতে খুলে গিয়েছিল প্রৌঢ়ার মাথার চুল। আরও টান দিতে চুল খুলে যায় একেবারে—প্রকাশিত হয় পুরুষ মূর্তি এবং চিনতে অসুবিধা হয় না যে সে রমাই টুঙ্গি, জামাতা রামচন্দ্রের ভাঁড়। ছি-ছি ধিক্কারে ভরে গিয়েছিল অন্দরমহল। গুরুতর অপরাধ। নিদারুণ ঔদ্ধত্য।—অনন্তরাঘবই সংবাদটি পরিবেশন করেছিল পার্শ্বচর মারফত, মনে পড়ছিল। পার্শ্বচর বলেছিল, 'কী দুঃসাহস! জামাতা রামচন্দ্র রমাই ভাঁড়কে রমণীবেশে অন্তঃপুরে পাঠিয়ে কেলেংকারি করেছেন—'

'কী করেছে রমাই ভাঁড়?'

জানতে চেয়েছিলেন তিনি।

'আজ্ঞে বলতে সংকোচ হয়।' পার্শ্বচর সংবাদ-পরিবেশনের নিরাসক্তি আনতে চেয়েছিলেন কণ্ঠস্বরে, তবু উত্তেজনা চাপা থাকে নি : 'কেউ কোনো সন্দেহ করতে পারে নি এমন নিখুঁত রমণীর ছদ্মবেশ ধারণ করেছিল রমাই ভাঁড়। সে বাসরে ঢুকে পুরনারীদের সঙ্গে বচসা করেছে, অশালীন কথা বলেছে। তার চেয়ে বড় অপরাধ, বলতে সাহস হয় না মহারাজ—'

'বলো আর কী করেছে রামচন্দ্রের প্রেরিত ভাঁড়? আমি শুনতে চাই।'

তিনি যে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছেন তা বুঝতে পারছিলেন পার্শ্বচর। বিশ্রী ব্যাপার ঘটতে পারে আশংকা করে পার্শ্বচর যথাসাধ্য নরমস্বরে বললেন, 'প্রহরী অনন্তরাঘব বলছিল সে নাকি—'

'থামলে কেন? বলো।'

পার্শ্বচর বললেন, 'সে নাকি এতদূর পর্যন্ত বেড়েছিল যে মহারাণীর গায়ে পর্যন্ত হাত দিয়েছে—'

'কী বললে?'

পার্শ্বচর জানাল, 'অনন্তরাঘব নিজের চোখে দেখেছে—'

'ডাকো অনন্তরাঘবকে। একখনি—'

পার্শ্বচর ডেকে আনলেন তাকে।

'রমাই টুঙ্গি কী করেছে রাঘব ?'

অনন্তরাঘব পার্শ্বচরের বক্তব্য পুনরুক্তি করল।

'রমাই টুঙ্গি এত সাহস পেল কোত্থেকে ? তুমি জানো কে তাকে পাঠিয়েছে অন্তঃপুরে ?'

অনন্তরাঘব বললে, 'আজ্ঞে আমি যখন টানতে টানতে ঘর থেকে বার করে আনছিলাম, ধরা পড়ে গিয়ে শাস্তির ভয়ে কিনা জানি না, আমাকে বলেছিল জামাতা রামচন্দ্রই তাকে ওই বেশে অন্তঃপুরে প্রবেশের পরামর্শ দিয়েছিলেন—হয়তো রঙ্গ-রসিকতা ভালোবাসেন বলেই তিনি—'

'হুম ! রঙ্গ-রসিকতা !' ক্রোধে জ্বলে উঠেছিলেন মহারাজ প্রতাপাদিত্য : 'রঙ্গ-রসিকতার মাত্রা থাকা উচিত। এ যশোর-রাজবংশের অপমান ! জামাতা হলেও সে যখন নাটের গুরু, শাস্তি তাকে পেতেই হবে। অনন্তরাঘব, তুমি ভীম সর্দারকে ডেকে দাও—'

পার্শ্বচরের সভয় জিজ্ঞাসা : 'আজ্ঞে ভীম সর্দারকে কেন ?'

'এখনই শুনতে পাবে। শাস্তিটা ভীম সর্দার দিতে পারবে ঠিকমতো—'

লম্বা অভিবাদন জানিয়ে ভীম সর্দার এসে দাঁড়ায়। দশাসই বিরাট চেহারা। আকর্ণবিস্তৃত গোঁফ, কপালে পাট-করা ফেট্টি বাঁধা আর চোখ ছুটি লাল বলে ওকে ভয়ংকর দেখায়। ভীম সর্দার বধ্যভূমির জল্লাদ। গুপ্তহত্যায় সিদ্ধহস্ত।

'ভীম সর্দার, আজ রাত্রিই আমি রামচন্দ্রের ছিন্নমুণ্ড দেখতে চাই। তুমি পারবে ?'

পুনঃ আভূমি অভিবাদন জানিয়ে ভীম সর্দার বললে, 'আমার অসাধ্য কাজ কিছু নেই, মহারাজ। লোকে বলে আমি জল্লাদ। মানুষের মুণ্ড কাটাই আমার চাকরি—'

পার্শ্বচর শিউরে উঠলেন যেনঃ 'মহারাজ, ক্ষমা করুন। রাজকুমারী বিমলার কথা চিন্তা করে দেখুন। রামচন্দ্র আপনার জামাতা। কন্যা-সম্প্রদান হয়ে গেছে—আপনি নিজের হাতে কন্যা সম্প্রদান করেছেন রামচন্দ্রের হাতে—এ হুকুম ফিরিয়ে নিন মহারাজ—'

দাঁড়িয়ে পড়েছিল ভীম সর্দার।

'তুমি যাও।' প্রতাপাদিত্য বললেন, 'সব জেনে-শুনেই তোমাকে আদেশ দিচ্ছি আজ রাত্রের মধ্যেই রামচন্দ্রের ছিন্নমুণ্ড দেখতে চাই—'

ভীম সর্দার চলে গেল।

তিনি বললেন, 'তোমরাও চলে যাও। কাউকে দরকার নেই। আমি একা থাকব—'

মহারাজ বদলে গেছেন সাংঘাতিকভাবে। এই পরিবর্তন যখন ঘটে, পার্শ্বচর দেখেছে, তখন তিনি অন্য মানুষ। বসন্তরায় হত্যার দিনের মতো রক্তাভা জমেছে চোখে, ভীষণ উত্তেজিত ভেতরে-ভেতরে, হাতে তলোয়ার থাকলে এখনই হয়তো ছুটে যেতেন জামাতা-হত্যার উদ্দেশ্যে—পলকপাতে তাই মনে হল। ভাগ্যিস তরবারি নেই, ঈশ্বর রক্ষা করেছেন সেই মহাপাপ থেকে। উনি অস্থিরভাবে পদচারণা করছেন, যেন এই মুহূর্তে জামাতার ছিন্নমুণ্ড দেখতে চান। উত্তেজনা চরমে উঠেছে, ক্রোধে ফেটে পড়ছেন বুঝিবা। এ সময়ে তিনি একা থাকতে ভালোবাসেন এবং সেই ইচ্ছা জ্ঞাপন করেছেন···গুটি গুটি বেরিয়ে এলেন পার্শ্বচর। এখনও সময় আছে, এক মহাপাপ সংঘটিত হয়েছে কয়েক বৎসর পূর্বে, দ্বিতীয় মহাপাপ রোধ করতে হবে যেমন করে হোক। কার শক্তি বা বুদ্ধি আছে মহারাজের রোষ থেকে রক্ষা করতে পারেন রামচন্দ্রকে? কে সে-ই শক্তিমান-বুদ্ধিমান ব্যক্তি? বেরিয়ে এসে দ্রুত চিন্তা করছিলেন পার্শ্বচর। প্রধানমন্ত্রী শংকর চক্রবর্তী? হয়তো তিনি পারেন, কিন্তু তাঁকে এখন পাওয়া যাবে কোথায়? বিবাহ-উপলক্ষে আগত অসংখ্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তি গিজগিজ করছে প্রাসাদে, তাঁরা অনেকেই মাননীয়, অভ্যর্থনার ভার ছিল তাঁর ওপর, এতরাত্রে তিনি

কোন্‌খানে আছেন খুঁজে পাওয়া কঠিন। দ্বিতীয় জনের নাম মনে পড়ল ঃ প্রধান সেনাপতি সূর্যকান্ত। তিনি তো চরকির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছেন এখানে-ওখানে কিংবা চলে গেছেন নিজ-আবাসে, মধ্যরাত্রি উত্তীর্ণপ্রায়, আহার-পর্ব চুকে গিয়ে ক্রমশ নিস্তব্ধ হয়ে এসেছে প্রাসাদ···কে কোথায় আছেন খুঁজে পাওয়া মুশকিল। অন্তঃপুর-মধ্যে ও বাসরেও আনন্দ-কোলাহল স্তিমিত, রমাই টুঙ্গির আচরণে গোলমাল হয়ে গিয়েছে সব। বাসর শূন্য হয়ে গেছে হয়তো, বধূ বিমলা ও জামাতা রামচন্দ্র হয়তো এতক্ষণে পুরনারীদের পরিহাস-বিমুক্ত হয়ে পরস্পর মুগ্ধ আলাপে রত কিংবা সারাদিনের ক্লান্তির পর সুখশয্যায় শায়িত, এখন তাঁদের বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাতে যাবে কে? এমন কেউ হওয়া চাই যিনি···

'রাজকুমার উদয়াদিত্য!'

ব্যস্তপদে কোনো কাজে যাচ্ছিলেন রাজকুমার উদয়াদিত্য—দেখে ডাক দিয়ে ফেলেছেন তিনি। একমাত্র উনিই পারেন এই মহাবিপদে ভগিনীপতিকে রক্ষা করতে—চকিতে মনে পড়ে গিয়েছিল তাঁকে দেখে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন উদয়াদিত্য।

'কিছু বলবেন?'

'হ্যাঁ—'

'বলুন।'

পার্শ্বচর আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বিবৃত করলেন। এমন-কি ভীম সর্দারের প্রতি মহারাজের আদেশ পর্যন্ত।

'তাহলে উপায়?'

পার্শ্বচর বললেন, 'আপনি এর একটা বিহিত করুন। অন্তত সতর্ক করে দিন জামাতা বাবাজীকে—'

'শুধু সতর্ক করে দিলেই কী হবে?' উদয়াদিত্যের স্বরে যেন অসহায়তা ঃ 'ভীম সর্দারের হাত থেকে তাঁকে রক্ষা করতে হবে তো! বাবা নিশ্চয় প্রত্যেক বহির্দ্বারে প্রহরী মোতায়েন করেছেন, পলায়নের পথও রুদ্ধ

কী করা যায়?'

'আপনি চিন্তা করলেই একটা পথ বেরুবে। দেখুন কী করতে পারেন—'

'তাই তো!'

উদয়াদিত্য চিন্তা করতে করতে চলে গেলেন। পার্শ্বচর লক্ষ্য করে দেখলেন তিনি চলেছেন বাসরের দিকে, স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন একটা। অন্ধকার রঙ্গমঞ্চে উদয়াদিত্য এখন একা, তাঁর ভূমিকা তিনি ঠিক করে নেবেন, হোক পিতা-পুত্রের লড়াই; বিবেকের কষাঘাত পড়ছিল মনে, তা থেকে অন্তত নিষ্কৃতি পেলেন তিনি। এই-বা কম কি।

অতঃপর কী ঘটেছে কেউ তা জানে না। পিতার উপযুক্ত পুত্র বটে উদয়াদিত্য! মহারাজের সমস্ত সতর্ক প্রহরা ভেদ করে, রাজকুমার সকলের নিকট পরিচিত, যেখানে বাধা পেয়েছেন সম্ভবত সে-সব ক্ষেত্রে নিজ প্রভাব ও বুদ্ধিবলে উত্তীর্ণ হয়ে, ভগিনীপতির পলায়নের পথ সুগম করে দিয়েছেন। অথচ প্রহরীরা রাজাজ্ঞায় কর্তব্যনিষ্ঠ বলে, পরে যাতে তাদের ক্ষতি না-হয়, শেষ রাতে একটি ক্ষেত্রে আবিষ্কার করা গিয়েছিল সুড়ঙ্গ পথের প্রহরী রজ্জুবদ্ধ—যেন সে প্রচণ্ড বাধা দিয়েছিল, প্রতিপক্ষের শক্তির সঙ্গে পেরে না-ওঠায় তাকে রজ্জুবদ্ধ করে তবে পলায়নের সুবিধা পেয়েছে।···চিৎকারে, গোলমালে পার্শ্বচর সেখানে দৌড়ে এসেছিলেন এবং তীক্ষ্ণ চোখে প্রহরীর ক্লেশহীন শরীরের পানে তাকিয়ে বুঝতে অসুবিধা হয় নি যে এ বন্ধন তার স্বেচ্ছাকৃত। প্রকৃতপক্ষে প্রহরী তাঁদের নিরাপদে পলায়নের সুযোগ ও সময় দেওয়ার পরই চিৎকার শোনা গিয়েছিল, কিছু করার ছিল না তখন। সুড়ঙ্গ পথের অপরপ্রান্তে খালের মধ্যে রামচন্দ্রের চৌষট্টি দাঁড়ের মহলগিরি নৌকা নোঙর করা ছিল, বড় নৌকা, কামান সজ্জিত; অতএব সহজেই অনুমান করা যায় যে তিনি রাজকুমারের সঙ্গে বাসর থেকে বেরিয়ে সুড়ঙ্গ পথে প্রবেশমুখে প্রহরী কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হন এবং প্রহরী উদয়াদিত্যকে দেখে যথারীতি সম্ভ্রম প্রকাশ করলেও অনুরোধে যদি বা সম্মত হয়, নিজের ভবিষ্যৎ-নিরাপত্তার কথা নিশ্চয় সে তোলে···উদয়াদিত্য চিন্তা করতে

থাকেন এবং অনুমান করা যায় রজ্জু-বন্ধন ঘটে তখনই। কারণ প্রহরীর সহযোগিতামূলক মনোভাব না-থাকলে তাঁদের পক্ষে এই দুর্ভেদ্য পুরী থেকে নির্গমন অসম্ভব। প্রহরীটি বুদ্ধিমান, তাকে জেরা করায় সে সোজাসুজি অস্বীকার করেছিল, 'মহারাজ, সুড়ঙ্গপথে আমি তাঁকে বাধা দিয়েছিলাম। তিনি প্রাণভয়ে ভীত ছিলেন বটে কিন্তু গায়ে অমিত শক্তি, আমার হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে দড়ির সাহায্যে হাত-পা বেঁধে ফেললেন,··· ধস্তাধস্তিতে ছিটকে পড়ে গিয়েছিল আমার হাতের অস্ত্র, অন্ধকারে যদি খুঁজে পেতেন তাহলে আমাকে আর প্রাণে বাঁচতে হত না···বাপরে কী তেজ! তবে সুড়ঙ্গ পথ ধরে তিনি বেশিদূর এগোতে পারেন নি, অন্ধকার, সাহস পান নি মনে হয়; ফিরে আমার পাশ দিয়ে অন্দরমহলে চলে গিয়েছিলেন আবার—পদশব্দে তাই মনে হয়েছিল আমার—'

'রামচন্দ্র কি একা ছিল?'···জিজ্ঞাসা করেছিলেন মহারাজা, কারণ ব্যাপারটা তাঁর কাছে রহস্যময় লেগেছিল। এই পুরীর গোপন সুড়ঙ্গ পথ রামচন্দ্রের পক্ষে চেনা তো সম্ভব নয়! অন্দরমহলে ফিরে আসার পথই বা চিনবে কী করে? সঙ্গে কেউ ছিল। সে কে?

'আজ্ঞে আমি ঠিক চিনতে পারি নি।' প্রহরী ঢোঁক গিলল: 'তবে উনি একা ছিলেন না একথা সত্যি। একা থাকলে আমি এত সহজে কাবু হতাম না—'

'ছাদে যাবার পথ দেখিয়ে দিয়েছে কে?'···মহারাজার মুখ অতিশয় গম্ভীর, ক্রোধে টলমল করছেন। রাত শেষ হয়ে আসছে, তিনি এখনও বিনিদ্র এবং ঈষৎ স্খলিত কণ্ঠস্বরে ধরা পড়ছিল যে তিনি অপ্রকৃতিস্থ, এ-রকম গুরুতর সিদ্ধান্ত কেউ সুস্থ মস্তিষ্কে গ্রহণ করতে পারেন না, পার্শ্বচর ভাবছিল। প্রহরীর উত্তর যদি সামান্য এদিক-ওদিক হয় তাহলে এই ভোর রাত্রেই তার গর্দান যাবে, ভীম সর্দারের অসমাপ্ত কর্তব্যকর্ম সুসম্পন্ন হবে অচিরে। তিনি প্রশ্নোত্তর শুনছিলেন এবং অতিরিক্ত যা শুনতে পাচ্ছিলেন তা নিজের বুকের ধকধকানি। না, সামলে নিয়েছে প্রহরী। মাতা-যশোরেশ্বরী ওর মঙ্গল

করুন !

'আমি রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় সুড়ঙ্গমুখে পড়েছিলাম,' প্রহরীর কণ্ঠতালু শুকিয়ে এসে তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল বারংবার ওষ্ঠোপরি জিব বুলানো দেখে, শুষ্ক কণ্ঠস্বর ঃ 'কিভাবে উনি ছাদে উঠেছেন তা বলতে পারব না। তবে এটা আমি জোরের সঙ্গে বলব, অনন্যোপায় হয়ে তিনি ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়েছিলেন খালের জলে, সাঁতরে চলে যান মহলগিরি নৌকার কাছে এবং মাঝি-মাল্লাদের সাহায্যে উঠে পড়েন তাতে। তাঁর আদেশে চৌষট্টি দাঁড়ে লাগে টান এবং মহলগিরি ভেসে যায় হুহু করে—'

'আমার নদী রক্ষীরাও হয়েছে তেমনি।' বিরক্ত ঝরে পড়ল তাঁর কণ্ঠস্বরে ঃ 'এক ব্যক্তি যে পালাচ্ছে এই বোধটা ফিরে পেতে এত সময় লাগল যে ততক্ষণে মহলগিরি চলে গেছে নাগালের বাইরে···মিছামিছি অনুসরণ করল কয়েকটা নৌকা, বন্দুকের গুলি খরচ হল কতকগুলো। ফল হল কী ? নাগালের বাইরে চলে গিয়ে আমাকে জানান দেবার জন্যে মহলগিরি থেকে দাগানো হল কামান, যে শব্দ শুনে আমার বুঝতে অসুবিধা হয় নি কে এই কামান দাগাল এবং কেন ? যত সব অপদার্থের দল !'

···এখন, এই বিনিদ্র মধ্যরজনীকালে, মনে হচ্ছে এ বরং ভালোই হয়েছে—রামচন্দ্রকে হত্যা করলে কন্যা বিমলা বিধবা হত, বিরোধ হয়তো জেগে রইল বরাবরকার জন্যে, তবু আর-এক মহাপাপ থেকে রক্ষা করেছেন যশোরেশ্বরী। অবশ্য পাপ-পুণ্যের জ্ঞান থাকে না ওই উত্তপ্ত মুহূর্তে, কে যে আপন কে বা পর এই বোধ যদি থাকত চরম ক্ষণে তাহলে···তাহলে আজও কী অশ্রু ঝরে দু-চোখের কোল বেয়ে, আকুল স্বরে ক্ষমা-প্রার্থনার প্রয়োজন হয় ? সংবাদ পাওয়া গেছে বিমলাকে রামচন্দ্র গ্রহণ করেন নি, সাধ্বী বিমলা, যত ছেলেমানুষ সে হোক, বিবাহের পর পিতৃগৃহ যে তার প্রকৃত গৃহ নয়, এ বোধটুকু হয়েছে বলেই শ্বশুরবাড়ির নদীঘাটে নৌকায় অবস্থান করছে ফিরে না-এসে ; কতদিন তাকে ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হবে, মনোবল অটুট থাকবে কিনা কে জানে। রামচন্দ্র আবার বিবাহ করতে পারে, কোনো-

দিন হয়তো আহ্বান না-জানাতে পারে, বিমলা যে-ধরনের জেদী মেয়ে নদীর ঘাটে নৌকাতেই হয়তো থেকে যাবে সারাজীবন—নিরপরাধী নিষ্পাপ এই মেয়ের সুখ শান্তির মূলে কুঠারাঘাত করেছে কে? ওঃ পিতা হয়ে কখনও কখনও তিনি কী ভীষণ ক্রোধান্ধ!···এই ক্রোধের বশেই তিনি হত্যা করেছেন পিতার অধিক বসন্তরায়-খুড়োমশায়কে, হত্যা, নির্মম হত্যা, আ, হাত উঠেছিল কী করে? অস্ত্র খসে পড়ে নি কেন অপঘাতের আগে? ঈশ্বরের হাতের বজ্র স্থির ছিল তখনও? হ্যাঁ তাঁর অমোঘ বজ্র নেমে আসা উচিত ছিল তাঁর শিরে। নিজের কাছে, কালের কাছে মহাঅপরাধী হতে হত না তাহলে! অপরাধ কী শুধু রায়গড় দুর্গেই শেষ? তার জের টেনে আনেন নি ধুমঘাটের অন্তঃপুর পর্যন্ত? ছোটমাকে কী ফলাও করে বলেন নি নিজের অপকীর্তিকাহিনীর কথা, যে-ছোটমার সঙ্গে খুড়োমশায়ের সম্পর্কগত দিকটি সম্পূর্ণ বিস্মৃত ছিলেন তখন? ভেবেছিলেন খুশি হবেন ছোটমা, তাঁর আদেশ মতই তো চরম হেস্তনেস্ত করে এসেছেন তিনি, গোবিন্দরায় ও তার পিতার মুণ্ডচ্ছেদ করে এসেছেন নিজের হাতে, তরবারিতে এখনও লেগে আছে রক্ত! প্রত্যক্ষ প্রমাণের জন্যে তিনি বাড়িয়ে দিয়েছিলেন রক্তাক্ত তরবারি।

ছোটমা বিশ্বাস করেন নি প্রথমে, ভেবেছিলেন অতিরিক্ত মদ্যপানহেতু ভুল বকছে, কিন্তু রক্তাক্ত তরবা' দেখার পর তাঁর চোখ-মুখ বিবর্ণ হয়ে ওঠে। কাঁপতে থাকে সর্বাংগ। অসাড় হয়ে আসে স্নায়ুতন্ত্রী। অন্ধকার দেখতে থাকেন চোখে।

'সত্যি এ-কাজ করেছিস প্রতাপ?'

'রায়গড় দুর্গে এখনও পড়ে আছে ওদের ধড় আর মুণ্ড—'

'কোষ্ঠীর ফল তাহলে ফলল! তুই পিতৃঘাতী হলি! মাগো—'

পড়ে গিয়েছিলেন তিনি। জ্ঞান ছিল না বহুক্ষণ। ধীরে ধীরে চোখ মেললেন। দেখতে পেলেন প্রতাপাদিত্য ব্যগ্র দৃষ্টিতে ঝুঁকে আছে তাঁর মুখের পানে। ক্ষীণ কণ্ঠস্বর, তিনি বললেন, 'প্রতাপ, তোমার কাছে একটা

অনুরোধ আছে। রাখবে কী বাবা?'

'নিশ্চয় রাখব।'···ঘোর কেটে এসেছিল, তিনি অনুতপ্ত: 'বলো কী করতে হবে?'

'তোমার খুড়োমশায়ের মুণ্ড এখানে আনাও।' ধীর স্বরে ছোটমার প্রার্থনা, কিন্তু তা বুঝি বজ্রের চেয়ে কঠোর: 'দাহ হবে এখানেই। আমি সতী হব—'

'ছোটমা!' আর্তনাদ করে উঠেছিলেন প্রতাপাদিত্য।

'এই আমার শেষ প্রার্থনা প্রতাপ। রক্ষা করা না-করা তোমার ইচ্ছা—'

'এ-শাস্তি আমাকে দিও না ছোটমা। আমি ভুল করেছি। বরং বলো আমি কোন্ প্রায়শ্চিত্ত করলে এই মহাপাপ থেকে উদ্ধার পাব। ছোটমা, আমার কেউ নেই তুমি চলে গেলে—'

ছেলেমানুষের মতো অঝোর ধারায় কেঁদে ফেলেছিলেন তিনি।

'ললাটের লিখন কেউ খণ্ডাতে পারে না।' তাঁর কণ্ঠস্বর অতি শান্ত ও মৃদু: 'আমি সর্বদা তটস্থ হয়ে থাকতাম, কবে কী দুর্ঘটনা ঘটে। আঁতুড় থেকে তোকে বুকের দুধ খাইয়ে বড় করেছিলাম আমি, মানুষ করে তুলেছিলেন তোর খুড়োমশায়। আমরাই তোর প্রকৃত মা-বাপ। অন্দরে আমি আগলে রাখতাম তোকে, বাইরে উনি। তোর সর্ব বিপদে-আপদে বুক দিয়ে রক্ষা করেছিলেন যে-মানুষ তাকে হত্যা করেছিস তুই নিজে, ওরে বুঝতে পারছি, এই তোর প্রকৃত পিতৃহত্যা। আমি তোকে প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেব না, কারণ এর প্রায়শ্চিত্ত আমার জানা নেই, যে ঈশ্বরের নির্দেশে তুই এ-কাজ করেছিস তিনি শাস্তি দেবেন···আমি শুধু শেষ প্রার্থনাটুকু জানিয়েছি, হ্যাঁরে এটুকু রক্ষা করা কী এতই কঠিন?'

'তুমি যখন ক্ষমা করতে পারবে না, বেশ, তবে তাই হোক—'

চোখের জল ফেলতে ফেলতে তিনি চলে গিয়েছিলেন ছোটমার আদেশ প্রতিপালনে। কাটামুণ্ড আনা হয়। ছোটমা কারো অনুরোধ শোনেন নি, চিতা সাজানো হলে অবিচলিতপদে তিনি চিতারোহণ করেছিলেন। তাঁর

স্বামীভক্তি অচলা ছিল, স্বামীর সঙ্গে তিনি স্বর্গে চলে গেছেন। ক্ষমা আশা করা যায় না তাঁর কাছ থেকে, স্ত্রী-পুত্র অন্ত্যজ হবে এই অভিসম্পাত দিয়ে গিয়েছিলেন চিতারোহণের পূর্বে, আরও কঠিন অভিসম্পাত দিতে পারতেন তিনি, অপ্রতিবাদে মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত ছিলেন···কেউ বিশ্বাস করবে না, কারো পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় কোন্ প্রতাপ এ-কাজ করেছে, তখন কোনো জ্ঞান ছিল না তাঁর, ঈশ্বর, তুমি সব জানো, তোমার ক্ষমা যেন আমি পাই···

'ঘুম হচ্ছে না বুঝি!' শিয়রে একটি কোমল করস্পর্শ, অতি ধীরে সঞ্চালিত হচ্ছে ললাটদেশে, যেন একখানি শীতল সুখঃ 'প্রায় প্রতি রাত্রেই দেখি জেগে আছো। বিড়বিড় করে বকছো। এঘরে আর কে আছে? কার সঙ্গে কথা বলো তুমি?'

'আত্মা। শরৎ, আমার আত্মা আমাকে ঘুমতে দেয় না। আমি কথা বলি আমার আত্মার সঙ্গে, দুজনে মুখোমুখি হই রাত্রি গভীর হলে। আমার দুটো আত্মা। একজন কত উদার ও মহৎ তা তুমি জানো; অন্য আত্মা ঠিক তার বিপরীত, বিবেকহীন, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য, ভয়ংকর। ওরা দুজনে কথা বলে, আমি শুধু নির্বাক শ্রোতা—'

'কিন্তু এমন করলে যে শরীর খারাপ হবে।'

হাসলেন প্রতাপাদিত্যঃ 'আমার শরীর খারাপ হয় না। কখনও শুনেছো? যাও শুয়ে পড়ো গে, আমার ঘুম আসবে আপনা থেকে—'

'না তুমি ঘুমাও আগে।'

'জুলুম?'

'তাই—'

'আমি কারো জুলুম মানি না। এ-জুলুমও মানব না। পাল্‌টা আক্রমণের জন্যে তৈরি হও—'

হেসে, মহিষীকে টেনে নিলেন দুই বিশাল বাহুর বেষ্টনে।

'জানো আমার সুখ দেখে অনেকে ঈর্ষা করে—'

সূর্যকান্ত পোশাক পরিবর্তন করে যোদ্ধবেশে সজ্জিত হচ্ছিলেন, পত্নীর কথায় সচকিত হলেন, 'তাই নাকি! ঈর্ষার কারণ?'

'বহু মেয়ের লোভ ছিল তোমাকে পতিরূপে পাবার, তাদের ইচ্ছায় বাদ সেধেছি আমি—'

'ভারি অন্যায় করেছো। ভবিষ্যতে এমন কাজটি কোরো না। আমার কত বড় ক্ষতি করলে বলো তো?'

'খালি ঠাট্টা! বেশ, আর বলব না! যশোরের সমস্ত মেয়ে তোমাকে পতিত্বে বরণ করুক, আমার আর-কি—'

'বটে! তাহলে সুযোগ নিতে হয় একটা। দাঁড়াও, ফিরে আসি হিজলী থেকে, তারপর দেখছি—'

এতক্ষণে নজরে পড়ল স্বামী সজ্জিত যোদ্ধবেশে।

'কোথায় যাচ্ছ তুমি? হিজলীর যুদ্ধে?'

সূর্যকান্ত বললেন, 'হ্যাঁ। রায়গড় দুর্গ থেকে পলায়ন করে কচু রায় আশ্রয় নিয়েছে হিজলীর ঈশা খাঁ-র দরবারে, সঙ্গে আছে কুচক্রী আত্মীয় রূপবসু, জ্ঞাতি-বিদ্বেষে গোবিন্দরায়কে সর্বাধিক উত্তেজিত করেছিলেন তিনি, এবার তার হাতিয়ার হয়েছে বালক কচু রায়, বসন্তরায়ের কনিষ্ঠ পুত্র।'

'ওর নাম তো রাঘব রায়, তোমরা কচু রায় বলো কেন?'

সূর্যকান্ত বললেন, 'আমরা কি বলি, সবাই বলে। বসন্তরায়-হত্যার দিনে এক দাসী ওকে কচুবনে লুকিয়ে রেখেছিল পাছে প্রতাপের ক্রোধে তারও মৃত্যু হয়, সেই থেকে ওর নাম কচু রায়—'

'কিন্তু ব্যাপারটা আমার কেমন যেন লাগছে।'

সূর্যকান্ত বললেন, 'যশোরের সব মেয়ে যেমন আমাকে পতিত্বে বরণ করে নেবে বলে তোমার ধারণা, এও তেমনি, একমুখী চিন্তা। মেয়েরা কাছের জিনিস দেখতে পায় ভালো মতো, এজন্যে মেয়েদের কাছছাড়া করতে নেই, দূরের জিনিস তাদের চোখে পড়ে না। ভাগ্যিস কোনো মেয়ে রাজা বা

মন্ত্রী হয় নি—'

'খুব হয়েছে বাক্যবীর! মেয়েদের প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ। শুনি ব্যাপারটা কী?'

সূর্যকান্ত বললেন, 'ব্যাপারটা একটু জটিল। বোঝাতে সময় লাগবে। তার চেয়ে বরং এক কাজ করো, তোমার অনুগত দীননাথ বা অন্য কাউকে দিয়ে রটনা করে দাও যে তাবৎ গৌড়বঙ্গের সুন্দরীগণ যেন তৈরি থাকেন, শ্রীমৎ যশোররাজ-সেনাপতি তাঁদের উদ্ধারের জন্য কৃতসংকল্প হয়েছেন···ওই কটা মেয়েকে ঠিক উদ্ধার করতে পারব···'

'ওই কটা!—শুধু যশোরেই বিবাহযোগ্যা কন্যা হবে লক্ষাধিক, তা জানো?'

ভুরু টান করে তাকাল অরুন্ধতী। যেন এই অস্ত্রেই ঘায়েল হবে বাক্যবীর স্বামী!

'মোটে!' হাসলেন সূর্যকান্ত: 'গৌড়বঙ্গে আরও দশগুণ বেশি হোক। শাস্ত্রে বলেছে, অধিকন্তু ন দোষায়। তুমি বাপু দেরি কোরো না, আজই ঢাক পিটিয়ে প্রচার করে দাও যে—'

'সামলাতে পারবে?'

'আলবত। নইলে মরদ কিসের? আগ্রা গিয়েছিলুম, বেগম-মহলের লম্বা-চওড়া ইমারত দেখে অনেকের চক্ষুস্থির। বাদশা আকবরের কত বেগম জানো? পাঁচ হাজার—'

'বলো কি!'

'সেদিক থেকে বাঙালিরা পিছিয়ে আছে অনেক, দুশো-আড়াইশোর বেশি এগোতে পারে নি কোনো কুলীন ব্রাহ্মণ। তুমি যদি ব্যবস্থা করতে পারো তাহলে সমগ্র গৌড়বঙ্গের কুমারী-কন্যাদের উদ্ধার করে বাঙালির বদ-নাম ঘোচাবার একটা দুর্লভ সুযোগ পাই। করব নাকি? হিজলী থেকে ফিরে এসেই তাহলে লেগে যাই মহৎ কাজে—এও এক রকমের দেশোদ্ধার বই কি—'

'তোমার সঙ্গে কথায় পারবার যো নেই। লক্ষ লক্ষ মেয়ে বিয়ে করতে হলে সময় দরকার। সে সময় কী তোমার আছে? কোমরে তলোয়ার গুঁজে যুদ্ধে যাওয়া যায়, বিবাহ-আসরে ও-জিনিসটা অচল।'

'কেন রাজপুত-পুরুষেরা বিবাহ করে না বুঝি?'

'বেশ বাবা বেশ, তুমি শুধু তরোয়ালটা পাঠিয়ে দিও, ওতেই সিঁদুর লেপে শুভকাজের ব্যবস্থা করা যাবে। এখন বলো হিজলী-অভিযানের দরকার পড়ল কেন?'

'প্রথমত হিজলীর নব-প্রতিষ্ঠিত পাঠান-রাজ্য রাজা বসন্তরায়ের রাজ্যাংশের ঠিক অপর পারে। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের ধারণা, এখনই পাঠানদের পর্যুদস্ত করতে না-পারলে তারাই উল্টে শক্তি সংগ্রহ করে যশোরের পশ্চিমভাগ আক্রমণ করতে পারে। দ্বিতীয়ত মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুরা বড় বাড়াবাড়ি সুরু করেছে, তাদের শাসন করা দরকার। ওরা ভাগীরথী, সরস্বতী ও রূপনারায়ণ প্রভৃতি জলপথে দেশের মধ্যে প্রবেশ করে অত্যাচার করছে নির্বিচারে. ওদের দমন করতে হলে ভাগীরথী মোহানায় সমুদ্র-কূলে অর্থাৎ সগরদ্বীপে একটি প্রধান সৈন্যাবাস স্থাপন না-করলেই নয়, এটা অনেক-দিনের পরিকল্পনা। এই সগরদ্বীপের পরপারে হিজলী রাজ্য। মোগল কর্তৃক উড়িষ্যা-বিজয়ের এতদিন পরে, যে কোনো কারণেই হোক. পাঠানগণ ওখানে এসে দলবদ্ধ হচ্ছে। হিজলী জয় করতে পারলে এ-সব আশংকা থাকে না। প্রধানত এই দ্বিবিধ কারণেই হিজলী-অভিযান অনিবার্য হয়ে উঠেছে। বুঝলে কিছু?'

এত কূট-কচালি বুঝি না বাপু। তার চেয়ে তোমার বিয়ের ঢাক বাজানো ঢের সহজ—'

'আ-হা তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক।'

'পড়ল কই?'

'কাছে এসো—'

এই নাকি বঙ্গদেশে জেস্যুইটদের সর্বপ্রথম গীর্জা! তাকিয়ে দেখছিল সুন্দর, রীতিমত জাঁকের সঙ্গে সাজানো হয়েছে এবং প্রথম উপাসনা হবে বলে ধূমধাম খুব। নাম দেওয়া হয়েছে যীশুর গীর্জা—এদের কাণ্ডই আলাদা। সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে এসেছে ওরা খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্যে—ওরা নিজেদের বলে জেস্যুইট বা যীশু-সম্প্রদায়। এক পাদরীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল কিছুদিন আগে, তার কাছে শোনাঃ ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে ইগ্নেসিয়াস লয়োলা নামে এক স্পেনদেশীয় ব্যক্তি দ্বারাই জেস্যুইট বা যীশু-সম্প্রদায় গঠিত হয়, উদ্দেশ্য জগতের সর্বদেশে খৃষ্টধর্ম প্রচার ও শিক্ষাবিস্তার, নানা প্রণালীতে লোক-সেবা।...উদ্দেশ্য অতি মহৎ নিঃসন্দেহ, কী ভীষণ ঝুঁকি নিয়ে ওঁরা দেশে-দেশে ঘুরে বেড়ায়, দুঃসাহসিক সৈন্যদল হিসাবে গণ্য করা যায় বইকি! কত পাদরী যে কত দেশে গেছে তার ইয়ত্তা নেই। নিকলাস্ পাইমেণ্টা নামে এক পাদরা ভারতীয় পরিদর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন গোয়াতে এবং তাঁরই তত্ত্বাবধানে চারজন পাদরী প্রেরিত হন বঙ্গদেশেঃ তন্মধ্যে ফ্রান্সিস ফার্ণাণ্ডেজ ও ডোমিনিক সোসা কোচিন থেকে রওনা হন বঙ্গদেশের অভিমুখে আর বাকি দুজন, মেলকিওর ফন্‌সেকা ও এনড্রু বাউয়েস, একই উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন পর বৎসর—পাদরীর কাছ থেকে জেনেছিল সুন্দর।

সহজে যশোরে আসতে পারেন নি ওঁরা কেউই—কোচিন থেকে হুগলীর পথে চট্টগ্রামে আসেন প্রথমে, সেখান থেকে ডিয়াঙ্গায় অবস্থান করেন বেশ কিছুকাল। ফার্ণাণ্ডেজ ও সোসা যখন ব্যাণ্ডেলে এসে পৌঁছান, পর্তুগীজ পল্লীমাত্রেরই সাধারণ নাম ব্যাণ্ডেল বা বন্দর, ডিয়াঙ্গাও তাই; মহারাজ প্রতাপাদিত্য তাঁদের যশোরে গিয়ে সাক্ষাৎ করবার জন্যে লোক-মারফত বলে পাঠান। কিন্তু তখন সে-অনুরোধ রক্ষা করা তাঁদের পক্ষে সম্ভবপর হয় নি। ডিয়াঙ্গায় গিয়ে ফার্ণাণ্ডেজ যখন শুনলেন যে যশোরে না-যাওয়ায় রাজা ক্রুদ্ধ হতে পারেন, তখন পাঠিয়ে দেন সঙ্গী সোসাকে।...যশোর রাজদরবারে ফাদার সোসা নাকি অত্যন্ত সমাদরের সঙ্গে গৃহীত হয়েছিলেন,

এমন-কি, মহারাজ নিজ পরিত্রাণ সম্বন্ধীয় বিষয়গুলি নিয়ে আলাপ পর্যন্ত করেছিলেন কিছুক্ষণ !—এমন সমাদর ওঁরা কেউ আশা করেন নি।

'তোমরা গীর্জা তৈরি করার হুকুম পেলে কি করে ?'

'ফন্‌সেকা তখন এসে গেছেন যশোরে ; পাদরী বললেন, 'ইছামতীর কূলে যেখানে তাঁরা বাস করতেন সেখানে একটা বড় জায়গা ফাঁকা পড়েছিল। রাজা তাঁদের প্রতি সহানুভূতিশীল বুঝে তিনি সেই জমিটি প্রার্থনা করে বসেন একদিন—রাজা তৎক্ষণাৎ সে-প্রার্থনা মঞ্জুর করে ফর্মান প্রস্তুত করতে বলেন এবং আজ্ঞা দেন যে ওখানে বাড়ি তৈরি হলে যে-সব হিন্দু, অর্থাৎ নতুন খৃষ্টানেরা, বাস করবে তারা রাজাকে কর না-দিয়ে আমাদেরই দেবে—শুনে সকলে এত আহ্লাদিত হয়েছিলেন যে—'

'আহ্লাদিত হবার মতো কথা বটে ! তা তোমরা বাড়ি না তুলে গীর্জা তৈরি করেছো, বেশ হয়েছে, কিন্তু গীর্জা তৈরি করার এত অর্থ পেলে কোত্থেকে ?'

'বা, রাজানুগ্রহ লাভ করলে রাজ্যমধ্যে অর্থ-সংগ্রহ বা কার্য-সাধনের ব্যাঘাত হয় নাকি ?' পাদরী ওর সরল জিজ্ঞাসায় বিমুগ্ধ : 'বিশেষত যে-রাজ্যে এত পর্তুগীজ সৈন্যদলে ও নানাবিভাগে কর্মরত। তারা প্রচুর অর্থ-সাহায্য করেছে—রাজা সাহায্য করেছেন মালপত্র দিয়ে। একমাসে তৈরি হয়ে গেছে এত বড় গীর্জা—'

বাস্তবিক তাই। নভেম্বর মাসের শেষভাগে ফন্‌সেকা যশোরে এসেছিলেন, সেই বছরের ডিসেম্বরের মধ্যেই গীর্জার কাজ শেষ। চতুর্দিক থেকে সাহায্য পেয়েছিলেন ফন্‌সেকা। কোথাও ত্রুটি নেই, নিখুঁত গীর্জা-ইমারতখানির পানে তাকিয়ে মনে মনে প্রশংসাই করছিল সুন্দর, করিতকর্মা লোক বটে ফাদার ফন্‌সেকা !

'কী দেখছিস হাঁ করে ?'

মদনদা। বিরাট চেহারা নিয়ে হাঁসফাঁস করে এসে গেছেন তিনিও।

'মহারাজ এইমাত্র ভেতরে ঢুকেছেন। আমি গীর্জার কারুকাজ দেখছিলাম—'

মদনদা যেন ধমক দিলেন।

'খুব হয়েছে। চল্ ভেতরে—'

এক রকম টেনে নিয়েই ভেতরে ঢোকালেন মদনদা। রাজার কাছছাড়া হতে চান না মদনদা, যদিচ সরক্ষীবাহিনী প্রবেশ করেছেন মহারাজা। সভাসদের দলও আছেন সঙ্গে।···ভেতরটি আরও ছিমছাম, পরিচ্ছন্ন। একটি পবিত্র আবহাওয়া। সুবৃহৎ উপাসনা কক্ষটি এমন চমৎকার সাজানো যে পা ফেলতে সংকোচ হয়, ভক্তিতে পরিপ্লুত হয়ে যায় মন। চারিদিক তাকাতে তাকাতে এগিয়ে যাচ্ছিলেন মহারাজা, সুন্দর দেখতে পেল, তাঁর গতিভঙ্গি শ্লথ। উচ্চ প্রশংসা করছিলেন তিনি গীর্জার সাজসজ্জা দেখে, কানে এল প্রশংসাবাক্য। ফাদার ফন্‌সেকা আছেন পাশে, তিনি বিশদভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন দেওয়ালে টাঙানো চিত্রগুলির পশ্চাৎ-কাহিনী···কত চিত্র যে টাঙানো রয়েছে দেওয়ালে। মেরী ও যীশু নাম দুটি বার বার কানে ভেসে আসছিল। অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন মহারাজ প্রতাপাদিত্য। মন্দিরে প্রবেশ-পূর্ব ভক্ত যেমন জুতো খুলে রাখে বহিঃদ্বারে, প্রধান চ্যাপেলটির নিকটে যাবার আগে তেমনি তিনি জুতো খুলে শূন্য পদে সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর উপবেশনের জন্য সুদৃশ্য আরামদায়ক একটি কেদারা সংগ্রহ করে এনেছিলেন ফাদার ফন্‌সেকা, সেটি ছিল পাশেই, অনুরোধ করলেন তিনি, কিন্তু মহারাজ উপবেশনে সম্মত হলেন না···এমন-কি কার্পেটেও নয়, তিনি সিঁড়ির উপরেই বসতে চেয়েছিলেন, একখানি ছোট মাদুর পেতে দেওয়া হল শুধু। সেইভাবে বসে তিনি প্রশ্ন করতে লাগলেন নানা খুঁটিনাটি বিষয়ে, যা চোখে পড়ছিল, গীর্জার বেদীর উপর রক্ষিত দুলভ দ্রব্যগুলি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা যেমন, অন্যান্য জিনিসগুলি সম্বন্ধেও একই কৌতূহল। ফাদার ফন্‌সেকা তাঁকে উত্তরদানে সন্তুষ্ট করতে পেরেছিলেন মনে হয়। কারণ, মহারাজ তাঁকে একটি পাথরের গীর্জা নির্মাণের অনুমতি দিলেন—যে গীর্জা বঙ্গদেশের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট হবে।

…হয়তো সে-গীর্জা নির্মিত হত, কিন্তু হাওয়া ঘুরে গিয়েছিল অতি দ্রুত, ওঁদের বিপক্ষে তো বটেই। তাছাড়া যুদ্ধ, কেবল যুদ্ধ। পাথরের গীর্জা নির্মিত হয়েছিল কিনা সুন্দর অন্তত জানে না। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সে আর ফিরে আসতে পারে নি। মুখ, একখানি মুখ বুঝি ভেসে উঠেছিল মৃত্যুকালে, মেরী-মাতার সঙ্গে সে-মুখের বুঝি মিল আছে। সুখী হোক… সকলে সুখী হোক…

এই তার শেষ উচ্চারিত বাণী।

'মন্ত্রী হয়ে বড় গম্ভীর হয়ে গেছ তুমি।'

খোঁচা দেওয়া স্বভাব। রেয়াত করে না এতটুকু, সুযোগ পেলেই ছোবল। অথচ ভেতরে-ভেতরে যে আনন্দিত তা টের পাওয়া যায় ভঙ্গিতে, কাজে, আচরণে। ভরা-সুখে টইটুম্বুর, টুস্‌কি দিলে ঝরে পড়ে বুঝিবা! প্রধান মন্ত্রী হওয়ার ফলে উদ্বৃত্ত সময় নেই এতটুকু যে পত্নীর সঙ্গে হাল্‌কা চালে কথা বলেন কিছুক্ষণ, দায়িত্ব বেড়েছে অপরিসীম, রাজ্যের প্রতিটি খুঁটিনাটি ব্যাপারে লক্ষ্য রাখতে হয়। তিলে তিলে শক্তি-সমৃদ্ধ হয়েছে যশোর, ছোটখাটো উৎপাত লেগে আছে সব সময়, সেগুলো কাটিয়ে মূল লক্ষ্যে পৌঁছুতে বেশি দেরি নেই আর। স্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠাব মহান ব্রতে অবতীর্ণ হবার লগ্ন ঘনিয়ে এসেছে প্রায়।…হিজলী অভিযানে বিপুল জয় ঘটেছে তাঁদের। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর হৃদয়। সগর-দ্বীপে সৈন্যাবাস স্থাপন করা গেছে। ফলে মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের অত্যাচার কমেছে অনেক। জল-স্থল নিরাপদ হয়ে উঠেছে পূর্বের চেয়ে, পাঠানগণ পরাজিত হওয়ায় স্থলভাগ যেমন নিরাপদ তেমনি জলভাগ আপাতত শান্ত, বিশেষত পর্তুগীজ জলযোদ্ধা অসীম সাহসী ডোমিঙ্গ কার্ভালোর সাম্প্রতিক পতনের পর… সাধারণ লোকের মনে কার্ভালোর মৃত্যু রহস্যময়, রাজ্যের নানাশ্রেণীর লোকের কাছে তার মৃত্যুজনিত প্রতিক্রিয়া নানাভাবে প্রতিভাত, যেহেতু

প্রকৃত ঘটনা কেউ জানে না, কার্ভোলো···

'কী এত ভাবো বলো তো ? যখনই বাড়ি আসো, মনে হয়, ভাবনায় মাথা তুলতে পারছো না। দু-একটা কথা বললে কী ভাবনার খেই হারিয়ে যাবে ?'

এতক্ষণে হাসলেন শংকর। বললেন, 'বারাসাত থেকে আসার পর আমার একমাত্র চিন্তা ছিল কী করে নিজে প্রতিষ্ঠিত হব এবং হিন্দুরাজ্য গড়ে তুলব। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই যশোরে আসা। রাজা বসন্তরায়ের আশ্রয় গ্রহণ করব ভেবেছিলুম, পেলুম আরও দুঃসাহসী প্রতাপাদিত্যের আশ্রয়, তাঁর চিন্তাধারার সঙ্গে আমার চিন্তাধারার আশ্চর্য মিল। তাঁর সহচর হিসাবে কর্ম করে ক্রমে এই পদোন্নতি···যশোরের প্রধান মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত হতে পেরেছি। প্রভা, রাগ কোরো না, বাস্তবিক এই গুরু দায়িত্ব পালনে আমি এমনই ব্যাপ্ত থাকি যে তোমার সঙ্গে মন খুলে কথা বলতে পারি না আগের মতো। ভাবতে হয়, সব সময় যশোরের কথা ভাবি। ধুমঘাটে আসার পর কত ঘটনা যে ঘটল, কোনো ঘটনাই বিচ্ছিন্ন নয়, ভাবতে হয় সেজন্যে বেশি করে। শিক্ষা ও জ্ঞান বাড়ে তাতে। এখন যেমন ভাবছি কার্ভালো হত্যা, যশোরের অধিকাংশ লোকের ধারণা, কার্ভালোকে হত্যা করা হয়েছে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের নির্দেশে, হত্যাকারী বুঝি তিনি স্বয়ং—'

'তবে কে হত্যাকারী ?' প্রভা স্বামীর মুখের পানে তাকালেন, তরলতা অন্তর্হিত : 'সবাই বলে, আমি যাদের সঙ্গে কথা বলেছি, মহিলামহলের কথা মানেই তাদের স্বামীদের কথা ; মহারাজ নাকি সাক্ষাৎ-মানসে তাকে ডেকে পাঠান দরবারে, সরল বিশ্বাসে কার্ভালো দরবারে আসে এবং তখন তাকে বন্দী করার নির্দেশ দিয়ে কারাগারে হত্যা করা হয়। সত্যি নয় ?'

'তোমাদের মহিলামহলে তিল থেকে তাল হয়,' তিনি সরস হতে চাইলেন, 'তাল থেকে উত্তাল ভাবধারার বিকাশ···উচ্ছ্বাসের ফেনায় প্রকৃত তথ্য পড়ে যায় ঢাকা। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের হত্যা-অপবাদ আছে তা ঠিক, অন্তত তৎকর্তৃক বসন্তরায় হত্যা অক্ষমনীয় অপরাধ, আমি তাঁকে বারংবার

এ-বিষয়ে সচেতন করে এসেছি, হয়তো তোমাকেও তাঁর ইংগিত দিয়েছিলাম···এই হত্যার নেশায় তিনি স্বীয় জামাতাকে পর্যন্ত রেহাই দিতে চান নি তা-ও সর্বজনবিদিত, তিনি ক্রোধান্ধ হলে কিছুতে আত্মসংবরণ করতে পারেন না আমি বহুবার দেখেছি ; কিন্তু কার্ভালোকে তিনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন ঠাণ্ডা মাথায়, হয়তো অশুভ চিন্তা তাঁর মনে ছিল, কেননা সে-সময়ে তিনি পড়েছিলেন ভীষণ রাজনৈতিক সংকটে···কার্ভালোকে দমন করতে না-পারলে আরাকানরাজ মানরাজগিরির বন্ধুত্ব হারাতে হয়, এ যে কী সংকট···'

'কিন্তু আমি শুনেছিলাম,' প্রভাময়ী বললেন, 'শ্রীপুরাধিপতি কেদার রায়ের সেনাপতি ছিলেন কার্ভালো এবং তাঁর অধীনেই নৌবিভাগে অধ্যক্ষের কর্মে নিযুক্ত ছিলেন তিনি—'

'ঠিক শুনেছো।···এটা প্রথম দিকের ঘটনা। সন্দীপ তখন শ্রীপুরাধিপতির দখলে। মোগলেরা জোর করে এই সন্দীপ কেড়ে নেয় তাঁর কাছ থেকে··· কেদার রায়ের সঙ্গে মোগলদের এ নিয়ে মন-কষাকষি চলছিল, মোগলেরা সন্দীপ ছাড়বে না আর তিনিও সন্দীপ দেবেন না ; এ-রকম অবস্থায় দুঃসাহসী কার্ভালো প্রভুর অসংখ্য রণতরী সজ্জিত করে সোজা সন্দীপে চলে আসে এবং যুদ্ধ করে সন্দীপ দখল করে নেয়। তার কৃতিত্বে মুগ্ধ হয়ে কেদার রায় তাকে ওই দ্বীপের শাসনভার অর্পণ করেন। শাসনকর্তা হবার পর কার্ভালো পূর্বতন প্রভুকে অস্বীকার করে সমস্ত প্রকার সম্বন্ধ ছিন্ন করে দেয় এবং তার যা স্বভাব, দ্বীপবাসী প্রজাদের ওপর চালায় অত্যাচার। ফলে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে মুসলমান প্রজারা। বেগতিক দেখে কার্ভালো সাহায্য চেয়ে পাঠায় চট্টগ্রামের পর্তুগীজদের কাছে, কেদার রায়ের কাছে নয় ; কেননা ওরা, পর্তুগীজরা, সম্পূর্ণ সন্দীপ দখল করে ওখানেই ঘাঁটি স্থাপন করতে চেয়েছিল। বিদ্রোহী প্রজাদের দমন করে কার্ভালো তা পেরেছিল শেষ পর্যন্ত···সন্দীপের মালিক হয়ে বসে পর্তুগীজরা—'

'এ তো এক প্রকার বিশ্বাসঘাতকতা !'

শংকর বললেন, 'কেদার রায়ের আগে আরাকানরাজ সর্বপ্রথমে আশ্রয় দেন পর্তুগীজদের, তাঁর ধারণা ছিল ওরা আশ্রিত বা বাধ্য হয়েই থাকবে, কিন্তু তা থাকে নি···বরং বলা যায়, তাঁরা বেশি অত্যাচার করেছে। শুধু তাই নয়, উত্তরে চট্টগ্রাম ও দক্ষিণে পেগু অঞ্চলে দুর্গ নির্মাণ করে এমন দুর্দান্ত হয়ে উঠেছিল যে স্বীয় রাজ্য আক্রান্ত হতে পারে এই আশংকায় সর্বাগ্রে তিনিই নেমেছিলেন যুদ্ধে। কেদার রায় তাঁকে সাহায্য করেছিলেন একশত কোশা দিয়ে, আমাদের মহারাজা নীরব ছিলেন, কারণ তখনও রাজনৈতিক আবহাওয়া এমন জটিল হয়ে ওঠে নি, হাওয়া কোন্‌দিকে বয়, আমাদের লক্ষ্য ছিল তাই। সন্দীপের নিকট সমুদ্রে প্রবল যুদ্ধ বাধে, দু পক্ষই সমান শক্তিধর, সমুদ্রের জল রক্তে লাল হয়ে উঠল। কিন্তু দুর্ভাগ্য মানরাজের, পরাজিত হলেন তিনি, বহু মগ-বীর নিহত হয় সে-যুদ্ধে, তাদের মধ্যে অন্যতম মানরাজের পিতৃব্য সিনাবাদী। ফিরিঙ্গিদের ভয়ে মগেরা চট্টগ্রাম ত্যাগ করে পালাতে লাগাল দলে দলে···ক্ষেপে গেলেন মানরাজ, প্রতিশোধ নেবার জন্যে নিজরাজ্যবাসী পর্তুগীজ স্ত্রী পুরুষের উপর চালাতে লাগলেন নির্মম অত্যাচার—'

'ফলে উলুখাগড়াদের প্রাণ গেল। বিপন্ন হল যীশু-সম্প্রদায়। লোক-সেবারত পুণ্যাত্মা ধর্মজাযকগণ অকালে প্রাণ দিল ওদের হাতে—কিছু গেল পালিয়ে, লণ্ডভণ্ড সব···'

শংকর বললেন, 'ওদিকে কেদার রায়ের সেনানী কার্ভালো কর্তৃক সন্দীপ অধিকারের সংবাদ বঙ্গের রাজধানী রাজমহলে পৌঁছলে, সেখানেও যুদ্ধের আয়োজন হচ্ছিল, স্বয়ং মানসিংহ সেই যুদ্ধের হোতা। মগ-বিজয়ী কার্ভালো তখন শ্রীপুরে, মানসিংহের আদেশে সেনাপতি বীর মন্দা রায় বহু রণতরী নিয়ে অগ্রসর হলেন শ্রীপুরের দিকে···কালীগঙ্গার মধ্যে বেধে গেল যুদ্ধ, কার্ভালো এবারেও যুদ্ধজয়ী, মন্দা রায় নিহত হলেন। আহত হয়েছিল কার্ভালো নিজেও, একটি তীর এসে বিঁধেছিল কাঁধে, কদিন বিশ্রামের পর সে নিরাপদ মনে করল না শ্রীপুর, রওনা হল অন্যতম পর্তুগীজ উপনিবেশ

গোলি বা গুলু, আমরা যাকে হুগলী বলি, তার উদ্দেশ্যে—'

'সাংঘাতিক লোক তো কার্ভালো ঃ—'

শংকর বললেন, 'সমস্ত পটভূমি ঠিক না-বুঝলে আমাদের মহারাজার ভূমিকা অনুধাবন করতে পারবে না।···হুগলীতে ব্যাণ্ডেল নামক স্থানেই পর্টু-গীজদের উপনিবেশ। মোগলদের নবগঠিত ছোট একটি দুর্গ ও ৪০০ সৈন্য ছিল হুগলী অঞ্চলে, ব্যাণ্ডেল যেতে হলে হুগলী পার হতে হয় বলে মোগল সৈন্যরা ফিরিঙ্গি বা দেশীয় খৃষ্টানদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করত, কার্ভালো রেহাই পায় নি। দুর্গ থেকে কামানের গোলা পড়েছিল তার নৌকায়, সে পালিয়ে না-গিয়ে সদলে জলে ঝাঁপিয়ে তীরে ওঠে এবং ক্রোধে দুর্গ আক্রমণ ক'রে সমস্ত মোগল সৈন্য নিধন করে···সে তখন বীর-নামে পবিচিত হয়েছে, জলযুদ্ধে খ্যাতিমান—'

'কার্ভালো ব্যাণ্ডেলে কতদিন ছিল ?'

শংকর বললেন, 'তা কিছু জানা যায় না। সম্ভবত সংঘবদ্ধ হতে চেয়েছিল সে, যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি। কিন্তু ব্যাণ্ডেলে তখন পর্তুগীজ ও দেশীয় খৃষ্টানের সংখ্যা মাত্র পাঁচ হাজার, তাদের যথেষ্ট পরিমাণে না-আছে যুদ্ধোপকরণ না-আছে রণতরী···সৈন্যদল ভারি করা যায় নি তেমন। অথচ দুদিকে মহাশত্রু, একদিকে মানরাজ অপরদিকে মানসিংহ, যে কোনো অবস্থায় আক্রমণ করে বিপন্ন করতে পারে। এই সময়ে আমাদের মহারাজ আমন্ত্রণ জানান তাকে। কার্ভালো তখন নিরাশ্রয়, উপায়ান্তর-বিহীন, তৎক্ষণাৎ আমন্ত্রণ গ্রহণ করে সে যশোরের দিকে আসছিল···ভেবেছিল যশোরের শক্ত আশ্রয়ে হয়তো সে পরিত্রাণ পাবে···'

'মহারাজের আমন্ত্রণে কী সে-রকম প্রতিশ্রুতি ছিল ?'

শংকর বললেন, 'অবশ্যই ছিল। তা না-হলে আমন্ত্রণ শব্দটার কোনো মানে হয় না। সব দিক বিবেচনা করেই কার্ভালো যশোরে আসছিল সন্দীপ পুনরুদ্ধার করা যাবে ভেবে। কারণ, মহারাজের দূত তাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আমাদের উদ্দেশ্যের কথাও বলেছিল স্পষ্ট করে, আমরা চেয়েছিলাম

মগরাজের বিরুদ্ধে তার যুদ্ধ-সাহায্য। এ রকম সাহায্য চাওয়ার পিছনে যুক্তি ছিল। রাজনৈতিক আবহাওয়া তখন বেশ ঘোলাটে হয়ে উঠেছে, মানরাজ পেয়েছে বাকলার সাহায্য আর মানসিংহ তো বেজায় ক্ষেপে উঠে-ছেন মহারাজ প্রচলিত মুদ্রা দেখে। মুদ্রা প্রচলন মানে অপরের অধীনতা অস্বীকার…নিজেকে স্বাধীন রাজা রূপে ঘোষণা করা, যা মোগলের প্রতি-নিধির পক্ষে সহ্য করা কঠিন। আমরা আলোচনা করে স্থির কবেছিলাম এক্ষেত্রে মানরাজেব সঙ্গে সন্ধি করাই শ্রেয কারণ আমাদের প্রবলতম শত্রু মানরাজ নয়, মানসিংহ, যিনি মোগলেব প্রতিনিধি এবং মোগলের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করে যুদ্ধ ও জযলাভ করা আমাদের প্রধান লক্ষ্য—'

'মহারাজা কর্তৃক প্রচলিত মুদ্রা আমি দেখেছি। তার একপিঠে বাঙ্গলা অক্ষরে 'শ্রীশ্রীকালী প্রসাদেন ভবতি শ্রীমন্মহারাজ প্রতাপাদিত্য রায়স্য' লেখাটুকু পড়তে পেরেছি, অপর পিঠে বাঙ্গলা ভাষা বটে কিন্তু কোন্ অক্ষরে লেখা আমি বাপু বুঝতে পারি নি—'

শংকর বললেন, 'তা যদি বুঝতে তাহলে সত্যি তুমি পণ্ডিত-গৃহিণী হয়ে যেতে। ওটা বাঙ্গলা ভাষা হলেও ফার্সী অক্ষর, মহারাজ ফার্সীতে কত দক্ষ এ তার আরও একটা প্রমাণ…ছোটবেলায় তিনি রীতিমত ফার্সী রপ্ত করেছিলেন। লেখা আছে ঃ 'বজৎ সিক্কা বছিমো জরবে বাঙ্গাল মহারাজা প্রতাপাদিত্য জর্দাল।' অর্থ প্রায় একই—'

'এটা ঠিক বুঝতে পারছিনে মানরাজের সঙ্গে তোমরা কী ধরনের ব্যবহার করতে চেয়েছিলে? কার্ভালোকে আমন্ত্রণ জানানোর পিছনে উদ্দেশ্য কী খুব স্পষ্ট? একবার বলছো তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাঠাবার জন্যে ডেকেছো কার্ভালোকে আবার পরক্ষণে সন্ধি করাই শ্রেয় বলে জটিল করে তুলছো ব্যাপারটা। উলটো-পালটা শোনাচ্ছে নাকি?'

শংকর বললেন, 'মেয়েছেলেদের এইজন্যে রাজনীতি বোঝাতে যাওয়া বিড়ম্বনা। আমি তো গোড়াতেই বলেছি ব্যাপারটা জটিল। প্রকৃতপক্ষে কার্ভালোকে আমরা হাতে রাখতে চেয়েছিলাম, অস্ত্র হিসাবে সময়মতো তাকে ব্যবহার

করার বাসনা। মানরাজ অসন্তুষ্ট বুঝলে তাকে বন্দী করা অথবা তার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে রাজ্যজয়—একটা-কিছু করা হত অবস্থা বুঝে, কিন্তু তৎপূর্বে হরে শৌণ্ডিক এমন কাণ্ড করে বসল যে—'

'হরে শৌণ্ডিক আবার কে?'

শংকর বললেন, 'আমরা ডাকতুম হরে শৌণ্ডিক, প্রকৃত নাম হরি শৌণ্ডিক। নামের মধ্যে হয়তো একটা অবজ্ঞা-ভাব আছে কিন্তু লোকটা খুব সাধারণ নয়। দৈবের কৃপা লাভ করে যৌবনে লোকটা অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়, খ্যাতিমান বণিক। যশোর থেকে পণ্যভারাক্রান্ত ডিঙ্গা সে নানা দেশে প্রেরণ করত—অর্থাগম ছিল প্রচুর। কবে যেন কার্ভালো বা দলের লোক তার কতগুলো পণ্যতরী লুণ্ঠন করে, হরি শৌণ্ডিক সে কথা ভুলতে পারে নি, প্রতিশোধ নেবার জন্যে সে সুযোগের সন্ধান করছিল।···মহারাজের আমন্ত্রণে কার্ভালো যখন যমুনা-পথে যশোরে আসছিল তখন পুরনো রাজ-বাড়ির সামনে এই সুযোগ সে পেয়ে গেল অপ্রত্যাশিতভাবে। কার্ভালোর দল ভারি ছিল না বিশেষ, সে তৈরি ছিল না আদৌ, হরি শৌণ্ডিক সদল-বলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের ওপর···হত্যার নেশায় পেয়ে বসে, নির্বিচারে হত্যা করে যায় হরি শৌণ্ডিক, কার্ভালো বাদ যায় নি তা থেকে। পুরনো রাজবাড়িতে এই হত্যাকাণ্ড সাধিত হয়েছিল বলে সাধারণ লোকের ধারণা, এর পিছনে মহারাজের অদৃশ্য হাত আছে নিশ্চয়। অথচ আমি জানি, হরি শৌণ্ডিকের এই আস্পর্ধার কথা শুনে মহারাজ অত্যন্ত ক্রোধোদীপ্ত হন এবং তাকে স্বহস্তে নিধন করেন—'

'মানরাজের সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক এখন কেমন?'

শংকর বললেন, 'কার্ভালো হত্যার পর তাঁর মনোভাব প্রসন্ন। কিছুকাল তিনি শান্ত থাকবেন বলেই আমাদের ধারণা—'

'মানসিংহ?'

শংকর বললেন, 'তার জন্যেই আমরা দুশ্চিন্তিত। সর্বতোভাবে প্রস্তুত হয়ে আছি। তিনি সসৈন্যে এগিয়ে এসেছেন অনেকখানি পথ, আমরা তাঁর

আক্রমণ ঠেকাব—'

'তোমার কাছে কখনও কিছু চাই নি, বুঝতে পারছি মোগলের সঙ্গে তোমাদের যুদ্ধ অনিবার্য, যুদ্ধে যেতে বাধা দেব না, কোনোদিন তা দিই নি···তবু মেয়েমানুষের মন, ভয় যায় না কিছুতেই, আমার বাপু ভয় করছে ; তুমি কথা দাও এ-যুদ্ধে পরিণতি যাই হোক তুমি ফিরে আসবে···'

শংকর বললেন, 'প্রভা, কথা দিলাম। যদি ফিরে আসি, তোমার জন্যেই আসব—'

'সেনাপতি সূর্যকান্ত, শেষ সংবাদ কী ?'

সূর্যকান্ত সেইমাত্র দরবারে প্রবেশ করেছিলেন, যোদ্ধবেশ, অভিবাদন করে বললেন, 'মহারাজ, মানসিংহ কালিন্দী পার হয়ে বসন্তপুরে ছাউনি ফেলছেন···তিনি শনৈ শনৈ এগিয়ে আসছেন—'

'জগৎ সহায় দত্ত বাধা দেয় নি ?'

সূর্যকান্ত বললেন, 'দিয়েছিলেন। তাঁর দল প্রচণ্ড বাধা দিয়েছিল বলেই সে-জায়গাটার নাম হয়েছে জগদ্দল, দুর্গ থেকেও বাধাদান করা হয়, জগদ্দলে আমাদের দুর্গ সৈন্য কর্তৃক বাধাদানের ফলেই তাঁর অগ্রগমন ব্যাহত হয়েছে, নইলে তিনি যশোর-সন্নিকটে এসে উপস্থিত হতেন আরও আগে—'

'মানসিংহের সঙ্গে আমার পূর্বপরিচয় আছে, আমি জানি তিনি দুর্ধর্ষ সেনাপতি, তবু বলি বসন্তপুর থেকে তিনি যেন এক পা-ও এগিয়ে আসতে না পারেন···সমস্ত সৈন্য পাঠিয়ে দাও বসন্তপুরে।'

সূর্যকান্ত বললেন, 'আজ্ঞে আমি তাই করেছি, প্রাসাদ রক্ষার্থে কিছু সৈন্য রেখে সকলকেই পাঠিয়ে দিয়েছি তাঁর গতিরোধের জন্যে, মেঘের মতো জমাট বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে বসন্তপুরে—'

'মানসিংহ আমার কাছে দূত পাঠিয়েছিলেন একগাছি শৃংখল আর একখানি তরবারি দিয়ে, বেছে নিতে বলেছিলেন যে-কোনো একটা। তুমি জানো,

আমার ইংগিতে নকীব কেশব ভট্ট বেছে নিয়েছিল কোন্ জিনিসটি—'

সূর্যকান্ত বললেন, 'জানি মহারাজ। কেশব ভট্ট তুলে নিয়েছিল তরবারি এবং সে ঠিকই করেছিল। শৃংখল মানে বন্দীত্ব আর তরবারি গ্রহণের অর্থ যুদ্ধ এবং আমরা তাই চাই—'

'আচ্ছা সূর্যকান্ত, আমার রাজ্যে যে চৌদ্দটি দুর্গ নির্মাণ করা হয়েছে তাতে যথেষ্ট সংখ্যক সৈন্য মোতায়েন আছে তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ—'

'মানসিংহের সঙ্গে যুদ্ধে আন্দাজ কত সৈন্য প্রেরিত হয়েছে?'

সূর্যকান্ত একটুক্ষণ চিন্তান্বিত হলেন, 'তা বাহান্ন হাজার ঢালী, একান্ন হাজার ধানুকী, দশ হাজার অশ্বারোহী এবং ষোলশো হস্ত-বাহিনী। তাছাড়া অন্যান্য অস্ত্রধারী পদাতিক সৈন্য আছে কিছু—সর্বসমেত লক্ষাধিক তো বটেই—'

'আমার অনুমান, মানসিংহের সৈন্যসংখ্যা আরও বেশি। তাতে কিছু যায়-আসে না। নিতান্ত দৈব বিমুখ না-হলে এ-যুদ্ধে আমাদের জয় অনিবার্য। বিশেষত বর্ষাকাল এসে গেছে। বাঙলা দেশের বর্ষার সঙ্গে মানসিংহের বিশেষ পরিচয় আছে, সেজন্যে বাঙলাদেশে না-থেকে তিনি বরাবর বিহারে বাস করতেন। আমাদের সৈন্যবাহিনী যদি এই বর্ষাকাল পর্যন্ত মোগল-সৈন্যদের ঠেকিয়ে রাখতে পারে তাহলে যুদ্ধের আর প্রয়োজনই হবে না, খাদ্যাভাবে আর মারী-মড়কে তারা অচিরে কালগ্রাসে পতিত হবে··· প্রকৃতির হাতে ওরা চরম শিক্ষা পেয়ে যাবে!'

সূর্যকান্ত বললেন, 'হয়তো সেই শিক্ষাই পাবে ওরা। কারণ, দিন কেটে যাচ্ছে, আক্রমণের কোনো উদ্যোগ নেই, মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে দু-পক্ষের সৈন্যদল। ওরা আক্রমণ না-করলে আমরাও আক্রমণ করতে চাই না। বর্ষা এলে আমাদের জয় হবে সহজে এবং তা এসে গেছে ইতিমধ্যেই। মোগল শিবিরে হাহাকার উঠবে শিগগির···'

'তুমি বসন্তপুরে চলে যাও। শংকর কোথায়?'

'রণক্ষেত্রে—'

'কমল খোজা ? উদয়াদিত্য ? আর সবাই

'সকললেই রণক্ষেত্রে আছেন—'

'আচ্ছা যাও। সংবাদ পাঠাবে প্রতিদিন। নিজে আসবে অথবা লোক-মারফত—'

'যথা আজ্ঞা।' সূর্যকান্ত চলে গেলেন অভিবাদন করে।

কচু রায় ও রূপবসু পথ দেখিয়ে এনেছে—তাদের সঙ্গে ছিল 'তিন মজুমদার': ভবানন্দ, জয়ানন্দ ও লক্ষ্মীকান্ত (গঙ্গোপাধ্যায়: মজুমদার উপাধি)। যদিচ বর্ষা সমুপস্থিত তথাপি কতকগুলি তথ্য সংগ্রহের জন্যে তৎক্ষণাৎ যুদ্ধে লিপ্ত না হয়ে কিছুকাল অপেক্ষা করাই সুবিবেচনা মনে করলেন মানসিংহ, তিনি বহুযুদ্ধবিশারদ, শত্রুপক্ষের শক্তি সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত না-হয়ে যুদ্ধে নামার পক্ষপাতী নন। পিতৃহত্যায় ক্রোধান্ধ কচু রায় ও তৎআত্মীয় রূপবসু তথ্যাদি সংগ্রহে প্রভূত সাহায্য করলেও কার্যক্ষেত্রে পরীক্ষা করে নেওয়া দরকার, তাছাড়া বনোদ্যানের অন্তরালে কী-পরিমাণ শত্রুসেনা লুকিয়ে থাকতে পাবে তারও একটা হিসাব না-পেলে চলে না; কোন্‌খানে বারুদপূর্ণ সুড়ঙ্গ খনিত হয়েছে, কি-কি ধরনের কূটযুদ্ধে বঙ্গীয় সৈন্যগণ সুদক্ষ, এ-সব সংবাদ না-জেনে আসামাত্র যুদ্ধে নামা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। দেরি হল আরও এজন্যে যে তাঁর সমগ্র বাহিনী এসে পৌঁছোয় নি তখনও। বিরাট সৈন্যবাহিনী—কী নেই বাহিনীতে, হাটবাজার থেকে সুরু করে চিকিৎসার ব্যবস্থা, এমন-কি আমোদ-প্রমোদ বা ক্রীড়া-কৌতুকের ঢালাও আযোজন। মোগলের সংস্পর্শে থাকায় বিলাসিতার চরম সীমায় উঠেছিলেন তিনি, রঙ্গরস, রমণী-উপভোগ কোনো-কিছু অভাব ছিল না তাঁর বাহিনীতে···ব্যক্তি-জীবনে ঃ তাঁর স্ত্রীর সংখ্যা দেড় হাজার! যানবাহন ও রসদাদি সংবলিত সমগ্র সৈন্যদলের শিবির সন্নিবেশিত হতে তাই একটু

বিলম্ব হয়ে গেল।

বসন্তপুরে এসে তিনি দেখলেন চারিধারে যশোরেশ্বরের বিভিন্ন প্রকারের সৈন্যসমূহ ঘনীভূত মেঘমালার মতো সমবেত হয়েছে, এ স্থানটাই যে যশোর রাজ্যের পুরনো রাজধানী তা তিনি টের পেয়েছিলেন পরিখা-বেষ্টিত দুর্গ-প্রাকারের উপর সারি সারি সুসজ্জিত কামান-শ্রেণী দেখে। পার্শ্ববর্তী স্থলভাগ বারকপুর ও পরবাজপুর প্রভৃতি স্থানে যেমন অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যসমূহ সমবেত হচ্ছে, তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন, জলভাগে যমুনায় তেমনি, ঘন-সন্নিবিষ্ট রণতরীগুলি অনলবর্ষী তোপ-দ্বারা সজ্জিত হয়ে তীর লক্ষ্য করে শ্রেণীবদ্ধ···মাস্তুলে মাস্তুলে মধ্যাহ্ন-সূর্য চিহ্নিত পতাকা সগর্বে উড্ডীন।

সুতরাং এ স্থানেই যে যুদ্ধ হবে তা বুঝতে তাঁর বিলম্ব হল না—আরও ভিতরে প্রবেশ করতে দেওয়ার মতলব, প্রজাসাধারণের ধনপ্রাণ লুণ্ঠনের সুযোগ যাতে না-পাওয়া যায় সেজন্যে ধুমঘাটের পাঁচক্রোশ আগেই মোগল সৈন্যের গতিরোধ করা হয়েছে। মোগল-সৈন্য যে-পথ দিয়ে এসেছে তার দুই পার্শ্ব লুণ্ঠনে ও অত্যাচারে জর্জরিত করেছে—এক জগদ্দল ব্যতীত প্রবল বাধা আসে নি কোনো স্থান থেকেও। জানা আছে প্রতাপাদিত্য প্রজাদরদী রাজা এবং শক্তিমান—তার যুদ্ধরীতির সঙ্গে পরিচয় আছে যৎসামান্য, উড়িষ্যা-অভিযানে তার সক্রিয় সহযোগিতা পাওয়া গিয়েছিল, এখন তার পাখা গজিয়েছে। নইলে এমন দুঃসাহস কীভাবে হয় যে মোগল-বাদশার অধীনে বাস করে স্বাধীন রাজার মতো স্বনামে মুদ্রা প্রচলন করে? এ ঔদ্ধত্য ক্ষমা করা যায় না। তদুপরি দূতহস্তে প্রেরিত শৃংখল ও তরবারির মধ্যে দ্বিতীয়টি বেছে নেওয়ায় তার মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, মোগলের সঙ্গে যুদ্ধ চায় প্রতাপাদিত্য।···বেশ তাই হবে, কে কত শক্তি ধরে পরখ করা যাবে।···তৈরি থেকো।

'প্রতাপ, তোমার চেয়ে আমার সৈন্যশক্তি অনেক বেশি।' তিনি মনে মনে বললেন, 'অপেক্ষা করছি বলে ভেবো না, আমি ভয় পেয়েছি! আমি

বিলাস-সুখে মগ্ন থাকতে পারি কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী···তুমি আমার শক্তির পরিমাপ জানো না বলে বালকের মতো ঔদ্ধত্যে আমার প্রেরিত শৃংখল গ্রহণ-না করে তরবারি বেছে নিয়েছো। আগুনে হাত দিয়েছো তুমি, বালকের হাত বলে আগুন তাকে রেয়াত করে না, তার হাত পুড়ে যায়।···'

শিবির মধ্যে পায়চারি করতে করতে থামলেন একটু। আবার বললেন মনে মনে, 'তুমি জানো না প্রতাপ, কারা আমাকে পথ দেখিয়ে যশোরে এনেছে এবং সমস্ত তথ্য দিয়ে গোপনে সাহায্য করছে, তারা এই শিবিরেই আছে, আমার আশ্রিত। আমি তাদের অতি যত্নে রক্ষা করছি। তারাই আমার প্রধান অস্ত্র। কচুরায় আর রূপবসুকে তোমার মনে আছে নিশ্চয়, কিন্তু তিন মজুমদারের কথা? একজন নিহত গোবিন্দরায়ের সহচর ছিল, তোষামোদকারী উচ্চাভিলাষী, তিনজনেই অল্পবিস্তর তাই···বাঙালী এত তোষামোদকারী ও স্বার্থপর তা আমার জানা ছিল না, ওদের জন্যেই হারবে তুমি। জ্ঞাতি-বিদ্বেষ ও বিশ্বাসঘাতকতাই হবে তোমার পতনের কারণ। ভবানন্দ ও জয়ানন্দ ভবঘুরে, অনুগ্রহ-লাভের আশায় তারা যোগ দিয়েছে মোগল-পক্ষে, কিন্তু লক্ষ্মীকান্ত কেন এল বুঝতে পারছি না···তাকে তুমি বিশ্বাস করে উচ্চ-পদে প্রতিষ্ঠিত ক' ছিলে, সে তোমারই অনুগৃহীত একজন ; গোপনে আমার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করছে, অন্যপক্ষে সে আমার গুরুভাই, লক্ষ্মীকান্তের বাবা কামদেব গঙ্গোপাধ্যায় একজন···'

'হুজুর—'

প্রহরী এসে দাঁড়াল অভিবাদন করে।

'কী খবর?'

প্রহরী বললে, 'হুজুর, শিবিরে শিবিরে নানা ব্যাধি দেখা দিয়েছে, এখানকার জলহাওয়া কারো সহ্য হচ্ছে না। চিকিৎসা সত্ত্বেও পেটের পীড়ায় অনেকে কাহিল। আমরা ক্রমশ হীনবল হয়ে পড়ছি—'

'এখন যুদ্ধ আরম্ভ করছি না। দু-চারদিনে যাতে চাঙ্গা হয়ে যায় তার ব্যবস্থা করো। যশোরে আসতে আসতে পথে যে-সব মেয়েছেলে ধরে আনা

হয়েছে, সেবার জন্যে ওই-সব শিবিরে তাদের পাঠিয়ে দাও—'

প্রহরী বললে, 'আর-একটি দুঃসংবাদ আছে হুজুর।'

'বলো—'

প্রহরী বললে, 'এইভাবে বসে থাকার ফলে এবং লুণ্ঠন করার সুযোগ না-থাকায় আমাদের রসদের ভাণ্ডার প্রায় শূন্য। এখনই কিছু রসদ সংগ্রহ না-করলে—'

'রসদ! রসদের দিকটা তো আমি তেমন চিন্তা করি নি!' বিচলিত হলেন তিনি: এখন রসদ পাই কোথা? চারদিকে প্রতাপের সৈন্য। সামান্য নড়াচড়া হলেই ওরা ধরে নেবে আমরা যুদ্ধে অবতীর্ণ হচ্ছি—বেধে যাবে ভয়াবহ সংগ্রাম-

'হুজুর, তাহলে?'

মানসিংহ একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন, দ্রুত কি-যেন চিন্তা করে নিলেন। বললেন, 'তুমি তিন মজুমদারকে পাঠিয়ে দাও এখনই। দেখি ওরা কিছু করতে পাবে কিনা'

তলব মাত্রেই তিন মজুমদার এসে হাজির

'হুজুর, আমাদের স্মরণ করেছেন?'

মানসিংহ বললেন, 'শোনো' আমাদের রসদ নিঃশেষিত। তোমরা এ-বিষয়ে যদি আমাকে সাহায্য করতে পাবো তাহলে কথা দিচ্ছি তোমাদের প্রত্যেককে দু'হাত ভরে পুরস্কার দেব, এমন পুরস্কার যা অধস্তন সাত পুরুষেও নিঃশেষ করতে পারবে না। সম্ভব?'

তিন মজুমদার মাথা চুলকে পর-পর কয়েকটা ঢোঁক গিলল। যেন খাবি খেতে লাগল। পরস্পরের মুখের পানে তাকাতে লাগল বোকার মতো।

'কী হল? পারবে না?'

জয়ানন্দ মজুমদার সাহস করে বললেন, 'হুজুর, এই বিরাট বাহিনীর রসদ সংগ্রহ করা কঠিন ব্যাপার। যশোর যদিচ সোনার দেশ, অন্ন-বস্ত্রের সংকট কদাচ নেই, তবু কিভাবে এই বিপদে আপনার উপকারে লাগতে পারি

সেজন্যে আমাদের ভাবতে সময় দিন একটু—'

'বেশ। যত খুশি ভাবো। কিন্তু মনে রেখো আজকের রাতটুকুই সময়, আগামীকাল সকালের মধ্যেই এই রসদ চাই—'

ভবানন্দ মজুমদার জিব দিয়ে ঠোঁট চেটে নিলেন একবার : 'আমাদের ওপর নির্ভর করতে পারেন হুজুর। আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করব—'

'ঠিক আছে। কাল সকালে বোঝা যাবে তোমাদের ক্ষমতার দৌড়। যাও, নিজেদের শিবিরে গিয়ে ভেবে বার করো, এ-সংকটে মুক্তি পাওয়া যায় কী করে? রসদ এসে পৌঁছলে আমি আর দেরি করব না, যুদ্ধের আদেশ দেব—প্রতাপকে শিক্ষা দিয়ে আরও একটু অগ্রসর হতে চাই—শ্রীপুরের কেদার রায় মাথা তুলতে চাইছে, এই সঙ্গে তাকেও শিক্ষা দিয়ে যাবার বাসনা আছে—'

লক্ষ্মীকান্ত বললেন, 'আমরা তবে আসি হুজুর।'

'হ্যাঁ, এসো—'

তিন মজুমদার অভিবাদন করে বেরিয়ে এলেন বটে কিন্তু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত··· চতুর্দিকে সৈন্য মোতায়েন করে বসন্তপুর থেকে ধুমঘাট পর্যন্ত পাঁচক্রোশব্যাপী স্থানের যা অবস্থা নিকটবর্তী গ্রামের সকল অধিবাসীই তো প্রাণের ভয়ে ধুমঘাটে চলে গেছে আগে থেকে, তদুপরি সময় মাত্র আজকের রাত্রিটি, কোথা থেকে রসদ সংগ্রহ করা যায়? দুশ্চিন্তা বই কি! অথচ কথা দিয়ে এসেছে যে···

ভবানন্দ বললেন, 'লক্ষ্মীকান্ত, তুমি একটা পথ বাতলাও ভাই। তোমার বুদ্ধি আছে। এ-সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেলে আমরা আর কোনোদিন দাঁড়াতে পারব না—'

'সাহস হবে তোমাদের কারো? বুদ্ধি একটা এসেছে। কিন্তু ঝুঁকি নিতে হবে বিস্তর। এ ভিন্ন আমি আর অন্যপথ দেখি না—'

'শুনি, শুনি।' দুই মজুমদার একযোগে ঘিরে ধরলেন তাঁকে।

লক্ষ্মীকান্ত ওদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখে হাসলেন।

'আমার রহস্যময় জন্মবৃত্তান্ত ও জীবনযাত্রা তোমরা জানো। বাবা ..
বরাবর সংসার-নিরাসক্ত ব্রহ্মচারী প্রকৃতির মানুষ ছিলেন এবং-জন্মের পরই আমি মাকে হারিয়েছিলাম—'

অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন জয়ানন্দ: 'জানি রে বাবা জানি। তুমি অনেকবার সে-বৃত্তান্ত বলেছো। তোমার মায়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করার পর তোমার বাবা সংসার ত্যাগের পথ খুঁজছিলেন, অথচ তুমি নিতান্ত শিশু, সেই সময় তিনি দেখতে পান তাঁর সম্মুখে একটি টিকটিকির ডিম ভেঙে গেল উপর থেকে পড়ে, তা থেকে লালাজড়িত এক শাবক বেরিয়ে নিশ্চল হয়ে পড়ে রইল আর এক মক্ষিকা এসে সেই লালা ভক্ষণ করতে লাগল··· লালা-বিমুক্ত হওয়া মাত্রই শাবকটি মক্ষিকাকে ধরে উদরসাৎ করে ফেলল। এ দৃশ্য দেখে তাঁর নাকি দিব্যজ্ঞান হয়, বুঝতে পারেন জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি, সদ্যঃ প্রসূত সন্তানের রক্ষার ভার শ্রীভগবানের উপর সমর্পণ করে তোমার পিতৃদেব অতঃপর গৃহত্যাগ করে চলে যান—'

'এও বলেছিলে যে তিনি কাশীধামে গিয়ে দণ্ডী সন্ন্যাসী হন।' ভবানন্দ যোগ করে দিলেন, 'আমরা জানি মানসিংহ বঙ্গে আসার পথে কাশীধামে ছিলেন কিছুদিন, তখন তোমার বাবার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি তাঁর নিকট শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হন। সেদিক থেকে, তুমি মানসিংহের গুরু-ভাই। কিন্তু এতদ্দ্বারা তুমি কী বলতে চাও তা আমাদের বোধগম্য হচ্ছে না—'

লক্ষ্মীকান্ত বললেন, 'দৈব সহায় না-থাকলে আমি রক্ষা পেতাম না আর ভাগ্য সাহায্য না-করলে ধাপে ধাপে এত উঁচুতে উঠতে পারতাম না। দৈব আর ভাগ্যের কথাটাই বোঝাতে চেয়েছিলাম—তারা কণামাত্র সহযোগিতা করলে তোমাদের জীবনের ধারা সম্পূর্ণ বদলে যেতে পারে—'

'শুনি তোমার পরামর্শ?'

লক্ষ্মীকান্ত বললেন, 'শুধু আমি কেন তোমরাও জানো, সকলেই জানে, মহারাজ প্রতাপাদিত্য মুক্তহস্ত দাতা, নিত্য প্রভাতকালে জাতিধর্মনির্বিশেষে

তিনি যে পরিমাণ দানধর্ম করেন তাতে তাঁকে দানবীর আখ্যা দিলে নিতান্ত অত্যুক্তি হয় না। আমার পরামর্শ এই যে, আমাদের হাতে যখন সময় কম এবং বিরাট মোগল-বাহিনীর রসদ সংগ্রহ প্রায় অসম্ভব তখন আমাদের মধ্যে কোনো একজনের আগামীকাল প্রত্যুষে মহারাজের দরবারে উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন। যুক্তিপূর্ণ কারণ দেখিয়ে এই রসদ প্রার্থনা করলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে। মহারাজ প্রতাপাদিত্য কখনও কাউকে বিমুখ করেন না—'

'ঠিক বলছো।' জয়ানন্দ মজুমদার যেন লাফিয়ে উঠলেন: 'এতে সাপও মরে লাঠিও ভাঙে না। কিন্তু যাবে কে? আমার বাপু এত সাহস হয় না।'

লক্ষীকান্ত বললেন, 'আমি তো গোপনে সংযোগ রেখেছি তোমাদের সঙ্গে, প্রকৃতপক্ষে আমি তাঁর কর্মচারী। আমার দ্বারা এ-কাজ সম্ভব নয়—'

'বাকি থাকছি আমি শ্রীভবানন্দ মজুমদার।' জোরের সঙ্গে তাঁর ঘোষণা: 'তোমাদের কারো যাবার দরকার নেই; নাচতে যখন নেমেছি, ভাল করেই নাচব—আমি যাব—'

এবং যে-কথা সেই কাজ।

···যজ্ঞ, যজ্ঞানুষ্ঠান উপলক্ষে লক্ষাধিক ব্রাহ্মণ ভোজন করা হবে এই ছিল অজুহাত। দেশের বর্তমান অবস্থায় কোথাও চাল সংগ্রহ করা যায় নি, তাই ধর্মরক্ষক দেশের রাজার কাছে এসে বিনীত প্রার্থনা, যজ্ঞ রক্ষা করে অধমকে উদ্ধার করুন। ভাষার বাঁধুনি খুব, ভঙ্গিতে ধর্মরক্ষার আবেদন, কণ্ঠস্বরে প্রগাঢ় আন্তরিকতা। লক্ষাধিক লোকের আহারের প্রার্থনা!

সামান্য দ্বিধা। প্রতাপাদিত্য মুহূর্তকাল তাকালেন প্রার্থীর মুখের পানে। চেনা-চেনা মুখ। কোথায় যেন দেখেছেন ওকে। পুরনো রাজবাড়িতে কী? হ্যাঁ তাই! গোবিন্দরায়ের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করত, তার সহচর। আহা গোবিন্দরায়কে তিনি নিজের হাতে···হয়তো তারই আত্মার শান্তি-কামনায় এ যজ্ঞ, এখন যুদ্ধের সময়, রসদ মজুত রাখা অতি প্রয়োজন, তা হোক···দ্বিধামনে কোনো দান করতে নেই, দ্বিধা মানে পাপ; তিনি

প্রয়োজনারিক্ত দানের আদেশ দিলেন।

ভবানন্দ সেই চাল এনে তুলে দিলেন মানসিংহের রসদ-ভাণ্ডারে।

একজনের দৈব সহায় অন্যজনের দৈব প্রতিকূল।

···যুদ্ধ বেধে গেল সেদিন থেকেই। মানসিংহ প্রস্তুত হয়েছিলেন সর্বতো-ভাবে, যুদ্ধ চলল কিছুদিন ধরে, বসন্তপুর থেকে ধুমঘাট পর্যন্ত নানাস্থানে প্রচণ্ড সংঘর্ষ বাধল। অগ্নিযুদ্ধে বিব্রত হয়ে পড়লেন মানসিংহ, প্রতাপা-দিত্যের পর্তুগীজ কর্মচারীদের অধীন গোলন্দাজেরা যেমন সুকৌশলী তেমনি অসমসাহসী, কোথা দিয়ে কিভাবে যে গোলা চালায় টের পাওয়া যায় না। ঢালী সৈন্যরাও তেমনি, অদ্ভুত রণ-ক্রীড়া ওদের, বিশেষতঃ কুকীসৈন্যদের সঙ্গে পেরে ওঠা ভার। শুধু একটা হিসাব ছিল প্রতাপাদিত্যের সৈন্যসংখ্যা যদি হয় একলক্ষ, তিনি সঙ্গে এনেছিলেন তিন লক্ষের অধিক···কতদিন লড়বে ওরা, পালটা মার খাবেই, তাঁর সৈন্যরাও হীনবল নয়।

প্রথম দিকে বিপুল তেজে প্রতাপাদিত্যের সৈন্যবাহিনী আক্রমণ চালিয়ে গেল, মোগল-সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় আর-কি, উল্লাসে গগন বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল—অকস্মাৎ ছেদ পড়ল। ঢালী-সেনাপতি মদন মল্ল সসৈন্যে এগিয়ে যাচ্ছিল ধানুকী-সেনাপতি সুন্দরের বাহিনীর সঙ্গে, অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছিল ওরা···প্রধান সেনাপতি সূর্যকান্ত ছিলেন সবার আগে, বিপুল ত্রাসের সঞ্চার করে তাঁরা যখন সংহার-মূর্তি ধারণ করেছেন সেই সময় কিভাবে যেন একটি গোলা এসে লাগে সূর্যকান্তের বুকে, তাঁর পতন হয়। সৈন্যদের মধ্যে তবু কোনো চাঞ্চল্য ছিল না—মদন মল্লের হুংকারে ও দাপটে মোগল-সৈন্য পিছু হটে যাচ্ছিল ক্রমাগত, একটি বর্শা এসে বিঁধল তার পিঠে, মদন মল্ল পড়ে গেল। সুন্দরের ধানুকী-বাহিনী অপ্রতিহত তবু, ঝাঁকে ঝাঁকে তীর বর্ষণ করে বিব্রত করে তুলছিল প্রতিপক্ষকে কিন্তু সে-ও বেশিক্ষণ আত্মরক্ষা করতে পারল না, প্রাণ দিতে হল শত্রুর প্রতি-আক্রমণে।···তিন মহারথী নিহত যুদ্ধের দ্বিতীয় দিনে বসন্তপুরে, প্রথম দিনের যুদ্ধে জয়-পরা-জয় নির্ধারিত হয় নি; অধিকন্তু দুঃসংবাদ প্রধান মন্ত্রী শংকর চক্রবর্তী আহত

অবস্থায় শত্রুকর্তৃক ধৃত এবং মুকুন্দপুরের দুর্গ হাতছাড়া হয়ে গেছে। সংবাদগুলো একের পর এক আসছিল, মনোবল ভেঙে যাবার পক্ষে যথেষ্ট, তবু সন্ধি নয়। মানসিংহ সন্ধির প্রস্তাব করে পাঠিয়েছিলেন, প্রতাপাদিত্য প্রত্যাখ্যান করে ফিরিঙ্গি সেনাপতি রডাকে ডেকে পাঠিয়ে তৃতীয় দিনের যুদ্ধের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগে প্রস্তুত হতে নির্দেশ দিলেন…ওরা এসে গেছে ধুমঘাটের অপর পারে, এখনই গতিরোধ করা দরকার। কিন্তু বিধি বাম। ফিরিঙ্গি রডা ভয়ংকর মূর্তি ধারণ করে মোগল-পক্ষে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি সাধন করা সত্ত্বেও বেশিক্ষণ যুদ্ধ চালাতে পারে নি—সে কালগ্রাসে পতিত হয়। পরাজয় অনিবার্য হয়ে ওঠে। এবার সন্ধি স্থাপন না-করে উপায় নেই। তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন মোগল-সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে এগিয়ে আসছে খুল্লতাত ভ্রাতা কচুরায় এবং স্বপক্ষীয় সৈন্যবাহিনীর অনেকের মনে বসন্ত-রায়-হত্যার স্মৃতি জাগরূক থাকায়, বুঝতে পারা যাচ্ছিল, সহানুভূতি উদ্রিক্ত হয়েছে তার প্রতি। জানা গিয়েছিল, কচুরায় যাতে পৈত্রিক রাজ্য ফিরে পায় সেজন্যে শত্রুমিত্র সকলেরই মনোবাসনা তাই। অতএব সন্ধি ছাড়া গত্যন্তর কই।

উভয়ের মধ্যে স[illegible] সংস্থাপিত হল।

মানসিংহ সন্ধি করার ব্যাপারে ব্যস্ত হয়েছিলেন এই কারণে যে তিনি সেনাপতি কিল্‌মক্‌কে শ্রীপুরে পাঠিয়েছিলেন কেদার রায়ের বিরুদ্ধে, সংবাদ পাওয়া গেছে, শ্রীপুরে সৈন্যসহ তিনি আছেন অবরুদ্ধ অবস্থায়—যথাশীঘ্র তাঁকে উদ্ধার করতে হবে। এই কাজটা জরুরি।

উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত মর্মে সন্ধি স্থাপিত হয়ঃ

এক, রাঘব বা কচুরায় পৈত্রিক সম্পত্তি অর্থাৎ যশোর রাজ্যের ছয় আনা অংশ পাবে এবং যশোরের প্রাচীন রাজধানী বসন্তপুরে অধিষ্ঠান করবে, তাকে উপাধি প্রদান করা হল, 'যশোহরজিৎ'।

দুই, প্রতাপাদিত্যকে যশোর রাজ্যের দশ আনা অংশ এবং স্বোপার্জিত অন্যান্য বহু পরগণার মালিক হয়ে, মোগল বাদশাহের সামন্তরাজ হিসাবে

পরিচিত হতে হবে। তাঁর সৈন্যসামন্ত, দুর্গ বা রণতরী যেমন ছিল তেমনি থাকবে, কেবল স্বাধীনতার চিহ্ন মধ্যাহ্ন সূর্য অংকিত পতাকা ও স্বনামাংকিত মুদ্রা বিলুপ্ত করে ফেলতে হবে।

তিন, উভয়পক্ষের বন্দীদের বিনাপণে ফেরত দিতে হবে।

সন্ধিপত্র সম্পাদিত হবার পর যশোরের কাজ মিটে গেল অনেকখানি। যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তা-ও দ্রুত সম্পাদন করলেন মানসিংহ। রাঘব রায়কে উপযুক্ত সংখ্যক রক্ষী-সৈন্য ও শিরোপা দিয়ে পুরনো যশোরে প্রতিষ্ঠা করে দিলেন তাড়াতাড়ি। আহত ও বন্দী শংকর চক্রবর্তীর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে মুক্তি দিলেন এই সর্তে যে তিনি কখনও বাদশার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন না···শংকর চক্রবর্তী মাথা নিচু করে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন। বয়স হয়েছে, আর কখনও হয়তো যুদ্ধে নামা যাবে না, স্ত্রী প্রভার কথা মনে পড়ল, মুক্তি পেয়ে তিনি সেইদিকে পা বাড়িয়ে দিলেন।···বাকি রইল শুধু তিন মজুমদার। তাদের সহযোগিতা না-পেলে এ যুদ্ধজয় কখনই সম্ভব হত না, ওদের কাছে কথা রাখতে হবে, পুরস্কার দিতে হবে হাত ভরে। এখন থাক্, বাদশার কাছ থেকে ওদের নামে সম্পদের ডালি এনে পাকা ব্যবস্থা করা যাবে। এখন শ্রীপুরের দিকে যাত্রা, কেদার রায়ের ঔদ্ধত্য সীমাহীন হয়ে উঠেছে, তাকে সমুচিত শিক্ষা দিয়ে ফিরে যেতে হবে জয়পুর, বঙ্গদেশের বিশ্রী আবহাওয়ায় কেটে গেল অনেকগুলো দিন···

যুদ্ধে কেদার রায় পরাজিত ও নিহত হলেন। শ্রীপুর ত্যাগ করার পূর্বে তিনি কেদার রায়ের ইষ্টদেবতা শিলাদেবীকে সঙ্গে নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

'পাছে উঠীনে কেদার কায়ত কো রাজা ছো। সো রাজা বাজৈ ছো। সো উকৈ সিলামাতা ছী। সো মাতাকা প্রতাপ সে উনে কোই ভী জীৎ তো নহী।···অর মাতা নেঁলে আয়া। আর বংগাল্যা নেঁ পূজন সোঁপো অর উঠা সূঁ কুঁচ করি আয়া।'

ঃ অনন্তর ঐ দিকে কেদার কায়েতের রাজ্য ছিল। তিনি রাজা নামে অভিহিত

হতেন। তাঁর নিকট শিলামাতা ছিলেন। সেই শিলামাতার প্রভাবে তাঁকে (কেদারকে) কেহই জয় করতে পারত না।···মাতাকে নিয়ে এলেন। এবং বাঙ্গালীদের উপরে তাঁর পূজার ভার অর্পণ করলেন। অতঃপর, সেখান থেকে কুচ করে যাত্রা।—জয়পুরী ভাষায় লিখিত পুরোহিতগণের বংশাবলী ঃ অনুবাদ—সতীশচন্দ্র মিত্র।

এই সময়ে আকবরের রাজ্যের উত্তরাধিকারী নির্বাচন নিয়ে বিষম গোলো-যোগ উপস্থিত হয়। ব্যস্ত হয়ে পড়লেন মানসিংহ। অথচ তিন মজুমদারের গতি করা হয় নি এখনও। একজন তো সঙ্গেই আছে, হয়তো আগ্রা পর্যন্ত যাবে সে। তৎপূর্বে অন্য দুই মজুমদারের ব্যবস্থা করে যেতে হবে। জয়ানন্দের ভূমিকা ছিল সামান্য, তিনি লাভ করলেন বাঁশবেড়িয়া অঞ্চল। বুদ্ধিদ্বারা সহযোগিতা করেছিলেন লক্ষ্মীকান্ত, তিনি গুরুভাইও বটে, তাঁকে দান করা যায় হাত খুলে ঃ মাগুরা, খাসপুর, কলিকাতা, পাইকান ও আনোয়াতপুর এই পাঁচটি দান করা যায় অনায়াসে। ভবানন্দের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি, চলুক আগ্রা, সেখান থেকে দেওয়া যাবে ফরমান বা সনন্দ—হয়তো নহবৎ ডঙ্কা নিশান ইত্যাদি পেয়ে যাবে সম্মানসূচক দান হিসাবে, স্বদেশে ফিরবে একেবারে মাথা উঁচিয়ে। ওকে দেওয়া হবে চৌদ্দটি পরগণা ঃ বাগোয়ান, মহৎপুর, নদীয়, মারূপদহ, লেপা, সুলতানপুর, কাশিমপুরা, বয়সা ও মশুণ্ডা।

···প্রতাপ বীর, উড়িষ্যাভিযানে তার বীরত্বের কথা মনে আছে, যশোরের যুদ্ধে বঙ্গীয় বীরের অসাধারণ রণ-কৌশল দেখে কে না মুগ্ধ হবে; নিস্তেজ করা গেছে, হয়তো নিধন করা যেত, জ্ঞাতি-বিদ্বেষ ও বিশ্বাসঘাতকতাই যে তার পরাজয়ের কারণ এই সত্যটুকু প্রতিষ্ঠা করে আসা গেছে, বাঙলা ও বাঙালির দুর্ভাগ্য যে এতবড় একটা প্রতিভা আত্মপ্রকাশের সম্যক সুযোগ পেল না। প্রতাপ টলিয়ে দিতে পারত মোগল-সাম্রাজ্য, প্রতিষ্ঠা করতে পারত স্বাধীনতা, সকল জাতির শ্রদ্ধা পাবার মতো অটুট ব্যক্তিত্ব। দৈব-প্রেরিত পুরুষ, ক্ষণজন্মা। চিন্তা করে মাঝে মাঝে আচ্ছন্ন হয়ে যান

মানসিংহ।

'আপনি ওকে বন্দী করে আগ্রা নিয়ে যেতে পারতেন।' জয়পুর থেকে আগ্রার পথে যাত্রা করেছিলেন মানসিংহ, সঙ্গে ভবানন্দ, তার আক্ষেপ ঃ

'পারতেন নাকি ?'

'লোকে আমাকে বীর বলে,' মানসিংহ উত্তর দিলেন ঃ 'আমি যেমন স্বস্বার্থে বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার দিয়ে থাকি তেমনি বীরের মহত্ত্বে নতমস্তক হতে কুণ্ঠিত হই না। প্রতাপাদিত্য যথার্থ বীর, তাকে বন্দী করে আগ্রায় নিয়ে গেলে বীরের অপমান হত, আমি তা চাই নি. আমার পরে অন্য কেউ এ-কাজ করুক। আমি তার সম্মানটুকু রক্ষণ করে এসেছি এই আমার সান্ত্বনা…'

ভবানন্দ একেবার চুপ। ওঁরা রাজধানীতে প্রবেশ করেছেন। আগ্রার দুর্গ দেখা যাচ্ছিল।